মানবেন্দ্রনাথ

জীবন ও দর্শন

ঃ রচনা ঃ

স্বদেশরঞ্জন দাস

ঃ ভূমিকা ঃ

মানবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত The Radical Humanist পত্রিকার বর্তমান
সম্পাদক ও অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভারতবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

শ্রীশিবনারায়ণ রায়

—প্রাপ্তিস্থান—

THE RADICAL HUMANIST

15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

প্রকাশক : স্বদেশরঞ্জন দাস
র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মুভমেণ্ট
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা— ১২

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

মূল্য—১৫·০০

প্রচ্ছদ : শ্রীরামচন্দ্র দাস

মুদ্রক : শ্রীনিত্যানন্দ চৌধুরী
নিউ এ্যাসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স
৩, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

আমার মানবতন্ত্রী বন্ধু, সহকর্মী ও
মননশীল দেশবাসীর করকমলে—

গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য বই :

সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রুশিয়ার চিঠি

মার্ক্সীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি

রায়

সমবায় আন্দোলন

মানবের জয়যাত্রা

Why Co-operative Commonwealth ?

নিবেদন

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একখানি ছোট্ট জীবনী লিখেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম, "রায়"। সেখানি তিনি পড়েও ছিলেন। তারপর আবার লিখছি। কিন্তু এবারের প্রচেষ্টা সহজ নয়। এখন তিনি নেই। লিখতে গেলে তাঁর জীবনের সকল কথাই লিখতে হয়, তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

কারণ, ভারত, এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপে ত্রিশ বছরের উপর তিনি যে-সকল বৈপ্লবিক কার্য-কলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ যতদূর সম্ভব তিনি সযত্নে মুছে ফেলার চেষ্টা করতেন। রায়ের প্রকৃত জীবনী লিখতে হলে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন ;

(১) ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় পুলিশের রিপোর্ট ;

(২) ব্রিটিশ পুলিশের রিপোর্ট ;

(৩) ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত দক্ষিণ-এশিয়ার দেশ-সমূহে তাঁর কার্যাবলীর যথার্থ বিবরণ ;

(৪) ১৯১৬—১৯ সালের মার্কিন পুলিশের রিপোর্ট ;

(৫) ১৯১৭—১৯ পর্যন্ত মেক্সিকোর কার্যাবলীর সম্পূর্ণ বিবরণ ;

(৬) ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত রুশিয়ায় থাকাকালীন কার্যাবলীর প্রকৃত বিবরণ ;

(৭) এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ-সমূহে কার্যাবলীর বিবরণ ;

(৮) তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে মধ্য প্রাচ্যের কোন কোন দেশে এবং

(৯) ১৯২৭ সালে চীনে তাঁর কাজ কর্মের সঠিক তথ্যাবলী ;

(১০) এ ছাড়া প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি যে বিপুল লেখা লিখে গেছেন তার অধ্যয়ন ও অনুধাবন ;

(১১) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ ও তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার সন্ধান ;

(১২) তারপর আছে তাঁর সম্বন্ধে লেখা অনেক রিপোর্ট, আদালতের নথি-পত্র, বহু সহকর্মী ও পরিচিত লোকের লেখা পুস্তক-পুস্তিকা।

এই সব মাল-মশলা একত্র ক'রে কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তি যদি বেশ কিছুদিন ধরে এই সব নিয়ে গবেষণা করতে পারেন, তবেই রায়ের প্রামাণিক জীবনী লেখা সম্ভব হ'তে পারে।

অতএব রায়ের জীবনের কয়েকটি বড় ঘটনা ও তাঁর চিন্তা-ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের দ্বারা তাঁর জীবনের একটা কাঠামো রচনার চেষ্টা করা ছাড়া আর বেশী কিছু করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

জীবনী লেখার প্রচলিত আঙ্গিক অনুসারে হয়তো এটি জীবনীই হয়নি। জীবনে তিনি কী করেছিলেন তা লিখলেই হ'ল না, তিনি কী করেন নি তাও লেখা চাই। কতটা ভাল, সেই সঙ্গে কতটা মন্দ তিনি ছিলেন এবং সেই মন্দের মধ্যেও যে তিনি কতটা ভাল করে যেতে সক্ষম হয়েছেন সেটা দেখাতে পারাই হয়তো জীবনী লেখার প্রকৃত আঙ্গিক। সমালোচকেরা বলবেন, যে নিরপেক্ষতা থাকলে জীবনী লেখা সম্ভব হয় সে নিরপেক্ষতা, সে সমদৃষ্টি লেখকের নেই। কারণ লেখাটির মধ্যে বহু স্থানেই উচ্ছ্বাস আছে।

এ সম্বন্ধে লেখকের নিবেদন হ'ল, যে উচ্ছ্বাসের কথা বলা হয়েছে তা লেখকেরই নতুন নয়। মানবেন্দ্রনাথের জীবনকালে, তাঁর মৃত্যুতে এবং পরে তাঁর সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে লেখা ও বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে এসেছে সে সবের ভাষাও উচ্ছ্বাসের দিক থেকে কিছু কম নয়। এই সকল সম্মানীয় পূর্বগামীদের ভাষা থেকেই লেখক ঋণ গ্রহণ করে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তা ছাড়া এ উচ্ছ্বাস লেখকের গুরুভক্তির নিদর্শন বা বীর-পূজার ভক্তি বিহ্বলতা নয়। এটি একটি আদর্শের সার্থক সাধকের সিদ্ধিলাভের প্রতি লেখকের অভিনন্দন জ্ঞাপন মাত্র। কারণ এই আদর্শের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা অপরিসীম। সেটি হ'ল বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের আদর্শ।

এই পুস্তক রচনায় মানবেন্দ্রনাথের সহোদর ভ্রাতা শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য মানবেন্দ্রনাথের জন্মকাল নির্ধারণে আমায় সাহায্য দান করে ঋণী করেছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী পাণ্ডুলিপিখানি পড়ে এবং অমূল্য উপদেশ দান করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বন্ধুবর সীতাংশু চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যও কম নয়, সে জন্যেও তাঁর নিকট আমার ঋণ ও কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।

বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ্ সংশোধনের জন্য যে কঠিন পরিশ্রম করেছেন সেজন্য তার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধনীয়।

অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত বিদ্যা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত

প্রধান অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ রায় সুদূর মেলবোর্ণ থেকেই পাণ্ডুলিপিখানি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দেখে সারগর্ভ উপদেশ প্রেরণ করে গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বিধানে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁর এতখানি আগ্রহ না থাকলে হয়তো এ বই লেখা হয়ে উঠত না। পরিশেষে ভূমিকা লিখে আমায় চিরঋণী করেছেন।

এ ছাড়া যে সব বন্ধু সহকর্মী ও অনুরাগী আমায় নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দান করে এই গ্রন্থখানি প্রকাশে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের নিকট আমার চির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মানবেন্দ্রনাথর জীবনী-লেখার চেষ্টা ভারতে ও ভারতের বাইরে অনেকদিন থেকে চলছে। লেখকের এই প্রচেষ্টা শেষ হবার সংবাদে অনুরাগী মহল গ্রন্থটিকে প্রকাশ করার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই আগ্রহাতিশয্যে গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্য বিশেষ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে হয়েছে। ফলে মুদ্রণে, অঙ্গসৌষ্ঠবে কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। দরদী পাঠকের নিকট সেজন্য ক্ষমা চাই। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লেখা, অর্থাৎ নব মানবতাবাদের প্রবক্তার জীবন-কাহিনীর সঙ্গে তাঁর এই দর্শনেরও কিছু পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত করা, সে উদ্দেশ্য যদি কিছুমাত্র সফল হয় তা হ'লে ভবিষ্যতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে মানবেন্দ্রনাথের জীবনী ও দর্শন সব ত্রুটিমুক্ত হ'য়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হ'য়ে চলতে থাকবে। তখন এই প্রথম প্রচেষ্টার দোষ-ত্রুটি কেউ আর মনে রাখবেন না, এই ভরসায় লেখক সান্ত্বনা লাভ করছে।

২৯শে আগষ্ট, ১৯৬৫
"Dreamlands"
দমদম
কলিকাতা—২৮

বিনীত
স্বদেশরঞ্জন দাস

ভূমিকা

গত দেড়শ' বছর ধরে ভারতবর্ষে যে ভাববিপ্লব চলেছে ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে তা অনায়াসে পনের শতকের পশ্চিম ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয়। এই ভাব বিপ্লবের আদি প্রবক্তা রামমোহন রায়ের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এই ভাব বিপ্লব যে প্রতিভাবান পুরুষের জীবনে এবং রচনায় অসামান্য প্রকাশ লাভ করেছিল সেই মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে ভারতীয় কোন ভাষায় এ পর্যন্ত কোনও গ্রন্থ রচিত হয় নি। শ্রদ্ধেয় স্বদেশ রঞ্জন দাস মহাশয় বর্তমান গ্রন্থে সেই অভাব কিছুটা দূর করেছেন।

মানবেন্দ্রনাথের জীবন কাহিনী এক আশ্চর্য অডিসি। তার ঘটনাবলী তিন মহাদেশে বিস্তৃত। এমন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবন ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেও চোখে পড়ে না। প্রায় দু' দশক ধরে এশিয়া, আমেরিকা এবং ইয়োরোপের বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে সুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, জাপান এবং চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো, সভিয়েট ইউনিয়ন, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল—প্রতি দেশের আধুনিক ইতিহাসে তাঁর ক্রিয়া-কলাপের স্বাক্ষর কমবেশী ছড়ানো আছে। মানবেন্দ্রনাথের একটি প্রামাণিক জীবনী যে আজ পর্যন্ত লেখা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি তার প্রধান কারণ উপাদানের এই প্রাচুর্য এবং ব্যাপ্তি। সম্প্রতি ষ্ট্যানফোর্ডের হুভার ইনস্টিটিউটে তাঁর জীবন সংক্রান্ত প্রচুর নথিপত্র সংগৃহীত হয়েছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অধ্যাপক রবার্ট নর্থ গত এক দশকের ওপর এই সব তথ্যাদি নিয়ে গবেষণা করছেন; কয়েকটি প্রবন্ধে এবং একটি গ্রন্থে তাঁর গবেষণার ফল ইতিমধ্যেই কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে।* ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও একদল গবেষক তাঁর ওপর কাজ করছেন।

তা সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাপক নর্থের কাছেই শুনেছি, যে পরিমাণ তথ্য এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি (রুশ চীন এবং ভারত সরকারের সাহায্য ছাড়া এই সব নথিপত্র এবং তথ্য সংগ্রহ করা গবেষকদের অসাধ্য) তার তুলনায় যেটুকু সংগৃহীত হয়েছে,

* দ্রষ্টব্য: *M. N. Roy's Mission to China:* The Cammunist-Kuomintang Split of 1927 *by* Robert C North and Xenia J. Eudin, University of California Press, 1963).

তা নিতান্ত সামান্য; এবং যা সংগৃহীত হয়েছে তার বিচার, বিশ্লেষণ এবং সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে গবেষকদের এখনও বেশ কয়েক বছর লাগবে। নর্থের হিসাব অনুযায়ী শুধু মেক্সিকোতে মানবেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাদি সম্পাদনা করতে গবেষকদের প্রায় পাঁচ বছর লাগা সম্ভব।

মানবেন্দ্রনাথের জীবনের বহু ঘটনা যেমন এখনো রহস্যাবৃত, তাঁর প্রকাশিত রচনাবলীর একটা বড় অংশ বর্তমানে তেমনি দুষ্প্রাপ্য। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাট্রিক উইলসন পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে মানবেন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনাবলীর একটি খসড়া তালিকা কিছুকাল পূর্বে প্রকাশ করেছেন। যে শতাধিক গ্রন্থের তিনি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অনেকগুলি স্প্যানিশ, রাশিয়ান, জার্মান অথবা ফরাসী ভাষায় লেখা। এবং কোনও একটি গ্রন্থাগারে তার সবগুলি এ তাবৎ সংগৃহীত হয়নি। তা ছাড়া মানবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন দেশে কাজ করার সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন; এগুলির সম্পূর্ণ সেট কোথাও পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে কারাগারে নির্জন বাসকালে তিনি প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার যে পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন সেটিও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

এই সব দুস্তর অসুবিধা সত্ত্বেও স্বদেশরঞ্জন যে বর্তমান গ্রন্থ রচনা করেছেন তার স্বপক্ষে তিনটি প্রধান যুক্তি আছে। তিনি নিজে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে মানবেন্দ্রনাথের সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন: এই অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষের শেষ জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ এবং অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। জীবনী রচনা এবং তাঁর চিন্তাধারা ব্যাখ্যায় এই পরিচয় তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছে। দ্বিতীয়তঃ মানবেন্দ্রনাথের জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য সব জানা না থাকলেও তার মোটামুটি কাঠামোটি স্পষ্ট, এবং যতদিন না সেই তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে ততদিন অন্ততঃ এই আশ্চর্য কাঠামোটির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্য লেখা, এবং আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই গ্রন্থ থেকে তাঁরা গভীর প্রেরণা লাভ করবেন। তৃতীয়তঃ জীবনী প্রসঙ্গ বাদ দিলেও মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বর্তমান ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান, এবং যেহেতু তাঁর সমস্ত লেখাই কোনও না কোনও ইউরোপীয় ভাষায় রচিত, সেই কারণে সাধারণ বাঙালী পাঠক-পাঠিকার জন্য স্বচ্ছ বাংলায় তাঁর ভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত প্রমাণিক বিবরণ অত্যন্ত জরুরী। স্বদেশরঞ্জন

বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেছেন; জ্ঞানান্বেষী বাঙালী পাঠক-পাঠিকা সে জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে পরবর্তী ভাবুকরা যখন পূর্ববর্তীদের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন তখন শুধু বিচারের ক্ষেত্রে নয়, ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্লেটো, শঙ্কর, কাণ্ট, হেগেল অথবা মার্ক্সের দর্শন নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন তাঁদের ভাষ্যের মধ্যে মিল যতখানি অমিল তার চাইতে সম্ভবত কম নয়। মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ব্যাখ্যা সূত্রেও এ জাতীয় মতভেদের যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্তমান। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান গ্রন্থে লেখক বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের যে দার্শনিক আত্মীয়তা নির্ণয় করেছেন, তা হয়ত অনেকের কাছে গ্রাহ্য না হতে পারে। মানবেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের চিন্তার সঙ্গে মার্ক্সবাদের সম্পর্ক নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন ওঠা সম্ভব। অন্ততঃ এই দুটি ক্ষেত্রে স্বদেশ রঞ্জনের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারিনি। কিন্তু এই বইটি সম্বন্ধে প্রধান কথা হোল, স্বদেশরঞ্জন তাঁর ব্যাখ্যা যথেষ্ট যুক্তি এবং তথ্য সহকারে উপস্থিত করেছেন; ফলে তাঁর সঙ্গে যদি কোনও কোনও ক্ষেত্রে মতভেদও ঘটে তা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। বরং তাঁর স্বচ্ছ এবং সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা পাঠ করে নিজের বিকল্প ব্যাখ্যাকেই নতুন করে বিচার করার প্রয়োজন বোধ করি। কোনও ব্যাখ্যাকারের কাছ থেকে এর চাইতে বেশী দাবী করা বোধ হয় অসঙ্গত।

নব্য ভারতের মানস উজ্জীবনে মানবেন্দ্রনাথের দান অসামান্য। ইয়োরোপ আমেরিকার মত ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও সম্প্রতি তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে উদ্যোগী তরুণ গবেষকেরা আলোচনা সুরু করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থ যে বাংলা ভাষায় রচিত হোল তার জন্য স্বদেশরঞ্জনের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। বাংলা ভাষায় আজকাল চিন্তাশীল গ্রন্থের পাঠক বাড়ছে। আশা করা যায় এই গ্রন্থ তাঁদের কাছে বিশেষ সম্বর্ধনা লাভ করবে।

১।১০।৬৪ ॥

ভারতবিদ্যা বিভাগ
মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়,
অষ্ট্রেলিয়া

শিবনারায়ণ রায়

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড :

চতুর্থ খণ্ড :

নব-মানবতাবাদের উদ্গাতা মানবেন্দ্রনাথ—১৯৫০

উপক্রমণিকা

দু'প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমরা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

এক প্রকার হ'ল, সেই সব ব্যক্তি যাঁরা তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি চরিত্র দিয়ে সকল মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করে গেছেন, কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে সব কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আর এক প্রকার হ'ল, সেই সব ব্যক্তি যাঁরা সত্য-দ্রষ্টা। যাঁদের অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি চরিত্রের ফল তাঁদের জীবদ্দশাতেই নিঃশেষিত হ'য়ে যায় না, ভবিষ্যৎ বংশধররাও বহু যুগ ধরে তার ফল ভোগ করে চলে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষ।

১৯৬১ সালের ২৫শে জানুয়ারী মানবেন্দ্রনাথের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুপণ্ডিত শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন :

"আমার বিশ্বাস যে, এই মানুষটি যে কেবল অত্যাচারী রাষ্ট্রকে ধ্বংস ক'রে লোকায়ত রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যে দেশ-দেশান্তরে জেহাদীর সঙ্কল্প নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাই নয়, পৃথিবীর যে সব চিন্তানায়ক তাঁদের চিন্তার দ্বারা মানব ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন, প্রভাবিত করেছেন, পরিচালিত করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন এবং তিনি যে-চিন্তাধারা, ভাব ও ভাবনা রেখে গিয়েছেন সেই চিন্তা-ভাবনার সূত্র ধরেই হয়তো ভবিষ্যৎ মানব সমাজ একদিন গড়ে উঠবে।"

"......এবং এটিও আমার ধারণা হয়েছে যে, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যত নেতার আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে একমাত্র রায়ের সঙ্গেই হব্‌স্‌, লক, বা বেন্থামের মত চিন্তা-নায়কদের তুলনা করা চলে ; আর তিনি তাঁর সে চিন্তা-শক্তির দ্বারা যে আশ্চর্য রাজনৈতিক

দর্শন রেখে গেছেন সম্ভবতঃ পৃথিবীকে একদিন তার মূল্য বুঝতেই হবে।"

"......মুসলমান শাসনের সময় থেকে ভারতের চিন্তা-রাজ্যের দৈন্য অতি নিদারুণ। আমি দেখছি যে তারপর ভারতে রায়েরই সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটল, যিনি তাঁর চিন্তা-শক্তির বিরাটত্ব ও নির্ভীকতা দিয়ে কেবল প্রাচ্যের নয় পাশ্চাত্যেরও একটি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, ভাব ও ভাবনার ঊর্ধে উঠে নিজের চিন্তাকে তুলে ধরলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের চিন্তানায়করা মানবতাবাদকে যেখানে ছেড়েছিলেন, রায় তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুললেন।" *

* ".........I have come to feel that here was a man who was not only a restless crusader in politics, wandering on his crusade from land to land but also a thinker who clearly belonged to the order of the world's established pioneers of thought and who has left ideas which may one day transform the whole pattern of man's corporate existence."

"........And it seems to me that alone among the Indian politicians who have appeared so far, Roy was a thinker of the same type as that of Hobbes, Locke or Bentham and who used that mind to produce a striking philosophy of politics to which the world will probably have to pay heed some day."

".........Since the days of Muslim Rule the record of the Indian mind has been completely blank.......... It appeared to me that in M. N. Roy there appeared for the first time in modern India a man who was able by the tremendous power and daring of his mind, to transcend the traditional thought on a subject, not only of the East but also of the West, and to contribute a thought of his own. He took up Humanism from where the thinkers of the Seventeenth Century Europe had left it and presented a complete philosophy........."

(M. N. Roy Memorial Committee Publication)

রায়ের সমগ্র জীবনকে তাঁর মানসিক বিকাশের দিক থেকে চারটি ভাগে ও ঘটনার দিক থেকে পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে।

মানসিক বিকাশের প্রথম অংশ বাল্য জীবন গঠন ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লব প্রচেষ্টা ;

দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক জগতে মার্কসীয় সূত্র অনুযায়ী বিপ্লব প্রচেষ্টা ;

তৃতীয়তঃ ভারতে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রবর্তন ও ভারতে গণ-বিপ্লব প্রচেষ্টা ;

চতুর্থতঃ নব-মানবতাবাদ দর্শনের উদ্ভাবন ;

ঘটনার পর্যায়ক্রমের প্রথম খণ্ড—শৈশব থেকে সুরু করে আমেরিকায় অবতরণ পর্যন্ত (১৮৮৮-১৯১৬) ;

দ্বিতীয় খণ্ড—আমেরিকা-মেক্সিকো থেকে সুরু করে ভারতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত (১৯১৬-৩০) ;

তৃতীয় খণ্ড—ভারতের মাটিতে অবতরণ থেকে ত্রিপুরি কংগ্রেসের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত (১৯৩০-৩৯) ;

চতুর্থ খণ্ড- লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন গঠন থেকে দ্বিতীয় দেরাদুন শিবিরে নব-মানবতাবাদ দর্শনের অবতারণা পর্যন্ত (১৯৩৯-৪৬) ;

পঞ্চম খণ্ড—নব-মানবতাবাদ (১৯৪৬-৫৪)।

ঘটনার দিক থেকে এই যে পাঁচটি খণ্ড এ সম্বন্ধে এখানে আর কিছু না বললেও চলবে, কিন্তু মানসিক বিকাশের যে চারটি ভাগ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে পরে তাঁর জীবনী অনুসরণ করতে সুবিধা হবে।

রায়ের মানসিক বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব প্রচেষ্টায় তাঁর প্রথম দীক্ষা লাভ ঘটেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও ধর্মতত্ত্বের (অনুশীলনী) শিক্ষা ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শ থেকে। ধর্মতত্ত্বে যে আদর্শের নাম মনুষ্যত্ব ও ধর্ম দেওয়া হয়েছে তাকেই রায় "মুক্তি"

নামে অভিহিত করে গেছেন। সমগ্র পৃথিবী ঘুরে তিনি যখন বৈজ্ঞানিক রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান শিখছিলেন, মার্কসবাদ চর্চা করছিলেন, সমাজ বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাতে কলমে করছিলেন তখনো তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের বিকশিত ব্যক্তিত্বের ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শ ভোলেন নি। মার্কসবাদে দীক্ষা নেবার পর প্রথম শিক্ষার্থীর প্রবল উৎসাহ-বন্যা-আবর্তে পড়ে প্রথম কয়েক বছর তা অবচেতন মনে তলিয়ে গেলেও ক্রমেই তা চেতন মনে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে থাকে। সেই জন্যেই তাঁর ডি-কলোনাইজেসন তত্ত্বে (Theory of De-colonisation) অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ বা পারিপার্শ্বিক নির্দেশ্যবাদের (objectivity) অন্ধ নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যক্তি মানসের সৃষ্টিশীলতার উপরই বেশী নির্ভর করা হয়েছিল এবং জেল থেকে ১৯৩৬ সালের ২২শে এপ্রিলে লেখা একখানি চিঠিতেও * ইউরোপে থাকাকালীনও যে তাঁর নিষ্কাম কর্মের প্রতি আস্থা ছিল তা স্মরণ করতে বলা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে যা ছিল ইউটোপিয়া তাকেই তিনি নিরলস প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে লোকায়ত আদর্শে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেই গুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম। সেই অনুশীলনের সীমা পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ।"

রায় তাঁর মুক্তির (freedom) সংজ্ঞানির্দেশকালে তাঁর নব-মানবতাবাদের তৃতীয় সূত্রে বলেছেন:

"ব্যক্তি ও সমাজের সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হ'ল অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় মুক্তি অর্জন। এই মুক্তির অর্থ হ'ল, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তি বিকশিত করে তোলার পথে যে সকল বাধা আছে তা-সবের ক্রমঃ বিলুপ্তি। এই যে ব্যক্তির বিকশিত

---

* M. N. Roy—Letters From Jail. (Renaissance Publishers)

ব্যক্তিত্ব এ কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনকে আশ্রয় করেই ফুটে উঠবে।......" †

রায়ের জীবনী অনুসন্ধান করে এটিই দেখা গেছে যে, এই বিকশিত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে যে অনুশীলনের প্রয়োজন, বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে সে পথের বাধা অপসারণের প্রচেষ্টাতেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, অনুসন্ধান করেছেন, সাধনা করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, মার্কসবাদী হয়েছেন, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাট হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত নব মানবতাবাদে এসে ঈপ্সিতের সন্ধান পেয়েছেন।

১৯৪৬ সালের দেরাদুনে নব মানবতাবাদের উদ্বোধনী শিবিরে বলেছেন :

"আমার বয়স যখন চৌদ্দ, স্কুলে পড়ি, তখন থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবনের সুরু। তখন থেকেই আমি মুক্তির সন্ধানে বেড়াচ্ছি। হয়ত জীবনটা বৃথাই কেটে যেত, কিছুই মিলত না; তথাপি সে দিন আমার আকুতির অন্ত ছিল না। একান্ত ভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাবার নব প্রেরণাই তখন আমায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। বিপ্লবীরা এইরূপ সর্বাঙ্গীন মুক্তির কামনাই করত। (New Orientation p. 183)

আর এক জায়গায় বলেছেন :

"আমার সমগ্র রাজনৈতিক জীবন, যা চল্লিশ বছরের উপর হয়ে গেল, শুধু মাত্র একটা বেদনা-কাতর চিত্তের মুক্তির সন্ধানে পথ হাতড়ে বেড়ান ছাড়া আর কিছু নয়।" (Ibid. p. 59)

---

† "The purpose of all rational human endeavour individual as well as collective is attainment of freedom in ever increasing measure. Freedom is progressive disappearance of all restrictions on the unfolding of the potentialities of individuals as human beings, and not as cogs in the wheels of a mechanised social organism.........."

রায়ের জীবনী অনুসরণ করলে দেখা যাবে, উপরিউক্ত স্বীকৃতিগুলি কত সত্য।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর মার্কসবাদ গ্রহণ। ব্যক্তির মুক্তি প্রচেষ্টার যুক্তি-সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক পন্থা যে মার্কসবাদের মধ্যেই নিহিত আছে সে ধারণা তাঁর প্রথমাবধিই হয় বলেই তাঁর মার্কসবাদী হ'তে বাধেনি এবং সেই জন্যেই তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গেই তা গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসের, "ব্যক্তির প্রাক্ অস্তিত্বই ব্যক্তির চেতনাকে নির্ধারিত করে—being determines consciousness এবং ব্যক্তি মানুষই মূল—man is the root of mankind" এই সূত্রসমূহ তাঁরই আদর্শের বিজ্ঞানসম্মত সমর্থক ও পরিপোষক। তাই তিনি উহা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন। রুশ কম্যুনিষ্টরা মার্কসবাদকে যে ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে আসছিলেন তিনি তা কোন দিনই গ্রহণ করেন নি। তাঁর কথাতেই বলি ঃ

"কম্যুনিজম ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ব্যক্তির অস্তিত্বের ধারণাকে তারা শুধুই মানসিক ধারণা মাত্রই বলে। তাদের তত্ত্ব অনুসারে সমষ্টিরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। পরে সেই বাস্তব অস্তিত্ব-বিশিষ্ট সমষ্টির একটি অংশরূপে ব্যক্তিকে মনে মনে কল্পনা করে নেওয়া হয়। সেই জন্যে ব্যক্তির পৃথক কোন বাস্তব অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই তত্ত্ব অনুসারে কম্যুনিজম তার দার্শনিক ভিত্তি থেকে সরে গেছে। মার্কসের যে মূল দার্শনিক তত্ত্ব—'ব্যক্তির প্রাক্ অস্তিত্বই ব্যক্তির চেতনাকে নির্ধারিত করে'—এই মূল তত্ত্ব থেকে কম্যুনিষ্টদের এই তত্ত্ব উদ্ভূত হয় নি। ব্যক্তির চেতনার মধ্যেই অপর ব্যক্তি সমূহের অস্তিত্ব। সেই বোধের উপরই সমষ্টির অস্তিত্ব নির্ভর করে। আবার এই ব্যক্তির চেতনা নির্ভর করে ব্যক্তির প্রাক্ অস্তিত্বের উপর।...

"...অপর মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বা সংঘবদ্ধ হওয়ার পূর্বে ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন। মার্কস প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত

দার্শনিক সূত্র অপেক্ষা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, "ব্যক্তি মানুষই মূল।*

মার্কসবাদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কেবল ১৯৪৬ সালে দেরাদুন নিদাঘ শিবিরেই হয় তা নয়, প্রথমাবধিই তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রায়ের জীবনী সম্বন্ধে গবেষকদের মধ্যে কেউ যদি বলেন, "৩১ সালের পর থেকে কারাবাস কালেই তিনি মার্কসবাদের অর্থনৈতিক বা পারিপার্শ্বিক নির্দেশ্যবাদের (economic determinism) এর মধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করেন এবং ব্যক্তির সৃষ্টিকারী মানসিকতার subjectivity র উপর জোর দেন এবং তজ্জন্য ব্যক্তির উৎকর্ষ বিধানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের কথা প্রথম বলেন; এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি গোঁড়া মার্কসবাদীর মত পারিপার্শ্বিক নির্দেশ্যবাদের উপরই সমধিক বিশ্বাসী ছিলেন, তবে তিনি ভুলই করবেন। এই সময়ে তিনি ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে সুরু না করলেও রেনেসাঁসধর্মী লেখা লিখে গেছেন এবং ব্যক্তির মানসিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি। ব্যক্তির বিকাশ, ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষের ফলেই যে বিপ্লব

---

* Communism does not recognise the individual ; his very existence is ruled out as an abstraction. The theory is that the individual exists only as a part of the collectivity. With this theory Communism breaks away from its philosophical anchorage. It does not result from the fundamental philosophical principle of Marxism, namely, being determines consciousness. Collective life is conditional upon man's consciousness of the existence of others, and his consciousness is the result of his being……… Man must be there before he can co-operate or collectivise with others. Marx was more explicit than the above philosophical formula ; he actually declared : 'Man is the root of things' (Ibid p. 153). Also vide—M. N. Roy—Politics, Power and Parties (p. 2) – 'I have never been an orthodox Marxist………"

ঘটিয়ে সমাজ ও সভ্যতাকে প্রগতির পথে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব, তা যে তিনি বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছেন সেটি আমরা এই সময়কার জীবনী আলোচনা করবার সময় দেখতে পাব।

তৃতীয়তঃ ১৯২০ সাল থেকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন। সে সময় তিনি রুশিয়ায় কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। গান্ধীজী একদিকে যেমন তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষায় এবং আফ্রিকার গণ আন্দোলন ও ভারতের কৃষক আন্দোলন পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অন্যান্য নেতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অনন্য ও অসাধারণ তেমনি অপরদিকে অতি নিষ্ঠাবান ঈশ্বর ভক্ত এবং পূজা প্রার্থনা ও আত্ম নিপীড়নের দ্বারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে অঘটন ঘটিয়ে মিরাক্যাল (miracle) সৃষ্টির মাধ্যমে ঈপ্সিত ফল লাভে একান্ত বিশ্বাসী। এই ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শলাভের একমাত্র অস্ত্র অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ। এটি তাঁর ঈশ্বরের কাছে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে পূজা-প্রার্থনা নিবেদনেরই সামিল। কারণ এই অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের ফলে ১৯২০-২১ সালে সারা ভারতে ব্যাপক গণ-জাগরণ ছাড়া এই অস্ত্রের কার্যকরিতা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর দেখা যায়নি।

১৯২০-২১ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চৌরিচৌরায় রক্তপাতের ফলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সন্ধি করার জন্যে ব্রিটিশ যখন একান্ত উন্মুখ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন জেল থেকেই সে সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাচ্ছেন (১) ঠিক সেই মুহূর্তেই গান্ধীজীর নির্দেশে আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুযোগ বুঝে ব্রিটিশও সরে গিয়েছিল।

(১) Vide—J. P. Suda--Indian Constitutional Development.

রায় তখন রুশিয়ায়। ১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই থেকে ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে মেক্সিকো থেকে এসেছেন। লেনিন পরাধীন জাতি ও ঔপনিবেশিক দেশসমূহে বৈপ্লবিক নীতি বিষয়ক (On the National & Colonial Question) এক থিসিস লিখে রেখেছিলেন। তিনি রায়কে তাঁর থিসিস সম্বন্ধে মতামত জানাতে আহ্বান করলেন। রায় সানন্দে স্বীকৃত হ'লেন। কিন্তু তিনি লেনিনের সঙ্গে এক মত হ'লেন না। লেনিন তাঁকে তার বিকল্প থিসিস লিখতে অনুরোধ করলেন। রায় লিখলেনও। এই দুই বিপরীত থিসিসই কংগ্রেসে আলোচিত হ'ল এবং উভয়ই গৃহীত হ'ল। রায় তাতে বলেছিলেন যে, পরাধীন দেশ ও ঔপনিবেশিক দেশসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধনী—জমিদার পরিচালিত নেতৃত্বকে সমর্থন ও সহযোগিতা না করে (লেনিনের মত) মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষক এই তিন শ্রেণীকে নিয়ে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যখনই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে উঠবে তখনই এই সব ধনী-জমিদার প্রভাবিত স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা জনগণকে পরিত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলোবে।

তখনো চৌরি-চৌরা ঘটে নি। অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যের মুখ থেকে তখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি। চৌরিচৌরার ঘটনা ঘটেছিল ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।

১৯২১ সালে রায় তাঁর এই মত আরো বিশদ ভাবে বিবৃত করেন তাঁর India in Transition নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের রুশ সংস্করণের কাল ১৯২১ সাল *—চৌরিচৌরা ঘটনার অব্যবহিত

* Vide—John P. Haithcox (a research scholer, University of California, also a Carnegie Teaching Fellow, University of Chicago, U.S.A.)
—The Roy-Lenin Debate on Colonial Policy—The Radical Humanist, dated 25.1.64.

পরেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারদৌলিতে যে অধিবেশন বসে সেই অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণের এক বছর আগে। তাতে তিনি লিখলেন :

"প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের জন্যে ভারতে যন্ত্রশিল্পের অভাবনীয় বাড়বৃদ্ধি ঘটেছে। তারই ফলে ভারতীয় ধনীরা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করার অধিকার পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দাবী করতে সুরু করেছে; এবং এই সব ধনীরা যাতে জনগণের সাথে হাত মিলিয়ে উভয়েরই শত্রু বিদেশীদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ না হয় সেই জন্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও এই সব ধনীদের ক্রমশঃই সুযোগ-সুবিধা দেবার নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভারতীয় ধনীগণ ব্রিটিশের মতই গণ-অভ্যুত্থান ও বিপ্লবকে ভয় করে, যদিও এরা মাঝে মাঝে জনগণের শক্তির ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে ব্রিটিশের নিকট থেকে আরো সুযোগ-সুবিধা আদায় করতেও ছাড়ে না; তারপরই যখন দেখে জনতা তাদের বৈপ্লবিক দাবী নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে তখনই জনতাকে থামিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে রফা করে ফেলে।" (India in Transition pp. 94-95)

এই মতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে রায়ের বিখ্যাত ডি-কলোনাইজেশন তত্ত্বে (Thesis on De-colonisation)। ১৯২৮ সালের কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের ষষ্ঠ কংগ্রেস এই তত্ত্ব বর্জন করে এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে এটিই তাঁর বেরিয়ে আসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা রায়ের জীবনীর এই অধ্যায় আলোচনা কালে দেখতে পাব, রায়ের এই বিশ্লেষণ এতই নিখুঁত হয়েছিল যে, ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঘটনার দ্বারা তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

১৯২২ সালের বারদৌলি প্রস্তাবের ফলে ভারতীয় ধনীরা বুঝে

নিলেন যে, গান্ধীজী যদিও জনগণের কল্যাণ চান, ধনীগণ অপেক্ষা দরিদ্রের প্রতি প্রীতি-ভালবাসা তাঁর সমধিক, তথাপি অহিংসা ও সত্যাগ্রহের নীতিতে তাঁর হাত-পা-এমনই বাঁধা যে, সত্য ও অহিংসার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যে তিনি অনায়াসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ বা জনগনের স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন। তাঁরা বুঝে নিলেন অহিংস পথে ধনতন্ত্র বা শোষণতন্ত্রকে হটান যায় না বা যাবে না। আর গান্ধীজীও এই নিগড়ে এমনই বাঁধা যে তিনি তা কেটে বেরুতে পারবেন না। তাঁরা অতি নিরাপদ জ্ঞানে গান্ধীজিকে তাদের নেতা ও গুরু ব'লে গ্রহণ করলেন।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত রায়ের এই সময়কার জীবনী আলোচনা কালে দেখব যে ধনীরা ভুল করে নি, এবং রায় ধনীদের এই নেতৃত্বের পরিবর্তে জনগণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব স্থাপন করতে, জনগণের দ্বারা ক্ষমতা দখল করে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করতে কী নিরলস চেষ্টাই না করে গেছেন।

চতুর্থ অংশ হ'ল, নব মানবতাবাদের উদ্ভাবনা। রায়ের সমগ্র জীবনের বিপুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞত'র ফসল নব মানবতাবাদ নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন। ২২টি সূত্রে ২৪০টি পংক্তির মধ্যে এটি বিরচিত।

তিনি তাঁর এই দর্শনের সমর্থনে দুইখানি মূল গ্রন্থ লিখেছেন। এই দুইখানির প্রথমটি New Humanism—a manifesto, দ্বিতীয়টি Reason, Romanticism & Revolution। এই গ্রন্থ দুই খানি ছাড়া প্রচুর লেখা লিখেছেন এই সম্পর্কে, তার কতক প্রকাশিত হয়েছে—বেশীর ভাগই প্রকাশিত হ'তে বাকি আছে, এর মধ্যে Politics Power and Parties গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র মানব সভ্যতার চিন্তা, ভাব ও ভাবনার ইতিহাস তিনি মন্থন করেছেন উপরিউক্ত দুই'খানি মূল গ্রন্থে। এই ইতিহাস-সমুদ্র মন্থনের সার হ'ল নব মানবতাবাদ।

সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত যে দার্শনিক মতবাদ ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রাধান্য পেয়েছে তার নাম লিবারেলিজিম (Liberalism)। এই লিবারেল (Liberal) দর্শন একদিন মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের প্রভাব থেকে ব্যক্তি-মানুষকে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল লিবারেল ব্যবস্থায় একদিকে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ধনতান্ত্রিক নৈরাজ্য ও শোষণ; অপরদিকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ। এরাই সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে উপনি-বেশের মানুষকে নিশ্চিহ্ন করেছিল, ক্রীতদাস করেছিল, চরম শোষণ-শাসন চালিয়ে ইউরোপকে সোনার ইউরোপ করে গড়ে তুলেছিল।

এর কারণ হ'ল, লিবারেল দর্শনের গলদ। লিবারেল দর্শনের মূল ভিত্তি হ'ল ব্যক্তি, এবং অঙ্গীকার হ'ল ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা। এই দর্শনের মূল্যায়ণ হবে এই বিচারেই।

সুরুতে লিবারেলিজিমের ব্যক্তি তার জন্মগত স্বাভাবিক অধিকারের বলে রাজার ঐশ্বরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার দাবি করেছিল। সকল মানুষই হ'তে চেয়েছিল সকল দিক দিয়েই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ফলে রাজা গেল, রাজন্য গেল, গেল যাজক সম্প্রদায়ও। মানুষ ভূ-দাসত্ব থেকে মুক্তি পেল। সমান অধিকারের স্বীকৃতিতে পারস্পরিক চুক্তিই সমাজ জীবনের ভিত্তি বলে গৃহীত হ'ল।

এই লেনদেন কিন্তু সহযোগিতার পর্যায়ে থেকে পরস্পরের সুখ শান্তি-সমৃদ্ধি বাড়াল না, তা প্রতিযোগিতার স্তরে নেমে গেল। শক্তিমান যারা, তারা দুর্বলকে হটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, সুযোগ-সুবিধার স্থান দখল করে কায়েমী হয়ে বসতে থাকল। ক্রমে দেখা গেল যে, জন্তু জগতে যেমন সবাই স্বাধীন, সবাই স্বতন্ত্র, কেউ কোন সর্বজন গ্রাহ্য নিয়ম কানুনের ধার ধারে না, 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির ফলে

দুর্বল মরে, শক্তিমান রাজত্ব করে, ঠিক তেমনই মনুষ্য সমাজেও অনুরূপ অবস্থা দাঁড়াল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ডারউইন আবিষ্কার করলেন যে, জন্তু জগতের মধ্যে যে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলে তাতে যারা অধিকতর শক্তিমান তারাই বাঁচে, যারা দুর্বল তারা লুপ্ত হয়ে যায়, জীবন যুদ্ধে যারাই হয় যোগ্যতম (fittest) তারাই বাঁচে, survive করে (survival of the fittest)। বাকি সব লুপ্ত হয়ে যায়। এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে (principle of natural selection) জন্তু জগত ক্রমঃবিকাশের পথে এগিয়ে চলে।

দেখা গেল যে, সে যুগের যারা শক্তিমান, বুদ্ধিমান, দক্ষ মানুষ তারা দুর্বল প্রতিযোগিদের হটিয়ে সমাজের শীর্ষে উঠছেন, তারাই সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে, উপনিবেশ স্থাপন ক'রে যন্ত্র শিল্প উৎপাদিত প্রচুর পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের বাজার খুলে চলেছেন। পথের বাধা আদিবাসীদের, নেটিভদের নিশ্চিহ্ন করছেন, ধ্বংস করছেন, শেকলে বেঁধে ক্রীতদাস ক'রে চালান দিচ্ছেন, নির্মমভাবে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করছেন।

ডারউইনের Survival of the fittest নীতি এদের ভারি সুবিধা করে দিলে। *

* অবশ্য ডারউইন Survival of the fittest বলতে মানুষের জীবনে তা নীতিরূপে গ্রহণযোগ্য এমন কোনও নৈতিক আদর্শ প্রচার করেন নি। তিনি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে Natural selection এর ফলে বিবর্তন কেমন করে সম্ভব হয় তাই দেখাতে চেয়েছিলেন। পরে Julian Huxley প্রভৃতি দার্শনিকেরাই এটা করেছিলেন। কিন্তু তাদের যুক্তি একটি বৃত্তাকার যুক্তি: Fit কে? যে Survive করে; কে Survive করে? যে fit। কিন্তু Fitness এর মাপকাটি কি? বিবর্তনের ক্ষেত্রে accident (পারিপার্শ্বিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তণ বা mutation) ও দীর্ঘদিনের genetic change—বংশাবলীর পরিবর্তনের ধারা, দুইই কাজ করে; এবং মানুষের পর্যায়ে এসে মানুষের সমাজ সংগঠন, তার শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রযুক্তি বিদ্যা পরবর্তী ক্রমবিকাশকে (evolution) নিয়ন্ত্রিত করে।

হারবার্ট স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিকেরা ডারউইনের মতবাদকে জন্তু জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানব সমাজের উপরই প্রয়োগ করলেন। মানব সমাজ যে জন্তু জগতের এই নীতিবহির্ভূত সে কথা তাঁরা বললেন না। দু'একজন যাঁরা কিছু বললেন তাও কায়েমী স্বার্থের দ্বারা স্পেনসারের ঢক্কা নিনাদে তা চাপা পড়ে গেল। *

এই সব ধনিক বণিক সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের স্বদেশে, দুর্বল প্রতিযোগীর উপর, শ্রমিকদের উপর এবং বিদেশে, উপনিবেশে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর নিষ্ঠুর নির্মম ব্যবহার যে প্রাকৃতিক নির্ধারণের শাশ্বত নীতি সম্মত তা সরবে ঘোষণা করবার যুক্তি ও সমর্থন পেলেন।

মনুষ্য সমাজে যে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চলে না, নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতার নীতি যে মনুষ্য সমাজে অচল, জীবধর্ম পালনে

* বলেছিলেন T. H. Huxley, ডারউইনের সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক মনীষী তাঁর Evolution and Ethics গ্রন্থে। তাঁর বক্তব্য ছিল প্রাকৃতিক নিয়ম আর নীতিশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ বর্তমান। প্রাকৃতিক নিয়মে(Law of Nature) আর নীতি শাস্ত্রে (Law of Ethics) হাক্সলির চিন্তায় যে দ্বৈতবাদ বা dualism আছে সেটি পরবর্তী কালে Julian Huxley অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। (Evolution in Action ; New Wine in Old Bottle ; Religion without Revolution ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাতেও সকল আপত্তির খণ্ডন হয় না।

মানবেন্দ্রনাথ সে কাজ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির যোগসূত্র আবিষ্কার করে এই সকল দ্বৈতবাদ ও অন্যান্য আপত্তি খণ্ডন করে মানুষের নীতিবোধকে লোকায়ত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠা করা।

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য :—C. H. Waddingtonএর The Ethical Animal আর Ashley Montague প্রণীত On Being Human।

পারস্পরিক সহযোগিতাই যে মনুষ্য সমাজের নীতি এ কথা সেদিন অনেকেই মনে রাখলেন না। *

মনুষ্য সমাজে অধিকার সাব্যস্ত হয় গায়ের জোরে নয়, পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে পারস্পরিক উপকারের নীতি দিয়ে, Live and let live সূত্র অনুসারে।

মনুষ্য সমাজে সব চেয়ে বেশী অধিকারের দাবী সর্বাপেক্ষা শক্তিমানের নয়, সবচেয়ে যে দুর্বল, তার। সেইজন্যেই মনুষ্য সমাজে শিশু রোগী-বৃদ্ধ নারী-বলহীন, এদের অধিকার বেশী। যারা শক্তিমান তারা এদের এগিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়, এদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, বিপদে বুক পেতে দেয়। একেই বলা হয় ভদ্রতা, সংস্কৃতি, নীতি-পরায়ণতা, moral behaviour.

জীবধর্ম পালনে নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতা জন্তু জগতের নিয়ম হলেও মনুষ্য সমাজের নয। মনুষ্য সমাজে যোগ্যতা fitness নিরূপণ গায়ের জোরে বা ধূর্তামী শঠতা দিয়ে হয না। মনুষ্য সমাজের নীতি হ'ল সহযোগিতা, সদাচার —যার অন্য নাম মর‍্যালিটি। নীতি-পরায়ণ জীবন

---

* উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশের ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১) কিন্তু দেখিয়েছিলেন যে বিবর্তনের ক্ষেত্রে সংগ্রামই একমাত্র কথা নয়, পারস্পরিক সহযোগিতাই বিবর্তনের সহায়ক (Vide Mutual Aid—A Factor in Evolution)। তিনি সহযোগিতার ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে রাষ্ট্র থাকবে না। নরতত্ত্ববিদ্ Ashley Montagueও তাঁর Derection of Human Development গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে প্রাণিজগতেও সংগ্রাম বা প্রতিযোগিতা মূল কথা নয়, সহযোগিতাই মূলকথা।

মানবেন্দ্রনাথ, আমরা পরে দেখব, সহযোগিতার (Co-operation) উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের (State) প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি।

যাপনই মনুষ্যের একমাত্র যোগ্যতা। এই যোগ্যতার বলেই সে বন্যজীবন থেকে সভ্যতার পর্যায়ে উঠে আসতে পেরেছে।

সেদিন একথা কেতাবে লেখা থাকলেও, নতুন যুগের নতুন চিন্তা ভাব ও ভাবনার সঙ্গে মনুষ্য সমাজের এই শাশ্বত নীতির সামঞ্জস্য বিধান কেউ করল না।

মানুষ যে কেবল জীবধর্মী জীব নয়—মনুষ্যধর্ম বিশিষ্ট জীবও বটে, সেকথা স্পষ্টভাবে বলা হ'ল না। অন্যান্য জীবের মতই মানুষও যে আহার নিদ্রা মৈথুন সর্বস্ব জীব সেই সংজ্ঞাই দেওয়া হ'ল। মানুষকে economic man পরিচয়েই দাঁড় করানো হ'ল, মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা হ'ল শুধু স্থূল utility বা উপযোগিতা দিয়ে।

ফুল খাওয়া যায় না বলে জন্তু জগতে ফুলের কদর নেই।

মানুষও ফুল খায় না, তবু তার কাছে ফুলের আদরের শেষ নেই।

মানুষ ধান চাষ করে জীবধর্ম পালনের জন্যে, ফুলের ফসল তোলে মনুষ্যধর্ম পালনের জন্যে।

ধান চাষে নির্মম প্রতিযোগিতা চললে যে হারে সে না খেয়ে মরে, কিন্তু ফুল চাষের প্রতিযোগিতায় যে হারে, সে মরে না বরং উন্নত হয়।

ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা থেকে মানব সভ্যতার আদিতেই সেই জন্যে নৈতিক অনুশাসন objective moral code সৃষ্টি করে— মনুষ্য ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চললেও— জীবধর্ম পালনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ ক'রে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা সেদিন লিবারেলদের ছিল না। *

---

* Vide L. T. Hobhouse Morals in Evolution.

মার্কসও সেদিন মানুষ সম্বন্ধে লিবারেলদের এই Economic manএর ধারণাই গ্রহণ করেছিলেন এবং দেখাতে চেয়েছিলেন যে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রেণী সম্পর্কের ভিতর দ্বান্দ্বিক নিয়ম কাজ করে ব'লে।

জন্তু জগতের নীতি অনুসরণের ফলে ইউরোপীয় সমাজ ধীরে ধীরে এক মহা নৈতিক সংকটের পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

যে নৈতিক সঙ্কট সুরু হয়েছিল উপনিবেশের উপর দস্যুতায় ও ঘরের দুর্বল অপটুদের শোষণে সেই সংকটের পরিণতি হ'ল প্রথম মহাযুদ্ধ। যে নির্মমতা ও পৈশাচিক বর্বরতার সঙ্গে উপনিবেশের মানুষদের মারা হয়েছিল, শোষণ করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি নির্মমতা ও পৈশাচিকতার সঙ্গেই ইউরোপের শ্বেতকায় মানুষরা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল। নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতা-মূলক সভ্যতার পরিণতি হ'ল মহাধ্বংসের আয়োজনে।

লিবারেল অর্থনীতির বিশ্বাস ছিল এই যে, প্রতিটি মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থে চালিত হ'লেই নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে পারবে, এবং এক অদৃশ্য হাতের (invisible hand) কারসাজিতে এই সব ব্যক্তি-স্বার্থের সংঘাতের ভিতর দিয়ে সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হবে। প্রতিযোগিতায় যারা অক্ষম তারা সরে দাঁড়ালে যোগ্যতমই স্থান পাবে—উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, সস্তায় প্রচুর ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন হবে, আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ না থাকলে শ্রম ও পুঁজির অবাধ গতিতে শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয়েই লাভবান হবে। উপনিবেশের কাঁচা মাল ও সস্তা মজুরী যন্ত্র শিল্পে উৎপন্ন ভোগ্যপণ্যের দাম কমাবে ; ফলে মজুরী কমলেও তার জীবন যাপনের মান কমবে না।

অপর পক্ষে উপনিবেশগুলি উন্নততর দেশের শাসনাধীনে নতুন সভ্যতা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। মানুষ সমগ্রভাবে উত্তরোত্তর প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে।

উন্নত দেশগুলির ভিতর ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ, আর্থিক বিপর্যয়, উপনিবেশ নিয়ে কাড়াকাড়ি, যুদ্ধ-বিপ্লব ইত্যাদির ভিতর দিয়ে অনেক রক্ত, অনেক অশ্রুর মূল্যে অবশেষে এই উপলব্ধি

হ'ল যে, ব্যক্তি স্বার্থকেই চূড়ান্ত মূল্য দিলে মানুষ যে একমাত্র বৈষয়িক (Economic), এ ছাড়া তার পরিচয় না থাকলে, প্রতিযোগিতাকেই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলে সমাজে শৃঙ্খলা (order) ভঙ্গ হয়, প্রগতি ব্যাহত হয়, শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বাধীনতাও নষ্ট হয়। স্বাধীনতার অর্থ হয় মুষ্টিমেয়র হাতে যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা ; আর অধিকাংশের না খেয়ে মরার স্বাধীনতা।

কিন্তু ইউরোপ তখনো সে পথ খুঁজে পেল না, যে পথে চললে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি আসবে।

ফলে লিবারেলিজিম এই সংকটাবর্তে পড়ে গভীর বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে গেল।

ইউরোপ যখন এই নৈতিক সংকটে নিমজ্জমান ঠিক সেই সময়েই তাকে আরো ডুবিয়ে দিলে সারস্বত সমাজের চিন্তা-সংকট।

পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন সব আবিষ্কারের ফলে বস্তু জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের ক্ষমতা মানুষের কতটুকু, সম্ভাবনাই বা কতদূর—সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মনে এক গভীর সন্দেহ দেখা দেয়। একদিকে লিবারেলিজিম গিয়েছে, তারপর বৈজ্ঞানিকদেরও যদি এই কথা হয় তবে সাধারণ মানুষের অদৃষ্টবাদ ছাড়া নির্ভরযোগ্য আর কি থাকে। শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের মনের গঠন এমনই যে তাকে নির্ভর করতেই হয় কারুর না কারুর উপর, তা সে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি যোগ্যতার উপরই হোক বা অপর কোন নির্ভরযোগ্যের উপরই হোক।

মানুষের জ্ঞান ও যুক্তির ওপরে আস্থা শিথিল হয়েছে আরও অনেকগুলি কারণে, যেমন :

মার্কস লিবারেল ব্যক্তি-স্বার্থের পরিবর্তে দেখালেন যে, মানুষ যুক্তি অনুসারে চলে না, চলে শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হয়ে। শ্রেণী স্বার্থই সমষ্টি জীবনের নিয়ামক।

ফ্রয়েড্ দেখালেন, মানুষের যুক্তির পিছনে কাজ করে তার কতকগুলি অবদমিত ও অসামাজিক জৈব ইচ্ছা, যার উৎস মনের নির্জ্ঞান-লোকের অন্ধকারে, যেখানে মানুষ জন্তু জগতের অতি নিকটে।

বার্গসঁ (Bergson) দেখালেন, মানুষের বুদ্ধি জিনিষটি (Intellect) বিশ্লেষণী (analytical); তা সব কিছুকে টুকরো করে দেখে, আর সেই টুকরোগুলো জুড়ে সে সত্যকে তথা সমগ্রকে জানতে চায়। কিন্তু analytical intellect সত্যকে পায় না —সত্যকে, সমগ্রকে পায় intuition।

বার্গসঁ ও উইলিয়াম জেমস দুজনেই দেখালেন, বুদ্ধি বা intellect কার্যসাধিকা (pragmatic); এবং যাতে কাজ হয় তাই মানুষের কাছে সত্য (Truth is that which works)। এই যুক্তি থেকে ফ্যাসিবাদে পৌঁছানো যায়। (Vide-M. N. Roy—Fascism, Its Philosophy & Practice)

যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রথম দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে রুশো এবং রোমান্টিকদের মধ্যে। যুক্তির চেয়ে Instinct Self-interest, Will, Emotion, Unconscious, Intuition প্রভৃতি সব বৃত্তিগুলিকে মূল্য দেওয়ার ফলে মানুষ নিজের যুক্তির উপরেই আস্থা হারায়। বলা বাহুল্য যে সব মণীষী অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করলেন, যুক্তির স্থান খুব সামান্য তাদের যুক্তিটি আত্মঘাতী। কিন্তু যুক্তির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ (revolt against reason) জন্ম দিল ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজিম। রায়ের ভাষায় twins of irrationalism—অযুক্তির দুই যমজ (M. N. Roy—Reason. Ramanticism & Revolution)।

যুক্তিবাদের প্রতি অনাস্থার ফলেই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় ব্যক্তির চেয়ে সমাজ, সমষ্টি, জাতি, ইতিহাস, রাষ্ট্র, ঐতিহ্য এই সব প্রাধান্য পেলো। Conservative চিন্তা খারিজ করলো ব্যক্তি

ও যুক্তির প্রাধান্য,(Burke* deBonald, de Maistre, Sarte Briand প্রভৃতি), প্রাধান্য দিল সমাজ ও ঐতিহ্যকে। Saint Simon, Comte, Hegel, Marx, Durkheim প্রধান্য দিলেন ইতিহাস, শ্রেণী, রাষ্ট্র ও সমাজকে। সমষ্টিবাদের জন্ম হ'ল এই ভাবে। (Jhon Boodle—Politics & Opinion in19th century)।

ব্যক্তি নিজের উপরে, নিজের যুক্তি-বুদ্ধির উপরে আস্থা হারালে ঈশ্বরকে স্মরণ করে, নতুন ঈশ্বর বানায় (রাষ্ট্র, ইতিহাস, সমাজ এই সব নতুন ঈশ্বর)। কোনও এক ঈশ্বর বা তাঁর প্রতিভূর (dictator) কাছে দায়িত্ব ও সব ক্ষমতা সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। স্বাধীনতার দায় বইতে চায় না। এটির নাম এরিখ ফ্রমের ভাষায় escape from freedom (Erich Fromme : Escape from Freedom)। ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজিম এই escape from freedom এর পরিণতি।

আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সামরিকএকনায়কত্ব ও কমিউনিষ্ট একনায়কত্ব মাথা চাড়া দিচ্ছে। গণতন্ত্রে আস্থাশীল দেশগুলির সঙ্গে কমিউনিষ্ট দুনিয়ার সংঘর্ষে পৃথিবীর শান্তি ও মানুষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। মানুষ বাঁচতে চায়। কিন্তু কোন্ পথে ? কোন্ পথ শ্রেয়ঃ বিচার করতেই হয়। মানুষের দায়িত্বই বিচার করা, বেছে নেওয়া। এ দায়িত্ব এড়ানো যায় না।

বেছে যে নেবে, কিন্তু ভালোমন্দ বিচারের মাপকাঠি কী? পূর্বেই দেখেছি বিস্তর যুক্তিতর্ক প্রয়োগ ক'রে আধুনিক কালের মণীষীরা দেখাচ্ছেন যে, মানুষের যুক্তির মূল্য বেশী নয়। অপিচ তর্ক শাস্ত্রের (logic) সাহায্যে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত-সম্পর্কে একটি সর্বজন গ্রাহ্য (objective ও universal) সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। মানুষের নীতিবোধ আপেক্ষিক ব'লে প্রতিভাত

---

* বার্কের সঙ্গে অন্যান্য Conservativeদের তফাৎ এই যে বার্ক তাঁর রক্ষণশীলতা সত্বেও নিয়ম তান্ত্রিক সরকারের প্রতি আস্থা জানিয়েছেন।

হ'তে পারে। অর্থাৎ আপাতঃ দৃষ্টিতে এক দেশে যা ভাল অন্যদেশে তা মন্দ, এক সমাজে যা ন্যায়সঙ্গত অন্য সমাজে তা অন্যায়। তর্কশাস্ত্রের যে আধুনিকতম চিন্তা—Logical Positivism, তার সিদ্ধান্ত এই যে, যখন আমি বলি এটা ভাল, ওটা মন্দ, তখন আমি আমার ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রকাশ করি মাত্র, এ নিয়ে তর্ক চলে না। সেই যুক্তি আশ্রয় করে T.D. Weldon সাহেব তাঁর Vocabulary of Politics গ্রন্থে দেখালেন যে গণতন্ত্র ভালো, কি এক-নায়কতন্ত্র ভালো, এটিও ব্যক্তিগত অভিরুচির কথা, যেমন বীয়ার ভালো কি অন্য কোন পানীয় ভালো, তা নিয়ে তর্ক বৃথা। তা যদি হয় তবে কী করে বলব প্রতিযোগিতা খারাপ, সাম্রাজ্যবাদ খারাপ, ফ্যাসিবাদ খারাপ, কমিউনিজিম খারাপ,—ব্যক্তি স্বাধীনতা ভালো, সহযোগিতা ভালো ইত্যাদি? বস্তুতঃ চিন্তা-সংকটের শেষ পর্যায়ে আমরা এই শুভ নাস্তিক্য বা বৈনাশিকতাবাদের (nihilism) মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

তর্কশাস্ত্রের এই আধুনিকতম শুভ নাস্তিকদের জবাব তর্কশাস্ত্র দিয়েই দেওয়া যায় না, দিতে হয় জীব বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান ও মানুষের শারীরবৃত্তের (Physiology) সাহায্যে। "ব্যক্তিগত অভিরুচি" প্রকাশ করার পূর্বে প্রয়োজন ব্যক্তির অস্তিত্ব, মানুষ হিসাবে ব্যক্তির অবস্থান। তার জন্যে চাই খাদ্য-বস্ত্র-গৃহ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার—মর‍্যালিটি।

খাদ্যের জন্যে এক ব্যক্তির কমবেশী ৩০০০ ক্যালরি উত্তাপ উৎপাদনে সক্ষম আমিষ শ্বেতসার চর্বি ও খনিজ জাতীয় সুসম খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষকে বাঁচতে হ'লে এটি অবশ্যই চাই। অতএব এটিকে সর্বজনগ্রাহ্য শাশ্বত প্রয়োজন বলা চলে (obejective & universal)। তবে এই কাঁচা খাদ্য দ্রব্য দেশী মতে রান্না হবে, কি বিলাতী মতে হবে, ফরাসি ডিশে বা মোগলাই কায়দায় গ্রহণ-যোগ্য হবে, পানীয় বীয়ার থাকবে, না হুইস্কী কিংবা স্রেফ্ জল,

সেটা ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরই ছেড়ে দিতে হবে—অবশ্যই সেটা সর্বজনীন হবে না।

তারপর বস্ত্র। শীতাতপ ও মনুষ্যোচিত লজ্জা নিবারণের জন্যে বস্ত্র যে অবশ্য প্রয়োজন এ সম্বন্ধে দ্বিমত করবে একমাত্র পাগল, দিগম্বর সম্প্রদায় ও নিউড কলোনির সভ্যরা ছাড়া আর কে? তবে পরিধেয়ের ছাঁটকাট ধরনধারন ফ্যাসান "ব্যক্তিগত অভিরুচি" অনুসারেই চলবে বৈ কি।

গৃহ সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। শীতাতপ নিবারণ আব্রু ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে আলোবাতাসযুক্ত একটি আচ্ছাদনের প্রয়োজন সকলেরই। এটিও একটি বিশ্বজনীন শাশ্বত প্রয়োজন; তবে সেই আশ্রয়টি গঠনের আঙ্গিক গথিক হবে, না অজন্তার ধাঁচে হবে, কিংবা অন্য কিছুর মত হবে, সেটা অবশ্যই ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করবে।

শিক্ষা সম্বন্ধেও অনুরূপ একটি সর্বজনীন প্রয়োজনের মাপকাঠি আছে। ভাষা ও নির্ভুলভাবে চিন্তা করার পদ্ধতি শিক্ষা সর্বজনীন চাহিদা। এরপর এই শিক্ষিত সংস্কৃত মনকে নিয়োগ করার জন্যে বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

তারপর সর্বশেষে সদাচার বা নীতিবোধের কথা। এটিও প্রাণীবিজ্ঞান ও মানুষের শারীরবৃত্ত অনুসারে আপেক্ষিক হ'তে পারে না। কারণ প্রাণী বিজ্ঞান অনুসারে মানুষ পিঁপড়ে, উইপোকা, মৌমাছির মত সামাজিক জীব নয়—মানুষ পারিবারিক জীব। পিঁপড়ে, উইপোকা, মৌমাছির মত মানুষের কোন সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি নাই। মানুষের আঁতের টান প্রতিবেশীর উপর নাই, আছে তার নিজের স্ত্রীপুত্র পরিবারের উপর। অথচ মনুষ্যোচিত উচ্চমানের জীবন যাপন করতে এবং তার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান করতে তাকে যখন তারই মতন বেদরদী প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলে

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে বাস করতে হচ্ছে তখন একটি সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন না থাকলে, একটি Universal objective moral standard না থাকলে এবং সেই অনুশাসন বলবৎ করতে একটি রাষ্ট্র না থাকলে বেদরদী, আক্রমণাত্মক প্রতিবেশীকে নিয়ে নিশ্চিন্তে পাশাপাশি বাস করা যায় না। সেই জন্যেই পরস্পর সহযোগিতা না করলে সমাজ টেকে না। সমাজ না টিকলে স্ত্রীপুত্র পরিবারকে নিয়ে বনে যেতে হয়; কিন্তু তাতে না রক্ষা হয় জীবনের মান, না থাকে জীবনের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা। অতএব মনুষ্য সমাজের আদি থেকে অন্তকাল পর্যন্ত এই নীতিবোধ বিশ্বজনীন ও শাশ্বত বটে। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে যে সমাজের প্রতিবেশী যে ব্যবহারকে সদ্ব্যবহার বলে গ্রহণ করবে সেই ব্যবহারটিকেই সদাচার বা মর‍্যালিটি বলে গ্রাহ্য হবে। এর ফলে দেশ বিদেশে একালের সেকালের নৈতিক ব্যবহারকে খানিকটা আপেক্ষিক ব'লে মনে হবে। কিন্তু মানুষের নীতি বোধের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি যে শাস্ত্রে আছে সে শাস্ত্রটি মনে রাখলে আর সেটি মনে হবে না।

দেখা যাচ্চে 'ব্যক্তিগত অভিরুচি' অনুসারে জীবনকে বিকশিত করে তোলা জীবনকে সম্ভোগ করা, অন্নবস্ত্রের মতই মানুষের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। অতএব আমরা ধরতে পারি যে, অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সদাচার ও ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রকাশের ক্ষেত্র যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবাপেক্ষা সহজলভ্য এবং তার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সর্বাধিক সেই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাই কাম্য।

সুতরাং এই বিংশ শতাব্দাতে এই যুক্তি বুদ্ধির উপর অশ্রদ্ধা —এই শুভ নাস্তিক্য, এই Cynicism একান্তই অবৈজ্ঞানিক। এর উদ্ভবের কারণ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখার ফল। কিন্তু যদি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামগ্রিক শিক্ষাকে সংশ্লেষণ করা যায় তা হ'লেই এসব মতের

কুজ্ঝটিকা কেটে গিয়ে পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। রায় সেই কাজটিই করেছেন। কিন্তু সে কথা পরে। এখন যে কথা বলছিলাম।

এ যাবৎ এ অবস্থা যাঁদের কাছে অসহনীয়, যাঁরা মনে করেন শুভ-অশুভ সম্বন্ধে ধারণাকে অভিরুচির স্তরে নামিয়ে আনা চলে না, তাঁরা কেউ কেউ ধর্মে ফিরে যাচ্ছেন, ধর্মীয় প্রত্যয় আশ্রয় করে সভ্যতার মূল্যগুলিকে বাঁচাতে চাইছেন।

অতীতে এইরূপ ধর্মীয় নৈতিকতার ফল আমরা সমগ্র ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখেছি। জনসাধারণকে ইহলোকে কৃচ্ছ্র সাধনা ও বঞ্চিত জীবনের বিনিময়ে পরকালের স্বর্গসুখের লোভ দেখিয়ে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে, যে সমাজে কেবল রাজা-রাজন্যের ও যাজক সম্প্রদায়ের ইহলৌকিক ভোগৈশ্বর্যেরই সকল ব্যবস্থা। মানুষের এই দৈহিক ও মানসিক দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙ্গতেই বর্তমান যুগের দার্শনিক বিপ্লব ঘটেছিল ইউরোপে রেনেসাঁস ও Enlightenment-এর (বৈদগ্ধের যুগ) যুগে, রাজতন্ত্র ও যাজক সম্প্রদায়ের বিলুপ্তিতে, গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানে।

ব্যক্তি মানুষের সার্বভৌমত্ব ও স্বরাটত্ব প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার নিয়ে সে বিপ্লব ঘটেছিল তা আজো সম্পূর্ণ পাওয়া হয় নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই চিন্তা জগতে সংকটের ফলে ব্যক্তি মানুষের সার্বভৌমত্ব স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হ'তে বসেছে, এবং কমিউনিজিম ও ফ্যাসি-জিমের উদ্ভবের ফলে সেই আশঙ্কা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দর্শনের যে ত্রুটির ফলে আজ এই নৈতিক সংকট সেই ত্রুটি দূর করাই ছিল দার্শনিক জগতের একমাত্র কাজ। সেই কাজই রায় করেছেন।

ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য এক ধারণার ভিত্তিতে সমাজে ন্যায় নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্যে পুনরায় ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া চলবে না। দিলে সেই সঙ্গে পুরোনো দিনের যাজক সম্প্রদায় আসবেন, রাজন্যরা আসবেন,

অবশ্য নতুন বেশে নতুন ঢংয়ে, যেমন এসেছিলেন হিটলার মুসোলিনি, তাঁরাও ঈশ্বরের দোহাই দিয়েছিলেন।

"The people will remain responsible to the State, the State will remain responsible to me, I shall remain responsible to God"—Hitler.

বর্তমানের সংকট ত্রানের জন্যে মানুষকে নিজের যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকের মধ্যেই নীতিপরায়ণ হওয়ার প্রেরণা সংগ্রহ করতে হ'বে। রায় দর্শনের ইতিহাস মন্থন করে এবং সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহকে কাজে লাগিয়ে সেটি যে সম্ভব এবং সেটিই যে স্বাভাবিক তা প্রমাণ করেছেন।

গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের বাণী ছিল "Man is the measure of every thing"—ব্যক্তি মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড, অর্থাৎ সমষ্টি সত্তা নয়, ব্যক্তি সত্তাই সকল জ্ঞান অভিজ্ঞতার, সকল সুখ-দুঃখানুভূতির একমাত্র বিচারক। রেনেসাঁসের অঙ্গীকারও তাই ছিল।

বেকন, দেকার্ত, হবস্, লক, প্রভৃতি ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর মণীষীরা মানুষকে সার্বভৌমত্বে ও স্বরাটত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের তেমন উন্নতি তখনো হয়নি বলে অধ্যাত্মবাদীদের সকল যুক্তি খণ্ডন করা যাচ্ছিল না। এই ভাবেই দু'শতাব্দী কেটেছে। বিশেষতঃ শরীর বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের স্বল্পতার জন্যে মানুষের অনুভূতি ও জ্ঞান লাভের তত্ত্বটির সঠিক সন্ধান লাভ তখন সম্ভব হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীতে যদিও শরীর বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সেই জ্ঞান-বিদ্যা সমস্যার (epistemological problems) লৌকিক সমাধান সম্ভব হ'ল, অপর দিকে আবার বিংশ শতাব্দীর নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানের উন্নতিতে যে রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক অনির্দেশ্যবাদের উদ্ভব হ'ল তাতে বস্তু জগতের বাস্তবতা সম্বন্ধে ও মানুষের জ্ঞান লাভের

ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ এসে গেল। ফলে মানবত্তাবাদের সমস্যা সপ্তদশ শতাব্দীতে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

রায় পদার্থ-বিজ্ঞানের এই সমস্যা থেকে সুরু করে দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখা উদ্ভূত অন্যান্য সমস্যাকেও বিচার করে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বসূরীদের সেই ব্যক্তি মানুষকে সবার উপরে স্থান দেবার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছেন। তাঁর যুক্তি যে কত অভ্রান্ত তা তাঁর ঐ দু'খানি মূল গ্রন্থ পড়লেই বোঝা যাবে। সেই জন্যেই শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মত সুপণ্ডিত তাঁর ভাষণের শেষে বলেছেন :

"এমনই একটি মানুষ যে আমাদের মধ্যেই জন্মেছিলেন এ কথা ভেবে গর্ববোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁর সৃষ্টির মৌলিকতা আমাদের আত্মমর্যাদা বোধ অনেকখানি ফিরিয়ে এনেছে ; এবং যখন তিনি আমাদেরই মতন একজন প্রাচ্য দেশীয় এবং যখন তাঁর চিন্তার আলোকপাতে মানুষের মনের দিগন্তে নতুন প্রভাতের ইঙ্গিত দেখছি, তখন বহুযুগ পরে এবার সত্য সত্যই ইংরেজ কবি Clough-এর ভাষায় বলতে পারি—যুগ সূর্যের অভ্যুদয় এবার প্রাচ্যের আকাশে।"*

আশা করি সেই যুগ-সূর্যের জীবন ও দর্শন আজ সমগ্র বিশ্বের ব্যক্তি মানুষের চলার পথকে আলোকিত করে তুলবে।

*"We have deep reason to feel proud that such man rose from amongst us. By the originality of the productions of his mind, he enabled us to recover to some extent our self-respect, and because he was one of us, an Easterner and because in the radiance of his thought, the breaking of a new dawn in the horizon of man's mind can be seen, we can perhaps say at last with truth in the language of the English poet Clough, though reversing his order of east and west :

> And not by western windows only,
> When day light comes comes in the light ;
> In front the sun climbs slow how slowly !
> But eastward, look, the land is bright !"

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাতৃক্রোড়ে নরেন্দ্রনাথ

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় ক্ষেপুত গ্রামের ক্ষেপুতেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ বহু পুরাতন। কিংবদন্তী, লঙ্কার রাজা রাবণ এই দেবীর নিত্য পূজা করতেন। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের সময় মহাবীর হনুমান এই দেবীকে নিয়ে আসছিলেন। ঘটনাচক্রে দেবী এইখানেই থেকে যান। সেই থেকেই তিনি এখানে পূজিতা হয়ে আসছেন। ক্ষেপুতেশ্বরীর পুরোহিত বংশেই মানবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

ভৈরবানন্দ ভট্টাচার্যের পুত্র (এই বংশের অনেকে "রায়" উপাধিতেও পরিচয় দেন) দীনবন্ধু ভট্টাচার্য ক্ষেপুত ত্যাগ করে কলিকাতা থেকে প্রায় ৩০ মাইল উত্তর-পূর্বে ২৪ পরগণা জেলার আড়বেলিয়া গ্রামে কর্ম উপলক্ষে এসে বাস করতে থাকেন। ঐ গ্রামের জ্ঞান বিকাশিনী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করতেন। এইখানে পিতা দীনবন্ধু ও মাতা বসন্তকুমারীর চতুর্থ সন্তানরূপে মানবেন্দ্রনাথ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে ৮ই চৈত্র (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭) সোমবার বেলা ১॥০ সময় জন্মগ্রহণ করেন। নাম দেওয়া হয় নরেন্দ্রনাথ।*

এই সময়টি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ যাম—ব্রিটিশ রাজের সবাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল সময়।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমিত হয়েছে। রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের মহারাণী হয়েছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যে সূর্যাস্ত হয় না তা

---

* মতান্তরে রায়েব জন্ম বৎসর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ। Letters From Jail বা M. N. Roy's Memoirs—এ এই সালের সমর্থন আছে। লেখক রায়ের সহোদর শ্রীযুক্ত ললিত মোহন ভট্টাচার্যেব নিকট তাঁদের পারিবারিক কাগজপত্র থেকে ১৮৮৭ সালটিকেই অধিকতর প্রামাণ্য রূপে গ্রহণ করেছেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ বাংলা ১২৯৩ সাল। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে বাংলা সালের ৯৩ সাল ভুল ক্রমে ইংরাজি '৯৩ সালে রূপান্তরিত হয়েছে।—লেখক

সদম্ভে ঘোষিত হচ্ছে। ব্রিটিশ শক্তি যে ঈশ্বরানুগৃহীত, সুতরাং এ বিশ্বে অপরাজেয় এ বিশ্বাস ব্রহ্মদেশ থেকে বেলুচিস্তান, তিব্বৎ আফগানিস্তান থেকে সিংহল পর্যন্ত সকল মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে।

এই হতাশার নীরন্ধ্র অন্ধকারে আশার বিন্দুমাত্র আলো সেদিন কারো মনে বুঝি উদয় হয়নি, সেই নিবিড় দাসত্বের, সেই নিশ্ছিদ্র শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণতম ধ্বনিও বুঝি কারো কণ্ঠে জেগে ওঠেনি।

এই সময়কার অবস্থা রূপকের ছলে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠের' উপক্রমণিকায় প্রকাশ করেছেন :

"........একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার ; কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

"........পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ সেই অরণ্য মধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধ ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।"

তথাপি এ হেন প্রবল প্রতাপ সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ঈশ্বরের অনুগৃহীত ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে কোন কোন দুঃসাহসী দৃঢ় কণ্ঠের প্রতিবাদ ধ্বনি ধীরে ধীরে জেগে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র রূপকচ্ছলে লিখলেন,

"........সেই অনন্ত শূন্য অরণ্য মধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে সে অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

"শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল ; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্য মধ্যে মনুষ্য শব্দ শুনা গিয়াছিল ? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি ?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবন সর্বস্ব।"
প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"
"আর কি আছে? আর কি দিব?"
তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

'আনন্দমঠ' লেখা হয়ে গেছে। জাতীয় কংগ্রেস গড়ে উঠেছে। বন্দে-মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হ'তে সুরু করেছে। ভারতের জাতীয়তাবোধ অতি ধীরে জেগে উঠছে। ঠিক এই সময়েই বাংলার মাটিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পর্ণ কুটিরে, পল্লীর সহজ সরল অনাড়ম্বরতার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে উঠতে লাগলেন।

'আনন্দ-মঠের' আদর্শ, স্বদেশ-সেবার জন্য কেবল জীবন দানই সব নয়। প্রথমে একাগ্র কঠিন সাধনায়, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে, দেহে ও মনে পরিপূর্ণ মানুষ হ'য়ে উঠতে হবে; তার পরে সেই মূল্যবাণ প্রাণ পরম নিষ্ঠায় দেশ মাতৃকার চরণে বলি দিতে হ'বে।

বঙ্কিমচন্দ্রই এই আদর্শের ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' লিখলেন, "সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম ও তাহার অভাবই অধর্ম।"

* * *

"মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার 'বৃত্তি' নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।
"তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।
"সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যে।
"তাহাই সুখ।"

• • •

"অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা, এবং সুরসে রসিকতা এই সকল হইলে তবে মানসিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।"

এই অনুশীলনী তত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখলেন, 'কৃষ্ণ চরিত্র' ও 'দেবী চৌধুরাণী।' রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকেই তাঁর অনবদ্য ছন্দে ও ভাষায় রূপ দিলেন:

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা।............
............শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।
............তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণ কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতি পরিচিত অবজ্ঞায়।............
............তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।............
............শুধু জানি,
সে বিশ্ব প্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।............"

[রচনা ২৩শে ফাল্গুন, ১৩০০ বঙ্গাব্দ]

বঙ্কিমের আদর্শে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও সুরের উন্মাদনার মধ্যে যখন বাংলার যুব-শক্তির উদ্বোধন সুরু হয়ে গেছে, তখন বিবেকানন্দ পশ্চিম থেকে ফিরে এলেন তাঁর গৈরিক উষ্ণীষের জয়ধ্বজা উড়িয়ে। উদ্বোধিত তরুণ বাংলা চোখের সামনে দেখল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বাণীর মূর্ত প্রকাশ। প্রত্যয়ে বুক ভরে গেল, "না, আমরাও পারি।" অপরাজেয় পাশ্চাত্যের কুলিশ কঠোর কাঠামোয় চিড়-ফাট স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। ধ্বনিত হ'ল তাঁর বীর কম্বুকণ্ঠের বাণী :

> "হে ভারত! ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ;···· ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ;—
>
> "হে বীর! সাহস অবলম্বন কর! সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের মৃতসঞ্জীবনী বাণী যখন বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে তখন উনবিংশ শতাব্দীর সূর্য অস্ত গেল। এই পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের নরেন্দ্রনাথের শৈশব অতিক্রান্ত হ'তে লাগল।

পিতার বিদ্যালয়েই নরেন্দ্রনাথের হাতেখড়ি। এগার বৎসর তাঁর এই আড়বেলে গ্রামেই কাটে। কলিকাতার ১২ মাইল দক্ষিণে কোদালিয়া গ্রামে ছিল তাঁর মাতুলালয়। ১৮৯৭ সালে তাঁর পিতা তাকে তাঁর মাতুলালয়ে প্রেরণ করলেন। কোদালিয়ার উত্তরের গ্রাম হরিনাভি। তিনি হরিনাভি এংলো সংস্কৃত স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। পর বৎসর তাঁর পিতাও আড়বেলিয়া স্কুলের কর্মত্যাগ করে কোদালিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিশোর নরেন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন সুরু হয়। নরেন্দ্রনাথের বয়ঃজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের (৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺হরিকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি) নিকট থেকে জানা যায় যে, ১৯০১ সাল থেকেই তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেন।

আড়বেলিয়াতে থাকার সময় আনন্দমঠ, ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবী চৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, তিলক ও চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী পড়ে যে বৈপ্লবিক ভাব ও ভাবনা তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠছিল, কোদালিয়ায় এসে সেই ভাব ও ভাবনাকে রূপায়িত করার জন্যে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হলেন। তখন তাঁর বয়স ১৪।

সেই সময় ব্যারিষ্টার পি, মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে এক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, নাম দেন, অনুশীলন সমিতি। তখন এই আদর্শ কেবল অনুশীলন সমিতিরই ছিল না, বাংলার সকল বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ও যুবক সমিতিরও ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই যখন বৈপ্লবিক আন্দোলন সক্রিয় প্রচেষ্টার রূপ নিতে থাকে তখন পুলিশের রোষ বহ্নিতে এই সকল ছাত্র ও যুবসংঘগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। আড়বেলিয়াতে থাকার সময়ই এই অনুশীলনীর আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই আদর্শকে রূপায়িত করে তোলার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক ও উপদেষ্টা লাভ করাই ছিল তাঁর শৈশবের স্বপ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপুত্র তাঁকে হ'তেই হ'বে, বিবেকানন্দের আশা তাঁকে পূর্ণ করতেই হ'বে, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে রূপ দিতেই হ'বে। নরেন্দ্রনাথের সাধনা চলল। চলল শারীরিক ও মানসিক সকল বৃত্তি ও শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনা ক'রে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের

সাধনা। শরীরকে বলিষ্ঠ, কষ্ট সহিষ্ণু, সুদক্ষ ক'রে তুলতে হবে, সেই দেহের মধ্যে থাকবে এক নির্ভীক দুঃসাহসী মন; জ্ঞান, বিদ্যা আহরণ করে সর্ববিষয়ে পণ্ডিত ও বিদ্বান হ'তে হ'বে; বিচার-বিতর্কে সুতীক্ষ্ণ যুক্তি প্রয়োগের দক্ষতা ও কৌশল শিখতে হ'বে; কাজ-কর্মে তৎপরতা অভ্যাস করতে হবে; চিত্ত সততা ও ধর্মাত্মতায় ভরে রাখতে হ'বে; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের জন্যে সঙ্গীত, চিত্রকলা, চারু ও কারু কলার রস গ্রহণ ক্ষমতাও গ'ড়ে তুলতে হ'বে।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মানব শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্পর্কে উত্তম-রূপে অবহিত হওয়ার জন্যে কৃষ্ণোপাসক রামদাস বাবাজীর নিকট এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তি সাধনায় হাতে কলমে শিক্ষা লাভের জন্যে শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।*

এই আদর্শ—বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ—নরেন্দ্রনাথের উত্তর জীবনে কতখানি সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল তা দেখা যাবে তাঁর সমগ্র জীবন-কাহিনীর মধ্যে।

* চাংড়িপোতা নিবাসী বিপ্লবী শ্রীঅলোক নাথ চক্রবর্তী কথিত ও ডক্টর নিরঞ্জন ধর লিখিত রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী। Vide—The Radical Humanist Dated 10. 11. 63 etc.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনীতিতে হাতেখড়ি ও স্কুল হইতে বিতাড়ন

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন দেশের অবিসম্বাদী নেতা। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহী আত্মার বাঙ্ময় প্রকাশ সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে। কত শতাব্দী পরে বিদেশী শাসনের প্রতিবাদে এমন দর্পিত কণ্ঠ ভারতের আকাশে আবার শোনা গেল! এমন মানুষের চরণে নরেন্দ্রনাথ মাথা নোয়াবে না তো নোয়াবে কোথায়? কার গলায় মালা পরাবে?

এ হেন সুরেন্দ্রনাথ হরিনাভি আসছেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা সভা-সমিতি শোভাযাত্রার আয়োজন যথাসাধ্য আড়ম্বরের সঙ্গেই করেছেন। নরেন্দ্রনাথকেও তো কিছু ক'রতে হয়।

স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রায় যোগদান করলে কেমন হয়। তারপর মালা পরানো, সভায় যোগদান।

পরবর্তী জীবনে বহু সুকঠিন ও সুবৃহৎ বৈপ্লবিক কর্মের সঙ্কল্পই তাঁকে নিতে হয়েছে, কিন্তু জীবনের সেই প্রথম বৈপ্লবিক কর্মের সঙ্কল্প গ্রহণের জন্যে তাঁকে যে পরিমাণ চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল এমনটি বুঝি আর কোন দিনই হয়নি। কর্মের দুঃসাহসিকতায় রায়ের জীবনের বহু উদ্যোগই অতুলনীয় হ'য়ে আছে, কিন্তু সে দিন যতখানি বুক দুরুদুরু করে ছিল এমনটি বুঝি আর কোন দিন করে নি। তিনি জানতেন, এই কর্মের জন্যে তাঁকে শাস্তি পেতে হবে, হয়তো চিরদিনের জন্যে স্কুল থেকে বিতাড়িত হ'তে হ'বে, অন্য কোন স্কুলেও তখন তার স্থান হবে না, তখন কি হবে? বাবা কি বলবেন? প্রতিবেশী আত্মীয়রা মুখ্যু বলবে; বাবার চাকরী নাই; সংসার চলবে কি করে? ভাই-বোন মানুষ হবে কি করে?

সবই সত্যি! কিন্তু যে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত তাকে তো বলি পড়তেই হবে? তার আবার অগ্র-পশ্চাৎ ভাবনা কিসের?

এইখানে তাঁর সহকর্মী বিখ্যাত বিপ্লবী ৺হরিকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্তৃক রায়ের মৃত্যুর পর লিখিত, "মানবেন্দ্রনাথ স্মরণে" পুস্তিকা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

> "একদিন শোনা গেল, স্বদেশী যজ্ঞের হোতা জাতির নায়ক সুরেন্দ্রনাথের শুভাগমন হবে রাজপুরের বাজারে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র যারা তাদের কি যে কর্ত্তব্য এ ক্ষেত্রে, তার দায়িত্বের কথা উদয় হ'ল নরেন্দ্রনাথের মনে। অভ্যর্থনা করতে হ'বে জাতির প্রধান নায়ককে। ডাকা হ'ল ছাত্র-সভা, নরেন্দ্র অগ্রণী, নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রের প্রধান কর্তব্য তাই প্রধান শিক্ষকের কাছে গেল নরেন ছুটির হুকুম আনার জন্যে। হুকুম মিলল না। কিংকর্তব্য স্থির করে ফেললে নরেন, গুরুকে অমান্য করা চলবে না, টিফিনের সময় ছুটি পেলে সভা হবে। সভা হ'ল। বক্তা নরেন। মিছিল করে বরণ করতে যাওয়া হ'বে জাতীয় মুক্তি যজ্ঞের প্রধান হোতা সুরেন্দ্রনাথকে। প্রধান শিক্ষক আদেশ দিলেন, মিছিল করে যাওয়া চলবে না। আদেশ মানা হ'ল না, জাতির নায়কের প্রতি কর্তব্য বড় হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সভার প্রধান পাণ্ডা নরেন্দ্রনাথ সহ আরও সাতজনের নাম চলে গেল জেলার স্কুল ইনস্পেকটারের কাছে। রায় (হুকুম) আসতেও দেরী হ'ল না, অমার্জনীয় অপরাধের জন্য একদিনের নয়, একমাসের নয়, চিরদিনের মত স্কুলের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। নরেন্দ্র প্রধান শিক্ষকের শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে চিরদিনের মত ইংরাজের দানপুষ্ট বিদ্যালয়-গৃহ ত্যাগ করে চলে এল।"

এক স্কুল থেকে বিতাড়িত হ'লে অন্য স্কুলে ভর্তি হওয়া কঠিন। তারপর যে অপরাধে বিতাড়িত করা হয়েছিল সে অপরাধ সে যুগে বোধ হয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথম। সেই জন্যে ঐ অঞ্চলে হৈ চৈও বড় কম হয়নি। সর্বোপরি গরীবের ছেলে। দূর বিদেশে গিয়েও স্কুলে ভর্তি হওয়ার সাধ্য ছিল না। অথচ লেখাপড়া তাকে শিখতে হবেই, নতুবা তার অনুশীলন ধর্ম পালন করা হয় কি

করে, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সম্যক চর্চা তাকে করতেই হবে। স্কুলের বাইরে লেখা-পড়া চলল বহু গুণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে।*

১৯০৫ সাল স্বাধীনতা যুদ্ধের বড় স্মরণীয় বৎসর। ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহের পর এই বৎসরই সুরু হ'ল গণশক্তির প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ। উপলক্ষ ব্রিটিশ-রাজের বাংলাদেশকে দুইভাগে ভাগ করার চেষ্টা। নরেন্দ্রনাথ নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিবলে এই আন্দোলন সংগঠনকারীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট কর্মী হয়ে উঠেছেন। তখনই রায় ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, নিয়মিত ব্যায়ামে শরীর দৃঢ় সুঠাম। বয়স ১৮ হ'লে কি হ'বে, মনে হয় অনেক বড, ব্যক্তিত্ব অমোঘ; দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়, চোখ ফেরান যায় না, প্রভাব এড়ান যায় না।

এই সময়কার কথা উল্লেখ করে ৺হরিকুমার লিখছেন,

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনার আর তুলনা নাই। সে উত্তাল জলতরঙ্গ সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ঘর বাড়ী, গৃহ সংসার, মাতাপিতা, ভাইবন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, কোন বন্ধনই আর অটুট রইল না, দেশ প্রেমের সর্বগ্রাসী বন্যায় সব একাকার হ'য়ে গেল। সে দিন কত জনের কত না আশা-আকাঙ্খা,কামনা-বাসনা, কত না সাধ-আহ্লাদ একটি মাত্র ডাকে সব ভাসিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল মায়ের সেবায় শত-সহস্র বাঙ্গলার যুবক। সে যৌবন জল তরঙ্গ রোধ করার শক্তি কোনও মানুষের নাই, সে এক দুর্বার দৈবশক্তি, সেই শক্তির প্রেরণা অন্তরে পেয়ে নরেন গৃহত্যাগী হ'ল।

"সে দিন মনে পড়ে যে দিন নিশায় গভীর চিন্তার পর স্থির হ'ল আগামী কাল প্রাতে নব সূর্যের উদয় আর আমরা এখানে দেখব না। যেই সঙ্কল্প সেই কাজ, নিশার অন্ধকারে যার যে-দিকে ইচ্ছা বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশের যাত্রা পথে। অন্তরে জলন্ত আকাঙ্খা, কোথায় গেলে মুক্তি সাধনার প্রকৃত মন্ত্রলাভ করা যাবে। মাস তিনেক পরে একে একে সবাই ফিরে এলো; সবাই আবার জুটলাম, এক ঠাঁই, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে বুঝতে পারা গেল দেশের মুক্তি সাধনার মন্ত্র

---

* তাঁর বিদ্যাভ্যাসে ঐকান্তিকতার কথা ও বিষয় নির্বাচনের ব্যাপকতা সম্বন্ধে রায়ের বাল্যের সহকর্মী মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা নিবাসী কংগ্রেস নেতা ৺রামসুন্দর সিংহের নিকট লেখক শুনেছিল, এবং লেখক এই রামসুন্দর বাবুর দ্বারাই রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করে।—লেখক।

দুর্লভ, একনিষ্ঠ মুক্তি সাধকের দর্শন লাভ মিলল না। তখন স্থির হ'ল, নিজেদের পথ নিজেদেরই স্থির করে নিতে হবে। তাই এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবক নিয়ে নরেন্দ্রনাথ দেশ মাতৃকার মুক্তি সাধনায় ব্যাপৃত হ'ল একান্ত নিষ্ঠায়।"

এই সময়েই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

৺হরিকুমার লিখেছেন :

"বৃথা সময় কাটায় নাই নরেন, অবসর সময়ও ছিল না। দেশে স্বামীজির আদশে, সেবা ধর্মের মধ্য দিয়ে অপরিতৃপ্ত দেশপ্রেমের সার্থকতা খুঁজে বেড়াত অহরহ। কিন্তু তাতেও সে ত' তৃপ্তি পেত না, সমগ্র দেশের মুক্তির সন্ধান তাতে ত' মেলে না। তাই দেশ-বিদেশের বৈপ্লবিক চরিত্রের কাহিনী থেকে বৈপ্লবিক চেতনায় ভরিয়ে তুলতে লাগল অন্তরটাকে। গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনি থেকে আরম্ভ করে ফরাসি বিপ্লবের অফুরন্ত কাহিনী সুধা আকণ্ঠ পান করে বিপ্লবের রাস্তায় চলাই স্থির করলে নরেন্দ্রনাথ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম স্বদেশী ডাকাতি

১৯০৬ সালে তিনি জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাদবপুরের বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনসটিটিউটে ভর্ত্তি হ'ন। তখন তিনি বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্যরূপে নিজেদের মধ্যে খ্যাত হয়ে উঠেছেন। যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াও চলেছে, সেই সঙ্গে রসায়ন। বোমা তৈরির ফরমূলাটি তাঁর সর্বাগ্রে জানা চাই।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্যে অর্থের প্রয়োজন হয় প্রচুর। বন্দুক-পিস্তল কিনতে, বোমার কারখানা গড়তে, নিষিদ্ধ পুস্তক-পুস্তিকা পত্র-পত্রিকা ছাপাতে, ছদ্মবেশে গোপন পথে চলা-ফেরার জন্যে টাকা কম লাগে না। এই টাকা চাঁদা চেয়ে চেয়ে সংগ্রহ করা কঠিন। চাঁদা চাইলেই উদ্দেশ্যের কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না, দিলে মন্ত্র-গুপ্তি নষ্ট হয়, উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধান হয় কি করে?

নরেন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি পাঠ করেন। সেই সঙ্গে বিদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের খোঁজ-খবরও রাখেন। নিহিলিষ্ট, এনার্কিষ্ট, সোস্যালিষ্ট বিপ্লবীরা অনেক সময়ই সরকারী খাজনা ও ধনীর ধন লুঠ ক'রে অর্থ সংগ্রহ করেন, এ কথা তিনি জানতেন। তা ছাড়া 'আনন্দ মঠ' ত' তাদের ধ্যান-জ্ঞান। স্থির করেন, বোমা-পিস্তলের টাকা সরকারী খাজনা লুঠ করেই নিয়ে আসবেন।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলার প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হ'ল কলকাতা থেকে ১২ মাইল দূরে চিংড়িপোতা (বর্তমানে সুভাষনগর) রেল ষ্টেশন লুঠ করে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে ৺হরিকুমার লিখেছিলেন, "সে দিন সেই ছোট্ট একটি গ্রামের ছোট্ট একটি রেল ষ্টেশনে এই যে যুগান্তকারী ঘটনা সমগ্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় এক নব অধ্যায়ের সূচনা করলে, ইহাই প্রথম ও অজানা পথের সুনিশ্চিত সঙ্কেত ব'লে এর মূল্য অনেক।"

নরেন্দ্রনাথ অনুশীলন ধর্মে দীক্ষিত। সর্ব কর্মে তাকে দক্ষ হ'তে হবে, এই ছিল তাঁর অন্যতম সাধনার বিষয়। বৈপ্লবিক কাজ করব, কিন্তু দক্ষতার অভাবে হয় তাতে অকৃতকার্য হ'ব, নয়তো ধরা পড়ব, এ রকম বিপ্লবী হ'লে চলবে না। গুপ্ত সমিতির কাজ করব ত' গুপ্তই থাকব। বোমা-পিস্তল সংগ্রহের জন্যে যদি অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, আর অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়তে হয়, তা হলে বোমা-পিস্তল সংগ্রহ আর হবে না; বোমা-পিস্তল সংগ্রহ করতে যদি ধরা পড়তে হয়, তাহ'লে বিপ্লব আর হবে না; আর বিপ্লবই ত' উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বে ধরা পড়া চলবে না।

এই ডাকাতির পর ধরা তিনি পড়েছিলেন, মিষ্টির হাঁড়ি হাতে কুটুম্ববাড়ী গমনেচ্ছু রেল যাত্রী রূপে। পুলিস সাড়ম্বরে মামলাও করেছিল। কিন্তু সামান্য মাত্র প্রমাণও তাঁর বিরুদ্ধে জোগাড় করা গেল না। পক্ষান্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সার্টিফিকেটই বিচারককে প্রভাবিত করল। তিনি সসম্মানে মুক্তি পেলেন।

পুলিশের সন্দেহ কিন্তু বেড়েই চলল। ছাত্র যুবক মহলে বৈপ্লাবিক ভাব-ধারা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। চতুর্দিকে কুস্তির আখড়া, জিম্‌নাষ্টিক ক্লাব, নানা-প্রকার খেলাধূলার সংঘ-সমিতি গড়ে উঠতে লাগল। তারই মধ্যে উপযুক্ত ছেলে বেছে বেছে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সভ্য সংগ্রহ চলতে থাকল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' ও ভূপেন দত্তর 'যুগান্তর' পত্রিকা তখন বাংলার ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ক্ষোভে রোষে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

রেল ডাকাতির মোকদ্দমা থেকে বেরিয়ে এসে, পুলিসের চোখে ধূলি দিয়ে কলেজে পড়া ও সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কাজ চালানো নরেন্দ্রনাথের পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। গুপ্ত-সমিতির কাজ তখন বেড়ে চলেছে, তাঁকে গৃহত্যাগ ক'রে, কলেজের পড়া ত্যাগ ক'রে আত্ম-গোপন করতে হ'ল।

এই সময় মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বোমা ছুঁড়ল। মেদিনীপুরে নারাণগড়ে ট্রেনের নীচে বোমা ফাটল।

কলিকাতার মুরারিপুকুর বাগানে বোমা তৈরির কারখানা থেকে ৺বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর প্রমুখ বিপ্লবীদের ও শ্রীঅরবিন্দকে ধ'রে আলিপুর বোমার মামলা সুরু হ'ল।

১৯০৮—০৯ সালের মধ্যে পুলিশ সারা বাংলার বহু সন্দেহ ভাজন বিপ্লবীকে ধরে জেলে পুরল। সে সময়কার মত সব যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পুলিশ নিশ্চিন্ত হ'ল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের যেন সুরু হ'ল। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলে সেই ভাঙ্গা বিপ্লবী দলকে আবার গড়ে তুললেন।

এই সময়কার কথা ৺হরিকুমার লিখেছেন,

"....এইটুকু মাত্র বলতে পারি, নরেন্দ্র বিহনে যতীন্দ্রনাথ অথবা যুগান্তর সংঘ বিপ্লবের পথে অত দ্রুত এবং অতখানি সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হ'ত কিনা সন্দেহের বিষয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রনাথের প্রথম কারাবাস

১৯১০ সালে পুলিশ আবার সচকিত হয়ে জেগে উঠল। এলোপাতাড়ি ধর-পাকড় সুরু হ'ল। তাদের মধ্যে থেকে বাছা বাছা পঞ্চাশ জনকে নিয়ে হাওড়ায় ব্রিটিশ রাজ উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করল। এতে নরেন্দ্রনাথও ধরা পড়লেন। ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী স্পেশাল বেঞ্চে তাঁদের বিচার হয়। এর জন্যে তাঁকে ২০ মাস জেলে থাকতে হয়েছিল। এই ২০ মাসের মধ্যে ৯ মাস তাঁকে নির্জন কোটরে (সেলে) বন্ধ অবস্থায় কাটাতে হয়। সাধারণ মানুষ এই নির্জন কোটরে তিন মাসের অধিক বাস করলে পাগল হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, তা এতই কষ্টকর। সেই জন্যে ব্রিটিশের জেল কোডে ৩ মাসের অধিককাল কোন বন্দীকেই এই কোটরে রাখার বিধি ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় তারা এ কথা মানতেন না।

নরেন্দ্রনাথ এই ৯ মাস কাটালেন যোগাভ্যাস করে। স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ ও শিবনারায়ণ স্বামীর নিকট হাতে কলমে শিক্ষা তিনি কাজে লাগালেন।

মানুষের সকল অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও শক্তিকে অনুশীলন করে স্ফূর্ত ক'রে তুলবার পথে আছে তিন বাধা। (*) প্রথম প্রকৃতির বাধা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে অপসারণ করতে হয়।

(*) Prof. S. N. Ray—Towards the Mature Personality for the Third International Humanist & Ethical Union Congress.
Oslo—Norway—August, 1962

দ্বিতীয় বাধা—সমাজ ও রাষ্ট্রের বাধা। ইংরাজ রাজকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ত' সেই জন্যেই।

তৃতীয় বাধা—নিজ অন্তরের বাধা, মনকে জয় করতে না পারলে, মনকে বশীভূত করতে না পারলে কোন কিছুই হবে না।

ব্যক্তি মানুষের বিকাশের পথের এই তিনটি বাধা অপসারণের নামই ত' হ'ল মুক্তি।

এই সর্বাঙ্গীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে শৈশব থেকে জীবনের সায়াহ্ন কাল পর্যন্ত এক দিনের জন্যেও স্থির থাকতে দেয় নি—দেশে বিদেশে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। (*)

প্রায়ান্ধকার কোটরের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের অন্য দুই সাধনার পথ যখন বন্ধ হ'ল তখন মুক্তি পথের তৃতীয় যে বাধা, অন্তরের বাধা, তাকেই দূরীকরণের জন্যে মনকে বশীভূত করার সাধনায় ব্যাপৃত হলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে যাঁরাই তাঁকে দেখেছেন তাঁরাই বলবেন, এই মনকে বশীভূত করার ক্ষমতা তিনি কী বিপুল পরিমাণে অর্জন করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে তিনি যে সেখানকার ভাষা শিখে সে দেশের রাষ্ট্র ও সমাজপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে নিজ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে যেতে পেরেছিলেন, বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার মন্থন করে মানব ইতিহাসের আদিকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত চিন্তা-ধারার, ভাব ও ভাবনার যে সু-সম্বন্ধ গতি-প্রগতির ইতিহাস রচনা করতে পেরেছিলেন, সর্বাধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যে দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতির তত্ত্ব, প্রয়োগ কৌশল ও কর্মসূচী প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল কেবল স্বীয় মনকে বশে রাখবার অসাধারণ ক্ষমতার বলে। মনের উপর অসামান্য কর্তৃত্ব না থাকলে এটি সম্ভব হ'ত না। পরবর্তী জীবনে দেখা গেছে কত সহজে, যে কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁর মনকে নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার মত যে কোন বিষয়ে একাগ্র করতে পারতেন। সাধারণতঃ নোট লিখে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস তাঁর ছিল না। অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতি উচ্চ স্তরের ভাষণ দিয়ে চলতেন। অতি তীক্ষ্ণ যুক্তি ধারা স্তরে স্তরে সাজিয়ে যেতেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি ভাবে যে পারম্পর্য রক্ষা করে

(*) "আমার বয়স যখন চৌদ্দ" ইত্যাদি—উপক্রমনিকা দ্রষ্টব্য
New Orientation—pp 183

চলতেন সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারই মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, উত্তরও দেন, কিন্তু একাগ্রতা নষ্ট হয় না, একচুল কেন্দ্রচ্যুতি নাই, শ্রোতার দল মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুনত।

এই সকল বক্তৃতা অনেক ছাপান হয়েছে, অনেক বাকি আছে। রায়ের যতগুলি বই ছাপান হয়েছে, এক জেলের মধ্যে লেখা কয়েকখানি ছাড়া বেশীর ভাগই এসব অলিখিত ভাষণের ও স্ত্রী এলেনকে বলা সর্টহ্যাণ্ডে নেওয়া বক্তৃতা ও শ্রুতি লিখন। পড়লেই মনে হয়, বহু দিনের গবেষণার পর বহু ছাঁট-কাট ক'রে লেখক এমন সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা পৃথিবীর মধ্যেও বিরল। এই শক্তি রায়ের বহু সাধনার ফল। বাল্যকাল থেকেই এই সাধনার শুরু। এইবার জেলের প্রায়ান্ধকার কোটরে সেই সাধনা চরমে উঠে। এই সাধনায় যে তার সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল সে কথাই উল্লেখ করলাম।

কুড়ি মাস পরে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হয়। বিচারক যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে সকলকেই মুক্তি দেন। তখন ১৯১২ সাল। বয়স পঁচিশ।

মুক্ত হয়ে কিছুদিন প্রকাশ্যভাবে সাধু-সন্ন্যাসী সঙ্গ করতে দেখা যায়। সকলে ভেবেছিল, এমন কি পুলিশ পর্যন্ত, নরেন বুঝি সাধু-সন্ন্যাসীই হয়ে গেল। কিন্তু নরেনের মনে শৈশব থেকেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র ও ঐকান্তিক ছিল, ঠিক তেমনই ছিল অতি তীক্ষ্ণ যুক্তি পরায়ণ এক বিশ্লেষণী মন। সেই জন্যে মুক্তি লাভের সাধনায় কোন মিথ্যা, কোন অসত্য, কোন ভুল ত্রুটি থাকলে তা সহজেই তাঁর কাছে ধরা পড়ত। তিনি সব কিছুকেই তাঁর স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতেন এবং তার মধ্যে থেকে যা তাঁর উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচনা করতেন তা ত্যাগ করতেন, যা উপযোগী হ'ত তা গ্রহণ করতেন। চিন্তার এই বিশ্লেষণ-আশ্লেষণ পদ্ধতির ফলে সমস্ত ধর্ম ও শাস্ত্রের মধ্যে যে-টুকু প্রকৃত সত্য সে-টুকু ধরা পড়ত। বেশীর ভাগ অংশই যে বহিরঙ্গ বা সাধারণ নিরক্ষর অশিক্ষিত লোককে রূপকের ছলে কিছু তত্ত্ব বুঝাবার চেষ্টা, ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করে নৈতিক জীবনযাপনের শিক্ষা দান প্রচেষ্টা মাত্র, এবং বাকি যাজক শ্রেণীর প্রভুত্বের জন্যে অর্থহীন নিয়মকানুন, অনুশাসনের বোঝা, তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। চিরাচরিত পথে মুক্তির সন্ধান তাঁর মিলল না।

এই যে বিশ্লেষণী মন, এ যে অতি শৈশব কাল থেকেই গড়ে উঠেছিল তা একটি সামান্য ঘটনা থেকেই বুঝা যায়।

কৈশোরেই তিনি বিবেকানন্দের বেদান্ত মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। তারপর সূর্যোপাসক শিবনারায়ণ স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তিনি সাকার ঈশ্বরে তখন বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং দেবদেবীতে তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। তাঁর স্কুলের সহপাঠিরা এ কথা জানত। একদিন তারা বললে যে, গ্রামের জাগ্রত শীতলাদেবীর ঘট নরেন পদাঘাতে ভাঙ্গতে পারে কিনা তারা দেখতে চায়। নরেন প্রত্যুত্তরে এক পদাঘাতে মা শীতলার ঘট ভেঙ্গে দিলেন। পদাঘাতের ফলে ঘটের ভাঙ্গা কানায় পা কেটে গেল। তিনি বাড়ি ফিরলেন। রাত্রিতে প্রবল জ্বর হ'ল। ক'দিন খুব ভুগলেন। নিরাময় হ'য়ে যখন স্কুলে গেলেন, তখন সকলে হাসতে হাসতে বললে, "দেখলি ত', হাতে হাতে ফল। মা বড়ই দয়ালু, তাই প্রাণে মারলেন না, কিন্তু এবার সাবধান।"

নরেন বললে, "জ্বরের পোকা আছে, সে পোকা সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ঢুকে জ্বর করে না, এ পোকা আমার শরীরে আগেই ঢুকেছিল। সে দিন রাত্রে এমনিতেই আমার জ্বর হ'ত। ঘট ভাঙ্গা, আর জ্বর হওয়া, এটা কাকতালীয়বৎ ঘটনা। তাল ঠিকই পড়ত, কাক বসল আর কাকের ভারে তাল পড়ল, তা নয়।"

কৈশেরের এই যুক্তিবাদ ও সেই সঙ্গে নিজ যুক্তি বুদ্ধি সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা ক্রমেই তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বেড়ে যায় এবং রায়ের জীবন এরই ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

নরেনের সন্ন্যাসী হওয়া হ'ল না। এই সময়কার কথা ৺হরিকুমারের ভাষাতেই বলি,

> "ভারতের বিপ্লবে নরেনের স্থান কোথায়, এ প্রশ্নের জবাব দু'এক কথায় দেওয়া যায় না। সে এক বিরাট ইতিহাস। তবে প্রথম জেলে যাওয়া আরজেল থেকে ফিরে আসার মধ্যে নরেনের পরিবর্তন লক্ষ্য করবার বিষয়। যে নরেন প্রাণ ধর্মের অন্ধ প্রেরণায় বিপদ সঙ্কুল পথে, দ্বিধাহীন চিত্তে পা বাড়িয়েছিল সে নরেন ফিরে এল যাত্রা পথের সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে। আবেগ-বিহ্বল প্রাণধর্ম তখন উচ্ছাস মন্থর পরিণতির দিকে মুখ ফিরিয়ে সুদূর প্রসারী দৃষ্টি নিক্ষেপে সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই দেখি—যে বিপ্লবী সংঘ একদিন মুক্তি সাধনায় শনৈঃ শনৈঃ শক্তি সংগ্রহ করে প্রচণ্ড আঘাত হানবার জন্যে দেশে বিদেশে শক্তি সংহত করছিল সেই সংঘ সৃষ্টির পরিকল্পনাটি নরেন্দ্রের সুচিন্তিত

কল্পনা প্রসূত। নরেন্দ্র তার কাঠামো সৃষ্টি ক'রে তাতে যে অবয়ব যোজনা করেছিল, যতীন্দ্রনাথ তাতে প্রাণ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত ক'রে তুলেছিল। যার শৌর্য-বীর্য, যার বীরত্বপূর্ণ কীর্তি কাহিনী দেশে বিদেশে শ্রদ্ধা আকর্ষন করেছে, সেই "যুগান্তর" নামীয় সংঘটির কথা বলছি। পত্তন নরেন্দ্রনাথের, প্রাণবন্ত ও বীর্যবন্ত ক'রে বিপ্লবী সংঘে পরিণত করার মর্যাদা যতীন্দ্রনাথের।"

এ সংবাদ ব্রিটিশও কোনোদিন পায়নি যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের আড্ডা গড়ে উঠেছিল নরেনের এই পরিকল্পনা অনুসারে। ব্রিটিশ ভারতের এলাকার বাইরে নিকটতম আন্তর্জাতিক যোগাযোগের স্থান ছিল ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিস, ইন্দোচীন প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন বন্দর। গোপন পথে ব্রিটিশের শত্রুরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে এবং বিদেশী জাহাজ ও খালাসীদের সাহায্যে অস্ত্রাদি আমদানীর পক্ষেও এ সকল স্থান সর্বোত্তম। সিডিসান কমিটির রিপোর্টে লেখা আছে নরেন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালে ঐ সব দেশে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ের পূর্বেও রায়ের সঙ্গে ঐ সকল দেশের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ ১৯১৪ সালেই তিনি একবার ঐ অঞ্চল থেকে ঘুরে এসেছিলেন।

সকল প্রকার বৈপ্লবিক কাজেই নরেন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল অনন্যসাধারণ। গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধূলো দিয়ে নরেন্দ্রনাথ যে কি ভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করে চলতেন তা এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

কতদিন পুলিশ অনুসরণ করেছে বমাল শুদ্ধ গ্রেপ্তারের আশায়—রেলে, গাড়িতে, নৌকোয়, হাঁটাপথে। হঠাৎ কি হ'তে কি হয়ে যায়। মানুষটা যেন উবে যায়, কিছুতেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ বাঙ্গালীর মধ্যে ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা লোক কটাই বা ছিল!

নদী পথে নরেন নৌকোয় করে পালাচ্ছে। পুলিশও নৌকো নিয়ে অনুসরণ করছে। নরেনের নৌকো ধরা পড়ল, কিন্তু নরেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

একবার কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট হঠাৎ তাঁর ঘর তল্লাসী করতে এলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে আদর আপ্যায়ন করে এমন হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন যে চোখের সমুখে বই ঢাকা পিস্তলটি তাঁর

নজরে পড়ল না। অবশেষে পুলিশ সারা ঘর তল্লাসী করে যখন কোন সন্দেহ-জনক জিনিষপত্রই পেল না তখন টেগার্ট সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়েই চলে গেলেন।

এইভাবে, সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ চেষ্টায় ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৪ সাল এসে গেল। ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধল। ব্রিটিশ তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এই সুযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করতে হবে। প্রবল উৎসাহে বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টায় নরেন্দ্রনাথ

অনেকদিন থেকেই নরেন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা স্থান থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে দক্ষিণ এসিয়ার বিভিন্ন বন্দরে এনে মজুত করে, পরে তা সুবিধামত দেশে আনা ও সঙ্গে সঙ্গে তা বিভিন্ন কেন্দ্রে বণ্টনের ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। সেই জন্যে নরেন্দ্রনাথের উপর ভার পড়েছিল অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থাদি সংগ্রহ, সৈনিক তৈয়ারি এবং বিভিন্ন প্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলা ও উহার পরিচালনা।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন বেশে সে কাজ করে চললেন। পাটনা সহরে তিনি কিছু কাল এক প্রেসে কম্পোজিটারের চাকরি নিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈপ্লবিক সংগঠন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনার কলা কৌশল শিখিয়ে দিয়ে এলেন।

ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধার ফলে ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে যেমন দ্রুত পরিবর্তন সুরু হ'ল, তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রেও দ্রুত পরির্তন ঘটতে লাগল।

যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা দ্রুত লাভবান হ'তে থাকলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের মুখেও দাবী স্পষ্ট হ'ল, জোরদার হ'ল। তারা স্পষ্টই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করে বসলেন।

১৯১৪ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে ভূপেন্দ্রনাথ বসু পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবী করলেন, এবং বললেন, এটি অনুগ্রহ ভিক্ষা নয়, ভারতের জনগণের দাবী—("Not a prayer but a call in the name of the people of India.")। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের ত্রিংশৎ অধিবেশনে বোম্বাইতে স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) তাঁর সভাপতির অভি-

ভাষণে বললেন, স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ (Self Government) "Government of the people, for the people, by the people." তিনি গভর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা দিলেন এই কথা বলে যে, "the whole function of the State Civil as well as Military, Executive as well as Legislative, Administrative as well as Judicial "

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য বিষয়ে কোন প্রকার অস্পষ্টতা নাই। তা অতি স্পষ্ট ও লোকায়ত।

১৯১৬ সালের অক্টোবরে Imperial Legislative Council এর ১৯ জন সদস্য ভাইসরয়ের নিকট ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালের কংগ্রেস সভাপতিদের ভাষণের মর্মেই এক স্মারক লিপি পেশ করলেন। স্মরণীয় যে স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

আরো লক্ষণীয় যে, কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য যতদিন লোকায়ত ও Secular ছিল, যুক্তি বুদ্ধি অনুসারে নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারিত হতো, ততোদিন মোসলেম লীগের সঙ্গে বিশেষ বিরোধ ছিল না। কারণ ঐক্যসাধনের জন্যে ১৯১৪ সাল থেকেই কংগ্রেস ও লীগ উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ১৯১৫ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের সময় লীগের অধিবেশনও সেখানে হচ্ছিল। কিন্তু নেতাদের কৌশলের অভাবে এই মিলন তখন সম্ভব হ'ল না। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ উভয়ে মিলে এক যুক্ত কমিটি গঠন করলেন, যার উদ্দেশ্য রইল উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে একটি যুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন। এই কমিটি বিশেষ পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও তৎপরতার সঙ্গে সে কাজটি সম্পন্ন ক'রে পর বৎসর লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের এক যুক্ত অধিবেশনে তা পেশ করলেন এবং তা গৃহীতও হ'ল।*

---

* In 1915, the Moslem League, like the Congress, held its session in Bombay, but for an unforeseen exhibition of tactlessness of the leaders unity of the two great National Organisations would have been achieved there. However, the Congress and the League elected Committees to formulate a common scheme of work. The two committees worked strenuously during the following year and the whole scheme was put before a joint conference of leaders at Lucknow on the eve of the next congress session···the Moslem League and the Congress had likewise come to an understanding and made up their minds to work jointly for the attainment of self-Government."

[Vide—The Congress and the National Movement. Written under the direction of Reception Committee of 43rd session of the Indian National Congress, 1928]

কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য, নীতি ও পদ্ধতিতে যে দিন থেকে লোকায়ত রাজনীতির পরিবর্তে হিন্দুধর্মীয় নীতি পদ্ধতি প্রবেশ করল, যুক্তি-বুদ্ধির পরিবর্তে মিষ্টিসিজম্‌কে ও ইন্‌টুইসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ল সেই দিন থেকেই ভারতে ব্যাপকভাবে এবং রাজনৈতিক নীতি হিসাবে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হ'ল, এবং মোসলেম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ সুরু হ'ল।

আজ ১৯৬৫ সাল, ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে—কিন্তু সেই সঙ্গে বিরাট বোঝার মত বয়ে চলেছে পাকিস্তান আর হিন্দু মুসলমান বিরোধের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং এক অতি ভয়ংকর আসন্ন দুর্দিনের আশঙ্কা।

এই অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের সর্বনাশা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে ভাবি, সত্যেন্দ্র প্রসন্নের আদর্শ অপেক্ষা বেশী কী পেলাম! পরিবর্তে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভিত্তিতে পাকিস্তান না পেয়ে যদি পেতাম স্যার সত্যেনের অখণ্ড ভারত গভর্ণমেণ্ট, যা হ'ত Government of the people, for the people, by the people, আর সেই সঙ্গে যদি বর্তমানের মত পূর্ববঙ্গে ৯০ লক্ষ হিন্দু ও হিন্দুস্থানে ৫ কোটি মুসলমানের নিধন আশঙ্কায় দুরু দুরু বুকে দিন গুনতে না হ'তো, উভয় পক্ষের বর্বরতায় ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠতে না হ'তো এবং নিদারুণ গৃহযুদ্ধে সারা ভারতের মহা সর্বনাশের চিন্তায় জীবন অসহনীয় হয়ে না উঠত—তবে লোকসানটা কী হ'তো?

১৯০৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেস নরমপন্থী (Moderate) ও চরমপন্থী (Extremist) এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। চরমপন্থীদের নেতা হিসেবে তিলক, লাজপত রায়, চিদাম্বরম পিলে প্রভৃতি থাকলেও বাংলা দেশেই ছিল চরমপন্থীদের প্রাণকেন্দ্র। তখন চরমপন্থীদের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেস থেকে চরমপন্থীদের বিতাড়িত ও প্রবেশ নিষেধ করতে নরমপন্থীরা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন করেন। প্রথম ধারাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় যে, ব্রিটিশ রাজের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য; এবং দ্বিতীয় ধারাতে বলা হয় যে, কংগ্রেসের প্রত্যেক প্রতিনিধিকে এই উদ্দেশ্য গ্রহণের এবং কংগ্রেসের সকল বিধি-বিধান পালনের জন্যে লিখিত ভাবে অঙ্গীকার করতে হবে। *

*"**Article 1.**—The objects of the Indian National Congress are the attainment by the people of India of a system of Government similar to that enjoyed by the Self-Governing Members of the British Empire and a

১৯০৭ সালে সুরাটে গঠিত কমিটির খসড়া প্রস্তাব প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর ১৯১২ সালে বাঁকিপুর কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

১৯০৮ সাল থেকে ক্ষুদিরাম এবং অরবিন্দ-বারীন্দ্র প্রমুখের বোমার মামলা ও হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার পর, ১৯১২ সাল থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে বাংলা ও উত্তর ভারতে যে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলা হ'তে থাকে তার ফলে এক দিকে যেমন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভয়চকিত হ'য়ে জেগে ওঠে, তেমনি কংগ্রেসের মধ্যে যে অংশ চরমপন্থী নামে অভিহিত হচ্ছিল তাদের অধিকাংশ নেতাও ভীত হয়ে পড়েন। বৈপ্লবিক প্রস্তুতি পর্ব শেষ হওয়ার পূর্বে অসময়ে যাতে কোন বৈপ্লবিক ঘটনা না ঘটে তার জন্যে শত সাবধানতা সত্ত্বেও ১৯১৩ সালে বাংলায় ১৩টি, ১৯১৪ সালে ১৯টি ঘটনা ঘটে যায় এবং ১৯১৫-১৬ সালে আরো বেড়ে চলে। সর্বোপরি ১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো রিফর্মের ফলে (Indian Councils Act of 1909 of the British Parliament) এবং প্রথম মহাযুদ্ধের তাগিদে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উদীয়মান শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা সরকারী উচ্চপদ ও যুদ্ধ কালীন শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা দ্রুত কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকেন। এর ফলে বিপ্লবীদের দমন করার জন্যে একদিকে ব্রিটিশ সরকার যেমন রাওলাট কমিটি নিযুক্ত করলেন (১৯১৭), অপর দিকে চরমপন্থীদের মধ্যে উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতারাও পুনরায় কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন (১৯১৬ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস)।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে দেখা যাবে যে, এই চরমপন্থী উচ্চ মধ্যবিত্ত বিরোধী নেতারাই পরে উদীয়মান শিল্পপতি ও ধনীদের মুখপাত্র রূপে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করে গেছেন, এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা যুদ্ধোত্তর কালে কংগ্রেসে প্রবেশ ক'রে বামপন্থী রূপে খ্যাত হয়েছেন। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতাকামী চরমপন্থীদের এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় নরেন্দ্রনাথের ভূমিকা নগণ্য নয়।

---

participation by them in the rights and responsibilities of the Empire on equal terms with those members. These objects are to be achieved by Constitutional means by bringing about a steady reform of the existing system of administration, and by promoting national unity, fostering public spirit, and developing and organizing the intellectual, moral, economic and industrial resources of the country.

"**Article 2.**—Every delegate to the Indian National Congress shall express in writing his acceptance of the objects of the Congress as laid down in Article—1 of this Constitution and his willingness to abide by this Constitution, and by the Rules of the Congress hereto appended."

এইখানে ঐতিহাসিক সিডিসন কমিটির রিপোর্ট থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। এর দ্বারা সে সময়কার সব খবর না পাওয়া গেলেও কিছুটা পাওয়া যাবে।

Sedition Committee Report থেকে উদ্ধৃতি

(কমিটির প্রেসিডেণ্ট রাওলাট সাহেবের নামানুসারে এই রিপোর্টকে রাওলাট কমিটির রিপোর্টও বলা হয়।)

বাংলায় জার্মান ষড়যন্ত্র

১১১। **বাংলায় জার্মান ষড়যন্ত্র :**—১৯১৫ সালের আগষ্ট মাসে ফরাসী পুলিশ সংবাদ পাঠায় যে, ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সকলেই বিশ্বাস করছে যে শীঘ্রই ভারতে এক বিদ্রোহ দেখা দেবে এবং জার্মানী সে বিদ্রোহ সফল করে তুলতে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবে। এইরূপ বিশ্বাসের কারণ নিম্নলিখিত ঘটনাবলীর বর্ণনার দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯১৪ সালের নভেম্বরে পিঙ্গলে নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ সেন নামে একজন বাঙ্গালী আমেরিকা থেকে 'সালামিস' নামে এক জাহাজে চড়ে কলিকাতায় এসে অবতরণ করে। পিঙ্গলে উত্তর ভারতে বিদ্রোহের আয়োজন করতে সেখানে চলে যায় এবং সত্যেন্দ্র ১৫ নং বহুবাজারে ওঠেন।

১৯১৪ সালের শেষের দিকে পুলিশ খবর পায় যে, শ্রমজীবী সমবায় নামে একটি স্বদেশী কাপড়ের দোকানের দুই মালিক রামচন্দ্র মজুমদার ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যতীন্দ্র মুখার্জি, অতুল ঘোষ এবং নরেন ভট্টাচার্যের সহায়তায় প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

১৯১৫ সালের প্রথমেই বাংলার কতিপয় বিপ্লবী মিলিত হ'য়ে জার্মানীর সাহায্যে ভারতে বিদ্রোহ ঘোষণা করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে শ্যাম দেশ ও অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলা দেশের বিপ্লবীদের, অন্যদিকে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও প্রারম্ভিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এর পরেই ১২ই জানুআরি গার্ডেনরীচে ও ২২শে ফেব্রুআরি বেলিয়াঘাটায় ডাকাতি হয় এবং ৪০,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়।

ভোলানাথ চ্যাটার্জিকে ইতিমধ্যেই ব্যাংককের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে সেখানে পাঠান হয়।

জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মার্চ-এর প্রথমেই বাংলার বিপ্লবীদের নিকট জার্মান সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে ইউরোপ থেকে বোম্বাইতে এসে পৌঁছেন, এবং অবিলম্বে বাটাভিয়াতে জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে বলেন।

এই প্রস্তাব আলোচনার জন্যে বিপ্লবীদের এক অধিবেশন বসে। এই সভায়ই জার্মানদের সঙ্গে আলোচনার জন্যে নরেন ভট্টাচার্যকে বাটাভিয়া পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নরেন ভট্টাচার্য সি, মার্টিন ছদ্মনামে এপ্রিল মাসে বাটাভিয়া যাত্রা করে।

ঐ মাসেই অন্য বিপ্লবীর দল (উত্তর ভারত) অবনী মুখার্জি নামে আর একজন বাঙ্গালীকে জাপান পাঠায়।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের নেতা যতীন মুখার্জি গার্ডেনরীচ, বেলিয়াঘাটা ডাকাতি প্রভৃতি ঘটনা সংক্রান্ত পুলিশী অনুসন্ধানের হাত এড়াবার জন্যে বালেশ্বরে গিয়ে আত্মগোপন করেন।

এই মাসেই S S. Movarick নামে একটি জাহাজ ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান-পেড্রো বন্দর থেকে যাত্রা করে (এ সম্বন্ধে আরো সংবাদ পরে বলা হচ্ছে)।

মার্টিন বাটাভিয়াতে পৌঁছলে সেখানকার জার্মান কনসাল থিওডোর হেলফ্রিশ* নামে এক জার্মানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। হেলফ্রিশ তাঁকে বলেন, ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্যে এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র করাচী বন্দর অভিমুখে যাত্রা করেছে।

মার্টিন সে জাহাজ করাচীতে না পাঠিয়ে বাংলা অভিমুখে ঘুরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। মার্টিনের এই প্রস্তাব সাংহাই-এর জার্মান কনসাল জেনারেলের নিকট পাঠান হয়। তিনি মার্টিনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সুন্দরবনের রায় মঙ্গল নামক স্থানে এই জাহাজ ভিড়োবার ব্যবস্থা ও জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে তা যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে মার্টিন দেশে ফেরেন। সংবাদে প্রকাশ যে এই জাহাজে ত্রিশ হাজার রাইফেল ও প্রত্যেক রাইফেলের জন্যে ৪০০ করে গুলি ও দুই লক্ষ টাকা ছিল।

*হেলফ্রিশ ভ্রাতৃদ্বয় ছিল সুদূর প্রাচ্যে জার্মান ব্যবসায়ের অধিকাংশের মালিক এবং এদের ব্যর্থ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের গোড়া পত্তনকারী বলা চলে—লেখক।

ইতিমধ্যে বাটাভিয়া থেকেই মার্টিন কলিকাতার এক বিখ্যাত বিপ্লবী পরিচালিত হ্যারি এণ্ড সন্স নামে একটি ঝুটো প্রতিষ্ঠানকে টেলিগ্রাম করে জানায় যে "ব্যবসা আশাপ্রদ"। এই প্রতিষ্ঠান মার্টিনকে টাকা পাঠাবার জন্যে টেলিগ্রাম পাঠায়। এর পর হেলফ্রিশ জুন ও অগাষ্টের মধ্যে হ্যারি এণ্ড সন্সের নামে ৪৩ হাজার টাকা পাঠায়। পুলিশের নজর পড়ার আগেই এই টাকার মধ্যে ৩৩ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হাতে পৌছায়।

মার্টিন জুনের মাঝামাঝি ভারতে ফিরে আসেন, এবং বিপ্লবী যতীন মুখার্জী, যাদুগোপাল মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্য (মার্টিন), ভোলানাথ চ্যাটার্জি এবং অতুল ঘোষ S. S. Movarick জাহাজের অস্ত্রশস্ত্রের যথাযোগ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা সম্পন্ন করেন।

তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, এই অস্ত্রশস্ত্র তিন ভাগে ভাগ করে নিম্নলিখিত স্থানে পাঠান হবে।

(১) বরিশাল পার্টির সাহায্যে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে প্রেরণের জন্যে হাতিয়ায় এক অংশ;

(২) কলিকাতায় এক অংশ;

(৩) বালেশ্বরে এক অংশ।

বিপ্লবীদের বিশ্বাস ছিল বাংলায় যে ব্রিটিশ বাহিনী ছিল তাদের পরাভূত করার পক্ষে তাদের লোকাভাব হবে না। কিন্তু বাংলার অবরুদ্ধ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে বাইর থেকে যে সাহায্য আসবে সে সম্বন্ধে তাদের ভয় ছিল। সে সাহায্য যাতে আসতে না পারে সেই জন্যে তারা বাংলার তিনটি রেলপথের প্রধান পুলগুলিকে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেবার ভার ছিল যতীন্দ্রনাথের উপর। ভোলানাথ চ্যাটার্জিকে চক্রধরপুর পাঠান হয়েছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ব্যবস্থা করতে। সতীশ চক্রবর্তীর উপর ভার ছিল অজয় নদের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পুলটি উড়িয়ে দেবার। নরেন চৌধুরী ও ফণীন্দ্র চক্রবর্তীকে হাতিয়া পাঠান হয়েছিল। সেখানে তারা এক বাহিনী গড়ে তুলে প্রথমে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি দখল করে পরে কলিকাতা অভিমুখে অভিযান চালাবে।

কলিকাতার দল নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলির নেতৃত্বাধীনে প্রথমে

* হরি কুমার চক্রবর্তী

কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করবে, তারপর কলিকাতা দখল করবে। যে সব জার্মান অফিসার মাওরিক জাহাজের সঙ্গে আসবে, তারা পূর্ববঙ্গে থেকে সৈন্যদলের শিক্ষণ ব্যবস্থা করবে।

ইতিমধ্যে যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় যাদুগোপাল মুখার্জি মাওরিক জাহাজের মাল খালাসের ব্যবস্থা করছিলেন। রায়মঙ্গলের নিকট এক জমিদার মাল খালাসের এবং তা স্থানান্তরে পাঠাবার জন্যে লোকজন নৌকো প্রভৃতি দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে প্রকাশ। ব্যবস্থা হয়েছিল, মাওরিক রাতের অন্ধকারে এসে ভিড়বে এবং লম্বালম্বি ঝুলানো আলোর সঙ্কেতের দ্বারা নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করবে। আশা করা হয়েছিল, ১৯১৫ সালের ১লা জুলাই থেকে অস্ত্র বিতরণ সুরু হ'তে পারবে।

এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই যে, অতুল ঘোষের নির্দেশে কিছু লোক মাওরিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাসের উদ্দেশ্যে নৌকোয় চ'ড়ে রায়মঙ্গলে গিয়েছিল। অনুমান হয়, তারা প্রায় দশ দিন সেখানে ছিল। কিন্তু জুন শেষ হয়ে গেলেও মাওরিক এসে পৌছল না, কিংবা বাটাভিয়া থেকে এই বিলম্বের কারণ সম্বন্ধেও কোন সংবাদ এল না।

বিপ্লবীরা যখন মাওরিকের জন্যে দিন গুণছিল তখন ৩রা জুলাই ব্যাংকক-এর বিপ্লবী প্রেরিত এক সংবাদ নিয়ে এক বাঙ্গালী এসে পৌছল।

শ্যামের জার্মান কনসাল যথেষ্ট গুলিবারুদ সহ ৫০০০ রাইফেল ও একলক্ষ টাকা এক জাহাজে করে রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছেন।

বিপ্লবীরা ভাবল এই চালান সম্ভবতঃ মাওরিক জাহাজের পরিবর্তে পাঠান হচ্ছে। তারা সেই বাঙ্গালী সংবাদ বাহককে বাটাভিয়া হ'য়ে ব্যাংককে ফিরে যেতে বলে এবং হেল্‌ফ্রিশকে সংবাদ পাঠায় যে. পূর্বেকার ব্যবস্থা যেন পরিবর্তন করা না হয়, এবং অস্ত্র বোঝাই দ্বিতীয় জাহাজটির অস্ত্র যেন হাতিয়া ও বালেশ্বরে নামিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কারওয়ারের দক্ষিণে গোকর্ণিতে নামিয়ে দেওয়া হয়।

সরকার জুলাই মাসে রায়মঙ্গলে এই অস্ত্র আমদানীর ষড়যন্ত্রের সংবাদ পায় এবং সাবধানতা অবলম্বন করে।

সংবাদ পেয়ে পুলিশ ৭ই অগাষ্ট হ্যারি এণ্ড সন্সের বাড়ী তল্লাসী করে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

১৩ই অগাষ্ট একজন বিপ্লবী বোম্বাই থেকে জাভাতে হেলফ্রিশকে টেলিগ্রাম করে সাবধান করে দেয় এবং ১৫ই অগাষ্ট নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (মার্টিন) ও অপর একজন হেলফ্রিশের সঙ্গে পরামর্শের জন্যে বাটাভিয়া যাত্রা করে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর হ্যারি এণ্ড সন্সের বালেশ্বর শাখা ইউনিভার্সেল এম্পোরিয়াম তল্লাসি করা হয়। সেই সঙ্গে বালেশ্বর থেকে ২০ মাইল দূরে কাপ্তিপোদায় বিপ্লবীদের একটি আড্ডাতেও তল্লাসী করা হয়। সেখানে সুন্দরবন অঞ্চলের একখানি মানচিত্র ও মাভেরিক জাহাজের সংবাদ সংবলিত পেনাঙ্গের এক খবরের কাগজের একটি কাটা অংশ পাওয়া যায়। সেই সময় পাঁচজন বাঙ্গালী বিপ্লবীর একটি দলকে ঘিরে ফেলা হয় এবং যুদ্ধে নেতা যতীন মুখার্জি এবং পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জির হত্যাকারী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী নিহত হয়।

ঐ বৎসরের বাকি তিন মাস যাবৎ "মার্টিন"-এর নিকট থেকে বন্ধুরা আর কোন খবর না পেতে তাদের মধ্যে দু'জন গোয়াতে যায় এবং সেখান থেকে বাটাভিয়াতে টেলিগ্রাম করে। ১৯১৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর গোয়া থেকে বাটাভিয়ায় মার্টিনকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি করা হয়, "How doing no news. Very anxious. B. Chatterton.—কেমন আছ কোন সংবাদ পাচ্ছি না, বড়ই চিন্তিত। বি চ্যাটারটন।

এই টেলিগ্রাম পুলিশের হাতে পড়ে। অনুসন্ধান করে দু'জন বাঙ্গালীকে ধরা হয়। এর মধ্যে একজন ভোলানাথ চ্যাটার্জি। ১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি পুনা জেলে সে আত্মহত্যা করে।

১১২। জার্মানীর অস্ত্রপ্রেরণ প্রচেষ্টা

আমরা এখন মাভেরিক জাহাজ ও হেনরি এস্ নামে আর একখানি জাহাজের কথা বলব। এই দুটি জাহাজই ভারতে অস্ত্র প্রেরণের উদ্দেশ্যে আমেরিকা থেকে প্রাচ্য অভিমুখে যাত্রা করে। এই সঙ্গে জার্মানদের অন্যান্য পরিকল্পনা সম্বন্ধেও কিছু বলব।

মাভেরিক জাহাজ (S. S. Movarick) ছিল ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর একটি পুরাতন তৈলবাহী জাহাজ। স্যান ফ্রান্সিসকোর F. Jabsen & Co. নামে একটি জার্মান ফার্ম এই জাহাজটি কেনে। এই জাহাজটি আনুমানিক ১৯১৫ সালের ২২শে এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানপেড্রো বন্দর থেকে কোন মালপত্র না

নিয়েই যাত্রা করে। জাহাজটিতে অফিসার ও খালাসিতে মিলে ছিল ২৫ জন, ওয়েটাররূপে ছিল আরো পাঁচজন তথা কথিত পারশী। এরা ছিল সবাই ভারতীয়। স্যান ফ্রান্সিসকোর জার্মান কনস্যুলেটের ফন্ ব্রিঙ্কেন ও গদর পার্টির রামচন্দ্র কর্তৃক এরা সব সংগৃহীত হয়েছিল। হরদয়ালের পর এই রামচন্দ্রই তখন গদর পার্টি চালাচ্ছিল। এর মধ্যে হরি সিং নামে এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে ছিল কয়েক ট্রাঙ্ক ভর্তি গদর পার্টি মুদ্রিত প্রচারপত্র। মাভেরিক প্রথমে স্যান জোস বন্দরে যায়। সেখান থেকে জাভার আঞ্জের বন্দরে যাবার জন্যে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে। তারপর এনি লার্সেন নামে একটি জাহাজের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় মেক্সিকো থেকে ৬০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত সকোরো দ্বীপে যায়। তানশ্চের নামে নিউইয়র্কের এক জার্মান অস্ত্রশস্ত্র কিনে স্যান দিয়াগোতে এনি লার্সেন নামে একটি জাহাজে বোঝাই করে দেয়। মাভেরিক জাহাজের কাপ্তেনের উপর নির্দেশ ছিল সকোরো দ্বীপে এনি লার্সেন থেকে এই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খালি তেলের ট্যাঙ্কের একটিতে রাইফেলগুলি রেখে তার উপর তেল ভরে সেগুলিকে ডুবিয়ে রাখবে। আর অন্য ট্যাঙ্কে গোলাবারুদ থাকবে। প্রয়োজন হ'লে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেবে।

কিন্তু এনি লার্সেন ঠিক সময়মত পৌছতে না পারার জন্যে মাভেরিকের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কয়েক সপ্তাহ পরে মাভেরিক হনলুলু হ'য়ে জাভা অভিমুখে যাত্রা করে। জাভাতে ওলন্দাজ সরকার জাহাজটির খানাতল্লাসী ক'রলে দেখা যায়, জাহাজটি খালি।

ইতিমধ্যে ১৯১৫ সালের জুনের শেষে এনি লার্সেন আমেরিকার ওয়াশিংটন রাজ্যের হকিয়াম বন্দরে আসে এবং আমেরিকা সরকার তার মালপত্র সব আটক করে। আদালতে আমেরিকাস্থ জার্মান রাজদূত এগুলিকে জার্মান সম্পত্তি রূপে দাবী করে। কিন্তু আমেরিকা সরকার সে দাবী অগ্রাহ্য করে।

মাভেরিক জাহাজের নাবিকদের ভার বাটাভিয়াতে হেলফ্রিশ গ্রহণ করে, এবং পরে তাদের আমেরিকা পাঠিয়ে দেয়। হরি সিং-এর স্থান গ্রহণ করে "মার্টিন"। এই ভাবে "মার্টিন" আমেরিকা পলায়ন করে।

আর একটি জাহাজ এই জার্মান ইণ্ডিয়ান প্লটে অস্ত্র পাঠানোর কাজে লাগান হয়েছিল। তার নাম ছিল হেনরি এস। এটি ম্যানিলা থেকে সাংহাই অভিমুখে যাত্রার জন্যে ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু ম্যানিলাতেই কর্তৃপক্ষ এর অস্ত্র

সম্ভারের সন্ধান পায় এবং তা নামিয়ে রাখতে বলে। তখন এই জাহাজটি অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে সাংহাই না গিয়ে পনটিয়ানেক অভিমুখে যাত্রা করে। পরে ইঞ্জিনের গোলযোগ হওয়ায় সেলিবিসের এক বন্দরে এসে আশ্রয় নেয়। এই জাহাজে দু'জন জার্মান বংশোদ্ভূত আমেরিকান ছিল। নাম ছিল তাদের ভেদে ও বোহেম।

সম্ভবতঃ এই জাহাজটির উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কক-এ অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেওয়া। সেখানে শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্তের পাথো অঞ্চলের কোন এক গিরিবর্ত্মের গুপ্ত স্থানে সেগুলি লুকানো থাকবে। ইতিমধ্যে বোহেম এই সীমান্ত থেকে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের জন্যে সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের শিক্ষিত করে তুলবে। সেলিবিস থেকে বাটাভিয়া হ'য়ে গন্তব্যস্থানে যাবার পথে সিঙ্গাপুরে বোহেম গ্রেপ্তার হয়। চিকাগো থেকে হেরম্বলাল গুপ্তের নির্দেশ পেয়ে তিনি ম্যানিলাতে হেন্‌রি এস্ জাহাজ ধরেন।* ম্যানিলার জার্মান কন্‌সাল তাঁকে নির্দেশ দেন যে, ব্যাঙ্ককে যেন ৫০০ পিস্তল নামিয়ে দেওয়া হয়; আর এই ৫০০০ মোজার পিস্তলের বাকি অংশ যেন চট্টগ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, যখন মাওরিক জাহাজের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় তখন সাংহাই-এর জার্মান কন্‌সাল জেনারেল আর দুটি জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বঙ্গোপসাগরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, তার মধ্যে একটি রায় মঙ্গলে আর একটি বালেশ্বরে। প্রথমটিতে থাকবার কথা ২০ হাজার রাইফেল, ৮০ লক্ষ গুলি, ২ হাজার পিস্তল ও প্রচুর হাত বোমা ও বিস্ফোরক এবং ২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়টিতে ১০ হাজার রাইফেল, ১০ লক্ষ গুলি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ হাত বোমা ও বিস্ফোরক।

মার্টিন অবশ্য বাটাভিয়ার জার্মান কনসালকে বুঝোলেন যে, অস্ত্র নামানোর পক্ষে রায় মঙ্গল আর নিরাপদ স্থান নয়, তদপেক্ষা হাতিয়া অনেক নিরাপদ। অস্ত্র অবতরণ স্থানের এই পরিবর্তন বিষয়ে মার্টিন হেলফ্রিশের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং এই আলোচনার ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত পরিকল্পনাটি রচিত হয়।

হাতিয়াগামী জাহাজটি সাংহাই থেকে ছেড়ে ডিসেম্বরের শেষে হাতিয়াতে সোজা এসে পৌঁছবে। বালেশ্বরগামী জাহাজটি ছিল একটি জার্মান জাহাজ। এটি ওখানকার কোন এক ডাচ বন্দরে আটক ছিল। সেটি ওখান থেকে বেরিয়ে

*এই জাহাজে ৫০০০ মজার পিস্তল ছিল—লেখক

এসে সমুদ্রের উপরই অন্য একটি জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা করবে। তৃতীয় জাহাজটিও জার্মানীর যুদ্ধবন্দী আটক জাহাজ। এটিও সমুদ্র বক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ভরে নিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ার আক্রমণ ক'রে সেখানকার সেলুলার জেলে আবদ্ধ রাজবন্দী, অন্যান্য কয়েদী ও সিঙ্গাপুর রেজিমেণ্টের বিদ্রোহী সৈন্যদের মুক্ত করে তাদের নিয়ে রেঙ্গুন আক্রমণ করবে।

এই পরিকল্পনা রূপায়নের প্রস্তুতিপর্বে সাহায্যের জন্যে বাংলার বিপ্লবীদের নিকট একজন চীনাকে পাঠান হয়। তার সঙ্গে দেওয়া হয় ৬৬০০০ গিল্ডার (পেনাঙ্গের টাকা), এবং পেনাঙ্গের একজন বাঙ্গালীর নামে একটি পত্র। নির্দেশ ছিল পত্রখানি পেনাঙ্গে দেওয়া সম্ভব না হ'লে কলিকাতার দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনকে তা' পৌছে দেওয়া। কিন্তু এই চীনাটি সিঙ্গাপুরে এই চিঠি ও টাকাসহ ধরা পড়ায় টাকা আর চিঠি যথাস্থানে বিলি করা সম্ভব হয় নি। এই সময়েই যে বাঙ্গালীটি "মার্টিনের" সঙ্গে বাটাভিয়া এসেছিল তাকে সাংহাইতে জার্মান কনসালের সঙ্গে আলোচনার জন্যে পাঠানো হয় এবং আলোচনার শেষে হাতীয়াগামী জাহাজে চড়ে ফেরার কথা থাকে। সে অনেক কষ্টে সাংহাই পর্যন্ত পৌছলেও সেখানে পৌছানোমাত্র গ্রেপ্তার হয়।

ইতিমধ্যে কলিকাতার বিপ্লবীরা যতীন মুখার্জির মৃত্যুর পর ফরাসী চন্দন-নগরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সাংহাই-এ বাঙ্গালী বিপ্লবীটির গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় বঙ্গোপসাগরে জার্মানদের অস্ত্র নামানোর শেষ পরিকল্পনাটিও পরিত্যক্ত হয়!

জার্মান ভারত ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণের অপরাধে আমেরিকার চিকাগো সহরে এক বিচারে ভেদে, বোহেম ও হেরম্বলাল গুপ্ত-র জেল হয়।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে স্যান ফ্রান্সিসকো সহরে এই অপরাধের জন্যে ধৃত অন্যান্য আসামীদের যে বিচার হয় তাতেও অনেকের কারাদণ্ড হয়। এই মামলার সম্পূর্ণ বিবরণ এখনো ভারতে এসে পৌছয় নি!"

১১৩। সাংহাই-এর গ্রেপ্তার

১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সাংহাই মিউনিসিপ্যাল পুলিশ দুইজন চীনাকে গ্রেপ্তার করে। তাদের নিকট থেকে ১২৯টি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও ২০৮৩০টি গুলি পাওয়া যায়। নীলসেন নামে একজন জার্মান সে গুলি তক্তার বাণ্ডিলের

মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে কলিকাতার শ্রমজীবী সমবায়ের অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেবার জন্য তাদের দেয়। চন্দননগরে যে সব বিপ্লবী আত্মগোপন করেছিল অমরেন্দ্র তাদেরই একজন।

ধৃত চীনা দু'জনের বিচারের সময় প্রকাশ পায় যে, নীলসেনের ঠিকানা ছিল ৩২ নং ইয়াংসিপু রোড। পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত জাপানে প্রেরিত অবনী মুখার্জি যখন দেশে ফিরছিল তখন সে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে। দেখা যায় যে, এই ঠিকানা তার নোট বইতেও লেখা আছে। এটি বিশ্বাস করার কারণ এই যে হয় এটি, নয় ত আর একটি ষড়যন্ত্র রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যুক্তি করেই হচ্ছিল। রাসবিহারী বসু তখন নীলসেনের বাড়ীতেই এই পিস্তলের জন্যে বাস করছিলেন এবং ভারতে পাঠাবার জন্যে একজন চীনা ১০৮ নং চাপ্তুঙ্গ রোডের মাইতা ডাক্তারখানা থেকে সেগুলি গ্রহণ করে। অবনীর নোটবুক থেকে জানা যায় যে, এটিও নীলসেন-এর একটি ঠিকানা। এই বাড়ীতে আর একজন বিপ্লবী বাস করত, তার নাম ছিল অবিনাশ রায়; সেও সাংহাই থেকে ভারতে অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। অবিনাশ রায় অবনী মারফৎ চন্দননগরের মতিলাল রায়ের নিকট সংবাদ পাঠায় যে, সব ঠিক আছে, এবং সে যাতে নিরাপদে ভারতে ফিরতে পারে সে জন্যে তারা যেন কোন উপায় নির্ধারণ করে জানায়।

অবনীর নোটবুকে চন্দননগর, কলিকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লার অনেক বিপ্লবীর নাম ঠিকানা ছিল। এছাড়াও ছিল শ্যাম দেশের পাখো সহরের এঞ্জিনিয়ার অমর সিং-এর ঠিকানা। হেনরি এস জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র এরই হেপাজতে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। অবনীর নোটবুকের নাম ঠিকানার সাহায্যে অমর সিংকে ধরা হয় এবং মান্দালয় জেলে তার ফাঁসি হয়।"

সিডিসন কমিটির এই বিবরণীতে কিছু কিছু ভুল আছে। তার কারণ, এই সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল কিছু দলিল দস্তাবেজ কাগজপত্রের সাহায্যে ও কিছু হয়েছিল কোন কোন ধৃত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির সাহায্যে। ভুল ভ্রান্তি ঘটেছে এই স্বীকারোক্তি সমূহ থেকেই।

যেমন রিপোর্টে লেখা আছে, নরেন প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে। সম্ভবতঃ সেটি তাঁর দ্বিতীয় সমুদ্র যাত্রা, যদিও মাওরিক জাহাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে সেইটি প্রথম।

রিপোর্টে লেখা আছে, নরেন "মার্টিন" নাম নিয়েই বাটাভিয়া অভিমুখে

যাত্রা করেন, কিন্তু রায়ের স্মৃতি কথা* অনুসারে জানা যায় যে, এ নাম তিনি নিয়েছিলেন যখন তিনি জাপান থেকে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। চীনের জার্মান এমব্যাসী থেকে পণ্ডিচারী নিবাসী ভারতীয় ক্রীশ্চান সি, মার্টিনের নামে সেই পাশপোর্টটি তৈরি করে দেওয়া হয়।

যদি সিডিসন কমিটির রিপোর্ট ঠিক হয়, তবে বুঝতে হবে সি, মার্টিন ও ফাদার মার্টিন দুই বিভিন্ন নাম। দুই ক্ষেত্রে রায় এই দুটি নামই ব্যবহার করেছিলেন।

তা ছাড়া নরেন্দ্রনাথের সে সময়কার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ হেনরি মার্টিন নাম নিয়ে ভারত ত্যাগ করেন। (Vide—M. N. Roy—A Revolutionary—Renaissance Publishers (P) Ltd.)

রিপোর্টে লেখা আছে, হরি সিং-এর ছদ্ম নামে নরেন্দ্রনাথ আমেরিকা পৌঁছান। কিন্তু সেটিও ঠিক নয়। সম্ভবতঃ এই নামে জাভা থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

রায় দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও এবং সর্বদাই সেই সব দেশের পুলিশ তাঁকে ধরার চেষ্টা করলেও তারা যে ব্যর্থকাম হ'ত তার অন্যতম কারণ ছিল, তিনি তাঁর সদাজাগ্রত মন দিয়ে নিজ কার্যকলাপ চলাফেরা বলাকওয়া প্রতি মুহূর্তেই যাচাই করে দেখতেন, বিশ্লেষণ করে চলতেন, ফলে প্রায়ই পূর্ব পরিকল্পনার কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধন করতেন, সেইজন্যে পুলিশ সংবাদ পেয়েও দেখত, সে সংবাদ ভুল। হরি সিং নাম নিয়ে আমেরিকা যাবার পরিকল্পনাটি হয়তো প্রচারিত হয়েছিল এবং আসল উদ্দেশ্য যে স্থল পথে অস্ত্র আমদানী করার জন্যে জাপান চীন হ'ল গন্তব্য স্থান সেটি হয়তো কেউই জানত না।

রায় যখন ১৯১৫ সালের শেষের দিকে হরি সিং নাম নিয়ে জাভা থেকে অন্তর্ধান করেন তারপর থেকে তাঁর কাজকর্মের বিবরণ সিডিসন কমিটির রিপোর্টে নাই। জল পথে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা যখন বার বার ব্যর্থ হ'তে থাকল এবং ভারতের উপকূলে যখন কড়া পাহারা বসল তখন তিনি ভারত ত্যাগ করেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে স্থল পথে অস্ত্র আমদানীর উদ্দেশ্য নিয়ে, সে কথাও

* M, N. Roy's Memoirs—Allied Publishers (P) Ltd—1964.

এই রিপোর্টে নাই; যদিও কিছুদিন জাভায় থেকে অন্তরীন সব জার্মান জাহাজের সাহায্যে জল পথেই আর একবার অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করেন। অবশ্য একথাটি রিপোর্টে আছে।

এই রিপোর্টে গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটা ডাকাতির উল্লেখ আছে। এ ডাকাতি দুটিও রায়ের নেতৃত্বে ঘটেছিল।

জার্মানীর সাহায্যের অঙ্গীকার আসার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগঠনকে দৃঢ় ও প্রয়োজনোপযোগী করে দ্রুততার সঙ্গে গড়ে তুলতে যে প্রাথমিক অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল তা সংগ্রহের ভার নরেনই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিল। যতীনদা সাত দিনের মধ্যে পনর হাজার টাকা চেয়েছিলেন। নরেন সাতদিনের মধ্যেই গার্ডেনরীচে ডাকাতি করে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করে আনেন। প্রয়োজন যখন আরো বেড়ে চলল তখন বেলেঘাটা অঞ্চলে পুনরায় ডাকাতি করতে হয়। এই দুটি মোটর ডাকাতিতে নরেন ৪০,০০০ টাকা এনে দিয়েছিল। ব্যাপার দুটি এমনই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, হাতে নাতে কেউ ধরা পড়ে নি, এমন কি বিপ্লবীদের উপর বিশেষ ভাবে সন্দেহও হয়নি। সেইজন্যে নরেন সন্দেহ বশে ধরা পড়লেও জামিন মঞ্জুর হতে দেরী হয়নি। ঘটনা দুটি এমনই দুঃসাহসিকতার সঙ্গে ঘটেছিল যে, সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছেলেদের দ্বারা এতটা যে সম্ভব সেটি প্রথমে পুলিশ বিশ্বাস করতে চায়নি।

এই সব কার্যকলাপের বিবরণ থেকে এটি জানা যায় যে, নরেন্দ্রনাথ অনুশীলন ধর্মের সাধনায় দেহকে যেমন সুপুষ্ট করে তুলেছিলেন, দেহে ও মনে সর্ববিষয়ে দক্ষও হয়ে উঠেছিলেন। দৈহিক শক্তি ও দক্ষতা দিয়ে এক দিকে যেমন দিনেদুপুরে সহস্র মানুষের মধ্যে থেকে টাকার থলি নিয়ে অন্তর্ধান করছেন, তেমনি আবার কাইজারি যুগের সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত সব কনসাল জেনারেল ও হেল্‌ফ্রিশ-এর মত কোটিপতি সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক বাদ-বিতণ্ডা করে নিজ মতে টেনে আনছেন। করাচীর পরিবর্তে সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে জাহাজটিকে আনার প্রস্তাব যে রায়েরই সে কথা আমরা রিপোর্টে পড়েছি; এবং আরো পড়েছি যে, মাভেরিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় রায় জার্মানদের আর একটি পরিকল্পনায় রাজি করান। সেটি ছিল জল পথেই সাহায্য আনার দ্বিতীয় পরিকল্পনা। উত্তর সুমাত্রার বন্দরে যে সকল জার্মান জাহাজ অন্তরীন ছিল সেই সব জাহাজের সাহায্যে এই পরিকল্পনাটি রচিত

হয়েছিল। এই জাহাজগুলি যদিও সবই বাণিজ্য জাহাজ ছিল তথাপি যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে জার্মানী পূর্ব থেকেই এগুলিকে গোপনে অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত করে রেখেছিল। খালাসিরাও ছিল ছদ্মবেশী নৌ সৈনিক।

পরিকল্পনাটি হ'ল * অন্তরীণ শিবির থেকে জার্মান খালাসিরা অকস্মাৎ বিদ্রোহ করে বন্দরে বাঁধা নিজ নিজ জাহাজে গিয়ে চড়বে। জাহাজগুলিকে রক্ষা করার জন্যে যে সামান্য খালাসি জাহাজে ছিল তারা আগে থেকে জাহাজের ষ্টীম বাড়িয়ে রাখবে। তারপর জাহাজ পুরোদমে চালিয়ে একদল আন্দামান জয় করে প্রথমে রেঙ্গুন তারপর কলিকাতা আক্রমণ করবে। আর একদল হাতিয়ায় ও আর এক দল বালেশ্বরের নিকট অবতরণ করবে।

রায়ের মতে, এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল জার্মানরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে তখন সাহস করেনি বলে। ঠিক সময়ে এই পরিকল্পনা হাশিল করার জন্যে টাকা পয়সা পাওয়া গেল না এবং যে দিন এই পরিকল্পনা রূপায়নের জন্যে হুকুম জারি করার কথা ছিল সে দিন জার্মান কনসাল জেনারেল কাউকে কিছু না জানিয়েই রহস্যজনক ভাবে অন্তর্ধান করলেন। অবশ্য যুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানরা ঠিক সময়ে ঠিক কাজ না করার জন্যে আফশোষ করেছিল কিন্তু সে কথা এখন থাক।

সিডিসন কমিটির রিপোর্টে কিঞ্চিৎ উপহাস করে বলা হয়েছে যে ঃ

"উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে বিপ্লবীদের অতিমাত্রায় নিশ্চয়তা ছিল, এবং জার্মানরাও যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সুযোগ নিতে চেয়েছিল সে সম্বন্ধেও তারা প্রকৃত অবস্থা বিশেষ কিছু জানত না।"

এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, সিডিসন কমিটির সদস্যগণ জানতেন না যে জার্মানরা যদি যেমনটি আগ্রহ নিয়ে শেষের দিকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করতে চেয়েছিল তেমনটি আগ্রহ প্রথম দিকেই দেখাত তা হ'লে ইতিহাসটি হয়তো অন্য রকম হ'তে পারত।

সর্বকালে সকল দেশের সব বিপ্লবীদেরই নিজ নিজ উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকে এবং আয়োজনও প্রচলিত ধারণার তুলনায় এমন বেশী কিছু থাকে না। তথাপি বিপ্লবীদের জ্বলন্ত বিশ্বাসের জোরেই পাহাড় টলে, পর্বত কাছে আসে, সাগর শুকোয়, দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেঙ্গে পড়ে, সিংহাসন চূর্ণ হয়, রাজ মস্তক

---

*Ibid pp 4-5

ধুলোয় লুটোয়। অবশ্য সে কথা রাওলাট সাহেব ও তাঁর কমিটির লক্ষ্মীর বর-পুত্রদের এই অলক্ষ্মী-তত্ত্ব জানবার কথা নয়। যদি জানত তা হ'লে যুদ্ধে জিতেও যে তাদের ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য হারাতে হবে, সে কথাও তা হ'লে জানতে পারত এবং দেশ ভক্ত বিপ্লবীদের উপর ভবিষ্যৎ ভেবে অতখানি অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আচার-ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হ'ত।

আমাদের কথা হ'ল, নরেন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের সাধনা তাঁর জীবনে এমনই সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল যে, দেহে মনে তাঁর দক্ষতা ও কার্যকরিতা চরমে উঠেছিল। এই যে ১৯০৭ সালে চিংড়ি পোতা (বর্তমানে সুভাষ নগর) রেল ষ্টেশন লুট করার অভিযোগ হ'তে মুক্ত হওয়ার পর ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে অতি সংগোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনে অনুক্ষণ ব্যস্ততা তা যে তিনি কত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একমাত্র সেই সাধকই পারে যে সম্পূর্ণ ভাবে মনকে কর্তৃত্বাধীনে এনেছে, ধরা-পড়া, না-পড়া যার কাছে সমান, জীবন মৃত্যু যার পায়ের ভৃত্য, পুলিশের অত্যাচারে যে ভীত সঙ্কুচিত নয়, যার মন সততই স্থির শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত, কোন কিছুতেই যে উদ্বেলিত হয় না, অথচ সর্বকর্মে দক্ষ, সতত সতর্ক সজাগ, দূর দৃষ্টি সম্পন্ন তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি দিয়ে যার সর্ব কর্ম নির্ধারিত হয়, যে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দেয় না, রাগে না, মোহিত হয় না, ভীত হয় না, কাতর হয় না, একমাত্র সে-ই এই ভাবে সাফল্যের সঙ্গে আত্মগোপন করে চলতে পারে। সে সময়কার সকল নেতাই এক বাক্যে সে কথা বলেছেন।

"বালেশ্বর যুদ্ধের বীর যতীন মুখার্জির নেতৃত্বাধীন সমস্ত সৈনিকের মধ্যে সে-ই (নরেন্দ্র নাথ) যে সর্বাপেক্ষা সাহসী বীর সৈনিক ছিল সে কথা তখন সবাই জানত"—অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, (M. N. Roy—A Symposium—Edited by Sib Narain Ray—Renaissance Publishers (P) Ltd.

দুঃসাহসী অনেকে হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে দক্ষ সুকৌশলী বুদ্ধিমান দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন চরিত্রবান ব্রহ্মচারী হওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। এ যেন বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে চরিত্র গড়ে তোলা। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন ধর্মের চরম বিকাশ দেখাবার জন্যে কল্পনায় যে চরিত্র এঁকেছেন এ যেন তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। তা ত' এমনি হয় না। তার জন্যে প্রয়োজন প্রথমতঃ উপযুক্ত আধার, দ্বিতীয়তঃ তীব্র দীর্ঘ

গভীর সাধনা, সর্ববৃত্তি ও শক্তির অনুশীলন। যত দিন যেতে লাগল নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অনুশীলন ধর্মের সিদ্ধি প্রচেষ্টা যেন সার্থক হয়ে উঠতে লাগল।

সাধনা ও অনুশীলনের দ্বারা তিনি তাঁর কায় মন ও বাক্যকে এমনই সুদক্ষ সজাগ ও তীক্ষ্ণ যুক্তিশীল করে গড়ে তুলে তাঁর ব্যক্তিত্বকে যে কতখানি আকর্ষণীয় ও অমোঘ করে তুলতে পেরেছিলেন তা আমরা এই সিডিসন কমিটির রিপোর্ট থেকেই দেখতে পেলাম। এবং এর পর আমরা আরো দেখব ভারতের বাইরে প্রথম শ্রেণীর সব মানুষের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই কী ভাবে তিনি তাঁদের মুগ্ধ করে তাঁদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্থলপথে অস্ত্র আমদানীর উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথের চীন যাত্রা

সমুদ্র পথে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর শেষ প্রচেষ্টা জার্মানদের দ্বিধাগ্রস্ততার জন্যে যখন ব্যর্থ হ'ল, তখন ১৯১৫ সালের হেমন্তে তিনি প্রকাশ্যে আমেরিকা যাত্রার নামে বাটাভিয়া ত্যাগ করলেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য এবার স্থলপথে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ফিলিপাইন দেশের মধ্য দিয়ে নানা পথ ধরে প্রথমে জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে হরি সিং নাম বদল করে মিঃ হোয়াইট নাম নিয়ে জাপানের নাগাসাকি সহরে অবতরণ করলেন। অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানী গোয়েন্দা তাঁর পিছু নিল। টোকিওতে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করা সহজ ছিল না। খুব সন্তর্পণে এ কাজ করতে না পারলে যুদ্ধে ব্রিটিশের সহযোগী জাপান সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হ'তে হবে। টোকিওতে অপর একজনের ঠিকানা জানা ছিল। তারই মাধ্যমে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। অনেক সতর্ক ও গোপন প্রয়াসের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। রাসবিহারীর সঙ্গে রায়ের পূর্ব পরিচয় ছিল না, কিন্তু প্রথম দর্শনেই নরেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রভাবিত করলেন এবং তাঁর আস্থাভাজন হ'লেন। বার বার চেষ্টা করেও এবং শেষ পর্যন্ত অবনীর নোটবুকের সাহায্যে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়ায় এবং সংগঠন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি হতাশ হ'য়ে তখন জাপানে স্থির হয়ে বসেছেন। রায়ের মত আশাবাদ তখন আর তাঁর ছিল না। রাসবিহারী যখন তাঁকে কোনরূপ সাহায্যের ভরসাই দিতে পারলেননা, তখন নরেন্দ্রনাথ চীনের নেতা সান ইয়াট্ সেন-এর সঙ্গে দেখা করলেন। ১৯১৩ সালের নানকিন বিদ্রোহের পরাজয়ের পর সান ইয়াট্ সেন তখন জাপানে এসে পলাতক জীবন যাপন করছিলেন।

সেই সময় ১৯১৫ সালের শেষ থেকে চীনের ভারত বর্মা সীমান্তে অবস্থিত ইউনান ও জেচুয়ান প্রদেশে রাজতন্ত্রী ইউয়ান সিকাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছিল। এই বিদ্রোহ সান ইয়াট সেন-এর প্ররোচনা ও নেতৃত্বাধীনেই ঘটছিল।

এ ক্ষেত্রেও নরেন্দ্রনাথের অমোঘ ব্যক্তিত্ব জয়ী হ'ল। তিনি অবিলম্বেই সান ইয়াট সেন-এর আস্থা-ভাজন হ'লেন। রায় প্রস্তাব করলেন যে, কিছু অস্ত্র যদি তিনি সেখান থেকে সীমানা পার করে ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে দেবার ব্যবস্থা করেন তা হ'লে চীনের মুক্তিকামী যোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতের মুক্তিকামীদের একটা সহযোগিতা স্থাপিত হতে পারে।

উত্তরে সান ইয়াট্ সেন বললেন যে, রায় যদি এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য বাবদ চীনে জার্মান রাজদূতের নিকট থেকে ৫০ লক্ষ ডলার মুদ্রা আদায় করে দিতে পারে তা হ'লে তিনি তাকে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ভারতের সীমান্তে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, এবং তখন তিনি সেই টাকার জোরেই ইউ এন সিকাইয়ের সমর্থকদের কিনে নিতে পারবেন, এবং যুদ্ধে সেটাই হবে তাঁর পক্ষে সহজ ও নিশ্চিত পথ।

সান ইয়াট্ সেনের মত বয়স্ক বিচক্ষণ মানুষের পক্ষে অজ্ঞাত অখ্যাত বিদেশী এক যুবকের প্রতি প্রথম দর্শনেই এতখানি আস্থা স্থাপন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কিন্তু বিশ্বাস করি আর নাই করি, এটাই হ'ল ঐতিহাসিক সত্য।

স্থির হ'ল নরেন্দ্রনাথ অবিলম্বে পিকিংএ গিয়ে জার্মান রাজদূতকে এই প্রস্তাব দেবে। রাজদূত এই প্রস্তাবে রাজি থাকলে সান ইয়াট্ সেন তাঁর লোক ইউনানে পাঠিয়ে সকল ব্যবস্থা করে দেবেন। টাকা সাংহাই-এ সান ইয়াট সেনের হাতে দিতে হ'বে।*

এদিকে এত সতর্কতা সত্ত্বেও রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎটা জাপানী পুলিশের কাছে গোপন থাকে নি। রাসবিহারী গোপনে সংবাদ দিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ যেন অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করেন, নতুবা এরা তাঁকে সাংহাই-এ ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবে।

এই অবস্থায় তাঁকে পালাতে হয়, কিন্তু কোথায় কি ভাবে কিছুই জানা নাই, রাসবিহারীও কিছুই জানান নি। যা করতে হবে তা তাঁকে নিজেই করতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই সান ইয়াট সেনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেছে এবং

কথাবার্তা ও পরিকল্পনা সবই পাকা হয়ে গেছে। সুতরাং পিকিংই তাঁকে যেতে হবে। তিনি পিকিং রওনা হলেন—পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে।

পরদিনই তিনি টোকিওর সবচেয়ে বড় দোকানে ঢুকলেন। জাপানের নিয়ম অনুযায়ী সকলকেই দরজায় জুতো-ছেড়ে কাপড়ের জুতো পরে ভেতরে ঢুকতে হয় পাছে জুতোর ধূলোয় দামী ম্যাটিং নষ্ট হয়ে যায়। নরেন্দ্রনাথ আর দরজায় ছাড়া জুতো নিতে ফিরে এলেন না, নতুন জুতো কিনে অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলেন। তারপর জাহাজ ঘাটায় গিয়ে কোরিয়ার জাহাজ ধরে সিউল; ফের জাহাজে চড়ে চীনের দাইরেন বন্দরে নেমে ট্রেনে চ'ড়ে মুকদেন হয়ে পিকিং।

পিকিংএ নামতেই দেখলেন অভ্যর্থনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সেখানকার ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ-প্রধান। জানলেন, সুদক্ষ জাপানী পুলিশ মিঃ হোয়াইটের গতিবিধি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছে। মিঃ হোয়াইটই যে নরেন্দ্রনাথ সে কথা অবশ্য তখনো এরা কেউ জানত না। অতএব যতক্ষণ না সনাক্ত হচ্ছেন মিঃ হোয়াইট, আসল ব্যক্তিটিকে ততক্ষণ হাজত বাস করতে হবে। নরেন্দ্রনাথকে হাজতে রাখা হ'ল। সে রাত্রিতে আর করার কিছু নাই দেখে তিনি নিরুদ্বিগ্নমনা হয়ে নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে রাতটি কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন কনসাল জেনারেলের কোর্টে তাঁকে হাজির করা হ'ল। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নরেন্দ্রনাথ তাঁর সম্মোহিনী শক্তি দিয়ে এমনই মোহিত করলেন যে, তিনি নরেন্দ্রনাথের সব কথাই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে ফেললেন। কেন তিনি জাপানে গিয়েছিলেন—কেন তিনি নামজাদা বিপ্লবী রাসবিহারীর এজেন্টের সঙ্গে দেখা করেছিলেন—কী তার মতলব। নরেন্দ্রনাথ অম্লান বদনে বলে গেলেন যে, সে ইংলণ্ডে পড়তে যেতে চায়; যুদ্ধের জন্যে সেটি হচ্ছে না; বিদেশে গিয়ে পড়বার তার বড়ই আগ্রহ; সেই উদ্দেশ্যেই জাপানে আসা এবং এই ঝঞ্ঝাট; জাহাজে তাহাকে একজন যাত্রী জানিয়েছিল যে রাসবিহারী বসু নামে একজন ভারতীয় টোকিওতে আছেন, বিপদে-আপদে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে; সে নিজে জাপানী ভাষা জানে না; জাপানে গিয়ে তার অসুবিধার অন্ত ছিল না; ভেবেছিল রাসবিহারীর নিকটে গিয়ে অসুবিধাগুলো দূর করার ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, এটা তার পক্ষে ভুলই হয়েছে, জাপানে পুলিশ পিছু নিয়েছে; তাতেই সে ভয় পেয়ে দেশে ফিরতে চেয়েছে; তবে দেশে ফেরার আগে চীন দেশের দু' একটি সহর

দেখে যেতে চায়; ব্যস্, আর কিছু নয়; এখন সে ইচ্ছাও গেছে; এখন দয়া করে ছেড়ে দিলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে বাঁচে।

কনসাল জেনারেল নরেন্দ্রনাথের সব কথা মন দিয়ে শুনলেন, ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করলেন এবং সবই বিশ্বাস করলেন। পুলিশ-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তুমি কি জাপান থেকে আর কোন সংবাদ পেয়েছ?"

"না স্যার, তবে যে কোন মুহূর্তে সংবাদ আসতে পারে।"

তাই বলে "তুমি এ ছোকরাকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটকে রাখতে পার না।"

নরেন্দ্রনাথকে বললেন, "দিন কয়েক হোটেলে গিয়ে থাক, তারপর বাড়ী যেও।"

পুলিশ সাহেবকে ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত করে হুকুম দিলেন, "পুনরায় তদন্ত সাপেক্ষে আসামীকে আপাততঃ খালাস দেওয়া হইল।"

"কোর্টের বাইরে এসে পুলিশ সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "the old fool।"

পুলিশ সাহেব নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তিনি কোথায় যাবেন। তিনি বললেন, "একটি ভাল হোটেলে।"

"ভাল হোটেল একটিই আছে—আর সেটি ব্রিটিশ এলাকায়।"

"নরেন্দ্রনাথ অম্লান বদনে বললেন, ভালই ত, সেটাতেই যাব, আর তা ছাড়া আমি ত ব্রিটিশ সাবজেক্ট—সেখানেই ত আমায় যেতে হ'বে।"

তিনি Astoria হোটেলে উঠলেন এবং সহরের একটি মানচিত্র দেখে কোথায় কী আছে তা দেখে নিলেন। বিকেলে একটি রিকশায় চড়ে চীন এলাকার মধ্যে দিয়ে চললেন। কিছুদূরেই একটি ছোট নদী, ওপারেই জার্মান এলাকা। স্মরণ করা যেতে পারে যে, তখন চীনে এবং তার রাজধানীতে ইউরোপীয় শক্তি সমূহের জন্য Extra Territorial Right অর্থাৎ সংরক্ষিত এলাকা ছিল। যে সব স্থানে চীনের সার্বভৌমত্ব চলত না, বিদেশীদের নিজ নিজ দেশের আইন-কানুন অনুসারে সেই সব স্থানের স্বায়ত্তশাসন চলত।

পিছনে দুটি রিকশাতে চারজন গোয়েন্দা অনুসরণ করতে লাগল। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। নদীর ধারে একটি বড় দোকানে ঢুকে অনেকটা সময় ধরে এটা-সেটা দেখতে লাগলেন। বিরক্ত হ'য়ে গোয়েন্দারা নিকটে চায়ের দোকানে

ঢুকল, তিনিও পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক গলিতে ঢুকে পড়লেন। কয়েক পা দূরেই নদী, খেয়া নৌকো এ পারেই ছিল। পার হ'তে যে চীনা পয়সা দিতে হয় তাঁর কাছে তা ছিল না। তিনি একটি চীনা টাকা তার হাতে গুঁজে দিলেন, সে একটু হেসেই অন্য যাত্রী না নিয়েই নৌকো ছেড়ে দিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তিনি জার্মান এলাকায় নিরাপদ স্থানে পৌছে গেলেন। পরদিনই তিনি জার্মান রাজদূতের সঙ্গে দেখা করলেন।

এ ক্ষেত্রেও নরেন্দ্রনাথের অনেক সাধনায় গড়ে তোলা বিকশিত ব্যক্তিত্বের অমোঘত্বের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল না। প্রথম আলোচনাতেই রাজদূত নরেন্দ্রনাথকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করলেন এবং যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গেই কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা করলেন। অবশ্য ডাচ ইণ্ডিসের জার্মান কনসাল জেনারেল ও সাংহাই-এর কনসাল জেনারেলের সঙ্গে পূর্বের যোগাযোগের উল্লেখ ও নজির তাঁকে সহজেই বিশ্বাসভাজন করে তুলতে খুবই সাহায্য করেছিল।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সান ইয়াট সেনের যে চুক্তি হয়েছে সে কথা উল্লেখ করলেন এবং ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। জার্মান রাজদূত তাঁর চুক্তির গলদ ধরে বললেন যে, সান ইয়াট সেন রইলেন জাপানে, আর যাঁর কাছে অস্ত্রের ভাণ্ডার তিনি রইলেন বহুদূরে ইউনানে, কী নিশ্চয়তা আছে যে, সান ইয়াট সেন অর্থ পেলে অন্য ব্যক্তিটি অস্ত্র সম্ভার হস্তান্তর করে দেবে? আর তা ছাড়া প্রকৃত পক্ষে তখনো সেই পরিমান অস্ত্র সেই মানুষটির আয়ত্তাধীনে আছে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন।

নরেন্দ্রনাথ সহজেই নিজ প্রস্তাবের ত্রুটি দেখতে পেলেন। তখন তিনি বহু বিপদ আপদ কাটাতে কাটাতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সংলগ্ন ইউনান প্রদেশের নেতার সঙ্গে দেখা করতে চীনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাত্রা করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত কার্য সমাধা করে পিকিংএ ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে চীনা রাজসিংহাসনের দাবীদার ইউয়ান সিকাই-এর মৃত্যু হওয়ায় বিপ্লবীদেরই জয় হয়। অতএব অস্ত্র পাবার পথও সুগম হয়ে পড়ে। এবার সঙ্গে আনলেন, হাঙ্কাও-এর জার্মান কনসালের সম্মুখে সম্পাদিত ইউনান প্রদেশের নেতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর এক চুক্তি পত্র। এখন আর কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তি রইল না। জার্মানরা ইচ্ছা করলে টাকা সরাসরি অস্ত্র সম্ভারের আসল দখলকারীকেই দিতে পারে। টাকা পেলে দখলকারীই ভারতের সীমান্তে

সে অস্ত্র সরাসরি হস্তান্তর করে দেবে। যে পরিমাণ অস্ত্র আছে তা বেশ কয়েক হাজার সৈন্যের পক্ষে যথেষ্ট। এ ছাড়াও চুক্তি পত্রে আরো একটি সর্ত ছিল যে, তিব্বতের পাশে জেচুয়ান প্রদেশের রাজধানী চেঙ্গটুর বৃহৎ অস্ত্র ভাণ্ডার থেকেও উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা অস্ত্র সরবরাহ পেতে থাকবে। সদিয়ার উপর দিয়ে পাহাড়ে পথ বেয়ে সে সরবরাহ আসবে।

প্রথম থেকেই জার্মানরা কেবল কথাই বলে এসেছিল। কিছু কিছু সাহায্য দিয়ে ভারতের আসন্ন বিপ্লবের কথা ফলাও করে জার্মানীতে প্রচার করে দেশের মানুষের মনোবল ঠিক রাখার কাজে লাগাত। আন্তরিকতার সঙ্গে পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করতে চায় নি। নতুবা সে সময় যদি জার্মানরা তৎপরতার সঙ্গে সাহায্য করত তা হ'লে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া যেত। বিপ্লবীরাও একে একে ধরা পড়ত না। আগেও যেমন জার্মান সাহায্য আসে নি, সেদিনও জার্মান রাজদূত সে পরিকল্পনাটি অবিলম্বে কার্যকরী করে তোলা সম্বন্ধে তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন।

কয়েক মাস ধরে অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করে অপরিসীম ঝুঁকি নিয়ে যে পরিকল্পনা পাকা করে তুললেন তা সফল করে তুলতে রাজদূত অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় নরেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। এ কথা প্রথমে বললে থামাকো তাকে এতদিন ধরে এই কষ্টটি ভোগ করতে হত না। তিনি কড়া সুরেই বললেন যে, টাকাটা কী এমন বেশী? ইউরোপে একটি খণ্ড যুদ্ধ জিততে কি এর চেয়ে কম লাগে?

রাজদূত সম্ভবতঃ একজন ভারতীয় যুবকের কাছে এইরূপ ঔদ্ধত্যসূচক জবাব আশা করেন নি।

তিনি বললেন, যে সম্বন্ধে কিছু জান না সে সম্বন্ধে কথা বলতে এসো না।

নরেন্দ্রনাথও বললেন, জানি বই কি। এটি জানি যে, ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্য হারালে ইউরোপের যুদ্ধেও হারবে. এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ৫০ লক্ষ ডলার কি খুব বেশী হচ্ছে? অবশ্য ভারত থেকে ইংরাজ গেলেও তার স্থানে জার্মানী আসবে না। ভারত সার্বভৌমত্বই লাভ করবে।

নরেন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট উক্তিতে রাজদূত একদিকে যেমন চটলেন তেমনি বিস্মিতও কম হলেন না। বুঝলেন, ছোকরা সহজ নয়। তিনি তাঁর কূটনৈতিক ব্যবহারে ফিরে এলেন। নরেন্দ্রনাথকে শান্ত করতে চাইলেন। বললেন যে,

তিনি যেন অবিলম্বে বার্লিন রওনা হয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ স্বয়ং সম্রাট ও তাঁর জেনারেল ষ্টাফ-এর নিকট এই প্রস্তাব পেশ করেন।

বিদায়ের প্রাক্কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সময় জিজ্ঞসে করলেন, "সত্যিই কি তুমি মনে কর, বিদেশী সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়া তোমরা তোমাদের দেশ শাসন করতে পারবে?"

নরেন্দ্রনাথও প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করলেন, "আপনিও কি মনে করেন না যে, ভবিষ্যতে আমাদের সাহায্য ও পরামর্শ দান করার অধিকার অর্জন করার আগে আমাদের স্বাধীন হবার জন্যে সাহায্য ও পরামর্শ দান করতে হবে?"

রাজদূত নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে হেসে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ভারতে তোমার মত ছোকরা আর কত আছে?"

নরেন্দ্রনাথও প্রকৃত বিনীত ভাবেই বলেছিলেন যে, এক বিরাট বৈপ্লবিক বাহিনীর তিনি একজন সামান্য প্রতিনিধি মাত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমেরিকা অভিমুখে নরেন্দ্রনাথ

জার্মান রাজদূত এডমিরাল ফন হিনৎসে (পরে রাজতন্ত্রী জার্মান সাম্রাজ্যের শেষ বৈদেশিক মন্ত্রী হয়েছিলেন) কেবল যে রায়কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বিদায় সম্ভাষণই জানিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর আমেরিকা গমনের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। আমেরিকায় গিয়ে জার্মান রাজদূতের সঙ্গে দেখা করে বার্লিনে যাবার ব্যবস্থা করাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমেরিকা যাওয়া তখন সহজ ছিল না। তাছাড়া নরেন্দ্রনাথের কানুনমাফিক কোন পাশপোর্টও ছিল না। আমেরিকার ইমিগ্রেসন আইন অনুসারে এসিয়াবাসীদের পক্ষে সেখানে প্রবেশ সহজ সাধ্য নয়। ব্যবস্থা হ'ল, একটি আমেরিকান মাল জাহাজে লুকিয়ে থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে। ব্রিটিশ পুলিশ তখন নরেন্দ্রনাথকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। তা সত্ত্বেও তাকে সাংহাই পৌছতে হবে। পিকিং থেকে তিনি রেলে চড়ে হ্যাঙ্কাও হ'য়ে ইয়াংসি নদীতে এক ষ্টীমার যোগে নানকিং পৌছলেন। তারপর নানকিং ও পুকাও-এর মাঝে নদীর বুকেই এক জার্মান গানবোটে গিয়ে উঠলেন। সেই গান বোটে তখন গদর পার্টির ভগবান সিংও আমেরিকায় ফিরে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বর্মায় ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহে উৎসাহিত করতে তিনি এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় ফিরে চলেছেন, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনিও সেই মাল জাহাজে গুপ্ত যাত্রী হবেন।

পথ দেখিয়ে নিরাপদে জাহাজে তুলে দেবার জন্যে সাংহাই থেকে যতদিন না লোক আসছে ততদিন গানবোটে ক্যাপটেনের আতিথ্যেই কাটাতে হবে। কয়েকদিন অপেক্ষার পর এক রাত্রে তাঁদের সাংহাই-এ জাহাজে চড়িয়ে দেওয়া
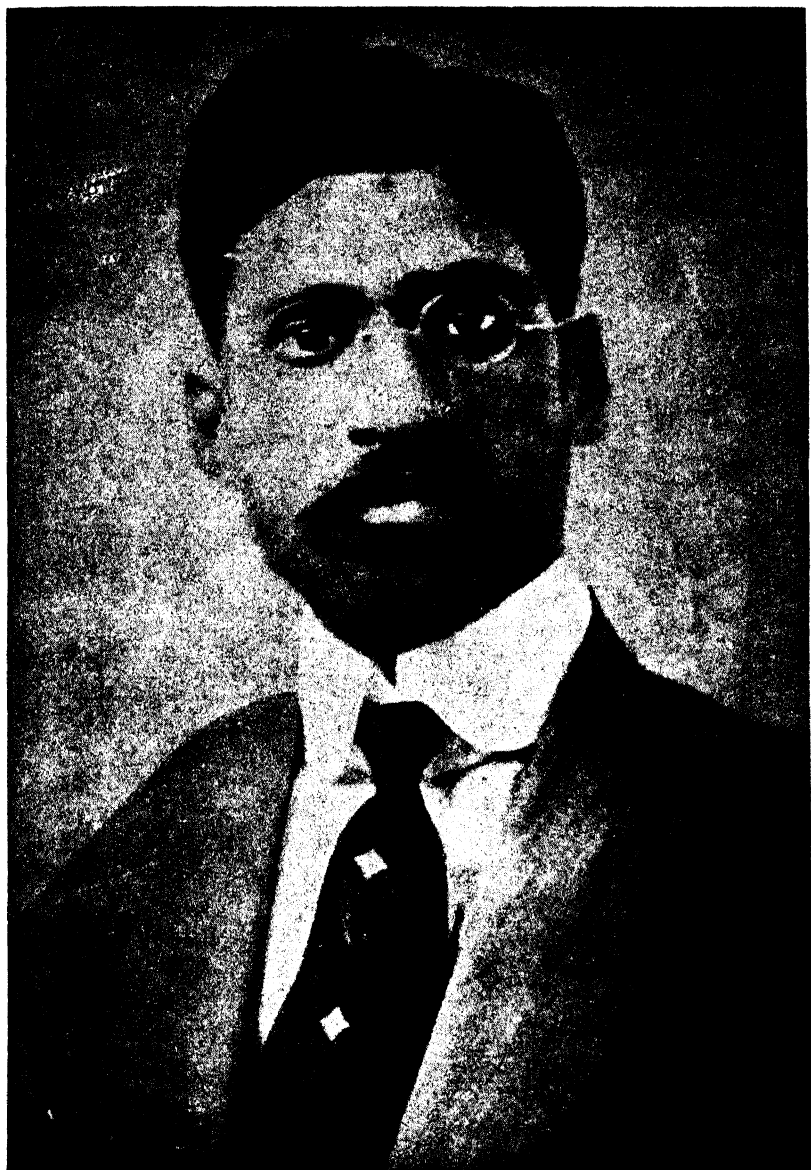
ফাদার মার্টিন রূপে মানবেন্দ্রনাথ—১৯১৫

হ'ল। জাহাজ ছাড়ার সময় ব্রিটিশ পুলিশ জাহাজ তল্লাসী করতে এলেন। জাহাজের পাটাতনের স্ক্রু খুলে পাটা সরিয়ে জাহাজের তলায় গুপ্ত কোটরে দুজনকে ভরে আবার স্ক্রু এঁটে দেওয়া হ'ল। কয়েক ঘণ্টা কোনমতে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় কাটাবার পর জাহাজ যখন সমুদ্রে পড়ল, তখন তাঁদের খুলে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু কিছুক্ষন পরে আবার তাঁদের পাটাতনের তলায় বন্ধ হ'তে হল। এক ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ তাদের জাহাজকে থামিয়েছে, কারণ তখনো টেরিটোরিয়েল ওয়াটার-এর সীমানা ছাড়িয়ে জাহাজখানা যেতে পারে নি। পুনরায় যথারীতি তল্লাসী হ'ল। তলা থেকে শুনতে পেলেন ঠিক তাদেরই মাথার উপর দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন বলছেন, "আমি জানি তারা এই জাহাজেই আছে....ড্যাম ইউ—গেল কোথায়?" আর ডেকের উপর বুটের ঠোক্কর মারছেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা খালাসীদের জেরার পরও যখন কিছু পেলেন না তখন কাপ্তেন সাহেব তার যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে চলে গেলেন; তাঁরাও অন্ধকূপ থেকে বাইরে এলেন। জাহাজ জাপানী এলাকায় প্রবেশ করল। মাল জাহাজকে সব বন্দরেই ভিড়তে হয়। কিন্তু জাপানীরা আমেরিকার জাহাজের সার্বভৌমিকতাকে নিজেদের এলাকাতেও ঘাঁটাতে সাহস করে না। কোব বন্দরে জাহাজ এসে ভিড়ল।

জাহাজ কূলে ভেড়া মাত্র নরেন্দ্রনাথ তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় মত পরিবর্তন করলেন। সে কথা ভগবান সিং পর্যন্ত জানল না। নাঃ, এ ভাবে যাওয়া চলবে না, অন্য কারণেও তিনি এই মন্থর গতি জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। তিনি অতি সন্তর্পণে কোব-এ অবতরণ করলেন এবং ট্রেন ধরে সোজা টোকিওতে গিয়ে উঠলেন। পিকিং থেকে আসার সময় জার্মান রাজদূত তাঁকে একখানা ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়ান পাশপোর্ট দিয়েছিলেন। পণ্ডিচেরির ফরাসী সরকার পণ্ডিচেরি অধিবাসী এক সি মার্টিনকে প্যারিসে গিয়ে ধর্মশাস্ত্র পড়ার জন্যে এই পাশপোর্ট দিয়েছিল। তিনি সেই পাশপোর্টের সদব্যবহার করবেন মনস্থ করলেন। কিন্তু এই পাশপোর্ট নিয়ে জাহাজে চড়তে গেলে তাতে আমেরিকান ভিসা থাকা প্রয়োজন। তিনি এক সোনার ক্রশ কিনে কোটের ল্যাপেল-এ ঝুলিয়ে পাদরি সাহেবের মত গম্ভীর মুখে আমেরিকান কনস্যুলেটে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে বললেন, প্যারিসে থিওলজির আগামী সেসনেই ভর্তি হ'তে চাই। তার আর বেশী দেরী নাই।

সেই জন্যে অবিলম্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে আটলান্টিক পার হ'য়ে প্যারিস যাবার ভিসা চাই।

এক আমেরিকান তরুণী মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনলেন, খানিকটা যেন মোহিতও হ'লেন, সব কথা ধ্রুব সত্য জ্ঞানে বিশ্বাসও করলেন এবং পাশপোর্টটি নিয়ে অফিসের মধ্যে গেলেন, কিছু পরে ফিরে এলেন পাশপোর্টের উপর যথারীতি সেই সীলমোহর মুদ্রিত করে। এক লহমায় কাজ শেষ হ'য়ে গেল। যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এসে সোজা এক বইয়ের দোকানে গিয়ে মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই এক বাইবেল কিনলেন। সুরু হয়ে গেল ফাদার মার্টিনের জীবন কাহিনী।

আর দেরী নয়। দু'দিন পরে যে জাপানী জাহাজ আমেরিকা যাবে তাতেই এক প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে ফেললেন। তারপর যে কাণ্ড করলেন তা নরেন্দ্রনাথের পক্ষেও দুঃসাহসিক কাজ বলে মনে হ'ল। তিনি রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করতে মনস্থ করলেন। দেখাও করলেন মধ্য রাত্রির গোপন অন্ধকারে। তারপর সোজা ইয়োকো-হামাতে গিয়ে জাহাজে চড়লেন। জাহাজও অবিলম্বে ছেড়ে দিল!

এতদিন পর্যন্ত এ অঞ্চলে কেবল লুকিয়ে লুকিয়েই সমুদ্র ভ্রমণ করতে হয়েছে। ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা ফিলিপাইন, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করতে কোথাও প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ভ্রমণ করাও যেমন সম্ভব হয় নি, তেমনি সমুদ্র ভ্রমণের যেটুকু উপভোগ্য তাও ভাগ্যে জোটে নি। সে আনন্দ মিলে ছিল সেই প্রথমবার, যখন মাদ্রাজ বন্দর থেকে পেনাঙ্গ গিয়েছিলেন, আর ফিরেছিলেন। তখন পাশপোর্ট লাগত না তাই লুকোবার প্রশ্নও ছিল না।* এবারে একেবারে সর্বাপেক্ষা বড় জাপানী লাইনারের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী রূপে প্রকাশ্যে সমুদ্র যাত্রা —নতুন অভিজ্ঞতা বই কি!

জাহাজের সব যাত্রীই ছিল ব্রিটিশ সৈন্য, অফিসার, রবার ও চা-বাগানের মালিক। তখনকার দিনে ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার খুব ভদ্রজনোচিত ছিল না। তাই নরেন্দ্রনাথ যতদিন জাহাজে ছিলেন খুব আনন্দে ছিলেন না। যদিও তখনো তিনি ব্রহ্মচারীর মত নিরামিশ আহারই গ্রহণ করতেন তবু তিনি পোষাকে পরিচ্ছদে আদব কায়দায় টেব্‌ল ম্যানার্স পুরোপুরিই আয়ত্ত করেছিলেন।

*M. N. Roy's Memoirs—Allied Publishers—

তিনি অপরের নৈকট্য এড়াবার জন্যে একটি কেবিনে থাকতেন। সব সময় কেবিনে থাকলে পাছে সন্দেহ জাগে সেইজন্যে তিনি মাঝে মাঝে ডেকে গিয়ে বসতেন এবং অধিকাংশ সময় বাইবেল মুখস্থ করে কাটাতেন।

তাঁর স্বাস্থ্য এমনই ছিল যে, জাহাজের অনেকে যখন সামুদ্রিক পীড়ায় শয্যাগত হ'ত তখনো তিনি ডেকে বসে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বসে বসে বাইবেল পড়তেন। কতবার কত সমুদ্র ভ্রমণ করেছেন, কখনই তাঁকে এ দুর্বলতায় লজ্জা পেতে হয় নি। একবার ম্যানিলা থেকে নাগাসাকি যাবার সময় জাহাজ দু'দিন ধরে এমনই দুলেছিল যে, জাহাজের সকল যাত্রীই পীড়িত হ'য়ে পড়েছিল। জাহাজের মধ্যে তিনিই কেবল সুস্থ ছিলেন।

গত দেড় বছর ধরে মালয়, ইন্দোনেসিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাপান কোরিয়া ও চীনদেশে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ১৯১৬ সালের গ্রীষ্মে নরেন্দ্রনাথ ফাদার মার্টিন নাম নিয়ে স্যানফ্রান্সিকোতে অবতরণ করলেন।

স্যানফ্রান্সিসকোতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন যে, আমেরিকাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে জনমত ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। পরদিন প্রভাতের সংবাদপত্রে দেখলেন যে, Mysterious Alien Reaches America Famous Brahmin Revolutionary or dangerous German Spy—রহস্যময় শত্রুর আমেরিকায় অবতরণ—"বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বিপ্লবী কিংবা বিপজ্জনক জার্মান গুপ্তচর?"

তিনি তখন খাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, এবং নিকটেই ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি সহর পালো আল্টোতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে নরেন্দ্রনাথের সহকর্মী বিখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জির ভাই ধনগোপাল মুখার্জি থাকতেন। তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'লেন, ধনগোপাল খুব কম বয়সেই সেখানে ইংরাজিতে কবিতা ও গল্প লিখে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং পুরোনো নামটি বদলে নতুন মানুষ সাজতে বললেন। সেইদিন সন্ধ্যাতেই ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রাঙ্গনে মানবেন্দ্রনাথ রায় ওরফে M. N. Roy-এর জন্ম হ'ল।

নরেন্দ্রনাথের পরিবর্তে মানবেন্দ্রনাথ নাম গ্রহণে এটিই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে, নিজ নাম নরেন্দ্রনাথের অর্থ সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন, যার অর্থ হ'ল

নরগণের মধ্যে যিনি উত্তম; তাঁর সাধনাই ছিল নিজ নামকে সার্থক করে তোলা; তারই জন্যে তাঁর বিকশিত ব্যক্তিত্বের সাধনা। সেই সঙ্গে এটিও প্রমাণিত হয় যে, যদিও তখন তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন তথাপি জাতীয়তাবাদের সমষ্টিবাদ অপেক্ষা ব্যক্তিত্ববাদ সম্বন্ধেই তাঁর যথেষ্ট সচেতনতা ছিল এবং তাঁর কাজকর্মে চলায় বলায় প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিই তাঁর একান্ত আস্থা ছিল। সুতরাং ব্যাকরণ শুদ্ধ খাঁটি জাতীয়তাবাদী বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোন দিনই ছিলেন না।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রায়ের নবজীবনের সুত্রপাত

এই ষ্ট্যানফোর্ড—এখানেই মানবেন্দ্রনাথ এভ্‌লিন ট্রেণ্ট্ নাম্নী এক স্নাতকোত্তর মহিলার সঙ্গে পরিচিত হ'ন। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং পরে উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। দুই মাস তিনি এই অঞ্চলে ছিলেন। এই দুই মাসে তিনি অনেকের সঙ্গেই পরিচিত হ'ন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত ব্যক্তি। তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা Dr. David Jordan ছিলেন অন্যতম। এখান থেকে তিনি শ্রীমতী এভ্‌লিন সহ নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য অস্ত্রের সন্ধানে জার্মানী যাত্রা।

নিউইয়র্কে এসে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা একদিকে যেমন মর্মান্তিক অপরদিকে তেমনি এক নতুন জগতের সন্ধানের সহায়ক।

সে সময় অনেক ভারতীয় ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সমর্থনের আশায় আমেরিকায় গিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন আমেরিকার জনগণের কাছে সমর্থন লাভ করেছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকলেও ক্রমেই মিত্র শক্তির পক্ষে জনমত প্রবল হ'য়ে উঠতে থাকে। তখন ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার ও জার্মানীর ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার বাহ্যতঃ এক রকমই হ'য়ে ওঠে এবং আমেরিকার জনগণের পক্ষে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হ'য়ে ওঠে। ফলে তাঁদের কাছ থেকে সমর্থন ত আর আসেই না বরং বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা তখন জার্মান স্পাইরূপে গণ্য হ'তে থাকে। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদিদের ব্যাপক ভাবে গ্রেপ্তার চলতে থাকে।

১৯১৬ সালের হেমন্তে যখন রায় নিউইয়র্কে এলেন তখন লালা লাজপত রায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে আমেরিকার জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক বছর পূর্বে সেখানে এসেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ আর তাঁকে ভারতে ফেরার অনুমতি দিচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে তখন তাঁকে আমেরিকাতে থেকে যেতে হয়। ক্রমে তিনি দেখেন, প্রথম যে সব মানুষের নিকট থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন এখন আর তা পাচ্ছেন না, তাঁকেও জার্মানীর সমর্থক রূপে গণ্য করা হচ্ছে। ফলে তাঁর মন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আরো বিষিয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে রায়ের দেখা হয়।

লাজপত রায় তখন তাঁর পূর্ব পরিচিত লিবারেল সমাজ থেকে এক ঘরে হয়েছেন, রায়ও নির্বান্ধব। এই অবস্থায় উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এই সময়কার কথা লাজপত রায় তাঁর ডায়রিতে লিখে রেখে গেছেন। তা এখন নিউ দিল্লীতে National Archives-এ (জাতীয় মহাফেজখানা) রক্ষিত আছে। তাতে "বাঙ্গালী বিপ্লবী" রায় সম্বন্ধে তিনি তাঁর ধারণা লিখে রেখে গেছেন। নিম্নে তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি (১৯১৬ সালের শেষের দিকে লেখা):

"ইতিমধ্যে এম, এন, রায় এসে পৌছলেন। জানলাম যে তিনি একজন পলাতক বিপ্লবী, আমেরিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহটা আমার খুবই বেড়ে গেল। যখন শুনলাম যে তিনি যখন ক্যালি-ফোর্নিয়ায় ছিলেন তখন একটি আমেরিকান মেয়েকে ভালবেসেছিলেন এবং মেয়েটিও তার ভালবাসায় সাড়া দিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল; কিন্তু মেয়েটির আত্মীয়দের এ বিবাহে মত ছিল না। মেয়েটি তখন আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং রায়ের অনুগামিনী হয়ে রায়ের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে নেয়। মেয়েটি ছিল লেল্যাণ্ড ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রী। আর তার এক ভাই নিউ ইয়র্কের এক সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত। এই প্রেমে পড়ার অপরাধে নিউইয়র্কে যে সব হিন্দু ছেলে ছিল তারা, এবং সেই সঙ্গে চক্রবর্তীও এম, এন, রায়কে দেশদ্রোহী, বিশ্বাস ঘাতক বলল, অনেকে তাঁকে প্রকাশ্যেই গালিগালাজ দিতে সুরু করল। মেয়েটি একদিন তার প্রিয়তমের খোঁজ নেবার জন্যে চক্রবর্তীর বাসায় গেলে চক্রবর্তী মেয়েটিকে অপমান করল।

এই সব সংবাদ যে মুহূর্তে আমার কানে এল, রায় ও মেয়েটির প্রতি আমি আমার সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করলাম। রায় অবশ্য তাদের বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে দেখা করে নি। দেখা হওয়া মাত্র আমি তাদের আমার ঘরে ডেকে নিয়েছিলাম, এবং আমরা আমাদের ভাব বিনিময় সুরু করেছিলাম। রায় ছিল যাকে বলে একেবারেই কপর্দক শূন্য। আমি তাকে মোট ৩৫০ ডলার দিয়েছিলাম, এর মধ্যে শ্রীমতী রায় আমার কিছু কাজ করে দিয়ে ৫০ ডলার শোধ দিয়েছিল। এর পরই রায় একটি চাকরী যোগাড় করে নেয়।" (৪০-৪১ পৃঃ)

"আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বড়ই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। প্রদেশওয়ারি ভাবে আমি আমার এই অভিজ্ঞতা লিখছি। যে সব বাঙ্গালী বিপ্লবীদের আমি দেখলাম তাদের মধ্যে অধিকাংশই আচার ব্যবহারে ও বৈপ্লবিক কাজে-কর্মে, অর্থ সংগ্রহে ও ব্যয়ে একান্ত ভাবেই নীতিজ্ঞান বর্জিত। তাদের দেশভক্তি প্রায়ই লাভ-লোকসান খতিয়ে খতিয়ে চলে। তারা বিলাসব্যসনে প্রচুর টাকা ব্যয় করে। অধিকাংশই ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করতেই বেশী ব্যগ্র।....বাঙ্গালী বিপ্লবীদের মধ্যে একটিমাত্র লোক যাকে আমি সত্যিকারের শ্রদ্ধা করি তিনি হলেন, এম, এন, রায়!....আমি অবশ্য তাদের সম্বন্ধেই এত কথা বললাম আমেরিকাতে যাদের আমি দেখেছি।" (৪৪ পৃঃ) *

** Extracts from the Diary of Lala Lajpat Rai, 1914-17 kept during his visits to the U. S. A. and Japan, written by him in New York now preserved in the National Archives—New Delhi.*

Late 1916 :

"In the meantime came M. N. Roy. He was represented to me as a revolutionary who had fled to take refuge in the U. S. But what interested me most was that during his stay in California he had fallen in love with an American girl who reciprocated his sentiment and asked to marry him. Her people however would not listen to the proposal and the girl had consequently left their protection to follow Roy and share his fate. The girl happened to be a graduate of Leland Stanford University and had a brother in N. Y. employed in some business firm. The Hindu boys in N. Y. including Chakravarty was disposed to consider M. N. Roy as a traitor to the cause in so far as he had fallen in love with the girl and consequently impaired his useful-

আমেরিকার লিবারেলদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে লালা লাজপাত রায় আমেরিকার "র‍্যাডিক্যাল" মতাবলম্বীদের সংস্পর্শে এসে পড়লেন। আমেরিকায় তখন "র‍্যাডিক্যাল" বলতে সোস্যালিষ্ট, এনার্কিষ্ট, সিণ্ডিক্যালিষ্ট প্রভৃতি সকলকেই বোঝাত। তারা ব্রিটিশ বা জার্মান বিরোধী ছিল না। তারা ছিল যুদ্ধ বিরোধী, তবে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী থাকায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের সমর্থনও ছিল। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই মার্কসপন্থী। লালাজি ও রায় দু'জনেই ছিলেন জাতীয় স্বাধীনতাকামী। মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দ্দেশ্যবাদ তাঁদের কাছে অতিমাত্রায় নতুন। সেই জন্যে এটি একটি বিজাতীয় ও পাশ্চাত্য অস্পৃশ্য মতবাদ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। অথচ আমেরিকার মত নির্বান্ধব দেশে এঁরাই ছিল বন্ধু, দরদী, সহযোগী। এঁদের মতটাও হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—ভেবে দেখতে হয়। লালাজির পয়সা ছিল। তিনি মার্কসীয় ও অন্যান্য সোস্যালিষ্ট গ্রন্থ কিনে আনলেন। রায় কপর্দক শূন্য। তিনি নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে মার্কসের গ্রন্থ পড়া সুরু করলেন। রায় এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন।

এক দিনের ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করল, যা তিনি উত্তর জীবনেও ভুলতে পারেন নি।

---

ness to the country. Some of them denounced him and Chakravarty insulted the girl when she one day went to his place to make enquiries about her lover. The minute the story was broken to me I expressed my sympathy with Roy and his girl. Roy however did not actually meet me until they had been married and the marriage made formal. I opened my rooms to them and we began to exchange views. Roy was in dire need and I gave him in all 350 dollars out of which 50 were earned by Mrs. Roy in doing some work for me. Roy soon after received a position." (pp 40-41)

"My experience of the Indian revolutionaries in the U. S., has been very sad and disappointing. I would state my impressions by provinces. Most of the Bengali revolutionaries I found absolutely unprincipled both in the conduct of their conspiracy and in the obtaining and spending of funds. Their patriotism was often tainted by considera ion of gain and profit. They spent a lot of money in luxuries (?). Most of them were conscious to save as much as they could for future use . ...the only one of the Bengali revolutionaries for whom I have had genuine respect is 'M. N. Roy'... ..I am only speaking of those I have come across in U S. (pp. 44).

একদিন লালাজি সোস্যালিষ্টদের সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ভারতের মত এক বিশাল দেশ, যে দেশ বহু পুরাতন শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী, সে দেশ যদি বিদেশী শোষকের পদানত থাকে তবে সেই পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। স্বদেশী ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরোধের ফয়শালা পরে করলেও চলবে।

লালাজি উঁচু দরের বাগ্মী ছিলেন। ভারতের দারিদ্র্য, ইংরাজের শোষণ এমন জলন্ত ভাষায় বর্ণনা দিচ্ছিলেন যে, সকলেই অভিভূত হয়েছিল। কিন্তু তারই মধ্যে একজন উঠে বললেন যে, ভারতের স্বাধীনতার দাবী অতি ন্যায্য দাবী, কিন্তু জানতে ইচ্ছা হয়, ভারতের জাতীয়তাবাদীরা কী উপায়ে ভারতের জনগণের দারিদ্র্য দূর করতে চায়?

লালাজি রুষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আগে আমাদের স্বাধীন হ'তে দিন।"

প্রশ্ন কর্তা পুনরায় বললেন, "বিদেশী ধনীর শোষণ আর দেশীয় ধনীর শোষণে কিছু তফাৎ আছে কি?"

লালাজি আরো রুষ্ট কণ্ঠে বললেন "আছে বই কি! ভাই-এর লাথি আর বিদেশীর লাথিতে অনেক তফাৎ।"

লালাজির এই জবাবে সেদিন সেখানকার সোস্যালিষ্ট শ্রোতারা গম্ভীর হয়ে ফিরে গিয়েছিল। রায়ও সেদিন এদের প্রশ্ন শুনে লালাজির মতই রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে সে মুহূর্তেই এক বিরাট প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, সত্যই ত, কোন্ উপায়ে ভারতের জনগণের দারিদ্র্য দূর করা যাবে?

সেই দিন থেকেই তিনি নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক হ'লেন এবং মার্কসবাদের মধ্যে এক নতুন আলো দেখতে পেলেন। সোস্যালিজিমের অর্থনৈতিক দিকটি গ্রহণ করতে তাঁর দেরী হ'ল না। দেরী হয়েছিল বস্তু-তান্ত্রিক দর্শন Materialism গ্রহণ করতে। তাও যে তিনি পুরোপুরি কোন দিনই গ্রহণ করতে পারেন নি তার প্রমাণ পাই, তার শেষ জীবনে Materialism এর পরিবর্তে Physical Realism দর্শনের প্রবর্তনে।

কিছুদিন পূর্ব থেকেই তিনি এক পুস্তিকা রচনা করছিলেন, বিষয়টি ছিল, "উপনিবেশই যখন যুদ্ধের কারণ তখন ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের স্বাধীনতা লাভ, বিশেষতঃ ভারতের মত বিরাট উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়।" কিন্তু এই সভার পর তিনি যে পড়াশোনা আরম্ভ

করলেন তাতে বুঝলেন আন্তর্জাতিক বিবাদ বিসংবাদের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে গলদ আছে। তিনি পুনরায় রচনাটি সংশোধন করলেন। ছাপার জন্যে তখনকার দিনের এক বিখ্যাত সোশ্যালিষ্ট সাংবাদিককে দিলেন। ক'দিন পরে সোশ্যালিষ্টদের এক আড্ডায় তিনি রায়কে অভিনন্দন জানালেন, এবং বললেন যে, সোশ্যালিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণটি এমন সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া এর আগে আর চোখে পড়ে নি। তিনি সেইদিন রায়কে তাঁদের সোশ্যালিষ্ট ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে সানন্দে গ্রহণ করলেন। সে সংঘে তিনিই প্রথম ভারতীয়।

এর পরেই আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের ধর-পাকড় সুরু হয়ে যায়। রায়ও ধরা পড়েন।

রায় যখন জাপানে তখন গুপ্ত নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি নিজেকে বার্লিনের ইণ্ডিয়ান রেভোলিউসনারি কমিটির প্রতিনিধি রূপে পরিচিত করেন। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে ইনিই হেরম্বলাল গুপ্ত নামে পরিচিত আছেন। তিনি আমেরিকা থেকে এসে রাসবিহারীর ওখানেই গোপনে বাস করছিলেন। কিন্তু জাপানী পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারেন নি। জাপানী পুলিশ তাকে জাপান ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। রায়কে তিনি বলেছিলেন যে, তার সাহায্য ছাড়া আমেরিকায় জার্মান রাজদূত রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না, বার্লিন যেতে সাহায্যও দেবে না। রায় তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর দাবী যদি সত্য হয়, তা হ'লে তাঁর উচিত তাকে সাহায্য করা। গুপ্ত তা অস্বীকার তো করেনই, উপরন্তু তিনি রায়ের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী জানতে চান এবং নিজেই যা করণীয় তা করবেন বলেন। রায় গুপ্তের সঙ্গেই আমেরিকা যেতে চান। গুপ্তর সে ইচ্ছা ছিল না এবং রায়ের আমেরিকা পৌছানোর পূর্বেই আমেরিকা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, এবং বলেন যে, যদি রায়ই সেখানে আগে পৌছায় তবে সে যেন অন্য কারুর সঙ্গে দেখা না করে তার জন্যে অপেক্ষা করে। রায় নিউইয়র্কে পৌছেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

গুপ্তের বয়স ছিল ৪০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। তিনি তখন কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে ছাত্র হিসাবে বাস করছেন। একদিন তিনি বললেন রাজনীতিতে তার আর রুচি নাই, বার্লিন কমিটির ব্যবহারে তিনি বিরক্ত, তাকে তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধি পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তিনি দলাদলি ও ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখে বিরক্ত হয়েই রাজনীতি ত্যাগ করেছেন। তিনি

আরও বললেন ডাঃ চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোক এখন বার্লিন কমিটির প্রতিনিধি হয়েছেন। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে হেরম্বলাল গুপ্তের পরিবর্তে ডাঃ চক্রবর্তীকে নিয়োগের হুকুমনামার নকলও দেওয়া আছে।

নিউইয়র্কে এসে রায় কিছুদিন বসন্তকুমার রায় নামে এক কবি যশোপ্রার্থী ভদ্রলোকের নিকট ওঠেন। তাঁর নিকট থেকেই তিনি অনেক কথা জানতে পারেন এবং সাহায্য লাভ করেন। রায় তখন নিঃস্ব। জামা-কাপড়েরও অভাব। এই বসন্ত কুমারের কথাতেই তিনি লালা লাজপত রায়ের নিকট যান এবং বিশেষভাবে উপকৃত হন। গুপ্তের কথাও বসন্ত কুমারের নিকট শোনেন এবং ডাঃ চক্রবর্তী যে এখন বার্লিন কমিটির এজেন্ট তাও জানেন।

রায় ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলেন। ডাঃ চক্রবর্তী এক জার্মান ডাক্তারের বাড়ীর এক তলায় বাস করতেন। অদ্ভুত তাঁর চাল চলন। কথা বলেন আর টেকো মাথায় গাদা গাদা ভেসলিন ঘসেন। তাঁকে দেখেই রায়ের বুঝতে বাকি রইল না যে, এই মানুষটির মধ্যে বৈপ্লবিক রাজনীতির নামগন্ধও নাই। ভেবে অবাক হলেন, কী করে বার্লিন কমিটি এই লোককে তাদের প্রতিনিধি করে। কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝলেন যে, বার্লিন কমিটিকে এবং জার্মান সরকারকে ধাপ্পা দিয়ে একদল ধূর্ত লোক রোজগার করছে। তিনি তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু না বলে কেবল তাঁকে বার্লিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। চক্রবর্তী তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন।

কিছুদিন অপেক্ষা করেও যখন রায় দেখলেন যে তিনি কিছুই করলেন না, তখন তিনি বার্লিন যাবার আশা একপ্রকার পরিত্যাগই করলেন। ইতিমধ্যে নিউইয়র্কের সোস্যালিষ্টদের সাহচর্যে এসে ও মার্কসের গ্রন্থ পড়ে রায়ের জীবনে নতুন এক ভাবজগতের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হ'তে থাকল। বিপ্লব ঘটাবার নতুন আদর্শ নতুন কায়দা ভবিষ্যতের নতুন চিত্র জার্মানী গিয়ে অস্ত্র আমদানী করার অনিশ্চিত পথে চলার উদগ্র আকাঙ্খাকে ক্রমেই স্তিমিত করে আনতে লাগল—কেবল অম্লান হয়ে ফুটে রইল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় দেশের সঙ্গীদের দিন গোনার ছবিটি।

সে সময় ভারত থেকে অতি সামান্য খবরই আমেরিকায় এসে পৌছত। কিছু কিছু খবরের কাগজ পৌছলেও তা খুব বিলম্বে আসত। আমেরিকার সংবাদ পত্রে ভারতের কথা প্রায় থাকতই না। চিঠি পত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেন্সর করা হ'ত। যে টুকু সংবাদ তারই মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল তাতে রায় জেনেছিলেন যে, ১৯১৫ সালে তাঁর ভারত ত্যাগের পর বিপ্লবীদের প্রায় সবাই ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ে গিয়েছে, কতক মরেছে, কতককে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, আর কতককে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে রাজবন্দী করে রাখা হয়েছে।

যারা ধরা পড়ে নি তারা আত্মগোপন করেছে। এই বিদেশ থেকে তাদের ঠিকানা খুঁজে বের করা অসম্ভব। কথা ছিল, একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল উত্তর পূর্ব সীমান্তে গিয়ে সীমান্ত পার থেকে অস্ত্র আমদানী করে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করবে এবং সেই সময়কার অবর উপজাতিদের বিদ্রোহকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। সে ব্যবস্থার কতদূর যে কি হ'ল তার কোন সংবাদই রায় জানেন না। অস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা যদিই বা করা যায় তা হ'লে উত্তর পূর্ব সীমান্তের ঠিক কোন্ ঠিকানায় পৌছলে তা অবিলম্বে দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে সেটাও ত জানা চাই। ভারতের উত্তর পূর্ব সীমানা ত আর সামান্য নয়। এই অবস্থায় এই সব খবর দেওয়া নেওয়ার পথ একেবারে বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার ফলে বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দেবার স্বপ্ন কার্যকরী করে তোলার সম্ভাবনা ক্রমেই বিলীন হয়ে আসতে লাগল আর সেই সঙ্গে মনে জেগে উঠতে থাকল আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করতে না পারার জন্যে আত্মগ্লানি। এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে রায়ের দিন কাটতে লাগল—একদিকে বার্লিন কমিটির ও জার্মানদের হতাশাব্যঞ্জক আচার ব্যবহার ও পুরোনো দলের প্রতি অনুগতোর ভাবাকুলতা, আর একদিকে নতুন আদর্শের প্রতি বিচার বুদ্ধির আকর্ষণ। এই সময়কার মনের অবস্থা রায় তাঁর স্মৃতিকথায় নিম্নলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

> আমি তখন এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের মানসিক যন্ত্রনায় কষ্ট পেতে থাকলাম। একদিকে পুরোনো বন্ধুদের প্রতি আনুগত্যের ভাবাবেগাকুলতা, আর একদিকে নতুন আদর্শের প্রতি আমার বিচার বুদ্ধি প্রণোদিত প্রবল আকর্ষণ। আমার জীবনে যে একটি মাত্র মানুষকে একপ্রকার অন্ধের মতন অনুসরণ করতাম সেই মানুষটির আদেশ আমি ভুলতে পারলাম না। দ্বিতীয় বার ভারত ছাড়ার আগে আমি নিজেই যতীনদাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর শেষ অজ্ঞাতবাসে, সেখানেই তিনি সম্মুখ যুদ্ধে বীরের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। আমি সেদিন একজন রোমান্টিক তরুণের মত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বলেছিলাম—"অস্ত্র না নিয়ে আর ফিরব না।" উত্তরে দাদা স্নেহমাখা কণ্ঠেই বলেছিলেন, "অস্ত্র পাও আর না পাও তাড়াতাড়ি ফিরে এস।" এত আমার কাছে শুভেচ্ছা মাত্র ছিল না—এ ছিল আমার কাছে আদেশ। তিনি আমাদের দাদা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের সর্বাধিনায়কও ছিলেন।
>
> যতীনদার মৃত্যু প্রত্যাবর্তনের-আদেশ পালনের নৈতিক দায়িত্ব থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছিল। ১৯১৫ সালের হেমন্তে যখন আমি ম্যানিলায় তখন আমি এই মর্মান্তিক সংবাদ পাই। সে সংবাদে আমার আবেগ স্তরের

প্রতিক্রিয়ায় আমি বিহ্বল হয়েছিলাম। ক্রোধে জ্বলে উঠে সংকল্প করেছিলাম, যতীনদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে। তারপর একবছর কেটে গিয়েছিল। এর মধ্যে আমি বুঝেছিলাম, আমি যে যতীন দাকে এতখানি পছন্দ করতাম তার কারণ তার মধ্যে আমি ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ দেখেছিলাম, এবং সম্ভবতঃ সে কথা তিনি নিজেও জানতেন না। এই ধারণার অনুসিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, যতীনদার মৃত্যুর যোগ্য প্রতিশোধ নেওয়া হ'বে যদি আমি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার চেষ্টা করতে পারি যেখানে সকল মানুষের পক্ষে চরম মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে আর কোন বাধা থাকবে না। আমি যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার আত্মগ্লানির হাত এড়িয়ে পুরাতন পথ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, তার কারণ, এই নতুন পথ কেবল যে আমার ভাবাবেগকেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করেছিল তাই নয়—আমার যুক্তি-বুদ্ধিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তা যদি না হ'ত তবে পুরাতন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা হতাশা ও বিরক্তি এসে আমার ভবিষ্যতের অতি দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর জীবন ত্যাগ করতে বাধ্য করত।*

* 'I was tormented by a psychological conflict between an emotion (loyalty to old comrades) and an intelligent choice of a new ideal. I could not forget the injunction of the only man I ever obeyed almost blindly. Before leaving India for the second time, I personally escorted Jatinda to the hiding place where he later on fought and died. In reply to the thoughtless pledge of a romantic youth—"I will not again return without arms"—the affection of the older man appealed —"come back soon with or without arms". The appeal was an order for me. He was our dada but the commander-in-chief also.

Jatinda's heroic death had absolved me from the moral obligation to obey his order. Already in the autumn of 1915, while passing through Manila, I had received the shocking news. But then, my reaction was purely emotional. Jatinda's death must be avenged, Only a year had passed since then. But in the mean time I had come to realise that I admired Jatinda because he personified, perhaps without himself knowing it, the best of mankind. The corrolary to that realisation was that Jatindas' death would be avenged if I worked for the ideal of establishing a social order in which the best in man could be manifest. In other words I could turn my back on the old mission without the guilty conscience of betraying a trust because a new one appealed more strongly not only to my emotion but also to my intelligence. Otherwise disappointment and disgust might have persuaded me to end a life of adventures with the end of a mission.—M. N. Roy's Memoirs pp. 35-36

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রেপ্তার ও মেক্সিকো পলায়ন

রায় ধরা পড়লেন। একদিন কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এক সভায় লালা লাজপত বক্তৃতা সেরে যখন ফিরছিলেন তখন সঙ্গে ছিলেন রায়। সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। অন্ধকার থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে জন ছয়েক বণ্ডা মার্কিন পুলিশ গোটা ছয় পিস্তল ধরে তাঁকে ঘিরে ফেলল। বোধ হয় ভেবেছিল, হিন্দু বিপ্লবী এক চলন্ত অস্ত্রাগার। গাড়ীতে ভরে তাঁকে নিয়ে চলল নিউইয়র্কের এটর্নি জেনারেলের কাছে অর্থাৎ পুলিশের বড় সাহেবের কাছে। স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চলল। কিন্তু টেগার্ট-ডেনহামের পরীক্ষায় যে বহুবার উত্তীর্ণ হয়েছে তার কাছে এ অভিজ্ঞতা খুবই তুচ্ছ। ভয় দেখাবার জন্যে ভূগর্ভের হাজতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে আরো কয়েক-জনের সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তীও ছিলেন। সঙ্গের পুলিশ পুঙ্গব বললেন, চক্রবর্তী মশায় সবই উদ্গীরণ করে দিয়েছেন, আর লুকোবার চেষ্টা, ন্যাকা সাজবার চেষ্টা বৃথা। ভূগর্ভের সেই অন্ধকার কবরখানায় যেখানে মানুষকে দিনের পর দিন জীবন্ত কবর দিয়ে রাখা হয়, তার থেকে বের করে রায়কে পুনরায় এটর্ণি সাহেবের কাছে নিয়ে আসা হ'ল। পুনবায় সুরু হ'ল স্বীকারোক্তি আদায়ের পাকাপোক্ত পুলিশি প্রচেষ্টা।

ঠিক উপযুক্ত সময়ে রায় তাঁর বহু পরীক্ষিত ব্যক্তিত্বের অমোঘ সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করে বললেন, "আমাকে ভয় দেখান বৃথা। তোমার কয়েদখানা দেখে এলাম, এর আগে আমি আরো অনেক জেল দেখেছি। এটার চেয়ে সেগুলো এমন কিছু ভাল নয়। তবে আমি তোমার জেলে পচতে চাই না। আমার একটা মিশন আছে—সেটা সম্পন্ন করতে হবে। তোমার দেশের আমি কোন

ক্ষতিই করি নি। আমি কেবল আমার দেশেরই সেবা করতে চাই। সে সম্বন্ধে তোমার কি বলার আছে ?"

একটি মানুষের মতন মানুষের কাছ থেকে এভাবে স্পষ্ট কথাতেই হোক আর যে কারনেই হোক এটর্ণি জেনারেলের ভাবান্তর ঘটল। মোলায়েম সুরেই বললেন, "তুমি আমাদের ইমিগ্রেসন আইন লঙ্ঘন করেছ।" রায়ও তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "শুধুমাত্র এইজন্যে এত কাণ্ড-কারখানা? এ যে মশা মারতে কামান দাগা! তা ছাড়া আমি খুব শীঘ্রই তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাব।"

এটর্ণি জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন এবং রায়কে বিস্মিত করে তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, "আমি তোমায় আজ ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি কাল সকাল ১১টার সময় টাউন হলে গ্র্যাণ্ড জুরির আদালতে হাজির থেকো। আমার মনে হচ্ছে তুমি পালাবে না, গুড্ মর্নিং"। তারপর পুলিশদের আদেশ দিলেন, "ভদ্রলোককে বাইরে নিয়ে একটি ট্যাক্সিতে তুলে দাও, ইনি বাড়ী যাবেন।"

রায় সেই নরক দর্শন করে বাইরের ফাঁকা বাতাসে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প স্থির করে ফেললেন। তাকে আমেরিকা ত্যাগ করতে হবে। সেই রাত্রি থেকেই সুরু হ'ল উদ্যোগ আয়োজন। তখন ভোর হয়ে এসেছে। পথে খবরের কাগজ বিক্রীর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে খান কতক কিনে দেখলেন যে, বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা দিয়ে কোনটিতে ছাপা "Hindu-German Conspiracy Unearthed—Enemy Agents in Custody"—হিন্দু জার্মান ষড়যন্ত্র—শত্রুচর গ্রেপ্তার" আর কোনটিতে ছাপা "Oily Leader of the Oily Revolution Locked up in Tomb."—পিচ্ছিল বিপ্লবের তৈলাক্ত নেতা "কবরের" হাজতে জীবন্ত কবরিত।"

সকালে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। চক্রবর্তীর টেকো মাথায় ঘন ঘন ভেসলিন মাখা অভ্যাসটির জন্যেই রসিক সাংবাদিক তাঁকে 'তৈলাক্ত নেতা' বলে অভিহিত করেছেন।

সকাল ১১ টার সময়েই তিনি আদালতে হাজির হলেন। পরিচিত পুলিশটি একটু আশ্চর্য হয়েই পিঠ চাপড়ে বললেন, "বাঃ, ঠিক কথার মানুষ দেখছি ত!"

আমেরিকার গ্র্যাণ্ড জুরির আদালত। প্রায় দু'শ সাধারণ আমেরিকান নিয়ে এই গ্র্যাণ্ড জুরি গঠিত। এটর্ণি জেনারেলের কথার উপর তারা যে কিছু বলেন তা রায়ের মনে হ'ল না।

আমেরিকার ইমিগ্রেসন আইন ভঙ্গের অপরাধে রায়কে অভিযুক্ত করা হ'ল। কোন সাক্ষী ডাকা হ'ল না। গ্র্যাণ্ড জুরি অভিযোগ অনুমোদন করলেন। এটর্নি জেনারেল রায়ের ব্যক্তিগত মুচলেকার জামিনে মুক্তি দেবার সুপারিশ করলেন—গ্র্যাণ্ড জুরি সম্মতি দিলেন। এটর্নি জেনারেল রায় শুনিয়ে বললেন, "তোমায় আবার সমন করা হবে। তার মধ্যে তুমি পালাবার চেষ্টা করবে না। তুমি কড়া নজর বন্দীতে থাকবে।"

আমেরিকার আইন অনুসারে এ সবই শুধু মুখের কথাতেই হয়ে গেল, সই-সাবুদ কিছুই লাগল না।

জার্মানী যাবার উদ্দেশ্যে রায় আমেরিকা এসেছিলেন। যখন দেখলেন জার্মানরা বা বার্লিন কমিটি কেউই তাকে সে সুযোগ করে দিল না তখন তিনি অন্য সম্ভাবনার কথা ভাবতে সুরু করেছিলেন।

আমেরিকা যখন ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল তখন ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্যে আমেরিকা আর নিরাপদ স্থান নয়। সোস্যালিষ্ট বন্ধুদের নিকট তিনি জানলেন যে মেক্সিকোতে বিপ্লব চলেছে। আমেরিকার জেলে পচার চেয়ে সেখানে গিয়ে সে দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে কাজ করা ঢের কাম্য। তা ছাড়া ক্রমেই তিনি বুঝতে লাগলেন যে ভারতের সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে যদি জনগণের সর্বাঙ্গীন মুক্তি আনতে হয় তবে বিশ্বজোড়া যে সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও শাসকগোষ্ঠী আছে তা নির্মূল করার জন্যে বিশ্বব্যাপী বিপ্লব ঘটাতে হবে। বিশ্ব বিপ্লবের জয়যাত্রার ফলেই ভারতের মুক্তি সম্ভব হ'বে। অতএব মেক্সিকোর বিপ্লব পরোক্ষ ভাবে ভারতকেও সাহায্য করবে।

মেক্সিকো যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে সে কথাও তিনি তাঁর নবলব্ধ সমাজতান্ত্রিক বন্ধুদের নিকট থেকে শুনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে য়ুকাতান প্রদেশের গভর্ণর এল্‌ভারেডো সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টাও করছিলেন। এই য়ুকাতান প্রদেশই লুপ্ত মায়া সভ্যতার দেশ ছিল। তখনকার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ভারতীয়রাই যে অতীতে একদিন প্রশান্ত মহাসাগর পার হ'য়ে আমেরিকাতে এই মায়া সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সে কথা তখন দেশভক্ত রায় বিশ্বাস করতেন। সেই ধারণা বশতঃ মেক্সিকোর প্রতি তিনি যেন এক রক্তের টান অনুভব করতে লাগলেন।

রায়ের দূরদৃষ্টি বিস্ময়কর। মিত্রপক্ষে আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে

সঙ্গেই হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার মত একটা কিছু যে ঘটবে, এবং তখন যে তাতে তাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে সে কথা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। সেইজন্যে বেশ কিছু দিন আগেই আমেরিকার পূর্ব সীমান্তের নিউইয়র্ক থেকে পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত সাড়ে তিন হাজার মাইল দূরের ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড ষ্টার জর্ডন-এর নিকট থেকে মেক্সিকোর জেনারেল এলভারেডোর নিকট এক পরিচয় পত্র লিখিয়ে এনে প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করেই রেখেছিলেন। মিঃ জর্ডন তখন আমেরিকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট যুদ্ধ বিরোধী শান্তিকামী ব্যক্তিরূপে প্রখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। রায় জামিনে ছাড়া পেয়েই অবিলম্বে মেক্সিকো যাত্রা করাই স্থির করলেন। কিন্তু তা সম্ভব হবে কী করে? নিউইয়র্কের মত শাদা আর নিগ্রোর দেশে একজন ভারতীয় সহজেই লোকের চোখে পড়ে—আকর্ষণও করে। লুকিয়ে পালান কঠিন ব্যাপার। ভারতে তিনি অনেক রকম কৌশল অতিশয় সাফল্যের সঙ্গেই অবলম্বন করে এসেছেন। তার কোনটাই কাজে লাগবে না। একমাত্র উপায় দুঃসাহসের সঙ্গে কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়া। প্রথমেই পুরাতন বাসাটা বদলান দরকার। একটা খুব ঘন বসতি অঞ্চলে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে বাসা নিলেন। বাসা বদলাবার সময় গোয়েন্দাদের দেখতে পেলেন না। তবে কি পুলিশের এটা একটা চাল। আসলে তারা সবই জানছে। যাই হোক আর দেরী করা চলে না। হয়তো তাদের ভুল হয়েছে—এরই মধ্যে সরে যেতে হবে। তিনি সন্ধ্যায় একটি রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলেন। খাওয়া শেষ করে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি ধরে একেবারে রেল ষ্টেশন। মেক্সিকোর সীমান্ত সহর স্যান এণ্টোনিও পর্যন্ত যাবার ট্রেনের সময় তিনি আগেই জেনে নিয়েছিলেন। ট্রেন ছেড়ে দিল। দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্য দিয়ে ট্রেন চলল। তিনিও সে সব দেশের মিশ্র অধিবাসীর একজন রূপেই জনতার সঙ্গে মিশে রইলেন। তৃতীয় দিনের দ্বিপ্রহরে ট্রেন গন্তব্য স্থানে পৌঁছল। আমেরিকার সীমান্ত রক্ষী পুলিশকে ঘুষ দিয়ে সীমানা পার হয়ে মেক্সিকোর মাটিতে পৌঁছতে আর বেশী কিছু বেগ পেতে হ'ল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেক্সিকোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মেক্সিকোর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে সেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ববিরোধ লেগেই ছিল। স্পেনিশ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মেক্সিকোতে যে সব স্পেনিশ অভিজাত শ্রেণী জমিদারী ও ব্যবসা-বাণিজ্য করত তারাই স্পেনের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সাধারণতন্ত্রী সরকার স্থাপন করে। এই সকল স্পেনীয় অভিজাত সম্প্রদায় রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিই অনুসরণ করে চলত এবং নিজেদের শাসক শ্রেণী এবং দেশীয় লোকেদের অনুন্নত ও শাসিত শ্রেণী-রূপেই গণ্য করত। এর ফলে মেক্সিকো স্পেন সাম্রাজ্যের বাইরে এলেও সেখানকার সাধারণ মানুষদের মুক্তি মেলে নি। সেই জন্যে গ্রাম্য পাদ্রী হিদালগো ও মোরেলাস-এর নেতৃত্বে ১৮১১ সালে সেখানে যে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু হয়েছিল তা ক্রমে একদিকে মেক্সিকোর আদিম অধিবাসী ও মিশ্র রক্তজ আর অন্যদিকে স্পেনীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশীয় লোকেদের জয় হয়।

মেক্সিকো অধিবাসী ইউরোপীয়দের বর্ণকৌলিন্য ও ছুঁৎমার্গী আচার-ব্যবহার সত্ত্বেও আদিম অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক বৃহৎ মিশ্র সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা সবই ইউরোপীয় ধাঁচে চলতে থাকে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসী ভাব ও ভাবনা, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শ তারা গ্রহণ করে। স্পেনীয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থানীয় স্পেনীয় অভিজাতদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই

ভাবে যখন গৃহ যুদ্ধ চলছিল তখন আমেরিকার সঙ্গে মেক্সিকোর যুদ্ধ বাধে। বিবাদের বিষয় ছিল টেক্সাসের অধিকার নিয়ে। সেই সময়ে গণতান্ত্রিক শক্তির জয়লাভ ঘটে এবং জুয়ারেজ ১৮৬১ সালে মেক্সিকো সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'ন।

যুদ্ধে আমেরিকার জয় হয় এবং মেক্সিকোকে টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্ণিয়ার বিশাল ভূখণ্ড হারাতে হয়। তথাপি গণতান্ত্রিক শক্তির অব্যাহতি মেলে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেন জুয়ারেজ-এর সরকারকে প্রাক্তন সরকারের অনাচারের দায়ে দায়ী করে বহু অর্থ খেসারত দাবী করে। তা আদায়ের জন্যে এক যুক্ত সামরিক বাহিনী মেক্সিকো আক্রমণ করে এবং জুয়ারেজের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে হ্যাপস্‌বার্গ রাজতন্ত্রের সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানকে মেক্সিকোর সিংহাসনে বসায়। কিন্তু জুয়ারেজ সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং ১৮৬৭ সালে সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানকে মেক্সিকো থেকে বিতাড়িত করে পুনরায় সরকার দখল করেন। মেক্সিকোর মুক্তি দাতা ১৮৭২ সালে মারা যান। তারপরই দেশ পুনরায় গৃহযুদ্ধে মেতে ওঠে। দশ বৎসরাধিক কাল ধরে এই গৃহযুদ্ধ চলবার পর স্পেনীয় অভিজাত বংশীয় জেনারেল পোরফিরিও দিয়াজ আমেরিকার সাহায্যে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করে।

দিয়াজের একনায়ত্ব প্রায় পঁচিশ বৎসর স্থায়ী হয়। সে সময় দেশে আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। আমেরিকা, ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক রাষ্ট্রের মূলধনে গড়ে উঠতে থাকে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য। অন্যদিকে পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায় পুনরায় তাদের ক্ষমতা ও কায়েমী স্বার্থ সব ফিরে পায়। জুয়ারেজের বিপ্লবের আবদান সব লোপ পায়, জনসাধারণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পুনরায় নিমজ্জিত হয়। মেক্সিকো সিটি ইউরোপের ল্যাটিন দেশ সমূহের ধনীদের প্রমোদ উদ্যানে পরিণত হয়। ভূদাস ও ক্রীতদাস খাটিয়ে বিরাট বিরাট কৃষিক্ষেতে যে প্রচুর ধনাগম হ'ত তা ব্যয় হ'ত মোক্সিকো সিটিতে। আর সমগ্র জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ আদিবাসী অতি কঠিন খাটুনি খেটে খেটে দাসত্বের জীবন যাপন করত। কিন্তু মিশ্র রক্তজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের স্মৃতি ভুলতে পারে নি—তারা সেই স্বপ্ন দেখত। ১৯১১ সালে তারা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ফ্রান্সিসকো ম্যাদারোর নেতৃত্বে দিয়াজের একনায়কত্বের অবসান ঘটায়। গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর সঙ্গে ভূমি বিপ্লবের ব্যবস্থা থাকায় এ বিপ্লবে কৃষক সম্প্রদায়েরও সমর্থন থাকে।

দিয়াজের রাজত্বে মেক্সিকোর অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা সুখে ছিল। সেই জন্যে বড় বড় সব ঔপনিবেশিক জোৎদার বিদেশী ধনীরা জোট বেঁধে ম্যাদারোর শাসনের বিরুদ্ধে জেনারেল হুয়ের্তার নেতৃত্বে প্রতি-বিপ্লব সুরু করে দেয়। ম্যাদারো সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকা থেকে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের হুমকী আসে। দেশকে পুনরায় গৃহযুদ্ধের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্যে ম্যাদারো ১৯১২ সালে প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ করেন। তাতে আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপ বন্ধ হ'ল বটে কিন্তু গৃহ যুদ্ধ বন্ধ হ'ল না। হুয়ের্তা ছিল একজন হঠাৎ উঠ্‌তি মানুষ ও বিদেশী ধনীদের হাতের পুতুল মাত্র। না জনসাধারণ, না সেনাবাহিনী কেউই তাকে মানত না। ফলে শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটল। সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতার লোভে অনেকে এসে জুটল। বিপ্লবের নামে অনেকেই লুঠপাট ডাকাতি সুরু করে দিল। এই ডাকাত দলের মধ্যে দু'জন প্রধান হয়ে উঠল। একজন এমিলিয়ানো জাপাটা, আর একজন পাঞ্চো ভিল্লা। এরা দুজনেই রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হবার চেষ্টা করতে লাগল।

রায় যখন মেক্সিকো পৌঁছলেন তখনো দেশের প্রায় সর্বত্রই এই গৃহ যুদ্ধ চলেছে। একদল জেনারেল ভেনাসতিয়ান কারাঞ্জার নেতৃত্বে বছর খানেক আগে রাজধানী দখল করে এক সরকার স্থাপন করেছে এবং অনেক প্রাদেশিক গভর্ণর ও সামরিক নেতা এই সরকারকে আনুগত্য জানিয়েছে।

কারাঞ্জা নিজে একজন আভিজাত শ্রেণীর জমিদার। কিন্তু তিনি জুয়ারেজ ও ম্যাদারোর আদর্শ গ্রহণের অঙ্গীকার ক'রে ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই এক গণপরিষদ আহ্বান করেন। দেশের তখনকার বিশৃঙ্খলার জন্যে হয়তো গণতন্ত্রের নিয়ম কানুন অনুযায়ী সেই গণপরিষদ ডাকা সম্ভব হয় নি। কিন্তু কার্যতঃ তা গণতান্ত্রিক সম্মেলনই হয়েছিল। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কেবল যে অনেক প্রগতিশীল উদারনৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন তাই নয়, অনেক আদর্শবাদীও ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকে নাম করা সোশ্যালিষ্ট ছিলেন, কিছু এনার্কিষ্টও ছিলেন। নতুন সাধারণতন্ত্রের সংবিধানও এই রকম একজন এনার্কিষ্টই রচনা করেছিলেন। আদর্শবাদীর হাতের তৎপর রচনাতে ব্যবহারিক দিক থেকে সে সংবিধানে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। কিন্তু সামাজিক ন্যায় বিচারের নীতিটি এই সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষতঃ জমি ও খনি সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়েছিল। তার ফলে জমিদার

শ্রেণী ও বিদেশী ধনীরা এই সংবিধানের উপর ক্ষেপে গিয়েছিল। দেশের জমি ও খনিজ তেল প্রভৃতি সম্পদ এই সব জমিদার ও বিদেশী ধনীদের দীর্ঘ মেয়াদী ইজারাতে বন্দোবস্ত নেওয়া ছিল। এই সব জমিদার, ধনী ও পাদরিরা মিলে কারাঞ্জা সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরোধী দল গড়ে তোলে।

অপর দিকে ভিল্লা ও জাপাটার দলও কারাঞ্জা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কারাঞ্জা যে একজন স্পেনিশ অভিজাত শ্রেণীর জমিদার এ কথা কৃষকদের মধ্যে প্রচার করে জাপাটা সেখান থেকে বেশ কিছুটা সমর্থন লাভ করে। ফলে কারাঞ্জা দু'দিক থেকে যুগপৎ আক্রান্ত হ'ন।

কারাঞ্জা সরকার যখন এই বিপদের মধ্যে তখন রায় মেক্সিকো পৌছলেন। সমসাময়িক ঘটনাসমূহকে নিজ পরিকল্পনানুযায়ী যোগাযোগ ঘটিয়ে এবং সেই সব ঘটনার সুযোগ নিয়ে রায় কারাঞ্জা সরকারের এই বিপন্মুক্তিতে মূল্যবান সাহায্য করলেন।

এতদিন ছিল তাঁর সামরিক বা সৈনিকের জীবন। এবার তিনি ব্যবহারিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলেন। এতে কারাঞ্জা সরকারের তথা মেক্সিকোর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্থায়িত্ব সম্পাদনে যত না সাহায্য হয়েছিল তার চেয়ে বেশী হয়েছিল রায়ের ব্যক্তিগত জীবনে এক অতি মূল্যবান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। উত্তর জীবনে তিনি যে গৌরব জনক সাফল্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন তার জন্যে এই অভিজ্ঞতা তাকে সর্বাধিক সাহায্য করেছিল।

তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কারাঞ্জা সরকারের অনুকূলেই ছিল। নতুন সংবিধানের ফলে ব্রিটিশ ধনীরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্যে কেবল পত্রের মারফৎ প্রতিবাদ করা ছাড়া আর বেশী কিছু করা ব্রিটিশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সেই জন্যে মেক্সিকোর কারাঞ্জা সরকারকে জব্দ রাখার দায়িত্ব পড়েছিল আমেরিকার উদারনৈতিক প্রেসিডেন্ট উইলসনের ওপর। তিনি ১৯১৬ সালে মেক্সিকোর বন্দর ভেরাক্রুজে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে তা দখল করেন। কিন্তু পর বৎসর ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তার বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নি। এই অবসরে কারাঞ্জা সরকারও নিশ্বাস ফেলার সময় পায়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে যে সব শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল তাতে কারাঞ্জা সরকার মোটেই নিরাপদ ছিল না। রায় এদিক থেকে কারাঞ্জাকে খুবই সাহায্য করলেন।

সেই বিস্ময়কর কাহিনীই এখন নিবেদন করার চেষ্টা করব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেক্সিকোর সমাজ জীবনে রায়ের প্রবেশ লাভ

মেক্সিকো নগর রায়ের একান্তই অপরিচিত। এমন একটি মানুষও জানা নেই যার কাছে যাওয়া যেতে পারে। এক জেনারেল এলভারেডোর নামে এক পরিচয় পত্র আছে। কিন্তু য়ুকাতান প্রদেশ মেক্সিকো সিটি থেকে হাজার মাইল দূরে। স্থল পথে যাওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। গৃহযুদ্ধে রেলপথ বিচ্ছিন্ন। এক সমুদ্র পথ, তাও আমেরিকার জাহাজে করে যেতে হয়। সুতরাং অন্য উপায় দেখতে হয়। তিনি সরকারী দপ্তরে লিখলেন যে য়ুকাতান প্রদেশের মাননীয় প্রদেশপালের সঙ্গে কি উপায়ে দেখা হ'তে পারে। উত্তরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নিকট থেকে এক সাক্ষাৎকারের অনুমতি পত্র পেলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার জামাতা।

বৈপ্লবিক পন্থায় যখন কোন দেশের পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘ'টে নতুন ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠতে থাকে, পুরাতন কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘ'টে যায়, পুরাতন আচার-ব্যবহার বদলে যেতে থাকে, কেবল তখনই অবহেলিত প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ পায়, পিছনের মানুষের এগিয়ে যাবার সুযোগ মেলে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে দেখা মানুষের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়। মেক্সিকোতে অনুরূপ ব্যাপারই ঘটছিল। সেখানকার বৈপ্লবিক সরকারের পুরাতন আদব-কায়দার কোন বালাই ছিল না। সেই জন্যেই প্রয়োজন বোধে ক্যাবিনেট মিনিষ্টারের পক্ষে একজন অজ্ঞাত অখ্যাত সাধারণ মানুষকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে বাধল না। অবশ্য এই অনুমতি দানের পিছনে কিছু নেপথ্য কারণ ছিল, যার ফলে মন্ত্রীর নিকট রায় ঠিক অপরিচিত বা সাধারণ ছিলেন না। ব্রিটিশ ও আমেরিকা সরকার রায়কে মেক্সিকো থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করছিলেন।

স্যান ফ্রান্সিসকোতে যে হিন্দু জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল তাতে ভারত সরকার রায়কেই প্রধান অপরাধী রূপে খাড়া করেছিলেন। রায়েরই একজন ঘনিষ্ট সহযোগী সাংহাই-এ ধরা পড়ে। এরই গ্রেপ্তারের কথা সিডিসন কমিটির রিপোর্টে আছে। ব্রিটিশ পুলিশ তাকে রাজসাক্ষী করতে সক্ষম হয়। রায়ের অপরাধ সপ্রমাণ করতে তাকে স্যান ফ্রান্সিসকোতে আনা হয়। এই মোকদ্দমা চালাবার জন্যে কলকাতা থেকে কুখ্যাত পুলিশ সাহেব ডেনহামকে নিয়ে আসা হয়। তিনি রায়কে অপহরণ চেষ্টায় মেক্সিকো পর্যন্ত এসেছিলেন।

মেক্সিকোর বৈদেশিক বিভাগ এ সব সংবাদ রাখতেন। কিন্তু এ সবই রায়ের পক্ষে শাপে বর হয়ে গিয়েছিল। মেক্সিকোর বিপ্লবী সরকারের সর্বপ্রধান শত্রু ছিল ব্রিটিশ এবং আমেরিকা। সুতরাং তাদের শত্রু রায় সেখানকার সরকারের কাছে সম্মানীয় অতিথিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। সেই জন্যেই রায়ের চিঠি পাওয়া মাত্র প্রেসিডেন্টের জামাতা এবং ক্যাবিনেটের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রায়কে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন।

রায় অবশ্য তখন এ সব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। পরে অবশ্য সব জেনেছিলেন এবং স্যান ফ্রান্সিসকোর হিন্দু জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার সংবাদও কাগজে দেখেছিলেন। সেই জন্যে তিনি যখন মন্ত্রীর নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের নিমন্ত্রণ পেলেন এবং সাক্ষাৎকারের সময় মন্ত্রী মহোদয় যে মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন তাতে তিনি খুবই বিস্মিত হলেন।

সাক্ষাৎকার খুবই হৃদ্যতার সঙ্গে ঘটল। মন্ত্রী জানালেন যে, রাজ্যপাল য়ুকাতান থেকে খুব শীঘ্রই রাজধানীতে ফিরছেন, এখানেই দেখা হতে পারবে। সেই সঙ্গে এও জানালেন যে, যদিও তাঁর জীবন এখানেও বিপদসঙ্কুল তথাপি সরকার তাঁর নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

এই সাক্ষাৎকারের পর থেকেই তিনি এই নির্বান্ধব পুরীতে আর ততটা একাকিত্ব বোধ করলেন না।

পরদিনই বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। তিনি সরকারের বে-সরকারী মুখপত্র সহরের প্রধান সংবাদপত্র El Pueblo-র (The People) সম্পাদকের নিকট থেকে এক চিঠি পেলেন। পত্রে খুবই বিনয়ের সঙ্গে তাঁর অফিসে রায়কে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ জানান হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছে যে, তার পক্ষেই রায়ের বাসস্থানে গিয়ে দেখা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু যে হোটেলে রায় আছেন সেখানে তার পক্ষে যাওয়ার বাধা আছে।

রায় যখন মেক্সিকো নগরে এসেছিলেন তখন একেবারেই নির্বান্ধব ছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, সে দেশের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর বন্ধুর অভাব নেই। সৌভাগ্যই বলতে হবে।

সম্পাদক মহাশয় ছিলেন এক সৌম্য বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর ব্যবহার এমনই আত্মীয়তাপূর্ণ ছিল যে, রায় প্রথম দর্শনেই তাঁকে একান্তভাবে আপনার জনের মতই গ্রহণ করলেন এবং অপর পক্ষও সম্ভবতঃ অনুরূপ ভাবেই প্রভাবিত হলেন। কারণ বিদায় সম্ভাষণে বললেন, "আমাদের এবার থেকে প্রায়ই দেখা হবে। কিন্তু ঐ হোটেলে থাকা চলবে না। তোমার পক্ষে হোটেলটি নিরাপদ স্থান নয়।" এরপর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রায়ের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে পরদিন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। সেই সঙ্গে এও জানালেন যে, শীঘ্রই তিনি তার জন্যে একটি বাড়ীরও ব্যবস্থা করে দেবেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রায় জেনেভা হোটেল ছেড়ে সেখানকার ভদ্রপল্লী Colonia Roma-য় একটি বাড়ীতে উঠে এলেন। হোটেলে থাকার শেষ ক'দিনের মধ্যে আরো এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে দূর প্রাচ্য ও আমেরিকা থেকে অনেক জার্মান এসে নিরপেক্ষ মেক্সিকোতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই এই হোটেলে থাকত। একদিন এক জার্মান গোপনে এসে জানাল যে, জাভাতে যে দু'জন জার্মানের সঙ্গে রায়ের পরিচয় হয়েছিল তাঁরা এখন এখানে। তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। যদি তিনি সন্ধ্যার পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেন তবে সেখান থেকে তাঁকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হবে। রায় প্রথমে এটিকে তাঁকে অপহরণ করার জন্যে একটা ফাঁদ বলে মনে করলেন। কিন্তু দুঃসাহসের যার অন্ত নাই তার পক্ষে কাল্পনিক ভয়ে পেছিয়ে থাকা সম্ভব নয়। ভাবটি হ'ল বিপদ যদি একান্তই আসে তখন সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যাবে, মানুষের চলার পথের একমাত্র পাথেয় মস্তিষ্কটা ত সঙ্গেই রইল। তিনি যেতে স্বীকৃত হ'লেন।

যথা সময়ে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছলেন, এবং তাঁকে একটি বড় মোটর গাড়ি এসে তুলেও নিলে। গন্তব্য স্থানে গিয়ে দেখলেন জাভার দু'জন জার্মান অফিসারই বটে। বাড়ীর যিনি কর্তা তিনি হ'লেন সে সময়কার বিখ্যাত সাবমেরিন ডয়েস-ল্যাণ্ড-এর কাপ্তেন কমাণ্ডার ফন কোনিগ। আমেরিকায় তাঁর সাবমেরিনকে আটক করার সময় তিনি পলাতক হ'য়ে মেক্সিকোতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

যথারীতি শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পানীয় পরিবেশন করা হ'ল। রায় সুরা জাতীয় পানীয় গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। কোনিগ অবাক হলেন। অফিসার দু'জন বললেন যে, না উনি খান না, জাভাতেও উনি সুরাপান করতেন না।

রায় যখন মেক্সিকোতে তখন তিনি আনন্দমঠ ব্রহ্মচারীর অনেক নিয়ম কানুন শিথিল করলেও সুরাপানে বিরত থাকতেন।

কাজের কথা সুরু হ'ল। রায় তাঁর গত দু'বছরের অভিজ্ঞতা বললেন। দু'জন অফিসারের মধ্যে একজন খুবই উচ্চপদস্থ। তাঁরা সকলেই বললেন যে, চীনে জার্মান রাজদূতের উচিত ছিল ৫০ লক্ষ ডলার (আড়াই কোটি টাকার মতন) ব্যবস্থা করে ইউনানের অস্ত্রগুলো ভারতে পাঠানর ব্যবস্থা করা। তবে রায় যদি আমেরিকায় এতদিন আগেই পৌঁছেছিলেন তবে তিনিই বা বার্লিন গেলেন না কেন? রায় বার্লিন কমিটির প্রতিনিধি ডাঃ চক্রবর্তীর কথা চেপে গেলেন। একজন ভারতীয়ের হীনতা বিদেশীর কাছে বলতে রায়ের বাধল। তিনি বললেন যাবার কোন উপায়ই ত তিনি দেখতে পান নি। তাঁরা বললেন যে, রায় জার্মান রাজদূতের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলেন না কেন। রায়কে স্বীকার করতেই হ'ল সেটা তার মাথায় আসে নি। বার্লিন কমিটির মারফৎ না গেলে জার্মান সরকার কোন প্রস্তাবই সরাসরি গ্রহণ করবেন না এই ভুল ধারনাই তাঁকে সে পন্থা গ্রহণ করতে দেয় নি। জার্মান অফিসারদ্বয় বললেন যে, পূর্বে যা হবার হয়ে গেছে। এখন রায়ের এ প্রস্তাব অবিলম্বে যথাস্থানে পেশ করা হবে। দূর প্রাচ্য, আমেরিকা ও কানাডায় জার্মান গুপ্তচরদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করার জন্যে শীঘ্রই কাইজারের কাউন্সিলের জনৈক সদস্য মেক্সিকো আসছেন। তিনিই রায়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

ভারতে বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্রসম্ভার পৌঁছে দেবার জন্যে এদের আগ্রহ এবং সেই সুকঠিন কর্ম সম্পাদন করার মত যোগ্যতা যে রায়ের আছে সে সম্বন্ধে এমন আস্থা দেখে রায় মুগ্ধ হ'লেন, অভিভূত হ'লেন এবং এতদিনে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য দানের জন্যে যে জার্মানদের আন্তরিকতা দেখা দিয়েছে তাও বুঝলেন। সেই সঙ্গে এও ভাবলেন যে এতদিন কেবল বার্লিন কমিটি ও তাঁদের প্রতিনিধি ডাঃ চক্রবর্তীর জন্যেই এ কাজ সুরু করা সম্ভব হয় নি।

আমেরিকাতে বার্লিন কমিটির অন্যান্য লোক ও ডাঃ চক্রবর্তীর উপর তিনি খুসী ছিলেন না। লালা লাজপত রায়ের ডায়রি থেকে দেখেছি যে, রায়ের বিবাহ

নিয়ে তাঁরা সকলেই তাঁর সঙ্গে অতি কদর্য ব্যবহার করেছিলেন। শ্রীমতী এভ্‌লিনকেও অপমান করতে তাদের বাধে নি। কিন্তু তখন মুখে তা প্রকাশ না করলেও অন্তরে তিনি বার্লিন কমিটি ও প্রতিনিধিদের প্রতি নিদারুণ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে জেদ চাপল, বার্লিন কমিটিকে ডিঙ্গিয়েই তিনি জার্মান সাহায্য গ্রহণ করবেন এবং চীন থেকে সেই অস্ত্র সম্ভার যদি তখনো পাওয়া সম্ভব হয় তবে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

বৎসরাধিক কাল পূর্বে গড়ে তোলা যোগাযোগ ব্যবস্থা যে এখনো অটুট আছে তা অবিলম্বে জানা দরকার। এর জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থ। সেই বৈঠকেই প্রাথমিক খরচের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন জানালেন। রায়ও তা গ্রহণ করতে রাজি হ'লেন। সেদিন স্থির হ'ল তাঁরা মাঝে মাঝেই গোপনে মিলিত হবেন।

পরদিনই El Pueblo দৈনিকের সম্পাদকের নিকট থেকে এক যুবক দেখা করতে এল। সেদিনই সন্ধ্যায় সম্পাদকের বাড়ীতে সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ। সে দিন সন্ধ্যায় তিনি সম্পাদকের স্ত্রী ও মেক্সিকোর একমাত্র মহিলা মহলের সংবাদপত্র La Mujer Moderna—(The Modern Woman) এর সম্পাদিকা ও বৈদেশিক মন্ত্রীর ভ্রাতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। রায় মেক্সিকোর সমাজ জীবনে প্রবেশাধিকার লাভ করলেন।

সেই রাত্রিতেই সম্পাদক রায়কে তার কাগজে ভারত সম্বন্ধে কিছু লেখা দিতে বললেন। রায় মেক্সিকোর ভাষা সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতার কথা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে সমস্যার সমাধান করে দিলেন। যে যুবকটি সকালে নিমন্ত্রণ পত্রটি নিয়ে গিয়েছিল সেই রায়কে স্পেনিশ ভাষা শেখাবে এবং রায়ের রচনা অনুবাদ করতে সাহায্য করবে। পরদিন থেকে সেই যুবকটি এসে রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে কাজে লেগে গেল। রায় দেখলেন, কোন এক অদৃশ্য হস্তের নির্দেশে এই সব ঘটনা দ্রুত ঘটে যাচ্ছে।

সেইদিন দুপুরেই পূর্ব রাত্রির ডিনার পার্টিতে পরিচিত বৈদেশিক মন্ত্রীর ভ্রাতা এসে জানালেন যে, তাদের ব্যাঙ্কে কোন এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রায়ের নামে দশ হাজার মেক্সিকান পেসো জমা দিয়ে গেছে। এক পেসোর মূল্য আমেরিকার অর্ধ ডলারের মত। পরদিন ব্যাঙ্কের এক পিয়ন এক থলি কুড়ি পেসো মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গেল, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই El-Pueblo-র সম্পাদকের

ব্যবস্থাপনায় মেক্সিকোর অভিজাত পল্লী Colonia Roma-তে অবস্থিত একটি বাড়ীতে হোটেল ছেড়ে এসে রীতিমত সেক্রেটারি ও দাসদাসী পরিবৃত হয়ে ভদ্রভাবে সস্ত্রীক বসবাস করতে সুরু করলেন।

ক'দিনের মধ্যেই রায়ের জীবনে যে সব ঘটনা অতি দ্রুত তালে ঘটে গেল তাতে ভাগ্যদেবীর উপর ভক্তি না বেড়ে উপায় ছিল না। মাত্র ক'দিন আগে কপর্দক হীন অবস্থায় মেক্সিকোতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রায় নিঃস্ব অবস্থাতেই সস্ত্রীক উৎকৃষ্ট জেনেভা হোটেলে এসে উঠেছিলেন। এই ক'দিনের মধ্যেই সেই নিঃস্ব সহায় সম্বলহীন বিদেশী মানুষটি মেক্সিকো নগরীর অভিজাত পল্লীর অধিবাসী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে গেলেন। রায়ের মতন সন্দেহবাদী না হ'লে যে কোন লোকই ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠত। রায় এই সব ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "It was an experience which might have resurrected my belief in providence had I not been a born sceptic.—যে সব ঘটনা ঘটল তাতে যদি না আমি জন্মসন্দেহ-বাদী হতাম তবে অদৃষ্টবাদী না হ'য়ে পারতাম না।

অদৃষ্ট এ অঘটন ঘটাল না, ঘটাল রায়ের বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের অনুশীলনী ধর্ম আচরণের সিদ্ধিলাভের ফলে আর কার্য-কারণ নিয়মের অনিবার্যতায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রায়ের উপর কমিউনিজমের প্রথম প্রভাব

রায় যখন মেক্সিকোতে পৌছলেন সে সময় সেখানে কোন রাজনৈতিক পার্টি ছিল না। বহু দলই ক্ষমতা দখলের জন্যে পরস্পর লড়াই করে চলছিল। এ সব দল গড়ে উঠেছিল এক একজন ব্যক্তিকে ঘিরে, এবং এদের প্রায় সবাই সামরিক শ্রেণীর মানুষ। ম্যাদারোই কেবল মাত্র অসামরিক ব্যক্তি যিনি ১৯১১ সালে সামান্য কিছুদিনের জন্যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ'তে পেরেছিলেন। এই সব বিদ্রোহী নেতার দল সকলেই এক একটি কর্মসূচী সম্বলিত ঘোষণাপত্র প্রচার ক'রে নিজ নিজ দলে যোগ দেবার জন্যে জন সাধারণকে আহ্বান জানিয়ে এসেছে। প্রত্যেক ঘোষণাপত্রেই কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্যে কিছু না কিছু কর্মসূচী থাকত। জমিদারী ও জোতদারী প্রথা বিলাপ ক'রে কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনই ছিল কৃষক সমস্যার সাধারণ সমাধান।

মেক্সিকোর জনসংখ্যার শতকরা নব্বই জনই জমিদার ও জোতদারের অধীনে ভূদাসত্বের জীবন যাপন করত। কৃষিজীবীদের দারিদ্র্য ও ব্যাপক বেকারীর জন্যে সৈন্যের চাকরী খুবই লোভনীয় ছিল। সেইজন্যে যে কোন বিদ্রোহী জেনারেল সৈন্যের চাকরী ও জমি বণ্টনের লোভ দেখিয়ে এই সব লোকেদের কাছ থেকে খুবই সমর্থন পেত এবং এদের নিয়ে দল গড়ে তুলত। এইসব লোকের নিকট "জেনারেল" পদবীর খুব ইজ্জৎ ছিল। এই জন্যে যে সব নেতা 'জেনারেল' ছিল না তারাও নিজেদের 'জেনারেল' নামে পরিচয় দিত।

বছরের পর বছর ধরে এইসব বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকায় শেষ পর্যন্ত লুঠপাট খুন-জখম সব দলই চালাতে থাকে। এর ফলে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশটি এদের উপর খুবই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। যদিও

তারা জমিদারী প্রথা লোপ করে কৃষি সমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিল তথাপি এইসব "জেনারেলদের" ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করত না। ফলে "বিপ্লব" ও "বিপ্লবী" কথাটারই বদনাম হ'য়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের এইরূপ বিরক্তির জন্যেই সেখানে তখনো পর্যন্ত কোন সত্যিকারের রাজনৈতিক পার্টি গড়ে ওঠে নি। যে সব দল ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল তাদের দলপতিদের নামেই তাদের নাম করণ হ'ত। ক্ষমতাশীল দলের নাম ছিল কারাঞ্জাপন্থী, আর দুই প্রধান দলের নাম ছিল জাপাটাপন্থী ও ভিল্লাপন্থী।

১৯১১ সালের বিপ্লবের পর কারাঞ্জাই অনেকদিন ধরে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকতে পেরেছিলেন এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে সারা দেশের শান্তিপূর্ণ অধিবাসীদের নিকট থেকে একটি আনুগত্যও লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের সংবিধান রচনা করার জন্যে ১৯১৬ সালে তিনি এক গণপরিষদও আহ্বান করেন। সেই সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত পার্লামেণ্টের অধিবেশনও নিয়মিত বসে আসছিল। পার্লামেণ্টে পার্টি না থাকলেও দল ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কারাঞ্জাপন্থী নামে অভিহিত হ'ত। একদল প্রতিনিধি নিজেদের সোস্যালিষ্ট বলেও পরিচয় দিত, যদিও তারা সবাই সরকারের বিরোধী ছিল না, এবং নিজেদের কারাঞ্জাপন্থীও বলত। এদেরই মধ্যে একজন পার্লামেণ্টের স্পীকার ছিলেন।

মেক্সিকোর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সোস্যালিজিম, এনার্কিজিম, সিণ্ডিক্যালিজিম, প্রভৃতি র‍্যাডিক্যাল মতবাদ যদিও অজানা ছিল না তথাপি তেমন কিছু দানা বেঁধে ওঠে নি। এরই মধ্য থেকে সামান্য কিছু লোক মিলে পার্লামেণ্টের বাইরে সোস্যালিষ্ট পার্টি নামে একটি ছোট দল গড়ে তুলেছিল। এই পার্টির নেতা ছিলেন একজন বৃদ্ধ উকীল এবং তিনি পার্লামেণ্টের সোস্যালিষ্ট স্পীকারের বন্ধু ছিলেন।

ইতিমধ্যে রায়ের ভারত সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ Elpueblo পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তার দ্বারা তাঁর নাম শিক্ষিত মহলে আর তেমন অপরিচিত রইল না, বিশেষতঃ সোস্যালিষ্ট ও র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী মহলে। তার কারণ তাঁর প্রবন্ধ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই লেখা হয়েছিল। তাতে লিখেছিলেন যে, ভারত স্বর্গ-রাজ্য নয়। সেখানকার জনসাধারণ মেক্সিকোর

জনসাধারণের মতই দরিদ্র। তার কারণ দেশীয় জমিদার, রাজা-মহারাজা ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের নির্মম শোষণ। সুতরাং মেক্সিকোর মত কেবল জাতীয় স্বাধীনতাই ভারতের অগণিত জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করতে পারবে না, সেই সঙ্গে দেশীয় জমিদার-রাজা-মহারাজেরও বিলোপ সাধন প্রয়োজন।

আমেরিকাতে থাকাকালীন শ্রীমতী এভ্‌লিনের নিকট থেকে তিনি কিছু কিছু ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন। সেটা তিনি প্রথমেই কাজে লাগিয়েছিলেন El Puéblo-র সম্পাদকের বাড়ীতে ডিনার পার্টির নিমন্ত্রণে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি তাঁর নতুন সেক্রেটারির নিকট থেকে কথাবার্তা চালাবার মত মেক্সিকোর ভাষা স্পেনিশ শিখে ফেলেছিলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যেই সে ভাষায় লিখতে এবং বক্তৃতা দেবার মত যোগ্যতা অর্জন করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি অতি সহজেই সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রেসিডেণ্ট ইগনাৎসিও স্যান্টিবানেজ-এর সঙ্গে পরিচিত হ'লেন। প্রথম পরিচয়েই তিনি রায়কে তাঁর পার্টির এক সভাতে ভাষণ দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন, এবং পার্লামেণ্টের সোস্যালিষ্ট স্পীকারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

এইখানে রায়ের মানসিক পরিবর্তনের কিছুটা আভাস দেওয়া প্রয়োজন। সে সময় রুশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব ঘটে গেছে এবং বলশেভিকরা ক্ষমতায় এসেছে। এ সংবাদে রায়ের মনেও গভীর আলোড়ন দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী রায় কমিউনিজমের তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জন্যে তার সঙ্গে কতকটা আত্মীয়তা বোধ করতে সুরু করেন। রায়ের নিজস্ব ভাষা থেকে তখনকার মনোভাবটা বোঝা সহজ হবে :

> বলশেভিক পার্টি রুশিয়ায় ক্ষমতা দখল করেছে, এ সংবাদের ঈষৎ আভাস আটলান্টিক পার হ'য়ে এসে পৌঁছতে সুরু করল। এ সংবাদে সকল বামপন্থী সোস্যালিষ্টই খুব উৎফুল্ল এবং যে কোন দিন যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে—এই আশায় দিন গুণছে। এদের সকলেই ছিল ভাবী কমিউনিষ্ট। আমার গায়েও সে গরম আবহাওয়ার ছোঁয়াচ লেগেছিল। তাতে আমার মধ্যে কেবল বৈপ্লবিক উত্তাপ কয়েক ডিগ্রী মাত্র বাড়ে নি, আমার রাজনৈতিক মতের বিবর্তনে এক বিরাট গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনে এটা ছিল একটা

বৃহৎ উল্লম্ফন বিশেষ—একটা মিউটেশন ; গোঁড়া জাতীয়তাবাদ থেকে একেবারে কমিউনিজম। একজন সোস্যালিজিম মতবাদে নবীন দীক্ষিতের নতুন গোঁড়ামীর কাছে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসী মারফৎ একটু একটু করে অগ্রগতির সংস্কারবাদ কানে তোলাও পাপ।"

"কিন্তু পরে অবশ্য আমি বুঝেছিলাম যে, কমিউনিজমের মধ্যে রাতারাতি এই সামাজিক পরিবর্তনের দিকটা খুবই ভাসাভাসা পরিবর্তন, এর মধ্যে উল্লম্ফন বলার মত পরিবর্তন কিছু ছিল না। সে সময়ে কমিউনিজমের প্রতি আমার যে আকর্ষণ তার পিছনে কোন কিছু নতুন বা আকর্ষণীয় কিছু ছিল না। রুশিয়ায় গমনের ইচ্ছাও তখন আমার স্বপ্নের অগোচর। সেটা ছিল সর্বাধুনিক বৈপ্লাবিক ভাবধারা গ্রহণ করার একটা মানসিক তৃপ্তি মাত্র। সংস্কার ও শিক্ষার দিক থেকে আমি তখনো জাতীয়তাবাদী। দীর্ঘ শিক্ষা ও অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে তা সহজে মরে না। সোস্যালিজম যে আমাকে আকর্ষণ করেছিল তা এর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তাৎপর্যের জন্যে। এর মধ্যে যে আদর্শবাদ বা মানবিক অবদান ছিল তা 'আনন্দমঠ' থেকে যারা তাদের বৈপ্লবিক আদর্শ লাভ করেছে তাদের পক্ষে নতুন কিছু নয়। সুতরাং সোস্যালিজমের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় নীতির আদর্শ ছিল তা আমার জীবনাদর্শের মধ্যে গ্রহণ করা সেদিন মোটেই কঠিন ছিল না। বামপন্থী সোস্যালিজমের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আদর্শ ছিল কম্যুনিজিমে সে দিকটির প্রতি খুবই জোর দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক সোস্যালিজম আমায় বেশী দিন ধরে রাখতে পারে নি। সেদিন আমার মত অনেকেই শুধু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জন্যেই কম্যুনিষ্ট হয়েছিল। এর ফলে কমিউনিজম তার মানবিক আদর্শবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে জাতীয়তাবাদী কমিউনিজমে রূপান্তরিত হয়। এ পরিণতির দিকে আমিও যে এগোইনি তা নয়, তবে সময়ে আমি সাবধান হ'তে পেরেছিলাম। এই নতুন মতবাদের ভুল-ত্রুটি ঠিক সময়েই আমার কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সেটা ঘটেছিল মেক্সিকো থেকে যে পথে সেদিন যাত্রা সুরু হয়েছিল তারো পঁচিশ বছর পরে—সে যাত্রা পথের শেষে।" (M. N. Roy's Memoirs—pp 59—60)

যেদিন রায় সোস্যালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারির বাড়ীতে উক্ত পার্টির কার্যকরী সমিতির সভ্যদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে আহুত হ'লেন সে দিনই তাঁর মেক্সিকোর ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা হয়ে গেল। সোস্যালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারির বাড়ী রায়ের অভিজাত পল্লী Colonia Roma থেকে দূরে মধ্যবিত্ত দরিদ্র পল্লীতে অবস্থিত ছিল।

সেক্রেটারি নিজের একটি ছোট ছাপাখানায় নিজের হাতেই পার্টির মুখপত্র The Class Struggle ছেপে প্রকাশ করতেন। সেখানেই রায়কে ডাকা হয়। আলাপ আলোচনার পর রায় তাদের নিকটবর্তী কোন কফিখানায় কফিপানের নিমন্ত্রণ জানান। সকলেই তা সানন্দে গ্রহণ করেন। নিকটেই El Chino নামে এক চীনা কফিখানা ছিল। সেখানে গিয়ে দেখেন, খবরের কাগজের এক সংবাদ নিয়ে সকলে বেশ উত্তপ্ত আলোচনায় মত্ত। সংবাদটি হ'ল, নতুন সংবিধানের ১৭ ধারা সংক্রান্ত। ঐ ধারা অনুসারে দেশের ভূমি খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের রাষ্ট্রীয় করণ হয়েছে। কারাঞ্জা সরকারের ঐ কার্যের প্রতিবাদে আমেরিকা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তৈল খনি প্রভৃতিতে নিজ স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে হুমকি দিয়েছে। আমেরিকার হুমকিতেই এই চাঞ্চল্য।

রায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ বিপদ যদি আসেই তবে তা কাটাবার জন্যে সোস্যালিষ্ট পার্টি কোন্ কর্মসূচী গ্রহণ করছে। সেক্রেটারি জোরের সঙ্গে বললেন, "দুই বুর্জোয়া সরকারের বিবাদে সর্বহারা প্রলেতারিয়েতদের কী করার থাকতে পারে?—আমরা নিরপেক্ষ।"

উত্তর শুনে রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমেরিকা সত্যই যদি আক্রমণ করে এবং তাতে যদি যুদ্ধই বাধে তবে মেক্সিকোর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধেও কি তারা নিরপেক্ষ থাকবেন? সমস্বরে উত্তর এল, "নিশ্চয়"।

অতিমাত্রায় বিস্মিত রায়ের মনে প্রশ্ন জাগল, এই কি সোস্যালিজম? সে দিন রায় চিন্তিত মন নিয়েই ফিরেছিলেন। পথে পার্টির প্রেসিডেণ্ট দুঃখের সঙ্গে বললেন, "আমাদের এটাই হয়েছে বিপদ। এদের সবাই এনার্কো সিণ্ডিক্যালিষ্ট"। সেদিন মার্কসীয় আদর্শবাদী বৃদ্ধকে রায় কোন সান্ত্বনা দিতে না পারলেও মনে মনে সংকল্প করলেন যে, প্রকৃত সোস্যালিজমের জন্যেই তিনি লড়বেন।

সেই দিন থেকেই রায়ের পথ নির্দেশ হয়ে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রায়ের বাস্তব রাজনীতিতে হাতে খড়ি

সে সময় আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বাধ্যতামূলক সামরিক কর্ম থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে বহু যুদ্ধ বিরোধী যুবক মেক্সিকোতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই মেক্সিকো সিটিতে এসে উঠেছিল। যুদ্ধ বিরোধী এই সব পলাতকদের উপহাসের জন্যে আমেরিকান মহলে তাদের নাম ছিল Slackers। তাদের মধ্যে অনেক গুণী ব্যক্তিও ছিলেন। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির ক্ষেত্রে এঁদের কেউ কেউ আমেরিকাতেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট আদর্শ না থাকলেও এঁরা সকলেই আমূল সংস্কারকামী র‍্যাডিক্যাল মতাবলম্বী ছিলেন। রায় এঁদের মার্কসবাদী নীতি ও কার্যসূচীর ভিত্তিতে একটা ঐক্য বিধানের চেষ্টা করলেন এবং অবিলম্বে কৃতকার্যও হলেন।

সে সময় য়ুকাতান প্রদেশের রাজ্যপাল সোস্যালিষ্ট জেনারেল এল্‌ভারেডো প্রেসিডেণ্ট পদের জন্যে পরবর্তী নির্বাচনে স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার মনস্থ করেন, এবং এই পত্রিকার একটি ইংরেজি বিভাগও রাখতে চাইলেন। উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার সমর্থন সংগ্রহ করা। রায় ইতিমধ্যেই এই সোস্যালিষ্ট জেনারেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই পলাতক র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীর চার্লি ফিলিপকে ইংরাজি বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন এবং এঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজন গুণীব্যক্তিকে নিয়ে এক. সম্পাদক মণ্ডলী গঠিত করে যৌথভাবে এই ইংরাজি বিভাগ পরিচালিত করতে লাগলেন।

মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট পদের জন্যে আরো একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি জেনারেল ঔবরগণ। তিনি মিত্র শক্তির সমর্থন লাভ করেছিলেন এবং আমেরিকা তাঁকে সাহায্য করছিল। আমেরিকার অর্থপুষ্ট সংবাদপত্র-

সমূহও জেনারেল ওবরগণের পক্ষে প্রচার কার্য চালাচ্ছিল। জেনারেল এল্-ভারেডো ওবরগণের প্রচার কার্যের প্রতিশেধক হিসাবেই তাঁর এই কাগজ বের করেছিলেন। রায় এই কাগজে ধারাবাহিক ভাবে আমেরিকার "মনরো ডক্‌ট্রিনের" নীতির বিরুদ্ধে লিখতে সুরু করলেন।

শীঘ্রই এঁদের চেষ্টায় El Heraldo কাগজ প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অন্যদিকে রায়ের উদ্দেশ্য যে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষিত মহলকে এবং শ্রমিক সম্প্রদায়কে টেনে এনে একটা বাস্তব রাজনীতি গড়ে তোলা তা ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলল।

তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন যে "The Way to Durable Peace—স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পথ" নামে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা তিনি এখানে স্পেনিশ ভাষায় নিজেই অনুবাদ করেছিলেন। এখন তিনি মনরো ডকট্রিনের বিরুদ্ধে লিখতে সুরু করলেন।

আমেরিকার পঞ্চম প্রেসিডেণ্ট টমাস মনরো ১৮২৩ সালে কংগ্রেসের নিকট এক বাণীতে বলেন যে, আমেরিকা মহাদেশ এখন স্বাধীনতা লাভ ক'রে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। ইউরোপীয় শক্তি সমূহের আর এই মহাদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করা চলবে না।

তারপর যখন নেপোলিয়ানের পতন ঘটিয়ে ইউরোপের 'হোলি এলায়েন্স' ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইল তখন স্পেন তার হৃত উপনিবেশ ল্যাটিন আমেরিকাকে পুনরায় জয় করার জন্যে তোড়জোড় সুরু করল। তখন আমেরিকা ল্যাটিন আমেরিকার মুরুব্বি সেজে স্পেন তথা ইউরোপের অন্যান্য শক্তিকে বাধা দিয়ে আসছিল। অর্থাৎ ইউরোপের খপ্পর থেকে বাচাবার নামে নিজেরাই গ্রাস করে রেখেছিল এবং ক্রমে আমেরিকার ধনীদের মূলধন খাটাবার লাভজনক ক্ষেত্র করে তুলেছিল।

রায় তাঁর প্রবন্ধে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসীদের মুক্ত হবার জন্যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে নিজনিজ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে আহ্বান করেন এবং ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্র সমূহের এক সংঘ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে থাকেন।

রায়ের এই প্রবন্ধ নতুনত্ব, সময়োপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার জন্যে মেক্সিকোর উচ্চ মহলেও সাড়া জাগায় এবং স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জাও প্রভাবিত হন। এই ভাবেই রায়ের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে মেক্সিকোর সোস্যালিষ্টদের ও বুদ্ধিজীবীদের অবাস্তব এবং এনার্কো সিণ্ডিক্যালিজিমের ইউটোপিয়ার পরিবর্তে সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্বদেশের বাস্তব রাজনীতিতে হাতে খড়ি সুরু হল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মেক্সিকোতে রায়ের অনুশীলন
ধর্মের পুনরনুশীলন

জাভায় জার্মান বন্ধুরা রায়ের সঙ্গে সেখানকার প্রবাসী জার্মান সম্প্রদায়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। জার্মানদের মধ্যে একজন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে তিনি ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখতে সুরু করলেন। তাঁর স্মৃতিকথায় যদিও তিনি নিজেকে একজন Indifferent linguist বলেছেন, তথাপি তিনি কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ কয়েকটি ভাষায় কাজ-চালাবার মত জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং তার সংখ্যা এক ডজনেরও বেশী।*

মেক্সিকোর জার্মান রাজদূত ও তাঁর আমেরিকান বিদুষী ও রূপসী স্ত্রী তাঁকে তাঁদের সকল ভোজ সভাতে নিয়মিত নিমন্ত্রণে মেক্সিকোর অভিজাত সমাজের শিরোমণিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন।

রায় তাঁর স্পেনিশ ভাষা ভালভাবে শেখবার জন্যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিলেন। জার্মান রাজদূতের ভোজ সভাতে ইউনিভার্সিটির রেক্টার আসতেন, অন্যান্য নামজাদা অধ্যাপক দু'একজন আসতেন। তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হ'ত। রায় তা থেকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন, এবং সেখানকার জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর পাঠ্য বিষয়ের পুস্তক নির্বাচনে অনেক সাহায্য পেতে থাকলেন। সেই সঙ্গে নানা বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন, এবং তা দূর করার জন্যে দিবারাত্র পরিশ্রম সুরু করলেন।

জার্মান উপনিবেশের কর্তা ব্যক্তি ছিলেন এক লৌহ ব্যবসায়ী। কিন্তু লোহার

* "যুগান্তর" সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে তিনি ১৭টি ভাষা জানতেন।
র, ১৪ই মাঘ, ১৩৬০।

ব্যাপারী হ'লে কি হবে তাঁর বৈদগ্ধের কিছু কমতি ছিল না। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বিদুষী এবং একজন শিল্পী। তিনি রায়ের ছবি আঁকতে চাইলেন। রায়কে সেই জন্যে কিছু দিনের জন্যে তাঁর বাড়ীতে রোজই গিয়ে ত্ব'এক ঘণ্টা করে বসতে হ'ল। সে সময়টা তাঁর বৃথা কাটল না। শিল্প কলা সম্বন্ধে নানা আলোচনায় রায়ের এ দিকের শিক্ষাটাও সুরু হ'ল।

তারপর সুরু হ'ল রায়ের সঙ্গীতের তাত্ত্বিক শিক্ষা। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরস্রষ্টা প্যাবলো কাজাল ও তাঁর স্ত্রী তখন মেক্সিকোতে। তাঁদের নিকট থেকেই তিনি প্রথমে সঙ্গীতের তত্ত্ব শ্রবণ করেন এবং জনৈক পোল পিয়ানো বাদক তাঁকে পিয়ানোর সাহায্যে সে তত্ত্বের বাস্তব শিক্ষাদান সুরু করলেন।

এই সঙ্গে পুরাতন শরীর চর্চা বিষয়ে যে টুকু অপূর্ণতা ছিল সে টুকুর পূর্ণতা দানের প্রচেষ্টাও চলল। যতদিন ভারতে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বৈপ্লবিক গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীর অনিয়মিত জীবন যাপন করতেন ততদিন প্রবল ইচ্ছা থাকলেও অনেক বিষয়েই শিক্ষা ও অনুশীলন করা সম্ভব হয় নি। ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস কিছুতেই করা সম্ভব হয় নি। খুব ভোরের দিকে সে অভ্যাস করতে গিয়েও পুলিশ সাহেবদের চোখে পড়তে হয়েছে। শিল্প-সঙ্গীত প্রভৃতির অনুশীলনের কথা ভাবাও যেত না। প্রথম ছিল শিক্ষকের অভাব, দ্বিতীয় সুযোগের অভাব। বিকশিত ব্যক্তিত্ব সাধনের আদর্শ যে, "জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কাযে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং স্বরসে রসিকতা এই সকল হ'লে তবে মানসিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে, আবার তার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্বাধিক শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই"—তা সংকল্পের মধ্যে অহর্নিশ জেগে থেকে সর্ব চিন্তা ও কর্মকে পরিচালিত করলেও বৈপ্লবিক জীবনের সর্বগ্রাসী কর্মসূচী বিকশিত ব্যক্তিত্বের সাধনার অন্য সকল দিকই গ্রাস করে ফেলেছিল। তাই এখানে সুযোগ পাওয়া মাত্র, যেমন নিয়মিত ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস চলল, তেমনি চলল শিল্প সঙ্গীত চর্চার ব্যবস্থা, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা লাভের চেষ্টা।

রায়ের মেক্সিকোর জীবন যাত্রার ব্যবস্থা দেখে স্বতঃই মনে হয় বঙ্কিমের আনন্দমঠ ও অনুশীলনীর আদর্শে আদর্শবাদী নরেন্দ্রনাথ যেন সেই দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক নির্ধারিত প্রফুল্লর শিক্ষা ও অনুশীলন ব্রত পালন সুরু করলেন। তফাৎ কেবল প্রফুল্লকে শিক্ষা ও অনুশীলনের সুকঠিন ব্রতে ব্রতী করাতে ভবানী পাঠক ছিল, আর এখানে ছিল রায়ের স্বীয় সংকল্পে দৃঢ় মন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভারতে অস্ত্র প্রেরণের শেষ চেষ্টা ও বিপ্লব প্রচেষ্টার পুরাতন পদ্ধতির অবসান

চীন থেকে ভারতে অস্ত্র প্রেরণের রায়ের পুরাতন পরিকল্পনা ১৯১৭ সালের শেষের দিকে জার্মানরা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে রায়ের মনোজগতে নতুন ভাব-বিপ্লব সুরু হয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবের নতুন আদর্শ নতুন কায়দা তখন তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠছিল। শুধু বিদেশী শোষকদের তাড়ালেই চলবে না, সেই সঙ্গে দেশীয় শোষকদের শোষণ বন্ধের ব্যবস্থাও করতে হবে, তবেই ব্যক্তি মানুষের মুক্তির পথ সুগম হবে। কিন্তু পুরোনো সম্পর্কের জট ছেড়েও ছাড়ে না। তিনি পুরানো যোগাযোগের ছিন্ন সূত্র পুনরায় জোড়া দেবার চেষ্টা করেন। আমেরিকায় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে চীনে এবং রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে জাপানে পাঠান। চীনা বিপ্লবীদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থাও হয়। ইউনানে যে নেতার কাছে অস্ত্র সম্ভার আছে তাঁর কাছে পত্র দিয়ে কাজ হবে না বুঝে একজন চীনাকে সেখানে পাঠান। সব দিক থেকেই অতিশয় তৎপরতার সঙ্গে কাজ সুরু হয়ে গেল। চীনদেশে অবস্থিত জার্মানদেরও এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্যে নির্দেশ পাঠান হ'ল। রায়ের জাভার জার্মান অফিসারটি নিজ তত্ত্বাবধানে সব কিছু ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্যে অবিলম্বে দূর প্রাচ্যে চলে গেলেন। প্রয়োজন হ'লে রাসবিহারীর সঙ্গেও দেখা করবেন। যুদ্ধের সময় একজন জার্মান জাপানে যাবে কি করে, একথা প্রশ্ন করাতে তিনি রায়কে বলেছিলেন যে, কাগজে পত্রে জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও আসলে তারা জার্মানীর শত্রু নয়। সুতরাং অন্য কোন দেশীয় লোকের ছদ্মবেশ নিলেই জাপানী পুলিশ জেনে

শুনেও চুপ করে থাকবে। অন্যান্য লোকজন পাঠাবার জন্যে রায়ের হাতে আরো কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হ'ল। রায় তখন মহা মুস্কিলে পড়লেন। চীন দেশ থেকে জার্মান রাজদূতের কথা মতই তিনি বার্লিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য জার্মানদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণে তখন তাঁর নীতিগত বাধা ছিল না এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমেরিকাতে আসা এবং আমেরিকার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া এবং কপর্দ্দকহীন অবস্থায় মেক্সিকো পলায়ন। সেই কপর্দ্দকহীন অবস্থায় জার্মান সাহায্য গ্রহণ তিনি তাঁর ন্যায্য-দাবী রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারপর যখন তিনি কেবল মাত্র আর জাতীয় বিপ্লবে আস্থাবান ন'ন এবং যুদ্ধের শেষকালে যখন জার্মানদের ভাঁওতা-বাজির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে সব বিপ্লবীই ধরা পড়ে গেছে, তখন এই অস্ত্র পাঠাবার অনিশ্চিত কারবারের নামে আরো অর্থ গ্রহণ করা তাঁর বিবেকে বাধল। টাকা পয়সা গ্রহণ সম্বন্ধে বাচবিচার অন্যান্য বিপ্লবীদের না থাকলেও রায়ের যে ছিল সে কথা আমরা লালা লাজপত রায়ের ডায়রি থেকে দেখেছি। এই সময় রায় যে মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলেন এবং কোন্ যুক্তিতে যে তিনি শেষ পর্যন্ত সে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর ভাষাতেই বলি :

> জাভা থেকেই দেখে আসছি জার্মানরা টাকা পয়সা বের করতে বর্তমানের মত এতখানি ব্যগ্রতা কখনো প্রকাশ করে নি। তাদের বর্তমানের এই উদারতায়, যে কারণেই হোক, আমি এক মস্ত বড় নৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম। যে উদ্দেশ্যে টাকাগুলি দেওয়া হচ্ছে সে উদ্দেশ্যে যদি আমি এর সবটুকু খরচ করতে না পারি তবে কি আমার পক্ষে তা এখনই গ্রহণ করা উচিৎ হবে? অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেককে কি ভাবে কাজে লাগিয়ে জার্মানরা এ যাবৎ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এসেছে সে সব কথা আমার মনে পড়ল। ডজন ডজন বিপ্লবী, বিশেষ করে গদর পার্টির লোকেদের কয়েকটি পিস্তল আর কয়েকশত ডলার দিয়ে সামান্য কিছু গোলমাল বাধাবার উদ্দেশ্যে ভারত অভিমুখে পাঠিয়েছে, এবং সেই সব সংবাদ জার্মানীর খবরের কাগজে বেশ ফলাও করে ছাপিয়ে জার্মানীর জনসাধারণের নৈতিক বল অটুট রাখার জন্যে ভাঁওতা দেওয়া হয়েছে এই বলে যে ভারতে বিদ্রোহ আসন্ন।

জার্মান ভাঁওতাবাজির এই সব সরল বুদ্ধি শিকারেরা মনে মনে এই আশায় মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ত যে, স্যান ফ্রান্সিসকো-র নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত গদর পার্টির সদর দপ্তর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় যে সব ভারতীয় সৈন্য আছে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ পথেই গ্রেপ্তার হ'ত, এবং জেলে পচত। সামান্য যারা গন্তব্য স্থলে পৌছতে পারত তারা সেখানে ধরা পড়ে ফাঁসি যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে সৈন্যরাই এই সব বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছে। জার্মান ভাঁওতা বাজির বলিদানের সে সব মর্মান্তিক কাহিনী এখনো লেখা হয় নি। এই মর্মান্তিক কাহিনীর শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়েছিল স্যান ফ্রান্সিসকো-র আদালতে হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময়।

এই মামলার কয়েকজন ভারতীয় আসামী দূর প্রাচ্যে ধরা পড়েছিল। জার্মান ভাঁওতা-বাজির এই সব বলির প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এদের মধ্যেই একজন গদর পার্টির নেতাকে কাঠগড়ার মধ্যেই রিভালভারের গুলিতে হত্যা করেছিল।

এ যাবৎ জার্মানদের হৃদয়হীন ব্যবহার আমার হৃদয়কেও তাদের প্রতি কঠিন করে তুলেছিল এবং তাদের সম্বন্ধে আমার বিবেকও অনুরূপভাবেই মরে গিয়েছিল। চীনে আমি নিজে তাদের এই হৃদয়হীন ব্যবহার পেয়েছি। সে সময় যখন আমি ভারতের একেবারে সীমান্তে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র পেতে পারতাম তখন তারা অর্থ সাহায্য করল না। ভবিষ্যতে এ সুযোগ যদি আর নাই আসে তবে আমি এখনই কেন না ভবিষ্যতের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করে রাখি? তা ছাড়া জার্মানরা যখন এগিয়ে আসছে তখন আমি আর একবার চেষ্টা করেই দেখি না কেন যদি পরিকল্পনাটি সফল করে তুলতে পারি। সে ক্ষেত্রে সব সময়েই প্রতি পদক্ষেপে জার্মানদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাও কোন কাজের কথা নয়। যদি পুনরায় সুরু করতেই হয় তবে চীন যাত্রার পূর্বেই আমাকে যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। সুযোগ যখন এসেছে তখন এটা ছাড়া ঠিক হবে না। ভারতে আমরা অর্থ সংগ্রহের জন্যে ডাকাতি করেছি, তার জন্যে অনেক সময় নির্দোষ মানুষও মরেছে।

> উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন উপায়ের ভাল-মন্দ বিচারের প্রয়োজন কি ? অর্থ ত বিপ্লব ও মুক্তি যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হবে। আমি ত এখনো সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে চলেছি। সুতরাং এই অর্থ আমি স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করতে পারি। (Ibid pp 90-91)

রায়কে ৫০,০০০ পেসো-র (লক্ষাধিক টাকা) স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হ'ল। সবই থাকত সহরের এক প্রান্তে জন বিরল অঞ্চলে অবস্থিত তাঁর বাসা-বাড়ীতে। সে-সময় তিনি নিরাপত্তার জন্যে কয়েকটি বন্দুক পিস্তল ও একটি এলসেসিয়ান কুকুর পুষেছিলেন। বছর খানেক পরে যখন কুকুরটি মারা যায় তখন রায়ের মনে এমনই আঘাত লাগে যে, তিনি প্রায় ত্রিশ বছর পরে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

> "কোন মৃত্যুই আমায় এমন করে হারিয়ে যাবার ব্যথা দিতে পারে নি। আমি আর কখনো কুকুর পুষি নি। যে ডাক্তার তার চিকিৎসা করেছিলেন, মৃত্যুর পর তার চামড়াটা মাউন্ট করে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি নি। যে প্রিয় বন্ধু আমার কতই না প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা ছিল, তারই মৃতদেহটিকে অহর্নিশ কি করে দেখব।"

এই উদ্ধৃতি থেকে রায়ের মত বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্বের স্নেহ কোমল দিকটির পরিচয় আমরা খানিকটা পেতে পারি। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আর কোন দিন কুকুর পুষতে পারেন নি সেজন্যে মূল্যও কম দিতে হয় নি। দেরাদুনেও তাঁর বাড়ী ছিল সহরের এক প্রান্তে জন বিরল অঞ্চলে। এক আধটি কুকুর যদি থাকত তবে শ্রীমতী এলেন ছিঁচ্‌কে চোরের হাতে মারা পড়তেন না।

যে সিন্ধুকে এই সোনার বাট ছিল, তার মামুলি কোন চাবি ছিল না। তাতে সমস্ত সংখ্যাগুলি লেখা একটি ডায়াল ছিল। বন্ধের সময় যে সংখ্যাটি থাকবে খুলবার সময়ও সেই সংখ্যাটি ডায়াল ঘুরিয়ে রচনা করতে হবে। সংখ্যাটি ভুললেই মুস্কিল—সিন্ধুক আর খুলবে না। নিরাপত্তার জন্যে সংখ্যাটি না লিখে মনে মনে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে মানুষের বিস্ময়ের সীমা থাকত না তাঁরই সংখ্যা মনে পড়ত না। সেই জন্যে সংখ্যাটিকে তাঁর লিখে রাখতে হ'ত। "I could never remember numbers"—Ibid

প্রিয় কুকুর সহ মানবেন্দ্রনাথ—মেক্সিকো ১৯১৭

অবশ্য এই সোনাব বাটের ঝুঁকি তাঁকে বেশী দিন বইতে হয় নি। শীঘ্রই ভারতের পলাতক বিপ্লবীদের অনেকেই—যাঁদের কথা লালা লাজপত রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছিলেন—ভারতে যাবার নাম করে কিছু কিছু নিয়ে যান, কিছু ভারতের বিপ্লবীদের জন্যে ভারতে পাঠান, কিছু মেক্সিকোর কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের জন্যে ব্যয় করেন, বাকি বরোদিনের জন্যে ও নিজের রুশিয়া গমনের জন্যে ব্যয় হয়ে যায়।

রায় যে অফুরন্ত স্বর্ণ ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন এ সংবাদ শীঘ্রই পলাতক বিপ্লবী ও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই সেই অর্থের ভাগ নিতে আসেন। যাঁরা পান তাঁরাও আরো বেশী কেন পেলেন না তার জন্যে রায়ের নিন্দা সুরু করেন, আর যাঁরা পেলেন না তাঁরাও তাঁকে গালমন্দ করতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত জার্মানী থেকে কাইজারের খাস পরামর্শ সভার সদস্য এসে পৌঁছলেন, তখন ১৯১৭ সাল শেষ হয়ে আসছে। তখন জারের পতনের পর রুশ সৈন্যদের মধ্যে লেনিনের যুদ্ধ-বিরতি আন্দোলনে ও কয়েক বছর ধরে যুদ্ধের দুঃখ-কষ্ট ভোগের ফলে রুশ সৈন্যবাহিনীর মনোবল নষ্ট হয়ে যায় এবং পূর্ব রণাঙ্গন এক প্রকার স্তব্ধ হয়ে আসে। তখন জার্মান বাহিনীর সম্মুখে উক্রেণের মধ্যে দিয়ে ককেসাস পার হ'য়ে ভারত আক্রমণ একটী সম্ভাবনার মধ্যে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে জার্মান হাই-কম্যাণ্ড ভারতের বিপ্লবীদের সর্ব-প্রকারে সাহায্য করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। এতদিন যে সাহায্য মৌখিক মাত্র বা যৎসামান্য মাত্র ছিল তা এখন অতি মাত্রায় উদার হয়ে যায়।

মাননীয় সদস্য মহাশয় রায়কে বললেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গণে আরো কিছুদিন শত্রুকে আটকে রাখতে হবে। তার জন্যে আমেরিকাকে তার পাশ্চাদ্দেশ থেকে আক্রমণ করতে হবে। মেক্সিকো থেকেই সে আক্রমণ চালাতে হবে। প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা যাতে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আমেরিকার মনরো নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে তুলতে পারেন সেজন্যে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। আমেরিকা ও কানাডাতে ব্যাপকভাবে অন্তর্ঘাত-মূলক কাজকর্ম চালানো হবে।

জার্মানীর অন্যতম কর্তৃপক্ষের মুখ থেকে তাঁদের মহাসমরের গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজির বিবরণ শুনে এবং তাঁর যোগ্যতার প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা দেখে

রায়ের মন গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিল। এই গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজির অন্যতম প্রধান রণাঙ্গন ভারতবর্ষের অন্তর্বিদ্রোহের দায়িত্ব তার উপর দেওয়াতে একদিকে যেমন তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল, অন্যদিকে পুনরায় দূর প্রাচ্যের ও ভারতে পুনরায় দুঃসাহসিক সব কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনায় জন্ম-রোমান্টিক ও দুঃসাহসিক রায়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। জার্মান ষ্ট্র্যাটেজিতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করার জন্যে তাঁর অনেকদিনের পরিকল্পিত দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যবিধান পরিকল্পনাটি গ্রহণ করায় তিনি খুবই উৎসাহ বোধ করেছিলেন, এবং তখন সেই ১৯১৭ সালের শেষে চীন থেকে ভারতে অস্ত্রসম্ভার প্রেরণ করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের সম্বন্ধে যত না নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন, আমেরিকার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র-সমূহকে সংঘবদ্ধ করার সাফল্য সম্বন্ধে তদপেক্ষা বেশী নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। তথাপি তাঁকে ভারতে অস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থার জন্যে চীন যাবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়েছিল—কারণ পরিকল্পনাটি একান্ত তাঁরই ছিল এবং অন্যের দ্বারা সে কাজ সম্পন্ন করাও সম্ভব হচ্ছিল না।

কাইজারের পরামর্শদাতা মেক্সিকো ত্যাগ করার আগে এক ডিনার পার্টিতে রায়কে প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। রায় বলেছেন, সেই ডিনার পার্টিতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী পর্যায়ের দিক নির্ণয় হয়ে গেল—"The third and last meeting with him after a few days launched me on the next stage of my political career. "(Ibid pp 95).

প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা কাইজার প্রতিনিধির নিকট থেকে রায়ের প্রস্তাবিত অভিযান সম্বন্ধে সবই শুনেছিলেন, এবং Heraldo-তে প্রকাশিত রায়ের প্রবন্ধে এই ল্যাটিন আমেরিকান সংঘ গঠনের পরিকল্পনাটি যে রায়েরই মৌলিক চিন্তা প্রসূত এবং কাইজার প্রতিনিধির নিকট থেকে শোনার পূর্বেই তাঁরই দেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সে কথা স্মরণ করে প্রেসিডেণ্ট বললেন যে, দূরপ্রাচ্যে যাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে তার সরকার সব সাহায্যই করবেন। যদি পুনরায় রায় মেক্সিকোতে ফিরে আসেন তা'হলে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার সংঘ প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় তাঁর সাহায্য সাগ্রহে গ্রহণ করবেন। প্রেসিডেণ্টের সেদিনকার হৃদ্যতায় রায় মুগ্ধ ও অবাক হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রস্তাবটি গ্রহণ

করার জন্যে মনটিও ঝুঁকেছিল। দেখা যাবে যে, শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের শেষ ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছিল।

তিনি তাঁর সদা-জাগ্রত সৃজনশীল উদ্যোগী মন দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে এই ল্যাটিন আমেরিকাকে সংঘবদ্ধ করে একটি মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি গড়ে তোলার জন্যে কয়েকটি চমৎকার উপাদান বিদ্যমান এবং সে ক'টি উপাদানকে কাজে লাগাতে তিনি পারেন—শেষ পর্যন্ত তিনি তা পেরেও ছিলেন।

ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের কোনটির পিছনেই তখন জনগণের সক্রিয় সমর্থন ছিল না। ফলে তাদের শক্তিও তেমন বেশী কিছু ছিল না। অথচ সব রাষ্ট্রই কম বেশী আমেরিকান বিরোধী ছিল। রায় ভাবলেন, এই সব রাষ্ট্রের সরকারকে দিয়ে যদি জনগণের সুখ-সুবিধার কার্যক্রম গ্রহণ করান যায় তাহ'লে এই সকল রাষ্ট্র জনগণের সক্রিয় সমর্থন লাভ করে শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং জনগণেরও লাভ হবে। তখন তাদের সংঘবদ্ধ করে সমাজতন্ত্রের পথে পরিচালিত করতে সুবিধা হবে। এই কাজ মেক্সিকো থেকে সুরু করতে হবে, কারণ সেখানেই এই সব উপাদানের সঙ্গে রায়ের পরিচয় সম্যক ও প্রত্যক্ষ, কিন্তু সে কাজ তখুনি সুরু করা গেল না। ভারতে অস্ত্র প্রেরণের দুঃসাহসিক অভিযানের নেশার আকর্ষণ থেকে তখনো তিনি মুক্ত হ'তে পারেন নি।

চীন যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন সুরু হ'ল। সব ব্যবস্থাই নেপথ্য থেকে হয়ে গেল। রায় কিন্তু তখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। এখানে রায়ের সেই সময়কার মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর স্মৃতিকথা থেকে :

> অস্ত্রের খোঁজে এক মহা দুঃসাহসিক অভিযানে চীন প্রত্যাগমনের সব কিছু উদ্যোগ-আয়োজন নেপথ্য থেকে হয়ে গেল। আমার কিন্তু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অন্ত ছিল না। এ অভিযানে আমার মন ছিল না, তথাপি কেবল অভ্যাস বশতঃই এগিয়ে চলেছিলাম, কিন্তু মনে জোর পাচ্ছিলাম না। দেড় বছর ধরে এক জন বিপ্লবী যুবক যে মরীচিকার পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে আজ আর সে উদ্দেশ্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। কিন্তু মুক্তিলাভের নতুন আদর্শের টানও তখন এতখানি প্রবল হয়ে ওঠে নি যা আমার পূর্বসংস্কার থেকে আমাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে। তবে এই চিন্তা আমি

করেছিলাম যে, যদি আমি অস্ত্র সম্ভার নিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হই তবে আমার বন্ধুরা কেবল অস্ত্রই পাবে না, সেই সঙ্গে পাবে মুক্তিযুদ্ধের এক নতুন আদর্শ। এ আদর্শ তারা নেবে কি নেবে না সে কথা আমি ভাবিই নি। কেন নেবে না? দরিদ্রের ও নিপীড়িতের মুক্তিই কি আমাদের আদর্শ ছিল না? বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ'ই ত ছিল আমাদের সকলকার প্রেরণার উৎস, তারই মধ্যে ছিল আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শ। সত্যসত্যই আমরা আনন্দমঠের প্রধান সব চরিত্রগুলি আমাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলাম। তারা সবাই সন্ন্যাসী ছিল। তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার সংকল্প ছিল আমাদের। তখন আমরা সব ভাবতাম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপরাংশের কোন এক স্থানে আনন্দমঠ গ'ড়ে সেখানকার মানুষকে আমাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে অস্ত্রশস্ত্রে, সুসজ্জিত অজেয় এক মুক্তি ফৌজের পুরোভাগে থেকে দেশের অভ্যন্তরে অভিযান সুরু করব। এই সব কথা আমার মনে পড়ল এবং ভাবলাম, এবার আমার প্রচেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহ'লে এবার আমি আর কেবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই ফিরছি না, সেই সঙ্গে ফিরছি বিপ্লবের এক নতুন ভাব ও ভাবনা নিয়ে। (Ibid pp 98)

আমেরিকার উপর দিয়ে চীনে যাওয়া চলবে না। সেই জন্যে মেক্সিকো থেকেই চীন অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। স্থির হ'ল যে-জাপানী জাহাজটি দক্ষিণ আমেরিকার বন্দরে মাসে একবার আসে সেই জাহাজে চড়েই রায় যাত্রা করবেন। জাপানে যেতে এখন আর বাধা নাই। তাঁর সঙ্গে থাকবে মেক্সিকো সরকারের কূটনৈতিক পাশপোর্ট, আর থাকবে জাপানে মেক্সিকোর কনসাল জেনারেলের নিকট পরিচয় পত্র। জাপানী ব্যাঙ্কের মারফৎ টাকাকড়ি যাতে রায় পেতে পারেন তার জন্যে তিনি যেন রায়কে ব্যাঙ্কের নিকট পরিচিত করতে সাহায্য করেন, এইরূপ নির্দ্দেশও তাঁর প্রতি ইতিমধ্যে পাঠান হয়েছে। মেক্সিকোর পল্লী অঞ্চলে তখনো অরাজকতা চলেছে। তখন মেক্সিকো নগরী থেকে সেই দুর্গমপথ অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের কোন বন্দরে পৌঁছান সহজ ছিল না। মেক্সিকো সরকারের সহায়তায় সামরিক বাহিনীর পাহারায় তিনি মাঞ্জানিলো বন্দরে পৌঁছলেন। কিন্তু গিয়ে শুনলেন যে, তামাক বোঝাই করতে জাপানী জাহাজ আসে বটে কিন্তু তার আসার কোন স্থিরতা

নাই। অন্য বন্দরে জাহাজ যদি ভর্তি হয়ে যায় তবে তা-আর আসে না। এই অবস্থায় তিনি অন্য জাহাজে করে আরো দক্ষিণে চললেন। উদ্দেশ্য স্যালিনা-ক্রুজ বন্দরে গিয়ে জাপানী জাহাজ ধরা, কিন্তু সেখানে গিয়ে কয়েকদিন থাকার পর শুনলেন যে, চিলিতেই জাহাজ ভরে যেতে সেটি আর আসবে না। মাসাধিককাল অপেক্ষা করলে পরবর্তী জাহাজ আসলেও আসতে পারে। সেটি সম্বন্ধেও যে এই জাহাজটির মতই খুব নিশ্চয়তা আছে তাও নয়। একদিকে এত দিন পরে ভারতের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা, চীনের ইউনানী নেতার নিকট থেকে অস্ত্র প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, তারপর এই জাহাজ পাওয়ার অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে মেক্সিকোতে প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ ফেলে আসা আরব্ধ কর্মের পিছুটান তাঁর মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে দূর করে দিল। এই সময়কার তার মনের অবস্থাটা তাঁর ভাষাতেই বলি :

> "মাসাধিক কাল পরে কবে জাহাজ আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করা চলতেই পারে না। আর এক উপায় হ'তে পারে। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে একটা জাহাজ পাওয়া যাবে, যাতে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকার ভ্যাল পারেসো পর্যন্ত গিয়ে তাতেই অনিশ্চিত কাল ধরে বাস করা—একদিন না একদিন জাপানে পৌছান যেতে পারবে। কিন্তু সেটি সম্ভব নয়। এই অবস্থায় অতিশয় বিরক্তিতে ও হতাশায় মনটা ভরে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে, যে উদ্দেশ্যের প্রতি আমার মন ছিল না সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় ঘাড়-থেকে-বোঝা-নেমে-যাওয়ার আরাম অনুভব করতে সুরু করলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, এতদিন পরে এই বুনো হাঁসের পিছনে ছুটতে সত্যই আমার মন ছিল না। মেক্সিকোই আমায় ডাকছে সেখানেই আমার স্থান। সেখানে আমার নতুন বন্ধু মিলেছে, জীবনের নতুন স্বাদ পেয়েছি, নতুন রাজনৈতিক জীবন সুরু করার সকল প্রারম্ভিক ব্যবস্থাও সম্পন্ন করেছি। অপর দিকে সেই পুরাতন দুঃসাহসিক জীবন সুরু করার সব পথই প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। একদিকে গন্তব্যস্থানে পৌছানোর অনিশ্চয়তা অন্যদিকে মেক্সিকোর জীবনের প্রতি আকর্ষণ—শেষ পর্যন্ত আমাকে মেক্সিকো-সিটিতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হ'ল।" (Ibid 102-103)

মেক্সিকো-নগরীতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পানামা যোজকের উপরে স্থলপথে আরো বিপদসঙ্কুল পথ ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে আটলান্টিক উপকূলে এলেন। তারপর নানা ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদ আপদ কাটিয়ে কলা বোঝাই মাল বোটে চড়ে ভেরাক্রুজ বন্দরে এসে রেলপথে মেক্সিকো নগরে ফিরে এলেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গিয়ে সুরু হ'ল রায়ের জীবনের পরবর্তী যুগ।

নবম পরিচ্ছেদ

মেক্সিকোর রাজনীতিতে রায়ের সক্রিয় অংশ গ্রহণ

অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে পাঠানোর যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আড়াই বছর আগে ভারত ত্যাগ করেছিলেন, অস্ত্র প্রেরণের শেষ প্রচেষ্টা এইভাবে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রায়ের সে রাজনীতির অবসান ঘটল। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে কিছু করা আর সম্ভব হবে না বুঝে তিনি মেক্সিকোর বৈপ্লবিক রাজনীতির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিলেন।

সোস্যালিষ্ট নেতাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন আমেরিকার সম্ভাব্য আক্রমণের বিষয় নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল এবং সে সময় তাঁদের নিরপেক্ষতার নীতিকে খণ্ডন করার যে সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা এবার সফল করে তুলতে মনোনিবেশ করলেন। তিনি সেই উদ্দেশ্যে একদিকে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকে এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট মনোভাবকে মার্কসবাদের সাহায্যে খণ্ডন করে সোস্যালিজিমকে একটি রাজনৈতিক শক্তিরূপে গড়ে তুলতে চাইলেন। অন্যদিকে বিদেশী আক্রমণের সময় একটি দৃঢ়বদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা যাতে গড়ে ওঠে তার জন্যেও চেষ্টা সুরু করলেন।

ল্যাটিন আমেরিকার সব ক'টি রাষ্ট্রেই যদি এই ভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীকে সোস্যালিজিমের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা যায় তা হ'লে সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতির উপর প্রস্তাবিত ল্যাটিন আমেরিকান ইউনিয়ানকে একটি সত্যিকারের শক্তিশালী সংস্থা রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং তখন মার্কিনী অভিযানকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে না।

মেক্সিকোতে বিপ্লবের নামে সামরিক নেতাদের ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে কোন রাজনৈতিক আদর্শ বা অর্থনৈতিক কর্মসূচী না থাকায় তা সহজেই লুঠ-পাট ও

অরাজকতায় পর্যবসিত হয়ে আসছিল, ফলে সহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই সব সামরিক নেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে নিজেদের যে দূরে রাখত সে কথা পূর্বেই আমরা বলেছি।

দেশের রাজনীতি থেকে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় এই ভাবে দূরে থাকার ফলে, জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির কোন প্রচারই সম্ভব হয় নি। ভাবালুতা মিশ্রিত এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট মতবাদ সামান্য কিছু শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেও তাতে তারা কেবল রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রাখতেই শিখেছিল, তাদের মতবাদে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীর স্থান ছিল না। অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সামজিক দায়িত্ববোধ ও শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও ব্যাপকতা জাতির সুস্থ রাজনীতির পক্ষে যেমন প্রয়োজন, বিদেশী শক্তিবর্গের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ নিরোধের পক্ষেও ঠিক তেমনি অপরিহার্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে সে সময় যে সব উপাদান সে দেশের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, নিজ অনুশীলিত মার্জিত ও বিকশিত মেধা শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বলে সেই সব উপাদানগুলির সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে রায় মেক্সিকোতে সামাজিক ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগঠনমূলক কার্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

তিনি মেক্সিকো নগরে ফিরে এসেই একদিকে যেমন স্যান্টিবানেজের সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে দেখা করে সেই সময়কার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচী প্রণয়নের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা সুরু করে দিলেন, তেমনি অন্যদিকে প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জার সঙ্গেও দেখা করার ব্যবস্থা করলেন। রায়ের চীন গমনের ব্যবস্থা প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জাই করে দিয়েছিলেন। সুতরাং যে পরিস্থিতিতে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল তা তাঁর সামনে পেশ করতেই হয়। রায় যে চীনের সেই বুনো-হাঁসের পিছনে দৌড়ানোর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে মেক্সিকোর বাস্তব রাজনীতিতে এসে হাত লাগালেন তাতে যে কারাঞ্জা খুশী হলেন, তা পরবর্তী ঘটনা থেকে বোঝা গেল।

১৯১৭ সালের একেবারে শেষের দিকে আমেরিকার সঙ্গে মেক্সিকোর সম্বন্ধটি খুবই খারাপ হয়ে উঠল। কাইজারের নিজস্ব প্রতিনিধির আসার পর থেকে মেক্সিকোতে জার্মান প্রভাব খুবই বেড়ে গিয়েছিল। জার্মানীর অর্থে মেক্সিকোতে এক শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। ফলে বার্লিন-মেক্সিকো

থেকে যে কেবল মিত্র পক্ষ বিরোধী প্রচার কার্যই চালানো হচ্ছিল তাই নয়, আমেরিকা-কানাডার মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মও ওখান থেকে পরিচালিত হচ্ছিল। এই সব জার্মান কাজ কর্ম ও প্রভাবকে ব্যাহত করবার জন্যে আমেরিকাও মেক্সিকো সরকারের উপর খুব চাপ দিতে সুরু করেছিল। মিত্রশক্তির অর্থপুষ্ট কয়েকখানি সংবাদ পত্র কারাঞ্জা সরকারকে জার্মানীর সমর্থক ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছিল। এমন কি মিত্র শক্তির পক্ষে যোগ না দিলে এই সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্ররোচনা দিতেও তাদের বাধছিল না। কিন্তু সে সময় কারাঞ্জা সরকার সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এমনই নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলছিলেন যে, এদের বিরুদ্ধে কিছু করতেও পারছিলেন না। তাদের সমর্থন ছিল জেনারেল ঔবরগণের প্রতি, এবং সামরিক বাহিনীর উপর জেনারেল ঔবরগণের কিছুটা প্রভাব ছিল।

আমেরিকার সঙ্গে মেক্সিকোর শত্রুতা চরমে উঠল মেক্সিকোর সংবিধানের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় অধিকারের ধারাটি নিয়ে। যে সব তেলের খনি আমেরিকার মূলধনে গড়ে উঠেছিল সে সব তেলের খনিকে সরকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে চাইলে আমেরিকা সৈন্য পাঠাতে চাইল। এমন কি আমেরিকার সীমান্তে মেক্সিকো দস্যুদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার অজুহাতে কিছু সৈন্য মেক্সিকোর অভ্যন্তরে প্রবেশও করল। রাজধানীতে আমেরিকার বিরুদ্ধে একদিকে যেমন জনসাধারণ ক্ষেপে উঠল, অন্য দিকে কারাঞ্জা সরকারও প্রমাদ গণলেন।

সাধারণভাবে সকলের মধ্যেই আমেরিকাবিরোধী মনোভাব জেগে উঠলেও, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে করণীয় কিছু আছে তা তারা মনে না করে নির্লিপ্তই থাকছিলেন।

এই বিপদ থেকে মেক্সিকোকে বাঁচাবার জন্যে সরকারের এক মাত্র ভরসা ছিল সামরিক বাহিনী কিন্তু সামরিক বাহিনীও খুব নির্ভরযোগ্য ছিল না। জেনারেল ঔবরগণের প্রভাব তাদের উপর খানিকটা ছিল। তার উপর উপর্যুপরি গৃহযুদ্ধের ফলে সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঘুষ ও টাকার খেলা খুবই চালু হয়ে গিয়েছিল এবং ঔববগণের হাতে মিত্রশক্তির টাকার অফুরন্ত যোগান ছিল। এই যখন অবস্থা তখন সরকার সর্বত্রই দোসর খুঁজে বেড়াবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক।

প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার প্রাক্তন প্রাভেট সেক্রেটারী লে মুজের মডার্ণা পত্রিকার সম্পাদিকা একদিন এক চা পার্টিতে রায়কে নিমন্ত্রণ জানালেন। রায় দেখলেন, এই চা পার্টি সাহিত্যিক-সংবাদিকের নয়, এর অধিকাংশই রাজনৈতিক জগতের ও সরকারী লোক। নিমন্ত্রিতের মধ্যে বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন, পার্লামেন্টের সোস্যালিষ্ট প্রেসিডেন্ট ডন ম্যানুয়েল আছেন। মন্ত্রী একান্তে রায়কে অনেক কথা বলে শেষে বললেন, যদিও সরকার তাঁর নিরাপত্তার জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন তথাপি সাবধানে থাকতে হবে।

আলোচনায় ডন ম্যানুয়েল স্পষ্টই বললেন যে, মেক্সিকোতে সব সোস্যালিষ্টদেরই উচিৎ ঐক্যবদ্ধ হওয়া, কিন্তু এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট মতাবলম্বীদের জন্যেই এটা হ'তে পারছে না। রায় এতদিন ধরে এরই জন্যে মাটি তৈরি করে আসছিলেন। তিনি সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং জানালেন যে তাঁরা যদি যোগ দেন তা হ'লে তিনি এনার্কো সিণ্ডিক্যালিষ্টদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, এবং মেক্সিকোতে এক ঐক্যবদ্ধ সোস্যালিষ্ট পার্টি অচিরে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। সেই সঙ্গে রায় এও বললেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি ঠেকাবার জন্যে অবিলম্বে শ্রমিক শ্রেণী থেকে আমেরিকার এই আক্রমণাত্মক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা উচিৎ এবং তা সম্ভবও।

"কিন্তু কী করে সম্ভব ?"

রায় বললেন, "দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট করে পেট্রোলিয়াম শিল্পকে অচল করে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য তার আগে রাজধানীতে গণ-প্রতিবাদ জানাতে হবে।"

শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ ভাবে যে এটা করতে পারবে তা'তে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলে রায় বললেন যে, সরকারের দিক থেকে শ্রমিকদের সুখ সুবিধা বিষয়ে যদি অবিলম্বে কিছু ঘোষণা করা যায়, তা হ'লে এটা সম্ভব করে তোলা অসম্ভব হবে না। কিন্তু সর্বাগ্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

সেই চা পার্টিতেই মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি করেই স্থির হয়ে গেল যে, সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট স্যান্টিবানেজ ও তাঁদের কতিপয় বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে রায় কথাবার্তা বলবেন এবং রায় প্রেসিডেন্টে কারাঞ্জার সঙ্গে দেখা করে শ্রমিকদের তরফ থেকে তাদের দাবী সম্বন্ধে পরিকল্পনা পেশ করবেন। এই সব বুর্জোয়া রাজনীতিকগণের সঙ্গে এইরূপ উচ্চ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও

কূটনৈতিক আলোচনার সময় তাঁর বামপন্থী বৈপ্লবিক উৎসাহ ও ব্যস্ততাকে যে অনেকখানি সংযত করেই চলতে হ'বে রায় তা অবশ্যই বুঝেছিলেন। রায় এই সময়ের কথা তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন :

> বৈদেশিক মন্ত্রী মহাশয় শিক্ষা ও স্বভাবের দিক থেকে যতটা না ছিলেন স্পেনীয় তার চেয়ে ঢের বেশী ছিলেন ফরাসী। প্রথমেই তিনি আমার পরিকল্পনাটি যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করতে চাইলেন। তিনি সোস্যালিষ্ট ছিলেন না বটে, কিন্তু গণতন্ত্রে ও সামাজিক ন্যায়-নীতির উপর তাঁর আস্থা ছিল। একজন নতুন মার্ক্সিষ্ট ইউটোপিয়ান, অতি আগ্রহের বশবর্তী হয়ে যে প্রথমেই কম্যুনিজিমের দিকে ঝুঁকেছে, তার পরিকল্পনাটিকে তিনি তাঁর বুর্জোয়া যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক মন দিয়েই দেখলেন। তখন আমার বৈপ্লবিক উৎসাহ যতই উগ্র থাক এইরূপ সব গুরুতর বিষয়ে এই সব উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির বিশ্বাস ভাজন হওয়াতে আমার নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিজেরই ধারণা বেড়ে গেল। তার ফলে আমার আপোষহীন বৈপ্লবিক একগুঁয়েমি নরম হ'য়ে এল। (Ibid pp 116)

রায়ের প্রথম চেষ্টা হ'ল আমেরিকা পলাতক র‍্যাডিক্যাল 'slackers'-দের পুনর্গঠিত সোস্যালিষ্ট পার্টিতে এনে পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে নেতৃত্বের তাত্ত্বিক দিকটির শক্তি বৃদ্ধি করা। সেই জন্যে তিনি প্রথমেই তাঁদের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজ মতে নিয়েও এলেন। সকলেই শেষ পর্যন্ত রাজি হ'লেন যে, তারা মেক্সিকোর শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তাদের বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করবেন। সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রেসিডেণ্ট স্যান্টিবানেজ এই সংবাদে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সিদ্ধান্ত হ'ল, এই সব সভ্যদের প্রথমে পার্টিতে গ্রহণ করা হ'বে, পরে এক গণ-সমাবেশে এদের জন সাধারণের নিকট পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। শীঘ্রই রায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যাশিত ঘটনাসমূহ ঘটে যেতে লাগল।

দশম পরিচ্ছেদ

রায়ের প্রথম পুস্তক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান

El Pueblo ও El Heraldo পত্রিকাতে রায়ের যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন। এটাই রায়ের প্রথম পুস্তক। এই উপলক্ষে লে মুজের মডার্ণার সম্পাদিকা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কাসাস প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্বজ্জন, সেনানী, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পার্লামেণ্টের প্রেসিডেণ্ট ও কতিপয় বামপন্থী রাজনীতিকও উপস্থিত ছিলেন। একজন কবি রায়কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে বললেন যে, ভারত থেকে একজন জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক আমেরিকার অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে ল্যাটিন আমেরিকাবাসীদের উৎসাহিত করতে এদেশে এসেছেন।

অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত হ'ল যে, রায় তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করে তোলার ব্যবস্থার জন্যে প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জার সঙ্গে দেখা করবেন এবং ইতিমধ্যে রায়ের স্বাক্ষর সম্বলিত এক পুস্তক নিয়ে লে মুজের মডার্নার সম্পাদিকা সেই সাক্ষাতের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অবিলম্বে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা বলবেন।

অনুষ্ঠান শেষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কাসাস রায়কে একান্তে ডেকে বললেন যে, তিনি তাঁর আমেরিকার ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের নতুন পরিকল্পনাকে যদি রূপায়িত করতে চান তা'হলে প্রথমেই তার উচিৎ হবে বিদ্বৎসমাজের সমর্থন সংগ্রহ করা। তিনি সেইজন্যে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন। রায় অবশ্য তখন সে নিমন্ত্রণ বেশ ভয়ে ভয়েই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা

দেওয়া তখনো তাঁর পক্ষে নতুন! তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনাতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। মেক্সিকোতে বক্তৃতা সুরু করতে হয়েছিল বটে কিন্তু তাও পার্টি বা ট্রেড্-ইউনিয়নের সভা-সম্মেলনে বা সমিতির সীমাবদ্ধ শ্রোতাদের সম্মুখে; সত্যিকারের গণসমাবেশে ভাষণ অবশ্য রুশিয়াতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত কোথাও দেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মোট পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতা শুনতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র ও অধ্যাপকগণই উপস্থিত থাকতেন। বক্তৃতা স্পেনিশ ভাষাতেই দিতেন। প্রথম দিন টাইপ করা কাগজ থেকে পড়লেও দ্বিতীয় দিন থেকে স্মৃতি থেকেই ভাষণ দিতেন।

শেষ দিন অধ্যক্ষ কাসাস সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং বক্তৃতার শেষে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন, "আমেরিকার আধুনিক ইতিহাসের এক নতুন ব্যাখ্যা বিচার বিবেচনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হ'ল। মনস্বী অতিথি ইতিহাসের এক মৌলিক ব্যাখ্যার দ্বারা কয়েকটি দুঃসাহসিক এবং উদ্দীপক সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন। যদি এই সিদ্ধান্ত সঠিক হয় তবে সে সিদ্ধান্ত যিনিই করুন না কেন, দায়িত্বও তাঁকেই বহন করতে হবে। পূর্বে যে সকল মুক্তি দাতা ল্যাটিন আমেরিকাকে মুক্তির পথে পরিচালিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই মহৎ ব্যক্তি। তাঁদের পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হবে; কিন্তু বর্তমান যুগে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামকে নতুন পথ আবিষ্কার করেই চলতে হবে।

রায় অধ্যক্ষের এই ভাষণকে পরোক্ষে তাঁকে সমর্থন হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্বৎসমাজের শিরোমণি সে দিন মেক্সিকোর সমাজ বিপ্লবকে আহ্বানই জানিয়েছিলেন।

রায়ের পক্ষে সেদিন ছিল জীবনের এক স্মরণীয় দিন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মেক্সিকোর সোশ্যালিষ্ট রাজনীতির আর্কিটেক্ট রায়

রায়ের স্পেনিশ ভাষার শিক্ষক মেক্সিকোর দাবা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। লেখা-পড়ার মাঝে মাঝে দু'জনে দাবা খেলতে বসতেন। খেলার মধ্যে রায়ের একমাত্র দাবা খেলাতেই কিছুটা আকর্ষণ ছিল। দাবা চ্যাম্পিয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পার্লামেণ্টের সভাপতি ডন ম্যানুয়েল। তিনিও রায়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে এসে চ্যাম্পিয়ানের সঙ্গে দাবা খেলতেন। রায় বসে-বসে দুইটি দাবারুর খেলা দেখতেন। শীঘ্রই রায় একদিন তাঁর গুরুকে দাবা খেলায় হারিয়ে দিলেন। যদিও তাঁর গুরুর কাছ থেকে দাবা খেলার জন্যে বাহবা পেয়েছিলেন কিন্তু দাবা খেলায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করার মত সময় তাঁর ছিল না। তবু তিনি মস্কোতে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান এলেখাইন-এর সঙ্গে সমানে খেলে খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ করেছিলেন। আরো ভাল করে ভাষা-শিক্ষা, দাবা খেলায় পারদর্শিতা লাভ, সংগীতে-কলায় যাঁর সমান আকর্ষণ তাঁর পক্ষে কিন্তু এসব বিষয়ে আর সময় দেওয়া সম্ভব হ'ল না। শীঘ্রই তিনি সোশ্যালিষ্ট পার্টির পুনর্গঠনে, El Heraldo সম্পাদনায় ও মেক্সিকোর রাজনীতির মধ্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তিনি প্রথমেই সোশ্যালিষ্ট পার্টির মুখপত্র La Lucha-কে (শ্রেণী সংগ্রাম) আট পৃষ্ঠার সাপ্তাহিকে পরিণত করলেন। নিজের নিকট সঞ্চিত অর্থ থেকেই পার্টি সম্পাদকের প্রেসটি কিনে তাতে আরো নতুন মেসিন, টাইপ, সাজ-সরঞ্জাম যোগ করলেন। প্রেসটি পার্টির সম্পত্তি হ'ল। পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহজে মার্কসবাদ গ্রহণ করান সম্ভব হয় নি। রাত্রির পর রাত্রি ধরে রায়কে তাঁদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করতে হয়েছে। এই সব তর্ক-বিতর্কের সুফল যাতে বাইরের লোকেরাও পেতে পারে সেই জন্যে রায় ছোট ছোট পুস্তিকা

প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। নিজেই পুস্তিকাগুলি লিখলেন এবং পার্টির প্রেস থেকে তা ছাপান হ'তে লাগল। কিছু দিন পরেই রায়ের প্রস্তাবে সোস্যালিষ্ট পার্টির এক সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত হ'ল। উদ্দেশ্য, সোস্যালিষ্ট পার্টিকে ব্যাপক ভিত্তিতে সমগ্র শ্রমজীবী নর-নারীর পার্টিতে পরিণত করা। এর জন্যে তিনি এক ম্যানিফেষ্টো রচনা করলেন।

১৯১৮ সালের মাঝা-মাঝি রুশ বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের সংবাদে ল্যাটিন আমেরিকা তখন চঞ্চল। শ্রমজীবী নরনারীদের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আদর্শ তখন আর স্বপ্ন নয় সত্য। অতএব ম্যানিফেষ্টোতে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে এক শ্রমশীল নরনারীর পার্টি গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানান হয় তবে তা এখন আর কেউ আজগুবি বলবে না। ক্ষমতা দখলের এই সম্ভাবনায় এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্টদের মধ্যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে বিরূপ ধারণা ছিল তা কেটে যেতে লাগল। ম্যানিফেষ্টোটি ব্যাপক সমর্থন লাভ করল। পার্টির মুখপত্র লে লুচা'র যে সংখ্যায় এটি ছাপা হল তা তিনবার পুনর্মুদ্রন করতে হ'ল। আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বহু চিঠি আসতে লাগল সম্মেলনে যোগ দেবার ইচ্ছা জানিয়ে।

সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজনের জন্যে সোস্যালিষ্ট পার্টির কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসল। ম্যানিফেষ্টোতে যে অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া গেছে তাতে সকলেরই ধারনা হয়েছে এটা একটা বড় ব্যাপারই হবে এবং তা সম্পন্ন করার মত সাধ্য তাদের নাই। সর্বাপেক্ষা বড় কথা হ'ল, এত টাকা আসবে কোথা থেকে। রায় বললেন, টাকার জন্যে ভাবনা নাই—জন-কল্যান মূলক কাজে টাকা তোলা সম্ভব হ'বে, তবে সম্মলনের দিন স্থির করার জন্যে আজই ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নাই। সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতেই হবে। এই সম্মেলন বসবে মেক্সিকো ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী নর-নারীর এক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠার নিদর্শন রূপে। সব কিছুকেই সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে, সম্ভাব্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে পত্রাদি আদান-প্রদান করতে হবে, ব্যাপক প্রচার কার্য চালাতে হবে, প্রস্তাবের খসড়া আগে থেকেই প্রস্তুত করে তা প্রচার করতে হবে এবং এমনি ধারা সব কিছুরই উদ্যোগ আয়োজন পূর্বাহ্নেই সমাধা করতে হবে।

সকলে যদিও উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর তথাপি ঠিক কী যে করতে হবে সে

সম্বন্ধে কারুর না আছে অভিজ্ঞতা না আছে কোন ধারণা। শেষ পর্যন্ত সভার অধিবেশন শেষ হ'ল রায়কে পার্টির মুখপত্রের সম্পাদক নির্বাচিত করে এবং পার্টির প্রচার ও আন্দোলনের ভার অর্পণ করে। সেই সঙ্গে দায়িত্ব চাপান হ'ল ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ থেকে সৌভ্রাতৃক প্রতিনিধি আনার। সিদ্ধান্ত হ'ল, Slackers Fraternity আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সৌভ্রাতৃক প্রতিনিধিত্ব করবে।

রায়ের বিদ্যুৎ গতি তৎপরতায় সম্মেলনের তোড়জোড় বেশ জোরের সঙ্গেই চলছে, এমন সময় পার্লামেণ্টের সভাপতি ডন ম্যানুয়েল একদিন এলেন প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জার সঙ্গে রায়ের সাক্ষাতের প্রস্তাব নিয়ে। জার্মান লিগেসনে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রায়ের এই সক্ষাৎ। সেটা ছিল বে-সরকারী, এটা হবে সরকারী। স্থান—প্রেসিডেণ্টের বাস ভবন; সাক্ষাৎ কালে থাকবেন সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ; এবং আলোচনার শেষে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ। ডন ম্যানুয়েল এও বললেন যে, প্রেসিডেণ্ট রায়ের সকল কাজকর্মই পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। প্রস্তাবিত সম্মেলনের প্রতি তাঁর খুবই সহানুভূতি আছে, এবং মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রতিনিধি আনার বিষয়ে এই সকল দেশে মেক্সিকোর কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা ও কন-স্যুলেটের কর্মচারীরা সাহায্য করবে।

ডন ম্যানুয়েল প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাতের সময় রায়কে নিয়ম অনুযায়ী পোষাক পরার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। যুক্তি ছিল, প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা স্পেনিশ সামন্ত বংশোদ্ভূত অভিজাত শ্রেণীর। সুতরাং সাক্ষাৎ যখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বিষয়ে তখন সামান্য পোষাকের ত্রুটির জন্যে যদি তাঁর মনকে প্রথমেই বিরূপ করে তোলা হয় তা হ'লে শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ সাফল্যলাভে হয়তো বিঘ্ন ঘটতে পারে। রায় কিন্তু অটল। তিনি বললেন যে তাঁর পোষাক অপরিষ্কার না হলেই হল, ফ্যাশানদুরস্ত নাই বা হল; প্রেসিডেণ্টের যদি তাকে প্রয়োজন থাকে তবে পোষাকের জন্যে তা আটকে থাকবে না। তা ছাড়া তিনি শ্রমজীবী নর-নারীর প্রতিনিধিস্বরূপই যাচ্ছেন, অভিজাত শ্রেণীর কেতা-দুরস্ত পোষাকে তা মানাবে না। শেষ পর্যন্ত রায় নিজ পছন্দ মত পোষাকেই গিয়েছিলেন।

পোষাক সম্বন্ধে রায় চিরকালই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতেন। সারা উইরোপে তাঁর বন্ধুরা সকল সময়েই তাঁকে গ্রে ফ্লানেলের পাৎলুন ও

ব্রাউন কোট পরতেই দেখে এসেছে। ভারতেও যখন তিনি ইউরোপীয় পোষাক পরতেন তখনো তিনি তাই পরতেন।

প্রথমেই ডন ম্যানুয়েল রায়ের পরিকল্পনাটি শুনতে চাইলেন। রায়ও সংক্ষেপে তা বললেন :

আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপের হুমকীর বিরুদ্ধে সোস্তালিষ্ট পার্টি প্রথমেই এক সাধারণ প্রতিবাদ সভা আহ্বান করবে : এই সভা আমেরিকার এই হুমকির বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে জন সাধারণের নিকট আবেদন জানাবে এবং গণতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এই গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান রক্ষার জন্যে শ্রমজীবী নরনারীর সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার জন্যে অনুরোধ করবে। ডন ম্যানুয়েল প্রমুখ গণতান্ত্রিক নেতারাও কোন না কোন আকারে এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাবেন :

ছাত্র এবং শিক্ষকেরা শ্রমিকদের মিছিলে যোগ দেবেন : পুলিশ বা মিলিটারির পক্ষ থেকে কোন প্রকার বাধা যাতে না আসে তার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে : রাজধানীতে এই প্রতিবাদ দিবস পালনের পরদিনই সোস্তালিষ্ট পার্টির কর্মীরা পেট্রোলিয়াম শ্রমিকদের এক ধর্মঘটের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে আমেরিকা মেক্সিকোর সংবিধানকে অমান্য করার সঙ্গে সঙ্গে তৈল শিল্প সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে যাবে : শ্রমিকদের এই সব কাজ সরকারকেও আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণে উৎসাহিত করে তুলবে : অবশ্য এই সঙ্গে সরকারকেও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া মেনে নিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা নিজে লিবারেল মতাবলম্বী বুর্জোয়া হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সুবিধা হবে এই মনে করে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে তাঁর বাধে নি। তিনি বুঝেছিলেন যে, আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও তাঁর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার অনুগ্রহ ভাজন জেনারেল ওবরগণের প্রতিষেধক হিসেবে রায়ের এই পরিকল্পনা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ তিন ঘণ্টা ধরে চলেছিল।

শ্রমজীবী শ্রেণীকে রায় সংঘবদ্ধ করে তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে অংশ গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে পেরেছেন বলে তাঁকে প্রেসিডেণ্ট ধন্যবাদ জানালেন। রায়ও বললেন, যারা মাতৃভূমি থেকে এমন কিছু স্নেহধারা পায় না যার জন্যে তারা দেশকে তাদের মাতৃভূমি বলে মেনে নিতে পারে, তাদের মধ্যে

দেশভক্তি প্রচার সহজ নয়; তবে এই অবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র চলেছে—মেক্সিকো ব্যতিক্রম মাত্র নয়। উত্তরে প্রেসিডেণ্ট বললেন, মেক্সিকো বিপ্লবের অঙ্গীকারই ছিল জমির উপর কৃষি-মজুরদের অধিকার দান; কিন্তু বৈদেশিক শত্রুর প্ররোচনায় ও সাহায্যে গৃহযুদ্ধ আজো শেষ হ'লো না; ফলে সে অঙ্গীকারও পূর্ণ করা যাচ্ছে না; তবে পার্লামেণ্ট যদি শ্রমিক মঙ্গলের জন্যে কিছু আইন প্রণয়ন করতে চান তা হ'লে তার কোন আপত্তি হবে না; তিনি একজন শ্রমমন্ত্রীও নিযুক্ত করতে চান: যদি উপযুক্ত কেউ থাকেন তা হ'লে রায় যেন তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। রায় সে জন্যে কিছু সময় চাইলেন। এর পর অন্য সকলে বিদায় নিলে ডন ম্যানুয়েল বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ও রায় প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসলেন।

সেই সময় রায় তাঁর সমগ্র পরিকল্পনাটি পেশ করলেন। প্রেসিডেণ্ট আগে থেকেই এ পরিকল্পনাটি ডন ম্যানুয়েলের নিকট থেকে জেনেছিলেন এবং পূর্বাহ্নেই মনস্থির করে রেখেছিলেন। তিনি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। এবং ল্যাটিন আমেরিকা থেকে প্রতিনিধি আনার ব্যবস্থার ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে বৈদেশিক মন্ত্রীকেও নির্দেশ দিলেন। সাক্ষাৎকার আশাতীতরূপে সাফল্যমণ্ডিত হ'ল।

পথে ডন ম্যানুয়েলকে রায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, একজন সামান্য বিদেশীর উপর এতখানি আস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণ কী। উত্তরে পার্লামেণ্ট অধ্যক্ষ বললেন যে, যোগ্যতা আছে এই বিশ্বাস, আর বিদেশী বলেই এতটা সম্ভব হয়েছে। যদি কূটনৈতিক কারণে প্রয়োজন হয় তবে একজন বিদেশীর ঘাড়ে সব দোষ চাপান সহজ হবে। তবে ডন ভেনাসটিয়ানো কারাঞ্জার স্পেনীয় আভিজাত্যসুলভ সিভাল্‌রি আছে, তাঁকে বিপদে ফেলবেন না। সে মতলবই যদি থাকত তা হ'লে যখন ইংরেজ-আমেরিকা তাঁকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলেছিল বা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিল, তখনই তা করত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সোস্যালিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে রায়

মেক্সিকোর সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনের অধিবেশন ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হ'ল। মেক্সিকোর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে কয়েকশত প্রতিনিধি এলেন। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সব ক'টি দেশ থেকেই বহু সোস্যালিষ্ট নেতা এলেন ল্যাটিন আমেরিকায় লীগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে। সম্মেলনে মার্কস্, বাকুনিন, ক্রোপটকিন-এর ছবির সঙ্গে লেনিনের ছবিও টানানো হ'ল। মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সম্মেলন সুরু হ'ল।

সম্মেলনে বহু "বুর্জোয়া পলিটিসিয়ান" নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিলেন। সোস্যালিষ্ট পার্টির এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট মতাবলম্বী বামপন্থীর দল সেটা হজম করল কেবল তাদের প্রিয় Al Companero Indo-এর (The Indian Comrade রায়কে ঐ নামেই সকলে ডাকত) সম্মানার্থে, কারণ তিনিই এদের সব নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। অবশ্য এরা সকলেই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ভাবধারারই মানুষ ছিলেন, এবং সম্মেলনে এই সকল প্রতিষ্ঠাবান মানুষের যোগ দেবার ফলে সোস্যালিষ্ট পার্টির মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গেল ; সারা দেশে একটি বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেল এবং ল্যাটিন আমেরিকান লীগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকেও সাফল্যের পথে এগিয়ে দিল। এই সকল নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ইউনিভার্সিটির রেকটর, অধ্যাপকবৃন্দ, পার্লামেন্টের সদস্য, সাংবাদিক, লেখক, কবি, শিল্পী প্রভৃতি।

সম্মেলন সুরু হ'বার ঠিক প্রারম্ভে শ্রমিকদের মিছিল এসে পৌঁছল সম্মেলনের তোরণ দ্বারে। প্রতিনিধিরা বাইরে বেরিয়ে তাদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। মিছিলের সম্মুখে ছিল লেনিনের এক প্রকাণ্ড ছবি আর "মেক্সিকোর তেল

মেক্সিকোবাসীর', "বলশেভিকরা দীর্ঘজীবী হোক" "মেক্সিকোর সাধারণতন্ত্র দীর্ঘ-জীবী হোক," প্রভৃতি পোষ্টার ও ফেষ্টুন।

তারপর মিছিল চলল সরকারী দপ্তরখানার দিকে। সেখানে সভা বসল, বক্তৃতা হ'ল। সেই উদ্দীপ্ত জনতার দাবীতে Palacio Nacional-এর অলিন্দে দেখা দিলেন সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা। তিনি বললেন, "The Voice of the people being the voice of God he would obey it—জনগণের দাবী ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, আমি তা মেনে নেব" প্রেসিডেণ্টের এই বাক্যে জনতার উদ্দীপনা চরমে উঠল।

এই পরিবেশের মধ্যে সম্মেলন সুরু হ'ল। ভাবাবেগ ভরা নানা বক্তৃতা, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও ভাষণের পর সমবেত কণ্ঠে "ইনটারন্যাশন্যাল" সঙ্গীত গাওয়ার পর প্রথম অধিবেশন শেষ হ'ল। রায়ের বেসুরো কণ্ঠে কিন্তু কোন দিনই "ইনটারন্যাশন্যাল" সঙ্গীত সোচ্চারে উচ্চারিত হত না, সে দিনও হ'ল না। তবে তাঁর উদ্দেশ্য যে আশাতীতরূপে সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে এবং যে জিনিষ তাঁর চোখের সামনে গড়ে উঠতে লাগল তা যে তাঁরই সৃষ্টি, তা ভেবে তাঁর সর্বাঙ্গে সে সুর ধ্বনিত হতে থাকল। কণ্ঠ দিয়ে না গাইলেও সর্বাঙ্গ দিয়ে সেদিন তিনি সে গান গাইলেন।

সম্মেলনের শেষ দিনে পুনর্গঠিত পার্টির নাম করণ হ'ল সোস্যালিষ্ট পার্টি অব মেক্সিকো রিজিওন অর্থাৎ মেক্সিকোর ভৌগোলিক সীমা রেখা ছাড়িয়েও এর এলাকা নির্ধারিত হওয়ায় region কথাটি যুক্ত করা হল। সর্ব সম্মতিক্রমে রায় জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত হ'লেন।

এও স্থির হ'ল যে, ল্যাটিন আমেরিকান লীগ স্থাপন কবার জন্যে যত শীঘ্র-সম্ভব একটা রিজিওন্যাল ইনটারন্যাশন্যাল কনফারেন্স ডাকা হবে। সেজন্যে একটি পৃথক আহ্বায়ক কমিটিও নির্বাচিত করে দেওয়া হ'ল। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশসমূহের ও মেক্সিকোর কিছু প্রতিনিধি নিয়ে এই আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হ'ল। পার্টির প্রধান সম্পাদক M. N. Roy এই কমিটিরও সেক্রেটারি হ'লেন এবং এর কেন্দ্রীয় দপ্তরও মেক্সিকো সিটিতেই স্থাপিত হ'ল।

বাইরের প্রতিনিধিরা ফিরে যাবার আগে নব নির্বাচিত কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসে। তাদের মধ্যে প্লুটার্কো এলিয়াস কালেস নামে উত্তর মেক্সিকোর সোনোরা প্রদেশের এক গ্রাম্য শিক্ষক স্বীয় যোগ্যতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর নিজ প্রদেশে সোস্থালিষ্ট নামে খ্যাত হয়েছিলেন এবং কয়েকটি আমেরিকান কৃষিক্ষেত্রে কৃষি মজুরদের ধর্মঘট করিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও গভর্ণর ঔবরগণের নিকট অপ্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন।

পত্রের মারফৎ রায় পূর্বেই কালেসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ডন ম্যানুয়েলের নিকট থেকে শুনেছিলেন যে, এই কালেসকে প্রাদেশিক গভর্ণরের পদে নির্বাচনে জেনারেল ঔবরগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করান যেতে পারে। রায় দেখলেন যে, গণনেতা হবার প্রায় সব গুণই কালেসের মধ্যে রয়েছে। কার্যকরী সমিতির সভায় এই কালেস প্রস্তাব করলেন যে. সোস্থালিষ্ট পার্টি জেনারেল ঔবরগণকে সোনোরার গভর্ণর পদ থেকে অপসারিত করার জন্যে অবিলম্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করুক। প্রস্তাবে সকলেই অতিমাত্রায় বিস্মিতই হয়েছিল। যখন বলা হ'ল যে ঔবরগণের অধীনে এক বৃহৎ সামরিক বাহিনী আছে এবং তিনি আমেরিকার আস্থাভাজন ব্যক্তি, গোপনে সাহায্যও পেয়ে থাকেন তখন কালেস বললেন যে, সেই জন্যেই ত সরকার থেকেও তার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে গোপনে সাহায্য পাওয়া যাবে, এবং তিনি এই আন্দোলনকে যে নিশ্চয় সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবেন সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত।

রায় বললেন, পরিকল্পনাটি খুবই লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নতুন পার্টির পক্ষে কি এটা খুব বেশী প্রত্যাশা নয়? কালেস তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি, আপনি বিদেশী, আপনি জানেন না যে, মেক্সিকোতে এই-ভাবেই সব কিছু ঘটে।" তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি জেনারেল সেক্রেটারিকে বুঝিয়ে বলার জন্য কিছু সময় চান। রায়ের প্রতি এইরূপ অসৌজন্যতাসূচক কথা বলায় অন্য সকলে কালেসের প্রতি চটে উঠলেও রায় কালেসকে কাজের লোক বলেই মনে করলেন। তিনি না রেগে বললেন যে, কমিটি যদি অনুমতি দেন তবে তাঁর আপত্তি নাই। রায়ের ইচ্ছা দেখে কমিটিও আর আপত্তি করল না। রায় তাঁকে তাঁর বাড়ীতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রায়ের নেতৃত্বে সোশ্যালিষ্ট পার্টির দ্রুত রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি

কার্লেস যে গভর্ণর ঔবরগণকে পদচ্যুত করে নিজে সেই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা মুখ ফুটে সোশ্যালিষ্ট পার্টির কার্যকরী সমিতিকে বলতে সাহস করেছিলেন তার কারণ ছিল। রায়ের কাছে যখন তিনি সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, তখন রায় বুঝলেন, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেলে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে।

সোনোরার গভর্ণর ছিলেন জেনারেল ঔবরগণ। তিনি কারাঞ্জাকে হঠিয়ে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ'তে চান। যেহেতু কারাঞ্জার বৈদেশিক নীতি আমেরিকা পছন্দ করে না, সেইহেতু তারা কারাঞ্জার বিরুদ্ধে ঔবরগণকে সাহায্য করবে। সোনোরার উত্তর সীমানা আর আমেরিকার দক্ষিণ সীমানা এক। ঔবরগণ কারাঞ্জা বিরোধী বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে সীমান্ত থেকে অতি সহজেই আমেরিকা থেকে সাহায্য আনতে পারবে। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার উচিত হ'বে অবিলম্বে ঔবরগণকে সীমান্তপ্রদেশ সোনোরা থেকে সরিয়ে দেওয়া।

রায় জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যাপারে সোশ্যালিষ্ট পার্টি কী করতে পারে। তখন কার্লেস অতি সহজেই বললেন যে, "কেন, তিনি কি প্রেসিডেন্টের বে-সরকারী পরামর্শদাতা নন? আর সেই জন্যই ত তাঁকে সোশ্যালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী করা হয়েছে।"

রায় স্বীকার করলেন যে, ঔবরগণ যখন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী তখন তাঁর প্রচার কার্য চালাবার উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই গভর্ণরের পদ থেকে তাঁকে ছুটি দেওয়া হ'ল, এই অজুহাতে তাঁকে সোনোরা প্রদেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাঁকে সরাবার চেষ্টা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

মেক্সিকোর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তিনি সে আদেশ অমান্য করে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন—তখন কী হবে ?

সে চেষ্টা যাতে ব্যর্থ হয় সে জন্যে কালেসও প্রস্তুত, তিনি তৎক্ষণাৎ ওবরগণের বিরুদ্ধে এক গণ-অভ্যুত্থান ঘটাতে পারবেন—অবশ্য সে জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাই এবং তাকেই ওবরগণের স্থানে গভর্ণর করতে হবে। এই জন্যে মাটি যে কতদূর প্রস্তুত তা সরজমিনে তদন্ত করে, কমরেড রায় যেন প্রেসিডেন্টের নিকট এই প্ল্যান পেশ করেন।

পরিকল্পনাটি রায়ের দুঃসাহসিক স্বভাবের নিকট বড়ই মুখরোচক মনে হ'ল। যদি এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় তবে ব্যর্থ বিদ্রোহীদের ভাগ্যে যা ঘটে, তাঁর ভাগ্যেও তাই ঘটবে। সোস্যালিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে সব দায়িত্বই তাকে নিতে হবে। প্রাণটা যদি একান্তই রক্ষা হয় তবে এ দেশ ছেড়ে আবার কোন্ অকূলে ভাসতে হবে তার ঠিক নাই। তথাপি এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ছাড়া অসম্ভব। ভারতে যা করতে চাওয়া হয়েছিল, পারা যায় নি—যা কেবল কল্পনাতেই রয়ে গেল, সে অভিজ্ঞতা যদি এখানেই মেলে তবে তাও যে অমূল্য সম্পদ। অতএব স্থির হ'ল, সরজমিনে তদন্ত করতেই তিনি যাবেন। দু'দিন পরে কালেস চলে গেলেন এবং ক'দিন পরে রায়ও যাত্রা করবেন।

কার্যকরী সমিতির দু'জন শক্ত সমর্থ সভ্য স্বেচ্ছাব্রতী হ'য়ে রায়ের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে অনুগমন করার সিদ্ধান্ত করলেন। রায়ের গুণমুগ্ধ ভক্ত-বন্ধুর অভাব ছিল না।

প্রথমে স্থির হয়েছিল, জেনারেল ওবরগণের দলের সন্দেহ নিরসনের জন্যে প্রচার করা হবে, পার্টির প্রধান সম্পাদক প্রদেশ সমূহে কাজকর্মের পরিদর্শনে বের হবেন, কিন্তু সে অজুহাতের প্রয়োজন হ'ল না।

এই ব্যাপারে কোন কিছু করার পূর্বে উচ্চ পর্যায়ের সরকারী মহলে আলাপ-আলোচনা করা দরকার এবং প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার সম্মতিও দরকার। সামরিক দপ্তর সোল্লাসে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন। তাঁদের মতে, জেনারেল ওবরগণ ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন, শীঘ্রই এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁকে যথাসম্ভব শীঘ্র সোনোরা থেকে সরাতে না পারলে আর চলছে না। তিনি

টেক্সাস অয়েল কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা ও আমেরিকা থেকে অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এনে ক্রমেই সেখানে এক বৃহৎ বাহিনী গড়ে তুলছেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রায়ের এখন ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে, এবং অধিকাংশ সাক্ষাৎই বে-সরকারী, আধা-সরকারী বা গোপনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেক্সিকোর সোশ্যালিষ্ট পার্টির শ্রমিক নীতিসম্পর্কিত কাজকর্মে, ল্যাটিন আমেরিকান লীগের সংগঠন ব্যাপারে, সর্বোপরি এই সোনোরা পরিকল্পনা নিয়ে তাঁকে ঘন ঘন যোগাযোগ রেখে কারাঞ্জার সঙ্গে চলতে হচ্ছে। কারাঞ্জা সোনোরা পরিকল্পনা নিয়ে খুবই উল্লসিত। তবে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর ব্যবহার খুবই সংযত এবং কূটনীতিসম্মত রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হ'ল, সরকার থেকে ঘোষণা করা হবে যে, যেহেতু জেনারেল ওবরগণ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সেই হেতু তিনি যাতে তাঁর প্রচারকার্য চালাবার জন্যে পর্য্যাপ্ত সময় পান সেইজন্য তাকে গভর্ণর পদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে অবসর দেওয়া হ'ল এবং সোনোরার নতুন গভর্ণর পদের জন্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হ'ল। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারও যথারীতি ঘোষণাপত্র জারী করলেন। সোশ্যালিষ্ট পার্টিও সেই সঙ্গে গভর্ণর পদের জন্যে প্রার্থী মনোনীত করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। সেই সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করা হ'ল যে, জেনারেল সেক্রেটারী এই নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে অবিলম্বে সোনোরা যাত্রা করবেন, সঙ্গে যাবেন দু'জন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। সোনোরা যাত্রার জন্যে অপর কোন ছলের প্রয়োজন হ'ল না।

পথ তখনো বিপদসঙ্কুল, সোনোরার পথ চিহুয়াহুয়ার উপর দিয়ে। সেখানে পাঞ্চোভিল্লার দস্যুতা তখনো নির্মূল হয় নি। চিহুয়াহুয়া সীসা, দস্তা, রূপা প্রভৃতি খনিজ সম্পদে ভরা। পাঞ্চোভিল্লার দৌরাত্ম্যে খনির মালিকরা পালিয়েছিল। সরকারী সৈন্য দলের পাহারায় এখন কিছু কিছু কাজ সুরু হয়েছে। রায়েরও নিরাপত্তার জন্যে একদল সৈন্য সঙ্গে চলেছে। পথে যে সব খনি পড়ল সেখানে শ্রমিকদের সভার অনুষ্ঠান হ'তে থাকল, গড়ে উঠতে লাগল ইউনিয়ন এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টির শাখা।

রুশ বলশেভিকদের সাফল্যে মেক্সিকোর সাধারণ মানুষ, সাধারণ সৈনিকেরা তখন বলশেভিক ভক্ত। আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষ সেই প্রীতি আরো সোচ্চার করেছিল, সেইজন্যে রায়ের অভিযান শ্রমিক, সৈন্য ও সাধারণ মানুষের সহর্ষ

সহযোগিতায় দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। রায় দেখলেন যে, সৈন্যবাহিনী যদিও গভর্ণর ঔবরগণের অধীনে তথাপি তাদের মধ্যেও বলশেভিক বিপ্লবের ছোঁয়াচ যথেষ্ট। পল্লী অঞ্চলের গ্রাম্য শিক্ষকেরা কালেসের সমর্থক। মেক্সিকোতে তখন অন্য কোন পার্টি না থাকায় কালেসের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

এদিকে ঔবরগণ যখন দেখলেন যে, তিনি তাঁর ঘাঁটি থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন তখন তিনি একটি চাল চাললেন। তিনি কারাঞ্জার নিকট প্রস্তাব করলেন যে, কালেসের বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দেবেন না, তার বিনিময়ে তাঁকে আমেরিকাতে রাষ্ট্রদূতরূপে পাঠাতে হবে। কারাঞ্জা তৎক্ষণাৎ অতখানি করতে রাজি না হ'য়ে তাঁকে স্বাস্থ্যের অজুহাতে বিদেশে যেতে অনুমতি দিলেন। কালেস বিনা নির্বাচনেই গভর্ণর নিযুক্ত হলেন। মেক্সিকোর নবগঠিত সোস্থালিষ্ট পার্টির মর্যাদা ও প্রভাব মেক্সিকোতে ও সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় আকাশচুম্বি হয়ে গেল।

আসলে কালেস ছিল গ্রাম্যশিক্ষক। সস্তা বাহাদুরি দেখিয়ে জনপ্রিয় হওয়াটাই যে রাজনীতিকের পক্ষে একমাত্র গুণ সেটাই তিনি জানতেন। তিনি গভর্ণর হওয়া মাত্র এমন কিছু একটা করতে চাইলেন যাতে তাঁর নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অবিমৃষ্যকারিতার চরম করে ছাড়লেন—যার ফল পরে ভাল হয় নি।

সে সময় আমেরিকাতে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে মেক্সিকোর সীমান্তে চোরাই মদের কারবার খুব ফলাও করে চলতে থাকে। এই সব কারবারের মালিক আমেরিকানরাই ছিল। কালেস এই সীমান্ত এলাকায় মদের কারবার নিষিদ্ধ করলেন এবং সীমান্ত অভিমুখী মদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিলেন। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমেরিকানদের সংঘর্ষ বাধল—দু' একজন হতাহতও হ'ল। আমেরিকান সংবাদপত্রের হৈ চৈ-এর ফলে আমেরিকার সশস্ত্র অভিযান আসন্ন হ'য়ে উঠল। কারাঞ্জা দেখলেন, নব-নিযুক্ত সোস্থালিষ্ট গভর্ণরের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তার সরকার আমেরিকার সঙ্গে মহাযুদ্ধে লিপ্ত হ'তে যাচ্ছে। ক'দিনের মধ্যেই কালেস নিজেকে রাষ্ট্রপতির কাছে এক অতি বিরক্তিকর ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করলেন। প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জা ছিলেন আসলে স্পেনীয় অভিজাত শ্রেণীর। রাজনৈতিক প্রয়োজনেই কালেসের

মত একজন গ্রাম্য শিক্ষককে গভর্ণর রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কালেসের এইরূপ বিরক্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে হয়তো তিনি তাঁকে পুনর্ম্যিকো ভবঃ বলতে পারতেন, কিন্তু রাজধানীতে রায় পারিচালিত সোশ্যালিষ্ট রাজনীতির প্রভাবে সেটা করতে পারলেন না। পরিবর্তে কালেসকে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত শ্রম মন্ত্রীর পদে বহাল করা হ'ল এবং জেনারেল ঐবরগণকে পুনরায় গভর্নর পদ গ্রহণ করে পরিস্থিতির ন্যায্য মীমাংসা করার জন্যে অনুরোধ জানান হ'ল। সাময়িক ভাবে কারাঞ্জা দুই কূল রক্ষা করে আমেরিকার সঙ্গে তখনকার মত মহাযুদ্ধ এড়ালেন বটে কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ঐবরগণের বিদ্রোহের ফলে তাঁকে গণতান্ত্রিক মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতিত্ব হারাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও হারাতে হয়েছিল। তা দেখতে রায় অবশ্য তখন ছিলেন না—তার দু-বছর পূর্বেই মেক্সিকো ছেড়ে রুশিয়ায় গিয়েছিলেন।

কালেসের শ্রমমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও সোশ্যালিষ্টরা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠল। নানা স্থানে কারণে অকারণে ধর্মঘটের আর দাবী-দাওয়ার বন্যা বয়ে চলল। শ্রমমন্ত্রী শ্রমিক কল্যাণ আইন প্রণয়ন করবেন। রায়ের উপর সে আইনের খসড়া রচনার ভার পড়ল।

দেশের পেট্রোলিয়াম শিল্পেও সাধারণ ধর্মঘট আসন্ন হয়ে উঠল। এদিকে তখন ইউরোপের যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে যাওয়ার ফলে জার্মানীর সঙ্গে তার সন্ধি হয়েছে। পূর্ব রণাঙ্গন থেকে মুক্ত হ'য়ে জার্মানী পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ জয়ের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে মিত্রশক্তিও সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। আমেরিকা আটলান্টিকের ওপার থেকে সে বিরাট বাহিনীর রসদ জোগাচ্ছে। এই অবস্থায় মেক্সিকো থেকে তেলের যোগান যদি অব্যাহত না থাকে তবে মহা বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। সে আশঙ্কা ঠেকাবার জন্যে মেক্সিকোর তৈল বন্দরের সমুদ্রে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত হয়ে আছে। ধর্মঘট সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন নৌবাহিনী অবতরণ করবে। এই অবস্থায় শ্রমিক তথা সোশ্যালিষ্ট পার্টির মুখ রক্ষা হয় অথচ যুদ্ধও না বাধে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে উঠল। রায়ের প্রস্তাব মত প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জা শ্রম মন্ত্রীকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে অকুস্থলে প্রেরণ করলেন। তিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সঙ্গে পার্টির প্রতিনিধি জেনারেল সেক্রেটারি রায়ও চললেন। রায়ের পরামর্শ ক্রমেই শ্রমমন্ত্রী যা করবার করবেন।

ঠিক হ'ল শ্রমমন্ত্রী হাঁকডাক করবেন, ভয় দেখাবেন, তারপর রায় মালিকদের সঙ্গে অবস্থা বুঝে একটা আপোষ করবেন। পথে এই কৌশলে কয়েকটি ময়দা কলের ১২০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট মেটান হ'ল এবং তাতে শ্রমিকদের ভালই লাভ হ'ল।

তৈল ক্ষেত্রে রায় শ্রমিকদের বুঝালেন যে, অকারণে ধর্মঘট ক'রে সোস্যালিষ্ট শ্রমমন্ত্রীকে বিপদে ফেলা উচিত নয়, সবে মাত্র সোস্যালিষ্টরা ক্ষমতায় আসতে সুরু করেছে এখন সাবধানে চলাই যুক্তিসঙ্গত। আর তা ছাড়া তৈল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির হার অপেক্ষাকৃত বেশীই আছে। অতএব ধৈর্য্য ধারণে ক্ষতি নাই। রায়ের যুক্তি তারা শুনেছিল। ফলে কারাঞ্জা সরকারের সে সঙ্কট কেটে গিয়েছিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মার্কসের অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদ রায় কোনদিন পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি

রায়ের বুদ্ধিমত্তা, সংগঠনী শক্তি এবং সকল বিষয়েই একটা আভিজাত্যব্যঞ্জক গাম্ভীর্য ও মর্যাদাসূচক ভাবভঙ্গি থাকায় প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জার সঙ্গে ঘণিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল। বয়সের তারতম্য ও সামাজিক ভেদাভেদ থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে একটি বিশ্বাস ও আস্থার ভাব গড়ে উঠেছিল। তার ফলে যখনই দেখা হ'ত তখন উভয়ে মন খুলেই কথাবার্তা কইতেন। এই যে একজন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্ণধারের সঙ্গে একজন সোস্যালিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারির ঘণিষ্ঠতা তা যে কীভাবে সম্ভব হ'ল সে সম্বন্ধে রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষা সংস্কৃতি ও মনের স্বকীয়তা যে অর্থনীতিক শ্রেণী নিরপেক্ষ, এ ধারণা তখন তাঁর সজ্ঞানে না থাকলেও—যা তাঁর উত্তর জীবনে এসেছিল—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তখনই তা প্রকাশ পেত। মার্কসের অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদ যে তিনি তখন বাক্যে গ্রহণ করলেও কায়-মনে নিতে পারেন নি সে কথা তাঁর মেক্সিকো ও ইউরোপীয় জীবন-স্মৃতির নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়ঃ

> পদ-মর্যাদার দিক থেকে দু'জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকলেও কারাঞ্জার সঙ্গে আমার যে এক বিচিত্র ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল তার নিগূঢ় তত্ত্বটি আমি অনেকদিন পরে টের পেয়েছিলাম। কারণটি ছিল, আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য ও নৈকট্য। এটা ছিল ভদ্র ব্যবহারের একটা চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কারাঞ্জা ছিলেন মধ্যযুগের ইউরোপীয় ক্রীশ্চান সংস্কৃতির মূর্তিমান নিদর্শন। মননশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যার খুব মিল। আমার যে

একজন মধ্যযুগীয় অভিজাত বংশীয় মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশতে বাধে না, অথচ একজন অশিক্ষিত অভব্য কমরেডের পাশে বসতে গা ঘিন ঘিন করে, এই সত্য কথাটা ভেবে আমার সোস্যালিষ্ট বিবেকের মনোবেদনার অন্ত থাকত না। এটা কিন্তু আমার বুর্জোয়া দেমাক নয়, সেটা আমি আন্তরিক ভাবেই অপছন্দ করি। মেক্সিকোর শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির আদবকায়দা খুব যত্নের সঙ্গেই মেনে চলত। আমার চোখে এ সব নিতান্তই মামুলি, অস্বাভাবিক, কখনো কখনো একান্তই আন্তরিকতাশূন্য বলেই মনে হয়েছে। অথচ আশ্চর্য এই যে বুর্জোয়া সমাজের মহা শত্রুরূপে যাদের পরিচয় তারাও বুর্জোয়া পোষাক-পরিচ্ছদ আদব-কায়দাকে অনুকরণ করাটাই ভদ্র সাজার উপায় রূপে গ্রহণ করে। এই সব অভিজ্ঞতা আমার মনে প্রথম থেকেই একটা উদার গোঁড়ামি মুক্ত মনোভাবের বীজ বপন করে —যা আমার নতুন মতবাদের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছিল না। যদিও তখনকার মত চাড়া দিয়ে তোলা নতুন ভক্তের গোঁড়ামি দিয়ে মনের এই উদারতাকে চেপে রাখতে চেয়েছি, তথাপি আমি কোন দিনই ঠিক গোঁড়া ভক্ত হ'তে পারি নি। মেক্সিকোতে আমার এই তাত্ত্বিক পদস্খলনকে হয় ত তত্ত্ব সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মার্কসবাদে যে সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শ আছে তা সকলের পক্ষেই আকর্ষনীয়। সমাজ বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করার জন্যে একজন মার্কসবাদ গ্রহণ না করেও পারে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করার জন্যে আমি মার্কসবাদী হই নি। মার্কসবাদের দার্শনিক তত্ত্বটাই আমাকে আকর্ষণ করেছিল। কয়েক-বছর পরে,একজন অতিশয় ধীমান রুশ মার্কসবাদী আমাকে বলেছিলেন যে, মার্কসবাদে যদি কোন মৌলিক অবদান যোগ করতে হয় তবে তা দর্শনের ক্ষেত্রেই করতে হ'বে, এবং এ পর্যন্ত প্লেখানভ ও লেনিন ছাড়া আর কোন ইউরোপীয়ই সেটা করেন নি। অর্থনীতিক নির্দ্দেশ্যবাদের সার্বভৌমত্ব ও শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্গে শ্রেণীর বা শ্রেণী-বিরোধের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি আমার সন্দেহ প্রকাশ করি। এ বিষয়ে আলোচনার সময়েই তিনি উপরের কথাগুলি বলেছিলেন।

প্রলেতারিয়েৎ বিপ্লবীদের প্রচলিত আদব কায়দা অনুসারে ভদ্র হবার চেষ্টা যে কেবল মেক্সিকোতেই দেখেছি তা নয় ইউরোপেও দেখেছি। অথচ ইউরোপে প্রলেতারিয়েৎ শ্রেণী চেতনা মেক্সিকো বা অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের মত ধনীদের প্রতি অন্ধ আক্রোশ-বশতঃ নয়—তা বিচার বিবেচনা পূর্বক মননশীলতার স্তরের সিদ্ধান্ত। তাদের আদব-কায়দা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে যদি বুর্জোয়া ছাপ থাকে, তা হ'লে বলতেই হবে—প্রলেতারিয়েৎরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া। প্রলেতারিয়েৎরা ক্ষমতায় এসেও যে একটা নতুন সংস্কৃতি, মানুষে মানুষে নতুন সম্বন্ধ, নতুন নৈতিক আদর্শ, নতুন আদব-কায়দা গড়ে তুলতে পারল না, তার বাস্তব কারণ এটাই। এই সব চিন্তার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, মানব সভ্যতার যে সব স্থায়ী অবদান আছে তারই উপর ভিত্তি করে—যে সব আচার ব্যবহার মানুষের স্বভাব অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত, যেসব সংস্কৃতি কেবলমাত্র আদব-কায়দা-আচার-সর্বস্ব নয়—যদি একটা নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেত তবে তা দিয়ে কৃত্রিম, স্থূল আচার সর্বস্ব বুর্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারত। তখন এই সংস্কৃতি কোন শ্রেণী বিশেষের নিজস্ব ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হয়ে সমগ্র মানব সমাজকেই উচ্চতর আদর্শে তুলে ধরে আরো বেশী ঐশ্বর্যশালী করতে পারত। বাস্তবিক পক্ষে আমি মনে করতাম যে, একজন অভিজাত শ্রেণীর লোক যদি তার নিজ শ্রেণীর প্রচলিত সংস্কার থেকে নিজ মনকে বিচার বুদ্ধির সাহায্যে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, তবে সে একজন উগ্র শ্রেণী সচেতন প্রলেতারিয়েতের চেয়ে অনেক বেশী অনপেক্ষ এবং সংস্কৃতির দিক থেকে ঢের বেশী বড় জীবন প্রেমিক সমাজ বিপ্লবী হ'তে পারে। অর্থাৎ মনস্বিতা সঞ্জাত আভিজাত্যের দাবীদার সবাই হ'তে পারে এবং কেবল সেই বিদ্যাবুদ্ধি সঞ্জাত অভিজাত শ্রেণীর দ্বারাই সৃষ্টি হ'তে পারে এক নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর স্থাপিত নতুন সমাজ ব্যবস্থা।

আমার এইরূপ গোঁড়ামি মুক্ত চিন্তাকে ভাব ও ভাবনার মধ্যে রূপ দান করতে অনেক বছর লেগেছিল। ইতিমধ্যে রাজনীতির দিক থেকে আমার নতুন গৃহীত মতবাদ অনুযায়ী আমি অন্য যে কোন

লোকের মত গোঁড়া সোস্যালিষ্টই ছিলাম, এবং প্রতিদিনই আরো বেশী করে পেকে "লাল" (কমিউনিষ্ট) হচ্ছিলাম। কিন্তু সমাজ জীবনে এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারে আমি আমার গোঁড়ামি মুক্ত রুচি অনুসারেই চলতাম; এবং আমার এই স্বাস্থ্যকর রুচি ক্রমেই বেশ সংক্রামক হয়ে উঠেছিল। মেক্সিকোতে আমরা ক'জন বিমুক্তমন মানুষে মিলে ছোট একটি বিশ্বমৈত্রী সংঘ গড়ে তুলেছিলাম। পরে ইউরোপে আমি যখন আমার ইউরোপীয় কমিউনিষ্ট বন্ধুদের বুর্জোয়া অভ্যাস ও সংস্কার নিয়ে সমালোচনা করতাম, তখন তারা আমাকে এই বলে পরিহাস করত যে আমি নাকি ইউরোপের অধিবাসীদের চেয়েও বেশী ইউরোপীয়। আমি মনে করতাম যে প্রকৃত পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইউরোপীয় সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ইউরোপে তখন ছিল বুদ্ধিজীবীদের আভিজাত্যের যুগ। যত সব বিপ্লব তারপর ঘটেছে সে সবেরই ভাবধারা উৎসারিত হয়েছে সেই যুগ থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দী হ'ল বুর্জোয়াদের যুগ। কার্ল মার্কস একজন বুর্জোয়াই ছিলেন।* এবং সেই জন্যে তাঁর শিষ্য বা অনুগামীরাও সকলেই বুর্জোয়া। (Ibd pp. 163—166)

*কারণ তিনিও বুর্জোয়া লিবারেলদের মতই মানুষকে Economic Man-এর পর্যায়েই অবনমিত করেই দেখতেন—লেখক।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

লেনিনের দূত বোরোদিনের মেক্সিকো আগমন

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি রুশিয়ার বলশেভিক সরকার আমেরিকায় এক ট্রেড ডেলিগেশন পাঠান, সে সময় পৃথিবীর মিত্র পক্ষীয় কোন রাষ্ট্রই বলশেভিক সরকারকে স্বীকার করে নেয় নি। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ব্যক্তিগত দূত উইলিয়াম বুলিট সরেজমিনে তদন্ত করে বলশেভিক সরকারের অনুকূলে বিবরণ দেবার পর আমেরিকা সরকার এই ট্রেড ডেলিগেশনকে *de facto* স্বীকৃতি দান করেছিলেন। তার পরেই রুশিয়ার গৃহযুদ্ধ বাধে, এবং মিত্র শক্তি বিপ্লব বিরোধী শক্তি সমূহকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দিতে থাকে। বলশেভিক রুশিয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়। তার ফলে অন্যান্য দেশের মত আমেরিকার ট্রেড্ ডেলিগেশনের সঙ্গেও মস্কোর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথম কিছুদিন আমোরিকাস্থিত বন্ধু ও সমর্থকদের সাহায্যে ডেলিগেশনের সদস্যদের চলেছিল। তারপর তারা মহাবিপদে পড়ে যান।

এই সংবাদ মস্কোতে পৌছে। কিন্তু সাহায্য পাঠান এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দরজা তখন বলশেভিক সরকারের কাছে বন্ধ। সকল প্রকার কূটনৈতিক আদানপ্রদানও নিষিদ্ধ। একমাত্র উপায় গোপন পথে লেনদেন।

মাইকেল বোরোদিন একজন পুরাতন বলশেভিক। ১৯০৫ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টার পর তিনি আমেরিকায় চলে আসেন এবং সেখানকার বিশ্ববিত্থালয়ে শিক্ষা শেষ করে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সিকাগোতে অধ্যাপনা করতে থাকেন। তারপর বলশেভিক বিপ্লব সফল হওয়ার পরই তিনি রুশিয়ায় ফিরে যান। ঠিক হয় বোরোদিন যখন বহুদিন আমেরিকাতে ছিলেন তখন তিনি পাঁচলক্ষ ডলার

মূল্যের (২৫ লক্ষ টাকার মতন) জারের হীরক গোপনে আমেরিকায় নিয়ে যাবেন এবং সেখানে তা বিক্রয় করে ট্রেড ডেলিগেশনের খরচ চালাবেন। বাকি অর্থ দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় কমিউনিজম প্রচারের কাজে ব্যয় করবেন।

বোরোদিন বলশেভিক সরকারের সেই নির্দেশ অনুসারে যাত্রা করেন। দুটি সুটকেসের চামড়ার মধ্যে কৌশলে সেলাই করে সেই সব মূল্যবান হীরক খণ্ড লুকিয়ে রাখা হয়। তারপর তিনি জাল পাশপোর্ট নিয়ে ছদ্মনামে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে হল্যাণ্ড পৌঁছান। এই হল্যাণ্ডে তখন কমিউনিষ্ট ইনটার-ন্যাশন্যালের পশ্চিম ইউরোপীয় কেন্দ্রের দপ্তর ছিল। হল্যাণ্ডের বহু বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও নাগরিকগণের সাহায্যে এই কেন্দ্র পরিচালিত হ'ত। এঁদের সাহায্যে কাষ্টম্ পাহারাকে এড়িয়ে তিনি এক ডাচ জাহাজে চড়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। অস্ট্রিয়াতে এক সামরিক অফিসারের সঙ্গে তাঁর ঘণিষ্ঠতা হয়। এই ভদ্রলোক যুদ্ধে পরাজয়ের পর জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইউরোপ ছেড়ে দক্ষিণ আমেরিকাতে বসবাস করার জন্যে ঐ একই জাহাজের যাত্রী হ'ন। হাইতি দ্বীপে জাহাজ পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দু'জনকেই আমেরিকার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সুযোগ বুঝে সমস্ত সন্দেহটা নিজের ঘাড়ে নেবার জন্যে বোরোদিন পলায়ন করেন। সুটকেস দু'টি সেই অস্ট্রিয়ান বন্ধুটির নিকট রেখে আসেন। বলে যান যে, সে যেন আমেরিকায় পৌঁছেই সুটকেস দু'টি সিকাগোতে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেন।

বোরোদিন গোপনে নিউইয়র্কে পৌঁছে সুটকেসের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জামিনে খালাস হয়েই তিনি মেক্সিকো পালিয়ে আসেন, তখন তিনি একেবারেই নিঃস্ব। এখানে তাঁর কারুর সঙ্গেই আলাপ ছিল না। যে সব বিপ্লবী বন্ধু তাঁকে মেক্সিকোতে পালাতে সাহায্য করেছিল তারা তাঁকে মাত্র "গেল্" নামে এক ব্যক্তির নিকট থেকে তফাৎ থাকতে বলেছিল। তিনি স্প্যানিশ ভাষা জানতেন না। মেক্সিকোতে পৌঁছে তিনি খবরের কাগজের ষ্টলে গিয়ে Gale's Magazine ও El Heraldo পত্রিকার ইংরাজি সংস্করণের কয়েক সংখ্যা ক্রয় করেন। গেলের ম্যাগাজিন-এ দেখেন মেক্সিকোর সোস্যালিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি এম, এন, রায়ের নামে কাগজের প্রত্যেক সংখ্যাতেই কুৎসা রটনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি এও দেখলেন যে El Heraldo পত্রিকার ইংরাজি সংস্করণের সম্পাদকও

সোশ্যালিষ্ট মতাবলম্বী। এই অনুমান থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে গেল্-এর কাছ থেকে যখন তাকে তফাৎ থাকতে হবে তখন গেল্-এর শত্রুই হবে তার মিত্র; অতএব এম, এন, রায়-এর সঙ্গেই তাকে পরিচিত হ'তে হবে; এবং El Heraldo পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকটিও তাঁকে রায়ের সন্ধান দিতে পারবে।

এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—গেল্ নামক ব্যক্তিটি একজন আমেরিকান। যুদ্ধ বাধার পর বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পালিয়ে এসেছিল। অনেকের মত সেও রায়ের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেল করার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেছিল। সেটা না পাওয়াতে রায়ের নামে নিয়মিত কুৎসা রটিয়ে বেড়াত। লোকে সন্দেহ করত যে, সে ব্রিটিশ গুপ্তচর এবং তাদেরই টাকায় কাগজ বের করে এবং এম, এন, রায়ের নামে কুৎসা রটায়।

বোরোদিন রায়কে খুঁজে বের করেন এবং প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। রায় তাঁকে কপর্দকহীন অবস্থায় নিজের বাড়ীতে নিয়ে তোলেন। বোরোদিনও তাঁর সকল ব্যাপার রায়ের কাছে প্রকাশ করেন। রায় অবিলম্বে তাঁর ফেলে আসা সম্বলহীনা স্ত্রীর নিকট পাঁচশ ডলার ও রুশ ট্রেড ডেলিগেশনের নিকট দশ হাজার ডলার পাঠিয়ে দেন। রুশ-বিপ্লবের পর সোভিয়েট রুশিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই কমিউনিজম বিস্তারের জন্যে টাকা পাঠিয়ে আসছে। সেই বোধ হয় প্রথম দৃষ্টান্ত যখন সোভিয়েট সরকার তার নিজের কাজের জন্যে অপরের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করল।

কিছু দিনের মধ্যেও যখন বোরোদিন স্যুটকেসের কোন সংবাদ তার স্ত্রীর নিকট থেকে পেলেন না, তখন রায় মেক্সিকো সরকার, নিজ বন্ধুবান্ধব ও সংগঠনের দ্বারা খোঁজ সুরু করলেন। খোঁজ করে দেখা গেল, বোরোদিনের বন্ধু হাইতি দ্বীপেই এক কুটির বেঁধে সাধুর মত বাস করছেন এবং সুটকেসের কোন চিহ্ন কোথাও নাই। এই সন্ধানের ফলে পরে অবশ্য বন্ধুটির খেয়াল হয় যে, তিনি তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। তখন তিনি সুটকেসের খোঁজ করেন, দেখেন সুটকেস দুটি থানার এক কোণে যেমন তিনি ফেলে চলে গিয়েছিলেন তেমনই পড়ে আছে। আরো অনেকদিন পরে তিনি সেটি বোরোদিনের স্ত্রীর ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বোরোদিন রুশিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জারের রত্নরাজি হারিয়ে ফেলার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হ'ন।

রায়ও তখন মস্কোতে। রায়ের সাক্ষীতে তিনি সে দণ্ড থেকে অব্যাহতি পান। তারপর তাঁর স্ত্রী দুটি সুটকেস প্রাপ্তির কথা তাঁকে জানান। বোরোদিন তাঁকে সেই সুটকেস সহ মস্কোতে চলে আসতে লেখেন। তাঁর স্ত্রী এলে দেখা যায় সকল রত্নরাজিই ঠিক আছে। সময়ে রায় যদি সাক্ষ্যটি না দিতেন তবে ততদিনে বোরোদিনের মৃত্যুদণ্ড বিধান পুরানো ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে যেত।

রায়ের বাড়ীতেই বোরোদিনের থাকার ফলে রায়ের প্রথম প্রথম খুবই সুবিধা হয়। বোরোদিনের নিকট থেকে রায় মার্কসবাদ, ইউরোপীয় দর্শন ও ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ভালভাবে জানবার সুযোগ পান। তাঁদের মধ্যে একটি হৃদ্যতাও গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে চীনে যদিও তাঁর সঙ্গে রায়ের মতভেদ ঘটে তথাপি রায় লিখে গেছেন যে, ১৯২৯ সালে রুশিয়া ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত বোরোদিন তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রুশিয়ার বাইরে রায়ের সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন

১৯১৮—১৯ সালের শীতে মস্কোতে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের উদ্বোধনী কংগ্রেসের অধিবেশন বসলেও এবং পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানান হ'লেও ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত রুশিয়ার বাইরে পৃথিবীর কোথাও কোন কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে ওঠে নি। রায় ভাবলেন, তিনিই মেক্সিকোতে রুশিয়ার বাইরে প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি পত্তন করবেন। সোস্যালিষ্ট পার্টিরই নাম বদলে কমিউনিষ্ট পার্টি হবে।

সোস্যালিষ্ট পার্টির কার্যকরী সমিতির এ বিষয়ে মত থাকলেও মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রীগণের মধ্যে পার্টির যে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা আছে সেই পৃষ্ঠপোষকতা যদি নব-গঠিত কমিউনিষ্ট পার্টি না পায় তবে নব গঠিত পার্টি দেশের রাজনীতি ও সমাজ জীবন থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়বে এবং সোস্যালিষ্ট পার্টির যে ক্ষমতা ও মর্যাদা আছে তা থেকেও সে বঞ্চিত হবে। অতএব খুব সাবধানেই কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

রায় স্থির করলেন, তিনি প্রথমে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে বোরোদিনের পরিচয় করিয়ে দেবেন। তারপর প্রেসিডেণ্টের প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য করবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রেসিডেণ্টকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। সেই সঙ্গে বৈদেশিক মন্ত্রী, ইউনিভার্সিটির রেকটর, অধ্যাপক কাসাস, পার্লামেণ্টের অধ্যক্ষ ডন ম্যানুয়েলকেও ডাকলেন। ভোজ সভায় বোরোদিন যে ভাষণ দিলেন তাতে নিমন্ত্রিতদের মনে খুব ভাল ধারনাই হ'ল। বলশেভিক সম্বন্ধে যে একটি নীচু ধারনা ছিল, বিদগ্ধ বোরোদিনের নিখুঁত আদবকায়দা সম্বলিত সময়োচিত উপযুক্ত ভাষণে সে ধারণা কেটে গেল। বোরোদিন বললেন যে, রুশিয়ার নতুন সরকার

ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করতে চায়। যদি হিজ একসেলেন্সী প্রেসিডেণ্ট অনুমতি করেন তবে সেই উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল এক ল্যাটিন আমেরিকান ব্যুরো স্থাপন করবে এবং তার কেন্দ্রীয় দপ্তর থাকবে মেক্সিকোতে এবং রায়ের উপর তার সকল ভার অর্পণ করা হবে।

জার্মানীর পরাজয়ের পর প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন। আমেরিকার শত্রুতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে সারা পৃথিবীতে তাঁর আর কোন মিত্রই ছিল না। আমেরিকার সঙ্গে মিটমাটেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। ওবরগণই আমেরিকার সকল পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিল এবং ক্রমেই কারাঞ্জার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হ'য়ে উঠছিল। এই রকম সঙ্গীন অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জার পক্ষে রুশিয়ার নতুন সরকারের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের সম্ভাবনাকে ভেবে দেখার মত প্রস্তাবরূপে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। তা'ছাড়া আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তার ল্যাটিন আমেরিকান লীগ গড়ে তোলার স্বপ্ন অনুরূপে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা বোরোদিনের প্রস্তাবের মধ্যেও তিনি দেখতে পেলেন। সুতরাং তিনি এই সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি বললেন যে, রুশিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতিকে যেন তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এর পর থেকে ইউরোপে যে সকল মেক্সিকোর এমব্যাসি ও কনস্যুলেট ছিল, মেক্সিকো সরকারের নির্দেশে তাদের মাধ্যমে বোরোদিন মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করলেন।

প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা ও তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মীদের প্রাথমিক মনোভাবটা জানবার পর তিনি ডন ম্যানুয়েল ও বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট কমিউনিষ্ট পার্টি নাম গ্রহণ সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টি যদি অবিলম্বে এমন কিছু না করেন যাতে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ বাধে তা হ'লে কমিউনিষ্ট পার্টি নাম গ্রহণে তাদের আপত্তি হবে না। বৈদেশিক মন্ত্রী এও জানালেন যে, যদি প্রস্তাবিত ল্যাটিন আমেরিকান ব্যুরো অব্ কমিউনিষ্ট ইনটার-ন্যাশন্যাল গোপনে পিছনে থেকে ল্যাটিন আমেরিকান লীগকে পরিচালিত করতে চায় তবে সরকার তা সমর্থন করবে। রায় সব দিক দিয়ে গোড়া বেঁধে সোস্যালিষ্ট পার্টির নাম পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে গেলেন।

সোস্যালিষ্ট পার্টির বিশেষ সম্মেলন ডাকা হ'ল। সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি

নির্বাচিত হলেন ভারতীয় কমরেড্ রায়। কর্মসূচীর প্রথম প্রস্তাব ছিল, কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল কর্তৃক প্রচারিত কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো সম্বন্ধে বিবেচনা। তাতে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি মার্কস এঙ্গেল্‌স্ কর্তৃক প্রচারিত কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে যে আহ্বান ছিল তা স্মরণ করতে বলা হয়েছিল। রায় বললেন, সত্যিকারের মার্কসপন্থী যাঁরা তাঁরা এই মেনিফেষ্টো না গ্রহণ করে পারে না। মেনিফেষ্টো গৃহীত হ'ল।

তারপরই রায় বললেন, এই নতুন কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো গৃহীত হবার পর যুক্তিসঙ্গতভাবে পার্টির নাম কমিউনিষ্ট পার্টিই রাখতে হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাবও গৃহীত হ'য়ে গেল। রুশিয়ার বাইরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি মেক্সিকোতেই স্থাপিত হ'ল।

কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের সঙ্গে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদেবার জন্যে রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল নির্বাচিত হ'ল ; সেই সঙ্গে রায়ের অনুপস্থিতির সময় কাজ করার জন্যে একজন অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারিও নির্বাচিত হয়ে গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লেনিন কর্তৃক রায়ের নিমন্ত্রণ

বোরোদিন রায়ের সমস্ত কাজকর্মের বিবরণ মস্কোতে পাঠাচ্ছিলেন। মস্কো থেকে তাঁর কাছে নির্দেশ এসেছিল রায়কে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে। প্রথমে রায় যেতে অস্বীকার করলেন। যুক্তি দিলেন যে মেক্সিকো ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে যে কাজ আরম্ভ করা গেছে সে কাজ ছেড়ে যাওয়া উচিৎ হবে না। কিন্তু বোরোদিন যখন বললেন, ভারত রুশের সীমান্তের অপর পারেই অবস্থিত এবং রুশ সরকারের মত একটা বৈপ্লবিক শক্তির সাহায্য পেলে তিনি তাঁর জন্মভূমিকে মুক্ত করতে অনেকখানি সাহায্য করতে পারবেন, তখন তিনি আর আপত্তি করতে পারলেন না, এবং মেক্সিকো পার্টি ও ল্যাটিন আমেরিকান লীগের কাজকর্ম সেখানকার সহকর্মীদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর আশ্রয়দাতা ও হিতাকাঙ্ক্ষী প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার অনুমতি তাঁকে পেতেই হ'বে, নতুবা যাওয়া কঠিন।

শেষ পর্যন্ত রায় যে মেক্সিকো ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তার কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, তিনি ছেড়ে গেলেও সেখানের আরব্ধ কাজের কোন ক্ষতি হবে না। ইতি মধ্যেই সে সব যথেষ্ট দৃঢ়ভিত্তির উপরেই গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, তা এখন নিজ শক্তিতেই এগিয়ে চলতে সক্ষম হবে। এই সম্ভাবনা না থাকলে তিনি থেকে যেতেন।

আড়াই বছর আগে রায় যখন মেক্সিকো এসেছিলেন, তখন সেখানে কোন রাজনৈতিক সংগঠন বা পার্টি ছিল না। শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকত। সামরিক

নেতারাই জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। এই আড়াই বছরের মধ্যে দেশের সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে সোস্যালিষ্টপার্টি মেক্সিকোর শ্রমজীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। নির্লিপ্ততার পরিবর্তে এই দু'শ্রেণীই তখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে, বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাধিক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় জেনারেল ওবরগণের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্যে কারাঞ্জা সরকার এখন জনসাধারণের নিকট থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেতে পারবে। মেক্সিকোর ইতিহাসে ১৯১১ সালে ম্যাডারোর পতনের পর আর কোন সরকারই জনসাধারণের নিকট থেকে এতটা সাহায্য পায় নি। এর সব কৃতিত্বই রায়ের। জনসাধারণ যে কতটা সংঘবদ্ধ ও রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল তার চরম পরীক্ষা শীঘ্রই হয়ে গিয়েছিল। রায় অবশ্য তখন ছিলেন না। রায়ের মেক্সিকো ত্যাগের বছর দুই পরে ওবরগণ এক বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে আমেরিকার সাহায্যে সরকার গঠন করেছিল বটে কিন্তু ক্ষমতা বেশী দিন ধরে রাখতে পারেন নি। শ্রমমন্ত্রী কালেস জনসাধারণের সাহায্যে ওবরগণের সামরিক শাসনের পতন ঘটিয়ে পুনরায় গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমগ্র দেশে এক নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন ক'রে সকল প্রকার অরাজকতার অবসান ঘটান। এই কালেসই প্রেসিডেন্ট হ'য়ে যখন ইউরোপ ভ্রমণে যান তখন তিনি রায়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং পুরোনো দিনের জেনারেল সেক্রেটারিরূপে রায়ের স্বাক্ষর সম্বলিত পার্টি কার্ডটি পরম গর্বের সঙ্গে দেখিয়ে বলেন যে, তিনি একটি মূল্যবান স্মারক চিহ্নরূপেই এটিকে রেখেছেন।

রুশ গমন সম্বন্ধে তিনি মনস্থির ক'রে প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার অনুমতি লাভের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। কারাঞ্জা বিশেষ সহৃদয়তার সঙ্গেই সব শুনলেন। যদিও তখন আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ওবরগণের ঔদ্ধত্য ও আক্রমণাত্মক আচরণ ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল এবং দেশের মধ্যে জনগণের সাহায্য পেতে হলে রায়ের সাহায্য যে অপরিহার্য, তা জেনেও তিনি রায়ের ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে আপত্তি করলেন না। স্নেহশীল পিতার মতই বললেন যে, লেনিনের বিশেষ আমন্ত্রণে রুশিয়ায় গেলে রায় নিশ্চয় সেখানে গিয়ে আরো বেশী কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পাবে, এবং তার জন্মভূমি ভারতের সেবা করারও সুবিধা হবে। তিনি এও বললেন যে, বিদেশে গিয়েও রায় যে মেক্সিকোকে সাহায্য করার

জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবেন সে বিশ্বাস তার আছে : রায়কে বিজয়ী মিত্র শক্তিবর্গের অবরোধের বেড়া ডিঙ্গিয়ে নিরাপদে রুশিয়ায় পৌছতে হ'লে মেক্সিকো সরকারের কূটনৈতিক পাশপোর্ট চাই : তা ছাড়া রায়কে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দূত হিসাবেই পরিচিতি দেবেন : বার্লিন প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিকটও পরিচয় পত্র দিয়ে দেবেন এবং ঐ মর্মে সংবাদ পাঠাবেন : সরকারের বৈদেশিক বিভাগ রায়ের এই বিপজ্জনক ভ্রমণের সকল ব্যবস্থা করে দেবে : তাঁকে স্পেন হয়েই যেতে হবে : সেখানকার বন্ধুরা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। বিদায় বেলায় স্পার্টার আদর্শে আস্থাবান বয়োবৃদ্ধ এরিষ্টোক্র্যাট্-এর কণ্ঠ বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছিল তিনি বলেছিলেন, "বড় কম বয়েস, সাবধানে চ'লো,—চির-জীবী হও—You are still very young. Don't ganble with fate. I wish you a long, successful life".

মেক্সিকো ছেড়ে যাওয়া স্থির হ'য়ে গেল। যাবার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, বিচ্ছেদ বেদনায় রায় ততই মুষড়ে পড়তে লাগলেন। রায়ের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট ছিল, সামাজিক আচার ব্যবহারে তিনি সর্বদাই একটি দূরত্ব, একটি নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করতেন। আমেরিকা ও মেক্সিকোতে এসে সেটা বেড়ে গিয়েছিল এবং ইউরোপেও সেটা বিশেষ কমে নি। যেটাকে তিনি নিজ চরিত্রের অসামাজিক কাঠিন্য (Stiffness) বলে অভিহিত করেছেন; একেই নিন্দুকরা "arrogance—গরব" বলে অভিহিত করে গেছেন; যদিও তা শেষের দিকে অনেক পরিমাণে কমে এসেছিল*। এই জন্যে মেক্সিকোতে তিনি খুব কম লোকের সঙ্গেই ঘনিষ্ট বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তথাপি মেক্সিকোকে তিনি তাঁর নিজের দেশের মতই ভালবেসেছিলেন। কেননা মেক্সিকোই তাঁর পুনর্জন্মের জন্মভূমি। তারপর সে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট থেকে যে অকুণ্ঠ স্নেহ-ভালবাসা-সহযোগিতা পেয়েছেন, সরকারের নিকট থেকে যে আনুকুল্য পেয়েছেন, ততুপরি সেখানকার চরম নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত আরামের পরম সম্মানিত জীবন, প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করলে মেক্সিকো ছেড়ে যাওয়া যে তার পক্ষে কঠিন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তথাপি তাঁকে যেতেই হ'বে। এই সময়কার তাঁর মনের অবস্থার কথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

এক হিসাবে মেক্সিকো ছিল আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি। যদিও

*Ibid pp 83

এটা ঠিক যে সেখানে আসার আগেই আমার পূর্বজীবনের ভাব ও আদর্শের সঙ্কীর্ণতার প্রতি আমি ক্রমেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলাম, তথাপি মেক্সিকোতেই আমার নতুন লক্ষ্যের ধারণা এক সুস্পষ্ট আকারে রূপ নেয় এবং পূর্বেকার বন্ধ্যা জীবনের প্রতি কেবলমাত্র অসন্তুষ্টির পরিবর্তে আমাকে এক সাফল্যমণ্ডিত ভবিষ্যতের পানে চলবার প্রত্যয় এনে দেয়। এটা কেবল রাজনৈতিক ভাব ও বৈপ্লবিক আদর্শের পরিবর্তন মাত্র নয়—তার চেয়ে ঢের বেশী। জীবনটাকে আমি এক নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে দেখতে সুরু করি। আমার মধ্যে এক বিপ্লব ঘটে যায়—দার্শনিক বিপ্লব—যে বিপ্লবের কোন শেষ নাই।

আমার জীবনবাদের মধ্যে এই মৌলিক পরিবর্তনই আমার দ্বিতীয় জন্মভূমির প্রতি ভাবাবেগ জানিত আকর্ষণ থেকে আমাকে মুক্ত করে দিল। আমার এই মুক্তির নতুন আদর্শ ত জাতীয়তাবাদের গণ্ডির ভেতর বা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পাওয়া যায় না। এই মুক্তির জন্যে সংগ্রাম সারা দুনিয়া জুড়ে চালাতে হবে, সমগ্র সভ্য মানুষকে এ যুদ্ধের অংশীদার হ'তে হ'বে। মেক্সিকোতে যা করেছি তারপর সেখানে থেকে আরো বেশী কিছু করার ছিল না।

(Ibid pp 217-218)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রায়ের মস্কো যাত্রা

বিকশিত ব্যক্তিত্ব অনুশীলনের যে ইউটোপিয়া তিনি বাল্যে গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তর জীবনে নব মানবতাবাদ নামে দর্শন উদ্ভাবনের দ্বারা যে ইউটোপিয়াকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন তার সূত্রপাত যে আমেরিকাতেই এবং মেক্সিকোতে তা যে একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে তা তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই পাওয়া যায়। সে সময়কার মতকে সাধারণ ভাবে মার্কসবাদীর মতবাদ আখ্যায় আখ্যাত করা গেলেও তিনি যে মার্কসীয় দর্শনের অনড়ত্ব ও গোঁড়ামিটি কোন দিন গ্রহণ করেন নি তা পূর্বে উদ্ধৃত উক্তি ও বর্তমানে পূর্ব পরিচ্ছেদের উদ্ধৃতির "আমার মধ্যে এক বিপ্লব ঘটে যায়—দার্শনিক বিপ্লব যে বিপ্লবের কোন শেষ নাই—A Philosoplical revolution which knew no finality" বাক্যটি লক্ষ্যণীয়।

ভারতে তিনি যতদিন ছিলেন, ততদিন বিকশিত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার, সাধনায় মনকেই গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর মননশীলতার ক্ষমতা, বুদ্ধি, মেধা, একাগ্রতা যেমন বেড়ে গিয়েছিল প্রচুর তেমনি ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও হয়েছিল দুর্নিবার। কিন্তু মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির সাধনার পথে আরো যে কত সম্ভাব্য বাধা থাকতে পারে, সে সব বাধা দূর করতে হ'লে কেবল যে ভাবালুতা দিয়ে সম্ভব নয়, তার জন্যে চাই যুক্তি সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা, তা ভারতের সে সময়কার সঙ্কীর্ণ ও অনগ্রসর পরিবেশে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সেটা হ'ল আমেরিকায় এসে। রাজনৈতিক বাধা কতভাবে আসতে পারে, সর্বসাধারণের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক মুক্তি যে রাজনৈতিক মুক্তির

সঙ্গেই আসে না তা তিনি আমেরিকাতে ও মেক্সিকোতে এসে বুঝলেন এবং সেই সঙ্গে আরো বুঝলেন যে, সত্যিকারের মুক্তির পথ গড়ে তোলা তখনই সম্ভব যখন সর্বপ্রকার বাধা-নিষেধ-শাসন-অনুশাসন-সংস্কার মুক্ত হ'য়ে মানুষ স্বাধীন ভাবে সঠিক পথে চিন্তা করতে শিখবে। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে পুনরায় কিছু উদ্ধৃত করছি :

> পাঁচ বছর আগে বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে অর্বাচীন ধারণা নিয়ে অস্ত্রের সন্ধানে ভারত ছেড়েছিলাম। তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে অনেক ভুলই ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমেরিকায় আমি যে কয়েক মাস ছিলাম তার মধ্যেই আমি অতিশয় দুঃখের সঙ্গে বুঝেছিলাম যে, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ থেকে যে সামাজিক আদর্শবাদ গ্রহণ করেছিলাম তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধ। এই জাতীয়তাবাদ সংস্কৃতিমূলক বা রাজনৈতিক, তা বৈপ্লবিক বা নিয়ম-তান্ত্রিক যাই হোক না কেন তা দিয়ে মানুষের সে আদর্শ লাভ হবে না। হিন্দু জাতীয়তাবাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম রচিত উচ্চনীচ জাতিভেদ, মধ্যযুগীয় ভূদাস প্রথা, জমিদারী প্রথা প্রভৃতি থাকতে মানুষের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয়। আগে সেটি বুঝতাম না। জাতীয়তাবাদ মানুষের ভাবাবেগের উপরই ভরসা রাখে, মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির প্রতি তার আবেদন কম। ঘরে বাইরে এর আবেদন হৃদয়ের উপর, মস্তিষ্কের নিকট নয়। জাতীয়তাবাদ মানুষকে জাগায় বটে কিন্তু চিন্তাশীল করে না, বুদ্ধিদীপ্ত করে না। যখন নিউইয়র্কে ছিলাম তখন আমি বেশ কিছু পড়েছিলাম এবং খুব শীঘ্রই সমসাময়িক ইতিহাসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি মোটামুটি বুঝেছিলাম। তার ফলেই হয়েছিলাম সোস্যালিষ্ট। কিন্তু তখনো জীবনাদর্শের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সেটা টের পেয়েছিলাম যখন একদিন বোরোদিনের সঙ্গে আলোচনা কালে হিন্দু জাতীয়সংস্কৃতির সমর্থনে মার্কসবাদকে শেষ আক্রমণ করেছিলাম তখন বলশেভিক তর্কচূড়ামণি তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সহজেই আমার দুর্বল স্থান খুঁজে পেলেন এবং দেখিয়ে দিলেন যে, আমি যা নিজে আর বিশ্বাস করি না তাকেই তর্কের সাহায্যে সমর্থন করতে চেষ্টা করছি— এটি আমার পুরাতন সংস্কারেরই জের মাত্র।

আমি আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি ত্যাগ করলাম একজন বিমুক্তমন মানুষ রূপে, অবশ্য এক নতুন মতবাদের উপর বিশ্বাস নিয়ে, কিন্তু সে মতবাদের অনড়ত্ব ও গোঁড়ামি কাটাবার প্রতিশেধক এই দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল। সামাজিক ন্যায় বিচার ও অর্থ নৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা ব্যতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি আমার আর তখন আস্থা ছিল না। এই সঙ্গে আমি এটাও বুঝেছিলাম যে সত্যিকারের ফলপ্রসূ যে সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম তা চালাবার প্রাথমিক প্রয়োজন হ'ল ব্যক্তি মনের স্বাধীনতা লাভ, সর্বপ্রকার অনুশাসন, অভ্যাস ও সংস্কারের বন্ধন ও দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ।

শীঘ্রই হয়তো আমি ভারতের বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে সক্ষম হ'ব। কিন্তু ঠিক যে উদ্দেশ্য নিয়ে এক দিন ভারত ছেড়ে ছিলাম সে উদ্দেশ্যের প্রতি আমার আর তখন আস্থা ছিল না। তখনো কিন্তু আমি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করতাম। কিন্তু সেই সঙ্গে বিপ্লবের ভাব ও ভাবনাকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার প্রতি আরো বেশী গুরুত্ব দেওয়া যে প্রয়োজন সেটিও শিখেছিলাম। অস্ত্রের চেয়ে এই শিক্ষা ও ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়াই যে বেশী প্রয়োজনীয় সেটাই বুঝেছিলাম। এই বিশ্বাস সম্বল করেই ভারতবর্ষে ফেরার পথে পা বাড়ালাম—তবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে।

(Ibid 219-220)

যাত্রার পনের দিন আগে রায় গোপনে মফস্বল ভ্রমণে বেরোলেন। আর ফিরলেন না। ১৯১৯ সালের নভেম্বরের প্রথমে ভেরাক্রুজে জাহাজ ছাড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গিয়ে জাহাজে উঠলেন। সঙ্গে রইল মিঃ ভি গার্সিয়ার নামে এক কূট-নীতিকের পাশপোর্ট—প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত দূত। যাবার আগে সঞ্চিত অর্থ থেকে মেক্সিকো কমিউনিষ্ট পার্টির অস্থায়ী সেক্রেটারির হাতে দিয়ে এলেন এক বছর পার্টি চালাবার মত যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ। শ্রীমতী এভ্লিন রায়ও রায়ের অনুগামিনী হলেন। তবে তিনি ভেরাক্রুজে জাহাজে উঠেছিলেন কিংবা অন্য কোন জাহাজে উঠেছিলেন সে কথা লেখকের জানা নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ইউরোপের পথে রায়

১৯১৯ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভেরাক্রুজে বন্দর থেকে রায় SS Alfanso XIII নামক স্পেনীয় জাহাজে মেক্সিকো ত্যাগ করলেন। সঙ্গে যে Roberto Alleny Villa Garcia-র নামে পাশপোর্ট ছিল, সেটি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই তৈরি করা হয়েছিল। রায়ের স্পেনিশ ভাষার উচ্চারণের খুঁত ঢাকবার জন্যে এমন একটি সত্যিকারের নাম খুঁজে বের করা হয়েছিল, যে ছিল মিশ্র পিতা মাতার সন্তান। এই ভদ্রলোকের পিতা ছিলেন একজন ইংরেজ, মাতা মেক্সিকোর জনৈকা দেশীয় ধনী কন্যা। বাড়ীতে ফরাসি ভাষাই ছিল কথ্য। সুতরাং সন্তানদের যে স্পেনিশ ভাষা মাতৃভাষা হবে না এবং উচ্চারণে ত্রুটি থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

জাহাজ হাভানাতে ডাক ও যাত্রী তুলতে থামবে। সেটাই এ যাত্রার ভয়ের কারণ। কিউবা তখন আমেরিকার প্রোটেক্টরেট। হাভানাতে ইংরেজ-আমেরিকার পুলিশ টের পেলে ছাড়বে না। দুই সরকারেরই গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ঝুলছে। এতদিন মেক্সিকো থেকে অপহরণ করার চেষ্টাও চলছিল—অবশ্য সফল হয় নি। তাই এত সতর্কতা। যুদ্ধের সময় থেকে নিরপেক্ষ জাহাজ তল্লাসী করার রীতি তখনো বলবৎ। সেই জন্যে এই বিশিষ্ট যাত্রীটিকে হাভানাতে যেন আড়ালে রাখা হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাহাজের কাপ্তেনকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

হাভানাতে যখন জাহাজ পৌছল, তখন রায় দেখলেন বন্দরে শ্রমিকদের ধর্মঘট চলেছে, অন্যান্য সব জাহাজই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আটকে আছে। এইভাবে পড়ে থাকা নিরাপদও নয়—কষ্টকরও বটে। তিনি খোঁজ করে জানলেন, শ্রমিক ইউনিয়ানের সেক্রেটারি তাঁর পরিচিত। সেক্রেটারি একজন

সোস্থালিষ্ট, দু'তিনবার মেক্সিকোতেও গিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি সংবাদ পাঠালেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি জাহাজ থেকে পিকেটিং তুলে নিলেন। অজুহাত দিলেন, যাত্রী জাহাজ আটকে রেখে যাত্রীদের কষ্ট দেওয়া তাদের নীতি নয়, জাহাজটি ছেড়ে যেতে পারে। ভোর রাত্রেই জাহাজ ছেড়ে গেল। এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট মনোভাবাপন্ন কিউবান শ্রমিকদের বুর্জোয়া যাত্রীদের প্রতি হঠাৎ এই ভালবাসা দেখে সকল যাত্রীই অবাক হয়েছিলেন ; অবাক হন নি—জাহাজের কাপ্তেন, মেক্সিকোর জার্মান স্কুলের এক শিক্ষক ও ফরাসী দেশস্থ মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত—এঁরা আগে থেকেই রায়কে চিনতেন। তাঁরা নীরবেই রইলেন। তাঁরা ও তাঁদের স্ত্রীরা এবং রায় দম্পতি মিলে ক'দিনের জন্যে ছোট্ট একটি পার্টি গড়ে তুললেন। স্যানটানডার-এ জাহাজ থামলে রায় সেখানে নেমে মাদ্রিদ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের স্পেনে অবতরণ

যুদ্ধে স্পেন নিরপেক্ষ থাকার ফলে তার গায়ে যুদ্ধের আঁচ ত লাগেই নি, বরং যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে সে রীতিমত ধনীই হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া সারা ইউরোপের ধনী সম্প্রদায় স্পেনীয় উপকূলে রৌদ্র সেবন করতে সেখানে এসে ভিড় জমাচ্ছিল। রাজধানী মাদ্রিদেও তখন প্রাচুর্য ও বিলাসিতার বন্যা বইছিল। রায়কে এ সব কিছুই আকর্ষণ করতে পারল না। রায়ের মন তখন কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের কল্পনাতেই ভরে ছিল। দেখা যাবে যে, যে আশা ও আগ্রহ নিয়ে তিনি তাঁর মেক্সিকোয় সুপ্রতিষ্ঠিত সাফল্যমণ্ডিত জীবন ছেড়ে স্পেন, সুইজারল্যাণ্ডের বিলাস বহুল পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করে মস্কো পৌঁছলেন তা মোটেই ব্যর্থ হয় নি।

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল-এর প্রথম কংগ্রেস নামে মাত্রই আন্তর্জাতিক ছিল। জার্মানীর লীগ অব স্পার্টাকুশের প্রতিনিধিগণ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন প্রতিনিধি ছিল না। বস্তুতঃ রুশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিই সেই কংগ্রেসের সব কিছু ছিল। প্রথম কংগ্রেসে কেবল দ্বিতীয় কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো নামে একটি মেনিফেষ্টো প্রচার করা হয় ও পৃথিবীর সকল শ্রমিককে নিজ নিজ দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানান হয়। তার দেড় বছর পরে দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হ'বে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের উদ্বোধনী কংগ্রেস। এই কংগ্রেসর প্রস্তুতিতে, সাংগঠনিক পরিকল্পনায়, কর্মসূচী রচনায় এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপনে রায়ের অবদান কম নয়।

স্পেনের সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রভাব যদিও দেশের মধ্যে তেমন কিছু ছিল

না, তথাপি সারা ইউরোপে তার যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। তার একমাত্র কারণ, পার্টির নেতা ইগ্‌লেসিয়াসের ব্যক্তিত্ব। সারা ইউরোপে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁকে যদি কোনক্রমে এই কংগ্রেসে নিয়ে যাওয়া যায় তা হ'লে রুশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের প্রতি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সারা ইউরোপব্যাপী বিরূপতা ম্লান হয়ে যাবে। রায় সেই উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু রায়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। খাঁটি লিবারেলকে রায়ের বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাস টলাতে পারল না। তবে তিনিও রায়ের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষিত না হয়ে পারেন নি। প্রাচীন জ্ঞান ও সভ্যতার পীঠস্থান ভারতের একজন কি করে বলশেভিকদের হিংস্র মতবাদকে সমর্থন করতে পারে, তা ভেবে তিনি অবাক হয়েছিলেন।

তারপর তিনি সোস্যালিষ্ট পার্টির বামপন্থীদের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করলেন। পত্রের মাধ্যমে রায়ের সঙ্গে এঁদের পরিচয় হয়েছিল। তাঁরাই পরে স্পেনে রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র স্থাপনের নেতৃত্ব করেছিলেন এবং ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে গৃহযুদ্ধে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁরা সানন্দে দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে স্বীকৃত হ'লেন। রায়ের স্পেনের কাজ শেষ হ'ল। কিন্তু বোরোদিনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল মেক্সিকো মারফৎ। পরবর্তী সংবাদের জন্যে তাঁকে কিছুদিন সেখানে অপেক্ষা করতেই হ'ল। তারপর মাদ্রিদ ত্যাগ করে বার্সিলোনাতে জাহাজে চড়ে জেনোয়া-মিলান-জুরিখ্‌ হয়ে বার্লিনে পৌছলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বার্লিনে রায়

চার বছর আগে তিনি বার্লিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। ইতিমধ্যে উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে সেখানে পৌছলেন বটে কিন্তু তখন ভারতে বিপ্লব ঘটাবার জন্যে কেবল মাত্র অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্য আর ছিল না। আমেরিকা-মেক্সিকোতে বিপ্লব সংগঠনের নতুন উদ্দেশ্য তখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন,—নতুন কায়দা শিখেছিলেন।

বিপ্লবের নতুন হাতে খড়িতে তিনি শিখেছিলেন যে, প্রয়োজনবোধ জাগলেই তবে বিপ্লব ঘটে। তখন আর বিশেষ কোন ব্যক্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে না। প্রয়োজনবোধে উদ্বুদ্ধ ভাবী সমাজের নতুন ভাবে ভাবিত মানুষরাই বিপ্লব সংঘটিত করে। এই নতুন ভাবে ভাবিত মানুষদের নতুন সামাজিক শক্তিরূপে সংগঠিত হয়ে ওঠার উপরই বিপ্লব নির্ভর করে। যতক্ষণ না সমাজের সে পরিণতি ঘটান যাচ্ছে ততক্ষণ সশস্ত্র বিদ্রোহ আত্মহত্যার সমতুল্য—কারণ তা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে শক্তি জেগে উঠছে, প্রথমতঃ তাদের রাজনৈতিক শিক্ষার দ্বারা সচেতন করতে হবে, তারপর তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে বৈপ্লবিক বাহিনী সংগঠিত করে তুলতে হবে। সর্বশেষে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার কথা আসবে। এসব আয়োজন পূর্বে সম্পন্ন না করে অস্ত্রের কথা ভাবা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার সামিল। গুপ্ত সমিতির মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে একটি দেশে বিপ্লব ঘটান যায় না। বৈপ্লবিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে আরো ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন – যা গুপ্ত সমিতির দ্বারা হয় না। এই জন্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

বিপ্লবের এই নতুন কায়দা শেখার পর থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি

ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্যে উপযুক্ত সামাজিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করছিলেন। মেক্সিকো ত্যাগ করে তিনি ভারত অভিমুখেই যাত্রা করেছিলেন। বার্লিন—মস্কো—মধ্য এসিয়া প্রভৃতি হয়েছিল দীর্ঘ পথের ঘাঁটিমাত্র।

১৯১৮ সালের শেষে পশ্চিম রণাঙ্গনের অসাফল্য জার্মানীর যুদ্ধজয়ের আশা নির্বাপিত করে দেয়। লুডেনডর্ফ ও হিণ্ডেনবুর্গ কাইজারকে সন্ধি করতে পরামর্শ দেন। এ যাবৎ সাব-মেরিণ বাহিনী ছাড়া জার্মানীর বাকী নৌ-বাহিনী কিয়েলে অটুট অবস্থায় মজুদ ছিল। মাত্র স্থল বাহিনীর পরাজয়ে পরাজয় স্বীকার না করে নৌ-বাহিনীর জেনারেল ষ্টাফ্ সিদ্ধান্ত করেন যে, তারা তাদের সকল শক্তি একত্রিত করে বাহির সমুদ্রে গিয়ে ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে মরণপণ ক'রে আক্রমণ করবে। কিন্তু সাধারণ সৈনিকেরা সেনানীদের এই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, এবং প্রধান নৌ-সেনাপতির জাহাজে লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়। ৯ই নভেম্বর বিদ্রোহী নাবিকরা তীরে নেমে বিদ্রোহী শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিলে যোগ দেয়। এইভাবে জার্মানীর উত্তরে বালটিক সাগরের বন্দর ও সাগর তীরের সহর সমূহে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঐ দিনেই বার্লিনে শ্রমিকদের মিছিলের উপর সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে অস্বীকার ক'রে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়, এবং অপরাহ্নে শ্রমিক, সৈন্য ও নাবিকদের এক বিরাট জনতা রাজভবনের সামনে হাজির হয়। কাইজারের রাজপ্রাসাদ পরম রাজভক্ত বাছাই করা সৈন্য বাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকত। কিন্তু সেদিন সেই রাজকীয় বাহিনীই বিপ্লবীদের উপর গুলি ছুঁড়তে অস্বীকার করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লাল পতাকার বন্যা বইয়ে দেয়। আর সেই নাটকীয় মুহূর্তেই কাইজারের সিংহাসন ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। বিশ্বত্রাস কাইজার পিছনের দরজা দিয়ে দেশ ছেড়ে পলায়ন করেন।

জার্মানীতে রাজতন্ত্রের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও স্পার্টাকুশদের মধ্যে (এই স্পার্টাকিষ্ট লীগের নাম বদলে পরে জার্মানীর কমিউনিষ্ট পার্টি রাখা হয়) ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব সুরু হয়। স্পার্টাকুশ নেতা কার্ল লেবনেকটের নেতৃত্বে বার্লিনে সোভিয়েট রিপাবলিক স্থাপন করা হয়। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা হিণ্ডেনবুর্গের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর পৃষ্টপোষকতায় কাশেল্-এ তাঁদের সরকারের দপ্তর স্থাপন করে। সমগ্র ১৯১৯ সাল ধরেই এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক গভর্ণমেণ্টের নেতা ফ্রিৎস এবার্ট স্পার্টাকুশ

বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটি রফা করার জন্যে কার্ল লেবনেকট্‌কে মন্ত্রীসভার মধ্যে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু স্পার্টকুশরা তা গ্রহণ না করাতে এবার্ট ভয় পেয়ে রাজকীয় বাহিনীর হাতেই আত্মসমর্পণ করেন এবং তার ফলেই জার্মানীতে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আশা বিলুপ্ত হয়। এই ভাবে পরস্পরের মধ্যে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল তখন রায় বার্লিনে পৌছান।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় রাজনীতিতে রায়ের প্রথম অভিজ্ঞতা

সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি পরিচালিত জার্মান সাধারণতন্ত্রের রাজধানী তখন বার্লিনে স্থানান্তরিত হয়েছে। স্পার্টাকিষ্ট-কমিউনিষ্টদের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বটে কিন্তু তখনো দেশের স্থানে স্থানে শ্রমিকরা বিদ্রোহ করছে। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় নতুন সরকার তা দমন করে চলেছে। ফলে সামরিক বাহিনীই ক্রমে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। ক্যাবিনেটে তাদের প্রতিনিধি আছে। জার্মানীতে রায় একটি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ভাঙ্গা-গড়া দেখতে লাগলেন, আর বিপ্লবকে সার্থক করতে হ'লে কী করা উচিত ছিল, বর্তমানে কী করা উচিত, তা তাঁর নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে লাগলেন।

শীঘ্রই তিনি জার্মাণীর নেতৃস্থানীয় সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও কমিউনিষ্টদের বৈঠকখানার একজন বিশিষ্ট পারিষদ হয়ে উঠলেন।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিশিষ্ট নেতাদের বৈঠকখানায় তিনি প্রবীনতম চিন্তাবীর বার্ণষ্টিন, কাউটস্কী, হিলফারডিং প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর ফাক্স স্বনামখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা রোজা লুক্সেমবার্গ, ফ্রাঞ্জ মেহরিং প্রভৃতি চিন্তাশীল নেতাদের বন্ধু ছিলেন। এই ডক্টর ফাকসই বোরোদিন ও কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে রায়ের যোগাযোগের ব্যবস্থা করতেন। বোরোদিন এ ব্যবস্থা মেক্সিকো থেকেই করে এসেছিলেন।

কমিউনিষ্ট নেতাদের বৈঠকখানা ছিল বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী ঈরণা মোরেণার বাড়ীতে। স্বনামধন্য রুশ কমিউনিষ্ট নেতা র‍্যাডেক তখন জার্মানীতে রাজবন্দীরূপে আটক ছিলেন। শীঘ্রই তিনি বেরিয়ে এলেন এক সপ্তাহের মধ্যে

জার্মানী ত্যাগ করার নির্দেশনামা নিয়ে। জার্মানীর কমিউনিষ্টদের মধ্যেও র‍্যাডেক-এর খ্যাতি তখন অসামান্য। জার্মানীর জেলে থাকতেই তিনি ন্যাশন্যাল বলশেভিজিম নামে এক নীতি জার্মান কমিউনিষ্টদের মধ্যে প্রচার করেন। এর অর্থ হ'ল, জার্মান জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের মৈত্রীবন্ধন এবং এক যোগে মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো। অর্থাৎ যুক্তিটি ছিল, জার্মান জাতীয়তাবাদকে যদি বলশেভিকরা সমর্থন করে তা হ'লে জাতীয়তাবাদী সামরিক বাহিনীর তরুণ সম্প্রদায়ও জার্মানীর বলশেভিক পরিচালিত সরকারকেও সমর্থন করবে এবং রুশ বিপ্লবের বিরোধিতা না করে তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

জার্মানী তখন বিজয়ী মিত্র শক্তির দখলে এবং ভার্সাই সন্ধি অনুসারে তারা জার্মান সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র করার কাজে ব্যস্ত। এর ফলে মিত্র শক্তির প্রতি জার্মান সামরিক বাহিনী একান্তই বিমুখ। মিত্র শক্তি তখন রুশিয়ার গৃহ যুদ্ধে বলশেভিক বিরোধী বাহিনীকেও সাহায্য করছে। জার্মানীতে যদি জাতীয়তা-বাদীরা বিদ্রোহ করতে থাকে তা হ'লে রুশিয়ার উপর মিত্র শক্তির চাপ কমবে। এই সব যুক্তিতে র‍্যাডেক জার্মানীতে ন্যাশন্যাল বলশেভিজিম-এর নীতি প্রচার করতে থাকেন এবং নিজ নীতির দ্রুত সাফল্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেন।

রায় র‍্যাডেকের নীতিকে বিপজ্জনক বলে মত প্রকাশ করেন, র‍্যাডেকও রায়কে ছেলেমানুষ বলে উপেক্ষা করেন। কিন্তু শীঘ্রই ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় যে, র‍্যাডেকের মত ভ্রান্ত ও রায়ের মতই ঠিক। লেনিনও শীঘ্রই তাঁর "Left Wing Communism—An Infantile Disease" পুস্তকে উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতাকে তীব্র আক্রমণ করেন।

জার্মান জাতীয়তাবাদী সামরিক বাহিনী জার্মানীতে কমিউনিষ্ট শাসন সহ্য করা দূরে থাক তাদেরই তাঁবেদার সোস্যাল ডেমোক্র্যাট সরকারকেই সহ্য করতে চাইছিল না। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে সামরিক বাহিনীর এক অংশ ভিমার-এ (Weimar) রচিত সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সাধারণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করার উদ্যোগ করল। একদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যের দল রাজধানী দখল করে বসল। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেণ্ট এবার্ট তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে পলায়ন করলেন।

রোজা লুক্সেমবার্গ-এর হত্যার পর জার্মান কমিউনিষ্টদের তাত্ত্বিক বিষয়ে এবং পার্টির নেতৃত্ব করছিলেন আর্ণষ্ট মেয়ার। র‍্যাডেক-এর ন্যাশন্যাল বলশেভিজিমের

নীতি যে বিপজ্জনক সে কথা রায় আর্ণষ্ট মেয়ারকে বোঝাতে পেরেছিলেন। সেদিনকার সামরিক বাহিনীর বার্লিন দখল রায়ের মতেরই অভ্রান্ততা প্রমাণ করেছিল।

সরকার অক্ষমের মত রাজধানী ত্যাগ করলেও সৈন্যবাহিনীর সেই অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হানার জন্যে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে এক নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটল। জার্মান ফেডারেশন অব্ লেবার-এর প্রেসিডেন্ট কার্ল লেজিন এতদিন কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিকট থেকে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল নামে ধিক্কৃত হয়ে আসছিলেন। আজ তিনিই এই আক্রমণের প্রতিবিধানার্থ দেশব্যাপী এক রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট করার জন্যে দেশের নিকট আবেদন জানালেন। রাত্রের মধ্যেই কার্ল লেজিনের এই সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ঘোষণা করতে হ'বে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের গোপন বৈঠক বসল। নিমন্ত্রিত হয়ে রায় পার্টির নেতা আর্ণষ্ট মেয়ারের সঙ্গে বৈঠকে এলেন। আলোচ্য বিষয় হল, এখন প্রলিতারিয়েৎ শ্রেণীর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের আসনে সমাসীন কমিউনিষ্ট পার্টি কি এই ধর্মঘট সমর্থন করে সংস্কারপন্থী লেজিনের পিছু পিছু চলবে, না বর্তমান সংকট মুহূর্তে কোন কিছু না করে দেশের রাজনীতি থেকে মুছে যাবে? মেয়ার প্রথমোক্ত পন্থাই সমর্থন করলেন। উইলহেল্‌ম পিয়েক প্রমুখ উগ্রবামপন্থীগণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোশ্যালিষ্ট পার্টির (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বামপন্থী দলের নাম) সঙ্গে যুক্তি করে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটের পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল।

এই ধর্মঘটের ফলে চারদিন সারা সহর নিশ্চল হ'য়ে রইল। পঞ্চম দিনে সৈন্যের দল যে গর্বোদ্ধত মাথা উঁচু করে বার্লিনে ঢুকেছিল সেই উঁচু মাথা নীচু করে রাজধানী থেকে বেরিয়ে গেল। আর পলাতক সরকার রাজধানীতে ফিরে এল।

এই ধর্মঘটের ব্যাপারে উগ্রবামপন্থীদের আচরণ রায় লক্ষ্য করলেন এবং বুঝলেন যে, এদের মতে চললে এত বড় জয়লাভ ঘটত না। পার্টির নেতা মেয়ার যে ধর্মঘটের পক্ষে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পেরেছিলেন তাতে তাঁর প্রতি রায়ের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেল।

এই যুদ্ধে জয়লাভের পর লেজিন-এর সাহস বেড়ে গেল। তিনি নোস্কে প্রমুখ সামরিক বাহিনী সমর্থিত মন্ত্রীদের বিতাড়নের দাবী করলেন। এ

দাবী যদি কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থীরা সেদিন সমর্থন করত তা হ'লে হয়তো জার্মানীর সাধারণতন্ত্র স্থায়ী হ'তে পারত এবং সেখানে হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটতে পারত না। সেদিন কমিউনিষ্ট পার্টি ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোস্যালিষ্ট পার্টি লেজিনকে সমর্থন করেনি। সেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আলোচনার যুগ্ম-বৈঠকে মেয়ার ছিলেন না, ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ছিলেন উগ্রবামপন্থী পিয়েক—যাঁর মাথা থেকে র্যাডেক-এর ন্যাশন্যাল বলশেভিজিমের ভূত তখনো নামে নি।

রায় মধ্যপন্থা গ্রহণ করে মেক্সিকোতে সুফল পেয়েছিলেন, জার্মানীতে এসেও সেই পন্থা ফলপ্রসু হতে দেখলেন (হয়তো মেয়ারের এই মধ্যপন্থা গ্রহণে কিছুটা হাত তাঁর ছিল)। আর দেখলেন, উগ্র পন্থা গ্রহণে কী ভাবে একটি জাতির দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত ঘটে।

জার্মানীতে থাকার সময় তিনি আর্ণষ্ট মেয়ার প্রভৃতি নেতা ছাড়াও অগাষ্ট থেল হাইমার, পল লেভি, পল ফ্রোলিক, ব্র্যাণ্ডলার প্রভৃতি কমিউনিষ্ট নেতার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'ন এবং পার্টির কাজ কর্মে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। থেলহাইমার জেল থেকে বেরিয়ে মেয়ারের নিকট থেকে পার্টির নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি রায়ের মতামতকে খুব মূল্য দিতেন এবং সকল গুপ্ত অধিবেশনেই তাঁকে ডাকতেন; এর ফলে সকলেই রায়কে জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা হিসাবেই গুরুত্ব, প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করতেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বার্লিনের ইণ্ডিয়ান রেভোলিউসনারি কমিটি

যুদ্ধের সময় জার্মান সরকার নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধার জন্যে যে ইণ্ডিয়ান রেভোলিউসনারি কমিটি গড়ে তোলেন রায় বার্লিনে এসেই সেই কমিটির খোঁজ করেন। ভারতে থাকাকালীন এই কমিটি সম্বন্ধে সকলেরই খুব বড় ধারণা ছিল। এঁদের কথাতেই তিনি ডাচ ইণ্ডিস থেকে ভারতের উপকূলে অস্ত্র আনার জন্যে বেরিয়ে পড়েন। ভারতের বাইরে এসে অবশ্য ক্রমে ক্রমে দেখলেন যে, জার্মানী বার্লিন কমিটি স্থাপনে সাহায্য করেছে যত না ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তার চেয়ে ঢের বেশী নিজেদের প্রচার কার্যের জন্যে। বার্লিনে গিয়ে দেখলেন যে, কমিটি ভেঙ্গে গেছে। কমিটির দু'একজন সভ্যের নিকট থেকে শুনলেন যে, এই কমিটির সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে খুবই দলাদলি এবং রেষারেষি ছিল। কমিটির প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মনসুর ছিলেন ব্রিটিশ চর। এই মনসুর পরে কমিউনিষ্ট সেজে জার্মান স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে মস্কো যান। রুশ পুলিশ যখন ব্রিটিশ গুপ্তচর সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার করে, তখন তাঁর স্ত্রী রায়কে গিয়ে ধরে। রায় তখন রুশ সরকারকে অনুরোধ করে ডাঃ মনসুরকে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচান। তারপর তিনি জার্মানীতে এসে বাস করতে থাকেন, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পেয়ে বা ভবিষ্যতে বহু সুযোগ পেয়েও রায়কে তার প্রাণ রক্ষার জন্যে একটা কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত প্রকাশ করে নি। রায় যখন ভারতে ফেরেন এবং গ্রেপ্তার হ'ন তখন তাঁকে সনাক্ত করার জন্যে এই ডাঃ মনসুরকে সাক্ষীরূপে হাজির করা হয়। ডাঃ মামুদই যে এম, এন, রায় এটি প্রমাণ করা হয় একমাত্র তাঁরই সাক্ষ্য থেকে। তিনি সাক্ষ্য না দিলে ব্রিটিশের পক্ষে সেদিন এম, এন, রায়কে সনাক্ত করা কঠিন হ'ত।

এই কমিটির আর আর সভ্য তখন ইউরোপব্যাপী বৈপ্লবিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করে রাজনীতি সম্পর্কশূন্য জীবনই যাপন করছিলেন। অবশ্য কিছুকাল পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এঁদের কয়েকজন মস্কোতে গিয়ে নিজেদের কমিউনিষ্ট পরিচয় দিয়ে ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা মস্কোর বিশ্বাসভাজন হতে পারেন নি। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ বার্লিনে ছিলেন না। তবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের মস্কো যাত্রা

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে রায় বার্লিনে পৌঁছেন। কিন্তু সে সময় গৃহযুদ্ধ ও পোলাণ্ডে পিলসুডস্কি গঠিত সরকার ও মিত্র শক্তির বাধার জন্যে জার্মানী থেকে রুশিয়া যাবার পথ একরকম বন্ধই ছিল। সুতরাং যতদিন না কোন গোপন পথে যাবার সুব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন রায়কে জার্মানীতেই অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মে মাসে তাঁর যাবার ব্যবস্থা হ'ল। অবশ্য এই ক'মাস তিনি জার্মানী ও হল্যাণ্ডের কমিউনিষ্টদের কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত রাখেন, এবং ইউরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে অনেকখানি প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের বিশ্ব কংগ্রেসে রুশিয়ার এবং বিশ্বের সেরা সেরা ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাবেশে নিজের গুণপনা দেখিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে তাঁকে কম সাহায্য করে নি।

প্রথমে রায়ের মস্কো যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল এক বিশেষ ভাড়া করা এরোপ্লেনে করে। কিন্তু পিলসুডস্কির অভ্যুত্থানের ফলে সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। ক্রমেই বহুদেশ থেকেই দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বার্লিনে এসে পৌঁছতে থাকেন। তাঁদের সকলকে মস্কো নিয়ে যাওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার ব্রেষ্টলিটোভস্ক চুক্তির পর জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েটের কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বার্লিনে রুশিয়ার এমব্যাসী খোলা হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই জার্মান সরকার রাষ্ট্রবিরোধী কাজ কর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগে রুশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করে। তবে একেবারে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। এমব্যাসীতে কিছু লোক রাখতে দেওয়া হয়, কিছু কিছু কাজকর্মও চলতে থাকে। তখন সেই এমব্যাসী মারফৎই এই সব

প্রতিনিধিদের মস্কোতে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। জাল পাশপোর্ট মস্কোতে তৈরি হয়ে কূটনৈতিক ডাকের মধ্যে বার্লিনে আসত, আর তার সাহায্যে প্রতিনিধিরা মস্কো গিয়ে পৌঁছতেন।

এপ্রিল-মে মাসের মাঝামাঝি কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী এঞ্জেলিকা বালাবানোভার নিকট থেকে এমব্যাসীতে খবর এল রায়কে অবিলম্বে মস্কো পাঠানোর জন্যে। রায়কে অবশ্য জাল পাশপোর্ট নিয়ে বার্লিনে থাকতে হয়নি। তাঁর কাছে মেক্সিকো সরকারের কূটনৈতিক পাশপোর্ট ছিল। বিপ্লবের পর "সোভিয়েট ল্যাণ্ড" নামে একটি জাহাজ লেনিনগ্রাদ থেকে সেই প্রথম জার্মানীর ষ্টেটিন বন্দরে এসেছিল। স্থির হয়েছিল, রায়কে তাতেই অবিলম্বে যাত্রা করতে হবে। তারপর এস্টোনিয়ার রাজধানী রেভাল-এ নেমে ট্রেনে করে লেনিনগ্রাদে গিয়ে নামতে হবে।

সোভিয়েট ল্যাণ্ড নামক জাহাজটি এসেছিল এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। জারের পতনের পর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণক্রমে বিশৃঙ্খল সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠনে সাহায্য করার জন্যে ফরাসী সরকার এক মিলিটারী মিশন প্রেরণ করেন। ক্যাপ্টেন সাদুল ছিলেন সেই মিশনের একজন সভ্য। রুশ বিপ্লবের পর তিনি বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেন এবং রেড্ আর্মি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। ক্রমে তিনি ট্রটস্কির একরকম দক্ষিণ হস্ত হয়ে দাঁড়ান। ফ্রান্সে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁর কোর্ট মার্শালে বিচার হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীকে ফরাসী সরকারের অজ্ঞাতে গোপনে বার্লিনে নিয়ে আসা হয়েছিল, এখন বার্লিন থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে এই স্পেশাল জাহাজখানি এসেছিল। এই জাহাজেই রায়কেও নিয়ে যাওয়া হ'ল। জাহাজে আর অন্য কোন যাত্রী নেওয়া হ'ল না।

উত্তর-পূর্ব বালটিক সাগর মধ্য রাত্রির সূর্যের দেশ। তারপর আবার ফিনল্যাণ্ড উপসাগর জমে বরফ হয়ে যায়। "সোভিয়েট ল্যাণ্ড" সেই কয়েক ফুট পুরু বরফ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চলল। মেরু অঞ্চলের মধ্য রাত্রির সূর্য পরিক্রমা দেখতে দেখতে রায় চললেন। তারপর রেভাল-এ নেমে ট্রেনে চড়ে লেনিনগ্রাদে পৌঁছলেন।

লেনিনগ্রাদেই বিপ্লবের সূত্রপাত। রায় যেটুকু সময় পেলেন তাতেই ঐতিহাসিক সব স্থানগুলি দেখে নিলেন, তীর্থযাত্রীর চোখ দিয়ে—নেভেস্কি

প্রসপেক্ট, উইণ্টার প্যালেস, পিটার এণ্ড পল গির্জার ভূগর্ভস্থ কারাগৃহ, বিপ্লবী সরকারের উদ্বোধনী স্থান স্মোলনী প্যালেস। তারপর সেই দিনই সন্ধ্যায় ট্রেন ধরতে ছুটলেন। পথ প্রদর্শকের উপর নির্দ্দেশ ছিল অবিলম্বে রায়কে মস্কোতে হাজির করা।

পরদিন মস্কোতে যখন ট্রেন পৌছল তখন বেলা দুপুর। বিপ্লবীদের মক্কা মস্কো। ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগল সেই শিহরণ, যেমন জাগে মক্কা-বদরি যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে পৌছে। আনন্দের উত্তেজনায় মন তখন এমনি আচ্ছন্ন যে, সেদিনের মস্কো বিপ্লবোত্তর দীনতা ও দারিদ্র্যে যে ভরে রয়েছে তা তাঁর চোখে পড়ল না। তখন ট্রেনে যেমন পারমিট হোল্ডার ছাড়া চড়া নিষিদ্ধ, পথে ঘাটেও তেমনি সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে মানুষের চলা ফেরা সীমাবদ্ধ। রুশিয়ায় তখন সংগ্রামী কমিউনিজিম (War Commuuism) চলেছে—সবই সরকারী, না আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, না আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। রায়কে মাননীয় অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট গাড়িতে চড়িয়ে মাননীয় অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ভবনে তোলা হল। যে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তিনি উঠলেন তা পূর্বে রুশিয়ার কোটিপতি ব্যবসায়ী 'চিনির রাজার' বাসভবন ছিল। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। এক তলাতে থাকেন বৈদেশিক দপ্তরের ভাইস কমিশার কারাখান। দ্বিতল মাননীয় অতিথিদের জন্যে সংরক্ষিত। বোরোদিনও সেই বাড়ীর একাংশে থাকতেন।

রায়ের গুণপনার প্রতি এই যে গুরুত্ব প্রদান, দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগ-আয়োজনে সাহায্য পাওয়ার আশায় তাঁকে যে পূর্বাহ্নেই আনায়ন করা, তার কারণ রায় ইতিমধ্যেই যে মার্কসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় দিকেই সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছেন তা মস্কো-র কর্তাব্যক্তিরা জেনেছিলেন। মেক্সিকোর ইতিহাস ছাড়াও জার্মানীতে তাঁর কাজকর্ম ও মতামতের কথাও রুশ এমব্যাসী মারফৎ তাঁদের অজানা ছিল না। বিশেষতঃ ন্যাশন্যাল বলশেভিজম সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। লেনিনও এক পুস্তিকায় এ মতের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। সে সময় বোরোদিন সেই পুস্তিকা রুশিয়া থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করছিলেন। বইখানিতে উগ্রবামপন্থাকেই সমালোচনা করা হয়েছিল। সাধারণভাবে বাম-পন্থী কমিউনিষ্টদের সমালোচনা করা হয়নি। জার্মান অনুবাদক সে পার্থক্য রক্ষা করতে না পারাতে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যায় এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসের

প্রাক্কালে বামপন্থী কমিউনিষ্টদের উপর সমগ্রভাবে যে আক্রমণ করা হয়নি তা জানানো প্রয়োজন হয়ে উঠে। রায় একথা কর্তাদের জানিয়েছিলেন এবং যখন দেখলেন বোরোদিন পুস্তিকাখানির নামের ইংরাজি অনুবাদ করতে মাথা ঘামাচ্ছেন তখন রায় আক্ষরিক অনুবাদ করতে নিষেধ করলেন, বললেন, তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আরো বাড়বে। তিনি উদ্দেশ্য-বিধেয় ক্রমে অনুবাদ করতে বললেন। নামটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়াত "The Infantile sickness of left communism," দাঁড়াল Left communism—an infantile disease"। লেনিনও এটি অনুমোদন করেছিলেন। পরবর্তী সকল সংস্করণে এই নামই চলল।

এই দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, রায়ের মস্কো আগমনের পূর্ব থেকেই নেতারা রায়ের যোগ্যতা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল ছিলেন। রায়ও মস্কোতে পা দেবার দিনই ঐ ছোট্ট ঘটনাটি দিয়ে তা প্রমাণও করলেন।

সেই রাত্রেই কারাখান নিজ গাড়িতে করে তাঁকে বৈদেশিক দপ্তরে নিয়ে গেলেন—সেখানেই কথাবার্তা হ'বে। সঙ্গে চললেন বোরোদিন—তিনি দোভাষীর কাজ করবেন। রায় তখনো রুশ শিখতে পারেন নি।

রায় সম্বন্ধে রুশ নেতাদের ধারণা যে ইতিমধ্যেই কত উচ্চে উঠেছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি, রায়ের পৌছানোর দিনেই বৈদেশিক দপ্তরের ভাইস কমিশার কারাখান দুর্লভ দর্শন কমিশার চিচেরিণের সঙ্গে রায়ের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এবং তাঁর সঙ্গে বিপ্লবের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্যে ভারত তথা মধ্য এসিয়ায় বিপ্লব সংঘটনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন।

রায় রুশিয়া আসার পূর্বেই মস্কোর সংশ্লিষ্ট নেতারা ভাবছিলেন, যেহেতু বোরোদিন রায়ের বিশেষ বন্ধু, সেইহেতু যেমন তাঁরা উভয়ে মেক্সিকোতে কাজ করেছেন তেমনি বোরোদিন যদি আফগানিস্তানের অ্যামব্যাসেডার হ'ন তা হ'লে রায়ের সেখান থেকে ভারতে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলতে সুবিধা হ'বে। বৈদেশিক দপ্তরেই সারারাত কেটে গেল। প্রত্যুষের আর দেরী নাই দেখে কারাখান রায়কে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। অবশ্য কারাখানকে আরো দু'চার ঘণ্টা থেকে দৈনন্দিন কাজগুলো সেরে ফেলতে হ'বে। রুশিয়ায় তখন বৈদেশিক দপ্তরের কাজকর্ম রাত্রিতেই চলত।

বিপ্লবের প্রথম রণাঙ্গন ছিল ইউরোপ। দ্বিতীয় রণাঙ্গন হবে এশিয়ার

বিভিন্ন দেশ। সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির অতিশয় গুরুদায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তাঁকে—এই প্রস্তাবে রায় তাঁর মেক্সিকো ছেড়ে আসার দুঃখ ভুলে গেলেন। না, মেক্সিকো ছেড়ে এসে ভুল করেন নি। জার্মানী ও রুশিয়ার সেইসব দিনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে সম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে এশিয়ায় বিশ্ব বিপ্লবের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দায়িত্ব লাভে রায় খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আগের কাজ আগে। মাথার উপর দ্বিতীয় কংগ্রেস। কোন্ নীতি ও কৌশলে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশসমূহে বিপ্লব সংঘটিত করতে হ'বে—সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, সেটা সেখানে ঠিক হ'বে। অতএব দ্বিতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধেই তিনি মাথা ঘামাতে সুরু করলেন।

পরদিনই কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের জেনারেল সেক্রেটারি এঞ্জেলিকা বালাবানোভা রায়কে চা-পানে আমন্ত্রণ করলেন। সেখানেই পরিচয় এবং আলাপ-আলোচনাও হবে।

বালাবানোভার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর শেষে তিনি জানালেন যে, পরদিন রায় যেন তাঁর দপ্তরে যান। পরাধীন জাতি ও ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে লেনিন দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্যে যে থিসিস লিখেছেন, তার অনুবাদ করিয়ে রাখা হয়েছে। লেনিনের ইচ্ছা, রায় আসা মাত্র তাঁকে যেন সেটা দেওয়া হয়। তার কাছেই সেটা আছে, দপ্তরে এলেই রায়কে সেটা দেওয়া হ'বে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

লেনিনের সহিত রায়ের প্রথম সাক্ষাৎ

তখনকার দিনে রুশিয়ার কেউই নিজস্ব মোটর গাড়ি রাখতে পারত না, মস্কো সোভিয়েটের হাতেই সব গাড়ি থাকত; প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্র প্রধানরা গাড়ি পেতেন। স্বয়ং লেনিনের জন্যও এরাই গাড়ির ব্যবস্থা করত। লেনিন একটা রোল্‌স্ রয়েস গাড়ি পেয়েছিলেন। রায় বিলাসিতা বা ফ্যাসানের চেয়ে আরামকে অগ্রাধিকার দিতেন বলে তাঁকে একটি পুরানো মডেলের বিরাটকায় ফিয়েট দেওয়া হয়েছিল। সেটি ছিল যেমন ভারি তেমনি শক্তিশালী। পাথরের ইট দিয়ে বাঁধান রাস্তার উপর অন্য গাড়ি অপেক্ষা এটা অনেক আরামপ্রদ ও নিরাপদ ছিল। এতেও বোঝা যায় যে রুশিয়ায় সেদিন রায়কে অসাধারণ গুরুত্বই দেওয়া হয়েছিল।

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের দপ্তরের মধ্যে প্রবেশ করার অনুমতি পত্র তখনো রায়ের কাছে এসে পৌঁছয় নি। প্রবেশ পথে দুই দিক থেকে দুই বন্দুকধারী এসে বন্দুকে বন্দুক ঠেকিয়ে পথ আটকাল। কিন্তু ভেতরে আর সংবাদ পাঠাতে হ'ল না। তখনি র‍্যাডেক-এর গাড়িও এসে পৌঁছল। পিছন থেকে রসরাজ র‍্যাডেক বলে উঠলেন, "ডোণ্ট স্যুট্ কমরেড্‌স।" তিনিই রায়ের কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে ভেতরে নিয়ে চললেন এবং জেনারেল সেক্রেটারির দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। র‍্যাডেক দ্বিতীয় কংগ্রেসে ইনটারন্যাশন্যালের জেনারেল সেক্রেটারি হবেন এটা প্রায় ঠিক হয়েই গিয়েছিল। সেই জন্যে তিনি তখন থেকে কাজকর্ম বুঝে নিচ্ছিলেন।

রায় বালাবানোভার ঘরে গেলেন। রায়কে যথারীতি বসতে বলে, হাতের কাজ শেষ করে। তিনি ফোনে লেনিনকে রায়ের আগমন বার্তা জানালেন।

লেনিন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই রায়ের আগমন প্রত্যাশা করছিলেন। লেনিন এক ঘণ্টার মধ্যেই ১২॥ টার সময় রায়কে দেখা করতে ডাকলেন। বালাবানোভা জানালেন যে, এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব লেনিনের থিসিসটা যেন পড়ে নেওয়া হয়। আজই অবশ্য খুব বেশী কিছু আলোচনা হবে না, তবু কিছু কিছু কথা-বার্তা হ'তে পারে। তারপর সন্তানের প্রতি জননীসুলভ কণ্ঠে বললেন: "Young man, you have reason to be proud, but don't loose your head, I wish you luck।"

রায় মাতৃতুল্য মহিলার এই উপদেশ বাণী কখনো ভোলেন নি। এই সময় হয় তো কারাঙ্গার উপদেশের কথাও মনে পড়েছিল।

তারপর থিসিসের টাইপকরা কপিটি দিয়ে এবার আর মায়ের মত নয়—শিক্ষিকার ভঙ্গিতে বললেন, "যাও ঐ কোনে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে মন দিয়ে পড়ে নাও।" রায়ও বিনীত ছাত্রের মত পড়তে বসলেন। থিসিসের প্রথম পাতার মাথার এক কোণে লেখা আছে দেখলেন, "Com. Roy for criticism and suggestion—V. I. Lenin—সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য কমরেড রায়ের নিকট প্রেরিত হইল-ভি, আই, লেনিন।" এই সময় রায়ের মনোভাবটি তাঁর নিজের কথাতেই বলা ভাল:

> এটা যদিও মাথা খারাপ হবার মত খুবই কড়ামদ, কিন্তু তখনো আমার কানে বাজছিল স্নেহময়ী বালাবানোভার সাবধান বাণী। লেখাটি পড়ার চেষ্টা করলাম, এতই উত্তেজিত ছিলাম যে, মন স্থির করতে পারলাম না। এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বর্তমান যুগের, শুধু বর্তমান যুগের কেন—(তখন সেই রকমই বিশ্বাস করতাম)—সম্ভবত সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের সামনাসামনি এসে দাঁড়াব। যেমানুষটি মাত্র দু'বছর আগেও অজ্ঞাত অখ্যাত একজন পলাতক উদ্বাস্তু মাত্র ছিল, সেই মানুষটিই তাঁর অভূতপূর্ব এবং অতুলনীয় দুঃসাহসী কর্মকুশলতায় আজ সারা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছেন। সেখানে বসেই আমার কল্পনা ক্রেমলিন প্রাসাদে চলে গেল। সেই মানুষটির একটি কাল্পনিক ছবি ধীরে ধীরে আমার মনশ্চক্ষে ফুটে উঠল। আমি আগেই লেনিনের ফটো ও চিত্র দেখেছিলাম, এবং আমার মনের মধ্যেও তাঁর একটি ছবি ছিল। লেখাটির এক কোণে এই যে এই লেখাটুকু তা লেখবার মত
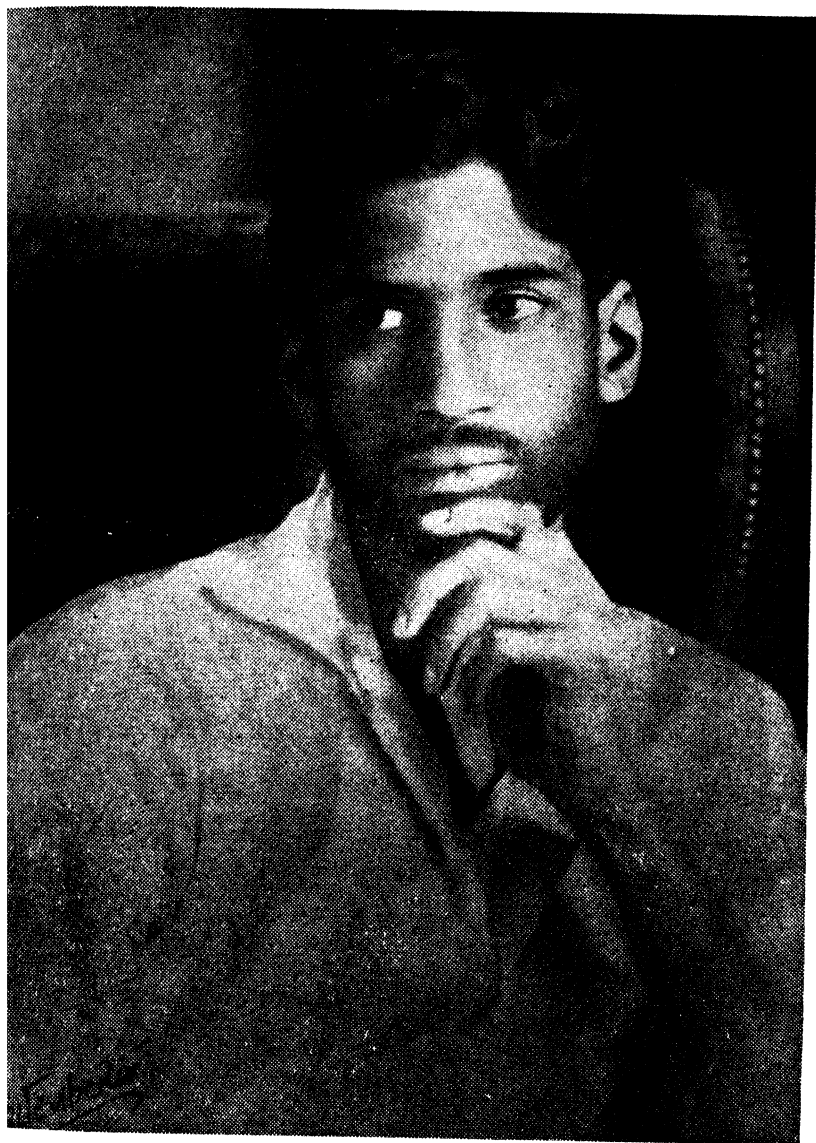
মানবেন্দ্রনাথ : মস্কো—১৯২০

বিনয় ও সহনশীলতা এতবড় একজন বিপ্লবী ও ডিক্‌টেটরের পক্ষে সম্ভব হয় কী করে। যার উদ্দেশ্যে এই লেখাটুকু সে ব্যক্তির নিতান্ত সামান্যতার জন্যে বড় বড় অথচ আন্তরিকতা শূন্য শিরোনামা দিয়ে সম্বোধন করার প্রয়োজন হয় নি। মাত্র "কমরেড" সম্বোধনই যথেষ্ট মনে করেছেন। Ibid pp 340

লেনিন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে রায়কে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। প্রথম সম্ভাষণ হ'ল, "You are so young! I expected a grey-bearded wise-man from the East।"

রায়ের ভয় মিশ্রিত বিস্ময় কেটে গেল। লেনিনের চোখে দেখলেন দুষ্টুমি ভরা হাসির আভাষ। এতদিন লেনিনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শুনে এসেছিলেন, মস্তিষ্কের গুরুভারে লেনিনের হৃদয় মরে গিয়েছে: লেনিনের মানবিক কামনা-বাসনা প্রভৃতি ভাবাবেগ বলতে আর কিছু নাই: লেনিন একটি যন্ত্র বিশেষ— । কিন্তু এই ধারণা নিমেশে দূর হয়ে গেল। যে হাসির আভাস লেনিনের মুখে ফুটে উঠল তাতে রায় স্পষ্ট বুঝলেন যে, এ হাসি সিনিকের উপহাসের হাসি নয়, এটি নিছক আশাবাদীর হাসি। মার্কসবাদ যে সর্বশেষ সত্য, কেবল তাই নয়—এর অবশ্যম্ভাবী জয় সম্বন্ধেও স্থির বিশ্বাস। তাঁর মধ্যে মিশে ছিল প্রত্যাদেশাবিষ্ট মহাপুরুষের উদ্দীপনা ও দীক্ষিত ভক্তের দৃঢ় প্রত্যয়। নতুবা তিনি তাঁর সকল সহকর্মী ও অনুচরদের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একাকী ক্ষমতা দখলের জন্যে আহ্বান জানাতে পারতেন না। যখন ক্ষমতা ধরে রাখার বিন্দু মাত্র আশা ছিল না, সকলের হতাশার মধ্যে আশার সঞ্চার তিনিই করেছিলেন। সংকট মুহূর্তে তিনি যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হ'ন নি, হয়েছিলেন বিশ্বাসের দ্বারা। সে বিশ্বাস ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদ নামক নিয়তির উপর ছিল না—ছিল মানুষের নতুন ইতিহাস গড়ে তোলার অপরিসীম সৃজনী ক্ষমতার উপর। লেনিন তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা সংকট মুহূর্তে বা পরবর্তী কালে যুক্তিবাদের দ্বারা পরিচালিত হ'ন নি—হয়েছিলেন রোমান্টিসিজিমের দ্বারা,-অর্থাৎ মানুষের সৃজনী ক্ষমতায় আস্থাবান হ'য়ে। সেই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে একটি মাত্র অসামান্য দুঃসাহসিক কাজ করেই তিনি অসাধারণত্বের উচ্চ শিখরে উঠে ইতিহাসের অমরাবতীতে নমস্য হয়ে রয়েছেন।

ড্যান্‌টন ও লেনিন আধুনিক যুগের দুই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। ড্যানটনও ছিলেন রোম্যান্‌টিসিষ্ট। যুক্তি দেবীর ভণ্ড পুরোহিত রোবস্‌পিয়ার তার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে যখন ড্যান্‌টনকে গিলোটিনে ফেলে কাটল, তখনই মহান ফরাসী বিপ্লবের আত্মাও কাটা পড়ল। লেনিনও তাঁর এই মহান পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিপ্লবের অনাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার পূর্বেই তিষ্ঠঃ বাণী উচ্চারণ করার মত দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। লেনিনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাই তাঁকে তাঁর নিউ ইকনমিক পলিশি প্রবর্তনের জন্যে মরতে হয়নি। ট্রট্‌স্কি হয়তো সুযোগ পেলে রোবস্‌পিয়ায়ের গোঁড়ামির অনুকরণ করতে চাইতেন। লেনিনের যদি অকাল মৃত্যু না ঘটত তবে হয়তো রুশ বিপ্লবের সফল পরিণতি হতে পারত। পরবর্তীকালে সন্ত্রাশ ও উৎপীড়নের ফলে কমিউনিজিমের মধ্যে মহান আদর্শের ইউটোপিয়া ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নিউ ইকনমিক পলিশির যুক্তিসংগত পরিণতি ঘটলে সেটি হ'তে পারত না। ট্রট্‌স্কির বামপন্থী বিরোধিতার জন্যে ষ্ট্যালিনকে বাধ্য করেছিল বিপ্লবের মধ্যে লেনিন-ড্যান্‌টনীয় সত্তাটিকে ধ্বংস করে ফেলতে। রোবস্‌পিয়ার ফরাসী বিপ্লবের যে ক্ষতি করেছিল, লেনিনের উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে ট্রট্‌স্কি ষ্ট্যালিনও তাই করেছিলেন।

লেনিন সম্বন্ধে এই ধারণা রায়ের বহুবৎসর ধ'রে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠলেও প্রথম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই যে সে প্রক্রিয়া সুরু হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের স্থায়ী গুণাগুণ বিচার রায়-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লেনিন সম্বন্ধেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সেদিন রায় দেখলেন, যে লেনিনের নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে ত্রাসের সঞ্চার হয় সেই লেনিন মানুষটি মোটেই ভয়ের নয়। যদিও তিনি এতবড় বিপ্লবের সর্বময় কর্তা তথাপি তাঁর মাথায় সেই সর্বাধিনায়কের মুকুটটি ঠিক বসেনি। কথাবার্তায় ভাবে-ভঙ্গিতে সে কর্তৃত্বের বিন্দুমাত্র আভাস নাই। তাঁর যে বিনয়, তাও অনেক ক্ষমতাবানের ছদ্ম বিনয় নয়, তা একান্তই আন্তরিক। তাঁর কথাবার্তাও যেমন প্রাণখোলা, ব্যবহারও তেমনি হৃদ্যতাপূর্ণ। বহু বৎসর ধরে বলশেভিক পার্টির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন তিনি। বহুবার তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সংখ্যা গরিষ্ঠের মতানৈক্য ঘটেছে, কিন্তু কেউ কোনদিন বিকল্প নেতৃত্বের কথা মনেও আনেনি। তিনি শুধুমাত্র নেতাই ছিলেন না, তিনি দীক্ষাগুরুও ছিলেন—ছিলেন বলশেভিজিমের মন্ত্রদ্রষ্টা গুরুদেব। পুরোনো

বিপ্লবীদের তিনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক, জ্ঞানদাতা এবং উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানের বন্ধু। তাঁরা সবাই তাঁকে ভালবাসত।

প্রথম যৌবন থেকেই তিনি রুশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কেবল সংগ্রাম চালিয়েই গেছেন। দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ থাকত জ্বালাময়ী। স্বভাব বিপ্লবীদের বেছে বেছে এক লৌহ কঠিন শৃঙ্খলাবোধের উপর গড়ে তুলতে হবে পার্টি —এই ভয়ঙ্কর নীতির উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। তথাপি বলশেভিক পার্টির মধ্যে তাঁর ব্যবহার সব সময়েই ছিল গণতান্ত্রিক। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সঙ্গে যখনই তাঁর মতানৈক্য ঘটত তখনই বিষয়টি তিনি পার্টির সাধারণ সভ্যের মতামতের জন্যে প্রেরণ করতেন। নেতার মতেই মত দেবার জন্যে, পার্টি সভ্যদের প্রভাবিত করতে, তখনো কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে বলশেভিক পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি ক্ষমতা দখলের জন্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। লেনিন তখন ফিনল্যাণ্ডের তাঁর গোপন আবাসে ফিরে এসে পার্টি পত্রিকা প্রাভ্‌দায় নিজ মতের সমর্থনে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। দুই মাসের মধ্যেই নিখিল রুশ শ্রমিক কৃষক সৈন্যদের প্রতিনিধিবর্গের সোভিয়েটের অধিবেশনে ধ্বনি তোলা হয়—**All power to the Soviets**—সব ক্ষমতা সোভিয়েটের হাতে চাই। (সোভিয়েট=পঞ্চায়েৎ বা সমিতি)

পার্টির বৈঠকে আলোচনা কালে তিনি ছবির মত এঁকে এঁকে তাঁর যুক্তি সমূহ পরিদৃশ্যমান করে তুলে ধরতেন। জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করার সময় পার্টিকে তিনি যুক্তি দিলেন যে, "নতুন সোভিয়েট সরকারের উচিত ব্রেষ্ট্‌লিটোভস্ক-এর সন্ধি গ্রহণ করা, কারণ সৈন্যরা তাদের পা দিয়ে সন্ধির পক্ষে ভোট দিয়েছে।" পা দিয়ে ভোট—সেটা আবার কি? সেটা হ'ল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গৃহ অভিমুখে বিনা অনুমতিতে পলায়ন। নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসে নিউ ইকনমিক পলিশি সম্বন্ধে যুক্তি দিয়েছিলেন, "We must now learn the house-keeping of the Revolution—এবারে আমাদের শিখতে হ'বে বিপ্লবের গৃহিণীপনা।" কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি পরাধীন জাতির ও উপনিবেশ সমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটি বৈপ্লবিক শক্তি বলেছিলেন,—সেই সঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, "But don't paint Nationalism

red—তাই বলে জাতীয়বাদের গায়েই লাল রং মাখিয়ে মনে কোরো না সেটি বৈপ্লবিক।" এমনি ছিল তাঁর ছবি এঁকে এঁকে বক্তব্যটিকে পরিদৃশ্যমান করে তোলার কায়দা।

লেনিনই রায়ের প্রথম বিমূঢ়তা কাটিয়ে ফেলতে সাহায্য করলেন। তিনি রায়কে সামনের চেয়ারে বসতে বলে নিজের আসনে বসবার জন্যে ফিরলেন। রায় দেখলেন, সেই বিরাট ঘরের আকাশ ছোঁয়া ছাদের নীচে মানুষটিকে বামনের মত খর্ব দেখাচ্ছে—যদিও তিনি নিতান্ত খর্ব ছিলেন না; তাঁর উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির মত। তাঁর বিরাট মাথাটিই এই ভ্রান্তি ঘটাচ্ছিল। তা ছাড়া তাঁর মাথা নীচু করে সামনে একটু ঝুঁকে হাঁটার অভ্যাসটির জন্যেও এই ভুল হচ্ছিল। তিনি ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকেই তাকাতেন না। চলার এই কায়দা থেকে মনে হতো তিনি গভীর চিন্তা মগ্ন হয়েই চলেছেন, এবং তাঁর স্বাভাবিক দ্রুত পদবিক্ষেপে চলার অর্থও ছিল যেন তাঁর দ্রুত চিন্তাশক্তির সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্যে পাও সমান দ্রুতগতিতে চলেছে। মনে হত, সর্বদাই তিনি ভারী ব্যস্ত, যেন যে টুকু সময় তাঁর হাতে আছে তারই মধ্যে এক অতি গুরু দায়িত্ব শেষ করে ফেলতে হ'বে। কারো কারো মনে হ'তে পারে, হয়তো তিনি তাঁর অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা টের পেয়েছিলেন। অতি দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করে ফেলার জন্যে সর্বশক্তিমান পোলিট ব্যুরোর আলোচনার সময় পর্যন্ত তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর সময় বলশেভিক পার্টির পোলিটব্যুরোর সভ্য সংখ্যা ছিল সাত। এঁদের সাপ্তাহিক বৈঠকে কারুরই দু'বারের বেশী কোন কথা বলার অধিকার ছিল না। প্রথমবার পনর মিনিট দ্বিতীয়বার মাত্র পাঁচ মিনিট। যদিও তিনি খুব দ্রুত চিন্তা করতে পারতেন, তথাপি কথা বলতেন তিনি খুব ভেবে চিন্তে, ধীরে ধীরে। জন সমাগমে বক্তৃতার সময় ছাড়া তিনি শিক্ষকের বা আইনজীবীদের সওয়াল জবাবের ভঙ্গিতে বলতেন।

লেনিন আসন গ্রহণ করেই তাঁর সেই বিরাট ডেস্কের উপর ঝুঁকে রায়ের দিকে তাঁর বাদামী ধাঁচের চোখ দিয়ে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল সেই দুষ্টুমির হাসি। রায় ভুলে গেলেন, তিনি জারের উত্তরাধিকারী এক সর্ব-শক্তিমান ডিক্‌টেটরের সামনে বসে আছেন। তাঁর সকল সঙ্কোচ কেটে গেল; তিনি অনুভব করলেন, তিনি যেন এক পরিচিত পরিবেশের মধ্যে বসে পুরাতন এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন, কিংবা স্নেহশীল পিতা সু-পুত্রের কাজকর্মে খুসী হয়ে

তৃপ্তির হাসি হাসছেন। বালাবানোভার সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল—মদমত্ত হওয়া চলবে না।

বেশীক্ষণ আত্মস্থ থাকা চলল না। লেনিনের কথায় সচেতন হ'য়ে উঠলেন। লেনিন বলে চলেছেন : মেক্সিকোর ইতিহাস বোরোদিনের কাছ থেকেই তিনি শুনেছেন : রায়ের কাছ থেকে সবিস্তারে সে ইতিহাস শুনতে চান : সত্যই বৈপ্লবিক কলা-কৌশলের সে একটা আকর্ষণীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা : এমন সাফল্যের সঙ্গে যে কাজ সুরু করা হয়েছে তা ছেড়ে আসা স্বভাবতই কষ্টকর : কিন্তু বিপ্লবের অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রয়োজনে ছেড়ে আসা ছাড়া উপায় কি : আমেরিকায় বিপ্লব ঘটতে দেরী হবে এবং যেখানে বিপ্লব অবিলম্বে ঘটার সম্ভাবনা আছে সেখানেই সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন : মেক্সিকো বা অন্যান্য ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রে বৈপ্লবিক অবস্থা গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু তা সুরুতেই ধ্বংস করে দেবার জন্যে যুদ্ধ বিজয়ী আমেরিকা পূর্বের মতই ওৎ পেতে বসে আছে : এই অবস্থায় আমাদের পশ্চিম গোলার্ধের উপর নজর না দিয়ে পূর্ব গোলার্ধের প্রতিই নজর দেওয়া প্রয়োজন : এশিয়ার শোষিত ও নিপীড়িত জনগণকে সংগঠিত করে এক বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে : এই কাজে মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লাগবে : দ্বিতীয় কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়রূপে ঔপনিবেশিক দেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহের বৈপ্লবিক কলা-কৌশলের নীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তা ত রায় মেক্সিকোয় হাতে কলমে প্রয়োগ করেছে : রায় কি তা পড়েছে ?

রায় ক্ষমা চাইলেন, না এখনো পড়ে উঠতে পারেন নি। এখানে আসার কিছুক্ষণ আগে মাত্র তাঁকে সেটা দেওয়া হয়েছে, সময় পাওয়া মাত্র তিনি পড়ে ফেলবেন।

লেনিন তখন বললেন, "তা হ'লে সেটা আলোচনা করতে আবার আমাদের বসতে হবে।" তারপর তিনি বলে চললেন, "ঔপনিবেশিক দেশ সম্বন্ধে তার কোনই প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। সুতরাং এই থিসিসটি রচনা করতে রায়কে সাহায্য করতে হ'বে। রায়ের অভিজ্ঞতা ও মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা অনুধাবনে নতুন আলোকপাত করতে পারবে।"

লাল আলো জ্বলে উঠল। সাক্ষাৎকার ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি লাল

আলো জ্বেলে জানিয়ে দিলেন যে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ। লেনিনের সঙ্গে রায়ের প্রথম সাক্ষাৎ এইভাবে শেষ হ'ল। লেনিন আসন ছেড়ে উঠে এসে হাত ধরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সেই সময় যে ব্যক্তিটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তিনি জিনোভিয়েভ—একই সঙ্গে ত্রি-মুকুটের অধিকারী। মস্কো সোভিয়েটের সভাপতি, লেনিনগ্রাদ সোভিয়েটের সভাপতি ও কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সভাপতি। রুশিয়ায় তখন পদ মর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে লেনিনের পরই তাঁর স্থান। লেনিন সেখানে দাঁড়িয়েই জিনোভিয়েভের সঙ্গে রায়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিনোভিয়েভ করমর্দন করে জানালেন, শীঘ্রই তিনি রায়ের সঙ্গে আলাপ করবেন। (Ibid-pp 341-347)

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের দ্বিতীয় কংগ্রেস

১৯২০ সালের এপ্রিল-মে মাসেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকেই দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা মস্কো পৌছিলেন। মে দিবসের উৎসবে এইসব প্রতিনিধিরা কুচ-কাওয়াজে পুরোভাগ স্থান পেলেন। অপরাহ্নে যে জনসভা হ'ল তাতে রায় বক্তৃতা করলেন। জনসভায় এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। ভারতে থাকতে ত কোনদিনই বক্তৃতা দেন নি। মেক্সিকোতেও কমিটি মিটিং বা প্রতিনিধি সমাবেশে বক্তৃতা করতেন। কিন্তু জন সভায় বক্তৃতা দেওয়া তিনি এড়িয়েই চলতেন। কিন্তু এখানে আর এড়ানো গেল না। এই বক্তৃতাটিতে যথেষ্ট হাততালি পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা দিতে হয় লেনিনগ্রাদে।

মস্কোর জারেদের করোনেসন হল-এ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের উদ্বোধন সম্পন্ন হবার পর বিপ্লবের জন্মস্থান লেনিনগ্রাদে তিন দিনের এক কর্মসূচী ছিল। প্রথম বৈপ্লবিক সরকারের উদ্বোধন হয়েছিল স্মোলনি প্রাসাদে। সেখানে একটি অনুষ্ঠান হল। প্রাসাদের সোপান শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে প্রতিনিধিদের যে ছবি তোলা হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে রায়ের এক পাশে লেনিন আর অপর পাশে আছেন জিনোভিয়েভ, বুখারিণ, র‍্যাডেক, গোর্কি, জেরেজেস্কি প্রভৃতি স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ। লেনিনগ্রাদের গণ-সমাবেশেই রায়কে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় বক্তৃতা দিতে হ'ল। রায়ের উত্তর জীবনে তাঁর মৌখিক ভাষণের খ্যাতির মূলে যে কারণ ছিল তা হ'ল বিষয় বস্তুর প্রধান সূত্রটি ভাষণের প্রারম্ভেই উপস্থিত করা এবং ধাপে ধাপে যুক্তি দিয়ে সেটিকে প্রতিপন্ন করার চমৎকারিত্ব। সেই পদ্ধতির সুরু এখান থেকেই।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচী অনেক পূর্বেই প্রচারিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক

সংস্থার প্রথম অবস্থায় কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করা হয় নি। মূলনীতি তখনো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা বাকি এবং রাজনৈতিক কর্মসূচী নির্ধারিত হয়নি। প্রতিনিধিগণ ইচ্ছা করলে ভিন্ন ভিন্ন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এক একটি থিসিস পেশ করতে পারতেন। কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসেও কেউ কিছু না দেওয়াতে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির উপরেই সব বিষয়ে থিসিস লিখতে হয়। সেই থেকেই অদ্যাবধি এটি একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রুশ পার্টিই সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব করবে। ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের বৈপ্লবিক আন্দোলনের নীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে থিসিস লেনিন ছাড়া আর কেউ কিছু লেখেন নি। এই থিসিস পড়ে রায় লেনিনের সঙ্গে এক মত হতে পারলেন না।

ইউরোপের সোস্যালিষ্টরা এ যাবৎকাল ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করতেন না। তাঁরা জানতেন উপনিবেশ সমূহের ধনসম্পদেই তাঁদের দেশ ধনী হচ্ছে এবং সেই সম্পদের কিছু ভাগ শ্রমিকরাও পাচ্ছে। সেই জন্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা ঔপনিবেশিক দেশ-সমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার না করে সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারই স্বীকার করে এসেছে। লেনিন ও তাঁর বলশেভিক পার্টিই কেবল পরাধীন দেশ সমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করলেন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করার অঙ্গীকার ও ব্যবস্থা করে এই নবগঠিত সংস্থাকে প্রকৃত পক্ষে এক আন্তর্জাতিক সংস্থাতে পরিণত করলেন। এখন পৃথিবীব্যাপী ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশ সমূহের জন্যে বিপ্লবের নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হ'বে।

লেনিন যে থিসিস তৈরী করেছিলেন তা তিনি ১৯১৪ সালে লেখা "সাম্রাজ্যবাদ" পুস্তকের মতবাদের উপর ভিত্তি করেই লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, উপনিবেশ সমূহ যতদিন থাকবে ততদিন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে শ্রমশীল নরনারীর মুক্তি নাই। মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী যে আজো অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে তার কারণ উপনিবেশ থেকে আমদানী অতিরিক্ত মুনাফা। যে দিন এই মুনাফা আসা বন্ধ হবে সে দিনই ইউরোপে বিপ্লব ঘটবে, সেইজন্যে উপনিবেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য দান করলে ইউরোপের বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে।

রায় দেখলেন, তত্ত্বের দিক থেকে থিসিসটি ঠিকই আছে। কিন্তু এই

মূলনীতি কার্যকরী করে তোলার পদ্ধতিটি কি হবে ? কোন্ উপায়ে উপনিবেশ-সমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য দান করা যাবে ? প্রশ্নটি দাঁড়াচ্ছে উপায়-পদ্ধতি সম্বন্ধীয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহে কমিউনিষ্ট পার্টি আছে, তার সাহায্যে শ্রমশীল নরনারীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সাহায্য দান করা চলবে, কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশ সমূহে বিপ্লবের জন্যে এই রকম কোন বৈপ্লবিক সংস্থা নাই। কার মারফৎ কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল এই সব পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য দান করে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের সহায়করূপে সেই সব দেশের বিপ্লবকে গড়ে তুলবে ? উপনিবেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে লেনিনকে সম্পূর্ণভাবেই তাত্ত্বিক জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল।

পরবর্তী সাক্ষাতে লেনিন রায়কে তাঁর যুক্তি দিলেন এই বলে যে, সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশসমূহে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কায়েম রেখেছে। তার ফলে উপনিবেশ সমূহে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকাশ লাভ করতে না পারায় দেশীয় উদীয়মান শিল্প-বাণিজ্যপতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না—উন্নতি লাভ ঘটছে না। উপনিবেশের স্বাধীনতা আন্দোলনই সেখানকার জাতীয় ইতিহাসের বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক রেভোলিউসন। ইতিহাসের গতিপ্রগতি যখন ধাপে ধাপে চলে তখন সর্বহারা বিপ্লব ঘটবার আগে বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লবটি ঘটানো চাই। সুতরাং উপনিবেশ সমূহে জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীনে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে তাতে এই বুর্জোয়া-শ্রেণীকে পরোক্ষভাবে বৈপ্লবিক শ্রেণী জ্ঞানে কমিউনিষ্টরা সাহায্য করবে।

লেনিনের এই যুক্তিকে রায় খণ্ডন করলেন। রায় দেখালেন যে, ভারতের মত উন্নত ঔপনিবেশিক দেশসমূহের বুর্জোয়ারা শ্রেণী হিসাবে সামন্ততান্ত্রিক এবং তাদের অর্থনীতি, সামাজিক রীতিনীতি ও মনোভাবও মোটামুটি সামন্ততান্ত্রিক ; এবং যেহেতু এই সব দেশের জাতীয় আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও আদর্শের উপর স্থাপিত সেই হেতু এদের জয়ের দ্বারাই যে, দেশে বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব ঘটে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। লেনিন গান্ধীকে একজন বিপ্লবী বলেই মনে করতেন, যেহেতু গান্ধী গণআন্দোলনের নেতা সেইহেতু তিনি বিপ্লবী। রায় বললেন, যেহেতু গান্ধী ধর্ম ও আচার ব্যবহারে একজন সনাতনী সেইহেতু তিনি রাজনীতির দিক থেকে যতই কেন না বৈপ্লবিক হ'ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তিনি একজন প্রতিক্রিয়াশীল হ'তে বাধ্য।

প্লেখানভ ছিলেন লেনিনের গুরু। রুশিয়ার পপুলিষ্ট ও সোস্যাল রেভোলিউ-সনারিরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং শ্লাভ্ জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদেও বিশ্বাস করত, সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রকে তারা পাশ্চাত্য শয়তানিও বলত, অতীতের "মীর"-এর (পল্লী পঞ্চায়েৎ) গৌরবোজ্জল আদর্শ প্রচার করত। প্লেখানভ্ এঁদের "রাজনীতিতে বিপ্লবী কিন্তু সামাজিক আদর্শে প্রতিক্রিয়াশীল" বলেছিলেন। রায় ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে রুশিয়ার ইতিহাসের তুলনা করে প্লেখানভের উক্তিটি নিজ সমর্থনে ব্যবহার করলেন। গুরুর নজিরে সম্ভবতঃ খুব বেশী কাজ হ'ল। কয়েকটি বৈঠকের পরই লেনিন রায়কে পৃথক থিসিস লিখতে বললেন।

এবার রায় মুস্কিলে পড়লেন। এতদিন লেনিনের থিসিস্ সম্বন্ধে তাঁর মতামতই দিচ্ছিলেন, কিন্তু পৃথক থিসিসের অর্থ হ'ল লেনিনের বিরোধিতা করা, এবং সে সময়ে লেনিনের বিরোধিতা কল্পনাতীত। যদিও লেনিনের সঙ্গে এ আলোচনা একান্তেই সম্পন্ন হচ্ছিল তথাপি লেনিনের সঙ্গে এই ভারতীয় অর্বাচীনের বিতর্কের কথাটা রটতে দেরী হয়নি, এবং তাতেই চারদিকে গুঞ্জন সুরু হয়ে যায়। যাঁর জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতার সীমা নাই, যিনি তর্ক-শিরোমণি, তাঁরই জ্ঞান বুদ্ধির উপর কথা, তাঁরই সঙ্গে বিতর্ক করার দুঃসাহস! কিন্তু লেনিনের ভাব ছিল অত্যন্ত সহৃদয়তাপূর্ণ, উদার ও সহনশীল। প্রথম প্রথম তিনি একজন নতুন ব্রতীবালকের ভাসা ভাসা কপচানি ভেবে একটু আমোদবোধ করছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি রায়ের যুক্তির সারবত্তা অনুভব করলেন। রায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা তাঁর জীবনে অভিনব। রায় সেদিন এই দুর্লভ অভিজ্ঞতাই লাভ করলেন যে, একজন প্রকৃত মহাপুরুষ তার মত সামান্য ব্যক্তিকে সমকক্ষ জ্ঞান করে নিজে যে সত্যই মহাপুরুষ তা হাতে হাতে প্রমাণ করে দিলেন। তিনি রায়ের মত এক সামান্য ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করতে রাজি না হ'তে পারতেন। তা হ'লে আসন্ন কংগ্রেসে রায় তাঁর বক্তব্য কাউকে শোনাতেই পেতেন না এবং তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতির অভাবে বিকশিত হবার সুযোগই পেত না।

রায়ের বিস্ময়ের আর শেষ হয় না। এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটি কমিশন গঠিত হ'ল। তাতে লেনিন প্রস্তাব করলেন যে, তাঁর থিসিসের সঙ্গে রায়ের থিসিসও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হোক।

রায় লেনিনের এই প্রস্তাবের উপর বললেন যে, তাঁর থিসিস বিকল্প থিসিস রূপে গ্রহণ না করে যেন মূল থিসিসের পরিশিষ্টরূপে গ্রহণ করা হয়। লেনিন রায়ের প্রস্তাবে রাজি হ'য়ে বললেন যে, অজানা ক্ষেত্রে আমাদের এই নতুন অভিযান। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর।

রায় সেদিন কিন্তু মনে মনে বলেছিলেন যে, তার পক্ষে এ অভিযান নতুন নয়। রায় তাঁর থিসিস সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়ই ছিলেন এবং লেনিনের ব্যবহারের দ্বারাই তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি ভুল করেন নি।

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের পক্ষ থেকে পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশ ও পরাধীন জাতি সমূহের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্যে ন্যাশন্যাল এণ্ড কলোনিয়াল কমিশন গঠিত হয়েছিল। সেই কমিশনের অধিবেশনে যখন লেনিন রায়ের থিসিসটিও নিজের থিসিসের সঙ্গে পেশ করলেন তখন সকলেই ভেবেছিল লেনিন বুঝি কেবল ভদ্রতার খাতিরেই রায়ের থিসিস পেশ করছেন, এটি সরাসরি অগ্রাহ্য করলেই চলবে। কিন্তু লেনিন যখন বললেন যে, রায়ের সঙ্গে বহু সময় এই বিষয়ে আলোচনা করে তিনি তাঁর থিসিস সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন, সেই জন্যে তিনি উভয় থিসিসকেই গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন, তখন সকলে বিস্ময়বিমূঢ় হয়েই বিনাবাক্যে তা গ্রহণ করলেন। রায়ের প্রতি লেনিনের এই সমর্থন ও আস্থা দেখে কমিশনের অন্যতম সদস্য সৌফারফ্ কমিশনের সহ-সভাপতি পদের জন্যে রায়ের নাম প্রস্তাব করেন। রায় তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীদের মাথা গরম না করার হিতোপদেশ অনুসারে সম্ভবতঃ সাবধানে পা ফেলছিলেন। তিনি বিকল্প প্রস্তাবে তাঁরই অন্যতম সুহৃদ ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ও হল্যাণ্ডের নেতা স্নীভ্লিট্‌কে ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও সৌফারফকে সেক্রেটারি পদের জন্যে অনুরোধ করলেন। লেনিনের সমর্থনে শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল।

লেনিনের সঙ্গে রায়ের প্রয়োগ ব্যাপারে মতান্তর হয়েছিল। উপনিবেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য দান করার ইচ্ছাকে কার্যকরী করে তোলার কোন ব্যবস্থা লেনিনের থিসিসে ছিল না। রায় বললেন, উপনিবেশ সমূহে কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তার মাধ্যমে এই সাহায্য দিতে হবে; এবং অনুরূপ সাহায্য ছাড়াও শ্রমিক ও কৃষকের সংঘবদ্ধ চাপ ও প্রভাবে জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী

শাসক শক্তির নিকট হতে কিছু সুবিধা লাভ করে যখন জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া নেতৃত্ব আন্দোলন থামিয়ে দিতে চাইবে তখন শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠন সেই জাতীয় আন্দোলনকে তাদের হাত থেকে নিয়ে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করবে।

এবারেও তিনি গুরু প্লেখানভের নজির উল্লেখ করেছিলেন। প্লেখানভ বলেছিলেন যে রুশিয়ায় গণতন্ত্রের জন্যে যে সংগ্রাম, তা কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হবে না, যদি না সে সংগ্রাম শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের রূপ নেয়।

কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে লেনিন উভয় থিসিসকেই গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

রায় লেনিন থিসিস

লেনিন রচিত থিসিসের সারমর্ম ছিল ঃ

ঔপনিবেশিক দেশ সমূহে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তব্য হ'বে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা আন্দোলন পরাধীন দেশে চলছে তাতে কেবল (১) শ্রমিক, (২) কৃষক, (৩) মধ্যবিত্তেরই নয়, (৪) ধনীদেরও সাহায্য করা।

রায় বললেন, এই সব পরাধীন দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনে ধনীদের সাহায্য করলে চলবে না, কারণ তারা বৈপ্লবিক শ্রেণীই নয়। বিপ্লবের সময়, যথার্থ বৈপ্লবিক শ্রেণী,—শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তদের পরিত্যাগ ক'রে ধনীরা সাম্রাজ্য বাদীদের সঙ্গে হাত মেলাবে। রায় লেনিনের "চার শ্রেণীর" নীতি ত্যাগ ক'রে তাঁর "তিন শ্রেণীর" নীতিকে গ্রহণ করতে বললেন।

রায় বললেন, ঔপনিবেশিক দেশসমূহে যদিও চারটি শ্রেণী আছে, কিন্তু এই চারটি শ্রেণীই যে একযোগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তা নয়। যদিও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন (বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক স্বাধীনতা আন্দোলন) চলছে এবং তাতে কমবেশী সকল শ্রেণীরই যোগ আছে, একথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে, উপনিবেশসমূহে যে দ্রুত শিল্পায়ন চলেছে তাতে দেশীয় ধনীরা শ্রমিকদের নির্মম ভাবে শোষণ করছে এবং শ্রমিকরাও ধনীদের বিরুদ্ধে তাদের দাবী দাওয়ার জন্মে লড়ে চলেছে। অর্থাৎ ভারতে একই সঙ্গে হু'টি লড়াই চলেছে। এক বিদেশী শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে, আর এক দেশীয় শাষক-শোষকের বিরুদ্ধে। জমিদারী ও নানা মধ্যযুগীয় প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকগণ মিশে পরস্পরকে শক্তিশালী ক'রে তুলছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার উচিৎ হবে না শ্রমিক-কৃষকের এই আন্দোলনকে ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা।

রায় আরো বললেন, এই আন্তর্জাতিক সংস্থার যে চেষ্টা পরাধীন দেশসমূহ থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটান, তার অর্থ দেশীয় ধনীদের হাতেই দেশটাকে তুলে দেওয়া নয়; বরং শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের মুক্তি আনাই হ'ল উদ্দেশ্য। সেই জন্যে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য হ'বে, এই তিন বৈপ্লবিক শ্রেণীকে সংগঠিত ক'রে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা, এবং পঞ্চায়েতি রাজের প্রতিষ্ঠা করা।

রায় অবশ্য লেনিনের সঙ্গে একমত হ'য়ে এ কথাও বললেন, ঔপনিবেশিক দেশসমূহে প্রথমেই উৎপাদনের যাবতীয় উপায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘোষণা করা চলবে না। প্রথমে জমিদারী প্রথা লোপ করে সেই জমি কৃষক ও পল্লীর মধ্যবিত্তের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। উপনিবেশসমূহে বিপ্লব প্রথম পর্যায়ে ভূমি বিপ্লবের রূপ নেবে।

লেনিনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইউরোপে খুব শীঘ্রই বিপ্লব ঘটবে, এবং সে বিপ্লব ঘটলে ঔপনিবেশিক দেশসমূহ আপনা আপনিই মুক্ত হয়ে যাবে। অতএব অবিলম্বে যদি ঔপনিবেশিক দেশসমূহে সকল শ্রেণীর (চার শ্রেণী) ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন চলে তা হলে সেখান থেকে লাভের কড়ি, কাঁচা মাল প্রভৃতি না আসার ফলে ইউরোপের ধনীরা শ্রমিকদের কাজ দিতে পারবে না। শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ইউরোপে বিপ্লব ত্বরান্বিত করে তুলবে।

পক্ষান্তরে, উপনিবেশসমূহে যদি দেশীয় ধনী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকে, তা'হলে সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল হ'য়ে পড়বে। ইউরোপের শাসকশ্রেণী বিপদে পড়বে না, ইউরোপের বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে না।

রায় দেখলেন, লেনিনের থিসিস অনুসারে ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ যদি ইউরোপের বিপ্লবের স্বার্থের জন্যে বলি দেওয়া হয়, তা হ'লে ভবিষ্যতে প্রাচ্যের শ্রমশীল মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

লেনিন যে ইউরোপের বিপ্লবকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তার কারণ সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ইউরোপ কমিউনিষ্ট রুশিয়ার পক্ষে সর্বদাই ভয়ের কারণ ছিল। সেই জন্যে ইউরোপে কমিউনিষ্ট বিপ্লব যত শীঘ্র ঘটে রুশিয়ার পক্ষে ততই ছিল মঙ্গল। এই কথাটাই এই দ্বিতীয় কংগ্রেসকে দিয়েই বলানো হ'ল, "সোভিয়েট রুশিয়ার মঙ্গলের জন্য লড়াই হবে বিশ্বে ধনতন্ত্র ধ্বংসের লড়াই; সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ রক্ষাই হ'ল এই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার স্বার্থ।"

রায় তাঁর উত্তর জীবনে যে দর্শন রচনা করেছিলেন, তাঁর মূল কথা হ'ল,

ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই নিজ বুদ্ধি বলে কোন আধিদৈবিক শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেই বস্তু জগতের নিয়ম-কানুন আয়ত্ত ক'রে সৃজনী ক্ষমতার সাহায্যে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদব্যবহার ক'রে নীতি পরায়ণ হওয়ার মত দায়িত্ব বোধ জাগাতে পারে—এক কথায়, নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলতে পারে।

রায়ের জীবনে মানব মনের এই সৃজনী ক্ষমতার উপর আস্থা যে প্রথমাবধিই অটুট ছিল, মার্কসবাদের অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদের প্রভাবে যে তা কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি সেটাই আমরা উপক্রমণিকাতে বলেছি।

সেটাই এখানে লক্ষ্যণীয় যে রায় তাঁর থিসিসে গোঁড়া মার্কসবাদ থেকে কিছুটা সরে গিয়েছেন। মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ (economic determinism) সূত্রটি তিনি সম্পূর্ণ অনুসরণ না করে মননশীলতার দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তোলার সৃজনী ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন; অবশ্য লেনিনই প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসের প্রথম কার্যকরী সংশোধনকারী।

মার্কস-এঙ্গেলস যেখানে বলছেন, "অতীতে যেমন 'অনিবার্য' ভাবে শ্রেণী সমূহের উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি 'অনিবার্য' ভাবেই শ্রেণী লুপ্ত হয়ে যাবে—Classes will vanish as *inevitably* * as they *inevitably* * arose in the past"; বা "শ্রেণী বিরোধের 'অপরিহার্য' পরিণতি সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় —That class *indispensibly* * lead to the dictatorship of the proletariat;" লেনিন সেখানে "inevitability" (অনিবার্যতা) ও "indispensibility (অপরিহার্যতা) মেনে না নিয়ে, অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদের কথা স্বীকার না করে মননশীলতার (Subjectivity) উপর জোর দিয়ে বলছেন:

> এই নতুন সরকারকে আমরা এক আঘাতেই সরিয়ে দিতে পারব না। যদিও তা সম্ভব হয়, (কারণ বৈপ্লবিক যুগে কী যে সম্ভব আর কী যে নয় তা বলা কঠিন) তথাপি ক্ষমতা দখলে রাখতে পারব না; যদি না আমরা রুশ ধনী ও বুদ্ধিজীবীদের উন্নত সংগঠন সমূহের সঙ্গে সমানে সমানে লড়বার মত সর্বহারাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে

---

*(Vide—Lenin—*State & Revolution* pp. 17—38)

*Italics mine—author.

তুলতে পারি। এখন এই বিপ্লবের নিতাকার ধ্যান-জ্ঞান ও আহব ধ্বনি হ'ল "সর্বহারার সংগঠন গড়ে তোল।"*

লেনিন তাঁর বিপ্লব গড়ে তোলার কাজে তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি যখন যেমন ভাবে তাঁকে চালিয়েছে তেমনি ভাবেই চলেছেন। যখন তাতে মার্কসবাদের সমর্থন পেয়েছেন তখন সেই নজির দিয়েছেন; যখন পাননি, তখন যুক্তিবাদের দ্বারা সমর্থন পেতে চেয়েছেন এবং গ্যেটের বিখ্যাত বাক্য; "তত্ত্ব বিবর্ণ ধূসর, কিন্তু জীবনবৃক্ষ চির সবুজ" অর্থাৎ তত্ত্ব জীবনের abstraction মাত্র, জীবন প্রবহমান গতিশীল—তাকে এক তত্ত্বের প্রাণহীন শৃঙ্খলায় বাঁধা যায় না,—Theroy is grey, but the tree of life is ever green" উদ্ধৃত করেছেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে লেনিনের পরই রায়ের স্থান, যিনি মার্কসবাদকে সংশোধন করেছেন। রায়ের ১৯২০ সালের Colonial Thesis ও India in Transition এবং ১৯১৮ সালের আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে উপস্থাপিত ডি-কলোনাইজেসন তত্ত্ব—(de-colonisation thesis) মার্কসবাদের অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদের পরিবর্তে মানুষের মননশীলতার উপর সম্যক গুরুত্ব প্রদানেরই ইতিহাস।

দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই যে রায়ের থিসিস, এতে তিনি মার্কসের অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদকে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলেন নি। বরং লেনিন তাঁর থিসিসে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে অপরিবর্তনীয় জ্ঞানে উপনিবেশের ও পরাধীন জাতির সকল মানুষকেই বৈপ্লবিক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ক'রে মার্কসের এই অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদকে সমর্থন করেছেন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে সাম্রাজ্য-

---

* We shall not be able to overthrow the new government with one stroke or, should we be able to do so (in revolutionary times the limits of the possible are increased a thousand fold), we could not retain power, unless we meet the splendid organisation of the entire Russian bourgeoisie and the entire bourgeois intelligentia with an organisation of the proletariat just as splendid, leading the vast mass of the city and country poor, the semi proletariats and the petty proprietors.

In any case the slogan of the hour, during the revolution, and on the day after the revolution, must be—proletarian organisation." (vide—Lenin—*Letters from Afar.* pp. 33-34.

বাদীরা নির্বিশেষে শোষণ করতেই নির্দেশিত। তা না হয়ে, অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকের নির্দেশ ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীরাও যে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে পারে, তারা যে তাদের মানসিকতার বলে তাদের শোষণের পদ্ধতি ও কৌশলের পরিবর্তন করতে সক্ষম, লেনিন সেটি ধরেন নি, রায় ধরেছেন।

রায়ের এই তিন শ্রেণীর নীতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের মনের সৃজনী ক্ষমতা স্বীকার করে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যাপারে মানুষের মননশীলতার স্থান যে অনেকখানি সে তত্ত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

আমরা এ সম্বন্ধে ষষ্ঠ কংগ্রেসে রায়ের প্রস্তাব আলোচনা কালে দেখব যে, রায় এইভাবে যখনই প্রয়োজন হয়েছে মার্কাসকে সংশোধন করে চলেছেন, এবং অবশেষে মার্কসকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করে নতুন এক দর্শনের প্রবর্তন করেছেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব বিপ্লবের অন্যতম নেতা রায়

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হ'ল। রায় এতদিন মেক্সিকোর অন্যতম প্রতিনিধি মাত্র ছিলেন। এখন বিশ্ববিপ্লবের অন্যতম নেতা রূপে খ্যাত হ'লেন। কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের ৪১ জনের কার্যকরী সমিতিতে এসিয়ায় তখন কোন কমিউনিষ্ট পার্টি না থাকাতে সেখান থেকে মাত্র দু'জনকে নেওয়া হয়। একজন পারস্যের প্রতিনিধি সুলতান জেদ ও অপরজন রায়। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। অজুহাত দিয়েছিলেন, তিনি অচিরেই প্রাচ্য অভিমুখে যাত্রা করবেন, হয়তো আর ফিরবেনই না। সুতরাং তার পরিবর্তে কোরিয়ার প্রতিনিধি পাক্‌কে নেওয়া হোক। রায় যে বার বার পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করছেন তা তাঁর সাবধানে পা ফেলা ছাড়াও অন্য কারণ ছিল। ভারতে রায়ের কাজ করার সুবিধার জন্যে বোরোদিনকে যে আফ্‌গানিস্তানের য়্যামব্যাসাডার করার কথা কর্তৃপক্ষ ভাবছিলেন সে কথা আমরা বলেছি। বোরোদিন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, সোভিয়েট রুশ যখন কোন জাতীয় রাষ্ট্র নয় তখন রায়কে য়্যামব্যাসাডার করলে কেমন হয়। প্রস্তাবটি ভেবে দেখার মত মনে করে তাঁরা তা বিবেচনা করছিলেন। সেই বিবেচনা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ রায়ের বার বার এইরূপ দায়িত্বভার প্রত্যাখ্যানকে কোনরূপ কদর্থ করেন নি। কার্যকরী সমিতি তার প্রথম অধিবেশনেই পাঁচজন সদস্যের এক ছোট কমিটি গঠন করে। তার নাম হয় স্মল ব্যুরো। এই স্মলব্যুরো কমিনটার্ণের * দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা ছাড়াও নীতি পদ্ধতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ পরিষৎ হয়। কাজের সুবিধার জন্যে রায়কে কিন্তু স্মল ব্যুরোতে কো-অপ্ট করা হয়। পরে যখন কর্তৃপক্ষ দেখেন যে রায়কে য়্যামব্যাসাডার করলে ব্রিটিশের সঙ্গে যে টুকু

* কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সংক্ষিপ্ত নাম।

কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে তাও নষ্ট হয়ে যাবে এবং আফগানিস্থানও ব্রিটিশের এতখানি চাপ সইতে পারবে না, তখন এ প্রস্তাব বাতিল করা হয়।

পোলাণ্ডে ফরাসী সেনাপতি ওয়েগাঁর নিকট রেড্ আর্মির পরাজয়ের পর ইউরোপে তখনকার মত বিপ্লবের আশা বিলুপ্ত হয়। তখন স্থির হয়, প্রাচ্যাভিমুখে বিপ্লবের প্রসার ঘটাতে হবে। পোলাণ্ডে রেড্ আর্মির পরাজয়ে রুশ নেতাগণ মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। লেনিন তাঁদের এই বলে চাঙ্গা করে তোলেন যে, ইউরোপই পৃথিবীর সবটুকু নয়। লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক-এর পতন ঘটতে পারে গঙ্গা ও ইয়াংসি-কিয়াং নদীর তীরে। তা ছাড়া জার সাম্রাজ্যের এশিয়ার অংশ এখনো সোভিয়েট রিপাবলিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কাজও বাকি আছে।

"স্মল ব্যুরোও" এশিয়াতে বিপ্লব সংঘটনের পরিকল্পনা রচনা করতে বসেন। দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। (১) বাকুতে প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন ; এবং (২) তাশখণ্ডে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের এশিয়ার শাখা—"সেন্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরো" প্রতিষ্ঠা। রায়কে এই ব্যুরো চালাবার ভারার্পণ করা হয়।

বাকুতে কংগ্রেসের পরিকল্পনাটি জিনোভিয়েভ-এর। রায় এতে আপত্তি জানালেন। বললেন যে, এত শীঘ্র কোন দেশ থেকেই সত্যিকারের বিপ্লবী প্রতিনিধি আনা যাবে না। বড় জোর স্থানীয় তৈল ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিয়ে এটি একটি বড় রকমের জনসমাবেশ হবে মাত্র। তার নাম কংগ্রেস দেওয়া কেন। কিন্তু রায় ছাড়া সকলেই এই পরিকল্পনায় খুবই উৎসাহিত। রায় বললেন, সেন্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরো স্থাপনের প্রস্তাবটিকেই কার্যকরী করে তোলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তা না করে এইভাবে সময়, শক্তি ও অর্থাদি নষ্ট করা অন্যায়। তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তে এমনই অবিচলিত রইলেন যে, তিনি বাকুতে এই কংগ্রেসে যোগ দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করলেন। অথচ যোগ দিলে তিনিই এই কংগ্রেসের মধ্যমণি হ'তে পারতেন। রায় চরিত্রের অনমনীয় দার্ঢ্যের দিকটি এতে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। রায়ের এই একগুঁয়েমি দেখে লেনিন প্রশ্রয়ের হাসি হেসে ছিলেন; একটি চ্যাংড়া ছোঁড়া তার ইচ্ছা মেনে নিচ্ছে না দেখে জিনোভিয়েভ্ চটেছিলেন ; র‍্যাডেক রায়ের অকালপক্ক গাম্ভীর্যের প্রতি বিদ্রূপ করলেন, বললেন যে, এতে কাজ হয়তো কিছু হ'বে না, কিন্তু ব্রিটিশ বৈদেশিক সেক্রেটারি লর্ড কার্জানের চোখ থেকে কয়েকদিনের জন্যে ঘুম ছুটে যাবে, তা ছাড়া কয়েকদিন

ধরে যোচ্ছব ত চলবে, তাই বা মন্দ কি? কারাখান—ককেসাস অঞ্চলে তাঁর জন্মস্থান—নিজে এশিয়াবাসী হয়ে রায়ের যুক্তিটা একটু বেশী বোঝেন। রায়ের মত তাঁরও এতে খুব বেশী আস্থা ছিল না। তথাপি তিনি এর বিরোধী নন। চিচেরিণের বার বার বিনয় নম্র অনুরোধও ব্যর্থ হয়েছিল। ডিসিপ্লিন মেনে চলা যে একটা মস্তবড় বলশেভিক গুণ তা শিখতে রায়ের যে কেন এত দেরী হচ্ছে এই ভেবে বোরোদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তথাপি রায় অটল ছিলেন। তিনি তাশখণ্ডে যাবার জন্যে একদিনও দেরী করতে চান না—তাশখণ্ড ভারতের পথের এক পান্থশালা—সেই জন্যে তিনি অবিলম্বে সেখানেই যাবেন—বাকু সে পথে পড়ে না।

তিন জনকে নিয়ে সেণ্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরো গঠিত হ'ল—রায়, সোকোলনিকোভ্ ও সৌফারোফ। সে সময় সেণ্ট্রাল সোভিয়েট সরকারের এক টার্কিস্তান কমিশন ছিল। সোকোলনিকোভ্ ছিলেন সেণ্ট্রাল এশিয়ার রেড্ আর্মির তুর্কী সমরাঙ্গনের সেনাপতি ও এই কমিশনের চেয়ারম্যান। এই সোকোলনিকোভ্ বিপ্লবের পূর্বে পার্টির মুখপত্র প্রাভদার সম্পাদক ছিলেন, পরে লণ্ডনের য়্যামব্যাসাডার হয়েছিলেন, এবং পরে সোভিয়েট রুশিয়ার অর্থমন্ত্রী হয়ে সেই দুর্দিনে মজুত স্বর্ণভাণ্ডারের সাহায্য ব্যতিরেকেই রুবলের মূল্যমান স্থির রেখে রুবলের মর্য্যাদা পুনঃসংস্থাপন করে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। অবশেষে অন্য সকল প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মতই ষ্ট্যালিনের হাতে কাটা পড়েন! ব্যুরোর অপর সদস্য সৌফারোফ। তিনিও অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি টার্কিস্তান কমিশনের বলশেভিক পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন এবং তত্ত্ব ও প্রচার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এঁকেও শেষ পর্যন্ত ষ্ট্যালিনের বলি হ'তে হয়।

সেণ্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরোর দায়িত্ব নিয়ে তাশখণ্ডে যাবার আগেই রায় মস্কোতে বসেই ভারত ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বিপ্লব সংগঠিত করার জন্যে একটি পরিকল্পনা রচনা করতে বসলেন। সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্যে একদল উপযুক্ত শিক্ষকও নিয়ে যেতে চান। কিন্তু এতবড় ব্যাপারের পরিকল্পনার উদ্যোগ আয়োজনে সময় লাগে। রায়কে মস্কোতে আরো কিছুদিন থেকে যেতে হ'ল।

সেই সময় প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর সহযোগী তুর্কীর তিন শাসকের মধ্যে এনভার পাশা ও জেমেল পাশা রুশিয়ায় ছিলেন এবং তৃতীয় যে তালাৎ পাশা

তিনি জার্মানী ছেড়ে আসেন নি। রায় যে বাড়ীতে ছিলেন, এই দুইজনকেও রাষ্ট্রীয় অতিথি রূপে সেই বাড়ীরই একাংশে রাখা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে এনভার পাশাই ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট উৎসাহী পুরুষ। ইনি রুশ সরকারকে প্রস্তাব দেন যে, তিনি মধ্য প্রাচ্যের মুসলমানদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিতে পারবেন। ভারত আফগান সীমান্তে যে সব মুসলমান উপজাতি বাস করে তাদের সাহায্যে ভারতের খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পারবেন, তিনি আফগানিস্তানের রাজা আমানুল্লার সমর্থন লাভ করতে পারবেন এবং কাবুলেতেই তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করে চারিদিকের এইসব বিদ্রোহ বিপ্লব পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন। এর জন্যে অবশ্যই রুশের সাহায্য চাই।

এনভার পাশার আসল মতলব ছিল অন্য। সেটা ব্রিটিশ বিরোধিতা নয়, নিজের জন্যে একটি নতুন মোসলেম রাজ্য এই ফাঁকে রুশ সাহায্যে গড়ে তোলা। রুশ কর্তৃপক্ষ এ উদ্দেশ্যের বিষয় কিছুই জানতেন না এবং এনভার পাশার এই চালে আস্থা স্থাপন করে তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। রায় অবশ্য তখনো রুশিয়ায় আসেন নি।

খিলাফৎ আন্দোলন ও প্যান ইসলামিয় আন্দোলন তখন স্বভাবতই প্রাচ্যে ব্রিটিশ স্বার্থ বিরোধী রূপেই দেখা দেয়। সেই জন্যে রুশ নেতারা এইসব আন্দোলনকে নির্বিচারে সাহায্য দেবার নীতি গ্রহণ করেন। লেনিন ও তাঁর থিসিসে এই সব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে সাহায্য ও সহযোগিতা দেবার কথা বলেছিলেন। এই নীতির বলেই কামাল পাশা রুশের নিকট থেকে সর্ব বিষয়েই সাহায্য পেয়ে আসছিলেন। রায় কিন্তু এনভার পাশাকে সন্দেহ করছিলেন। এনভার পাশা ব্রিটিশ বিরোধী বলেই যে তাঁকে সাহায্য করা উচিৎ হবে তা তিনি মনে করছিলেন না। তিনি এনভার পাশার আসল মতলব যে কী সেটা জানবার জন্যে বৈদেশিক মন্ত্রী চিচেরিণকে বললেন। চিচেরিণ রায়কেই সে দায়িত্ব দিলেন এবং এনভার পাশাক রায়ের সঙ্গে কেতা মাফিক পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে রায় আফগানিস্তানের য়্যামব্যাসাডার হ'তে যাচ্ছেন, ওঁর সঙ্গেই যেন অতঃপর তাঁর সকল পরিকল্পনা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন, রায়ই তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন। এরপরে রায় তাঁর আসল মতলবটি জানতে পারেন, এবং কর্তৃপক্ষকে জানান। এনভার পাশা পূর্ব

তুর্কীস্তানে নিজের জন্যে এক নতুন মোসলেম রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারলে সেটা যে রুশ বিপ্লব বিরোধীই হবে এবং ব্রিটিশের সঙ্গে রফা করেই রুশিয়ার বুকে ছোরার ফলার মতই বিঁধে থাকবে তাতে সন্দেহ নাই। এই সংবাদে লেনিন, চিচেরিণ, কারাখান প্রভৃতি নেতারা এক দিকে যেমন সতর্ক হ'য়ে ওঠেন, অন্যদিকে তেমনি রায়ের উপর উত্তরোত্তর আস্থাবান হয়ে উঠতে থাকেন।

ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের দেশীয় উচ্চ সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হ'লেও তারা যে বৈপ্লবিক শক্তি নয় এবং জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, রায়ের এই থিসিস এনভার পাশার উদ্দেশ্যের দ্বারা সমর্থিত হ'ল এবং ১৯২৪ সালে চতুর্থ কংগ্রেসে তাঁর এই থিসিস পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার পক্ষে ধীরে ধীরে পথ পরিষ্কার হ'তে থাকল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের ভারতে বিপ্লব পরিকল্পনা

রায় ভারতে বিপ্লব গড়ে তোলার এক নিজস্ব পরিকল্পনা রুশ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করলেন।

সে সময় তিনি সংবাদ পেলেন যে, ভারতে খিলাফৎ কমিটির আবেদনের ফলে হাজার হাজার মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক তুর্কীতে কামাল পাশার বাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে ভারত ছেড়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পার হয়েছে। অবশ্যই এরা সবাই বৃহত্তর প্যান-ইসলামী ধর্ম সাম্রাজ্য গড়ে তোলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ধর্মান্ধ গোঁড়া মানুষ। কিন্তু এর মধ্যে কিছু শিক্ষিত যুবকও আছে।

রায় ভাবলেন যে, যদি এই সব শিক্ষিত যুবকদের বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, কামাল পাশা যখন খলিফার পদ লোপ করে দিয়েছেন তখন প্যান ইসলামী আন্দোলনের আর কোন অর্থ থাকে না। এই যুগে জনগণের স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবী নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে হবে, তা হলে হয়তো তারা শুনবে। তখন তাদের বৈপ্লবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ভারতে পাঠালে ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়া-পত্তন হ'তে পারবে। এই অগ্রগামী বৈপ্লবিক বাহিনীর পিছনে যাতে পর্যাপ্ত পরিমানে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও সর্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ একদল শিক্ষক ও সেনানীমণ্ডলী থাকে সেইরূপ ব্যবস্থাসহ এক পরিকল্পনা দাখিল করলেন।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য রইল উপজাতিদের সাহায্যে সীমান্ত অঞ্চলে খানিকটা ভারত ভূমিদখল করেই স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করে জনগণের আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির একটি কর্মসূচী ঘোষণা করা। মুক্তিফৌজ যাতে ভারতের অভ্যন্তরে সহজে অগ্রসর হ'তে পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সৈন্যের রসদ ও সাহায্য আসার পথ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে দেশের নিকট আবেদন। এই আবেদন

বিশেষভাবে রেল ও কলকারখানার শ্রমিকদের নিকট করা হবে। মুক্তি-ফৌজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্ত জনগণকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হবে। ফলে একদিকে মুক্তিফৌজের দলও যেমন বাড়বে, অন্যদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত স্থান সমূহ তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতেও সক্ষম হবে এবং বৈপ্লবিক সরকারের প্রচারিত কর্মসূচী রূপায়িত করেও চলবে। এইভাবে বৈপ্লবিক সরকার জনগণের সমর্থনও লাভ করবে। স্বাধীনতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপটির সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের ফলে জনসাধারণ তখন সত্যই স্বাধীনতার জন্যে মরণপণ করে লড়বে। কায়েমী স্বার্থবানরা অবশ্যই এইরূপ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতাই করবে। কিন্তু মহাযুদ্ধে ক্লান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই গণ বিপ্লবের হাত থেকে দেশীয় ধনী জমিদার মহাজনদের বাঁচাতে সক্ষম হ'বে না।

রায়ের এই পরিকল্পনা রূপায়ন করতে হ'লে রুশ সরকারের পক্ষে আফ-গানিস্তানের অ্যামব্যাসাডার হওয়া চলে না। সুতরাং অন্য একজনকে পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল। কৃষ্ণসাগর নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক রাসকোলনিকোভকে এই পদের জন্যে মনোনীত করা হ'ল।

রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থনে রুশ সরকার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজনের ব্যবস্থা করলেন। ১৯২০ সালের অক্টোবর বিপ্লব স্মরণোৎসবের পরই নভেম্বরে রায়ের তাশখণ্ড অভিমুখে যাত্রা করার দিন স্থির হয়ে গেল।

মস্কো থেকে তাশখণ্ড প্রায় দু'হাজার মাইল দূরে। কয়েকমাস পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লব বিরোধী শত্রু সৈন্য দ্বারা এর অধিকাংশ অঞ্চলই অধিকৃত ছিল। তখনো হোয়াইট রুশিয়ার পরাজিত সৈন্যের দল স্থানে স্থনে লুটপাট ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল। এরা প্রায়ই রেল লাইন ভেঙ্গে ট্রেন থামিয়ে তা লুঠ করত। এই সব বিপদ আপদের হাত থেকে রক্ষা করে সাজ-সরঞ্জাম রসদপত্র যাতে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা হ'ল। দুটা লম্বা ট্রেণ বোঝাই করে যে পরিমাণ স্বর্ণ, ইংলণ্ড ও ভারতীয় মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজন নিয়ে রায় যাত্রা করলেন, তা একটি ছোটখাট সামরিক বাহিনীকে সজ্জিত করার পক্ষে যথেষ্ট। একটি ছোট এরোপ্লেন স্কোয়াড্রন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় এরোপ্লেনের অংশ ও সাজ-সরঞ্জামও সঙ্গে চলল। পরে সবকিছুই প্রয়োজন মত যোগানের ব্যবস্থাও রইল। দু'টি সশস্ত্র দল দুটি ট্রেণকে রক্ষা করার জন্যে সঙ্গে থাকল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় সাফল্য মণ্ডিত বিপ্লব

তাশখণ্ডে পৌঁছেই রায়ের প্রথম কাজ হ'ল কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সেণ্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরোর দপ্তর গড়ে তুলে রুশ সাম্রাজ্যের মধ্য এশিয়ার প্রদেশ-গুলিতে বিপ্লবের বিস্তার ঘটান ও সোভিয়েট সরকারের শাসন ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদন। সেই সঙ্গে ভারত তথা নিকটবর্তী দেশসমূহে বৈপ্লবিক সরকার গড়ে তুলতে সাহায্য করবার জন্যে এক আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন।

কয়েক বছর ধরে গৃহযুদ্ধে তাশখণ্ডের স্বাভাবিক জীবন ভেঙ্গে পড়েছিল। বার বার লুঠ ও ধ্বংস কার্যের ফলে বাসযোগ্য গৃহ থেকে সুরু করে সব কিছুরই অভাব ঘটেছিল। তারপর উৎপাদন বণ্টন ও বিনিময়ের নতুন ব্যবস্থা তখনো ঠিকমত চালু না হওয়ার ফলে ভোগ্য বস্তুর অভাব চলছিল। সবচেয়ে কষ্টকর হয়েছিল 0 ডিগ্রীরও অনেক নীচের ঠাণ্ডায় জ্বালানির অভাব। ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগের পর থেকে রায়কে থাকা খাওয়ার এতটা কষ্ট কোথাও যেমন পেতে হয়নি, তেমনি এতটা দায়িত্ব, এত বেশী সম্মান ও পদমর্যাদাও কোথাও পান নি। তা ছাড়া যুগ যুগান্তের দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত নিপীড়িত মানুষের বন্ধন-মুক্তিদানের এমন প্রত্যক্ষ আনন্দও কোথাও লাভ করেন নি। এখানে দুর্গম পথের কঠিন জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা রায়ের জীবনকে অতুল ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান করে তুলতে লাগল।

ব্যুরোর অপর দুইজন সদস্যের নিজ নিজ দায়িত্ব থাকায় রায়কেই ব্যুরোর দৈনন্দিন সকল কাজ চালাতে হ'তো এবং সাপ্তাহিক সভায় সভাপতিত্ব করতে হতো।

ব্যুরোর প্রথম কাজ হ'ল, নিকটবর্তী দেশসমূহের মধ্যে বৈপ্লবিক মানুষ খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। যে সব লোক খিলাফৎ

আন্দোলনের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে এসে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের প্রথমে সংঘবদ্ধ করে বৈপ্লবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারপর তাদের দেশে পাঠালে তারা সেখানে বিপ্লব বাধাবার পক্ষে কাজ সুরু করতে সক্ষম হবে। কিন্তু নিকটবর্তী কোন দেশের সঙ্গেই খোলাখুলি যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছিল না। রুশ বিপ্লব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন জার-সাম্রাজ্যের অধীন বোখারা ও খিবা রাজ্যকে স্বাধীনতা দান করেছিলেন, এবং সেখানে তখন বোখারার আমীর ও খিবার খাঁন রাজা হয়ে বসেছিলেন। এই দুই রাজ্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সীমানা একদিকে আরব সাগর, আর একদিকে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত। এরই গায়ে ট্রান্স কাস্পিয়ান মালভূমি। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী তখন পারস্যের পূর্বাঞ্চলের খোরাশান, মেসেদ প্রভৃতি দখল করে এই সমগ্র মালভূমির উপরেই প্রভুত্ব করছে। এর ফলে বলশেভিক বিপ্লবের হাত থেকে এক দিকে পারস্যকে যেমন রক্ষা করা হচ্ছে, অপর দিকে ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেল পথের কয়েকশত মাইল দখল করে তুর্কিস্তান সোভিয়েট রিপাবলিকের কয়লা ও পেট্রোল সরবরাহের পথও বন্ধ করে দিয়েছে। সোভিয়েট সরকার যে যুদ্ধ ক'রে এই চলাচলের পথ উন্মুক্ত করবে তারও উপায় নাই। কারণ স্বাধীন বোখারার অনুমতি ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। স্বাধীন বোখারার আমীর সে অনুমতি দেবেন না। আমীর সাহেব মনে করেন না যে, তাঁদের স্বাধীনতার জন্যে সোভিয়েটের প্রতি তাঁদের কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের হেতু আছে।

সীমান্ত সহর আস্কাবাদে সোভিয়েট সরকারের যে একটি ছোট বাহিনী ছিল, তাদেরও রসদ ও সাহায্য পাঠান সম্ভব হচ্ছিল না। সুতরাং সামরিক বাহিনীর দ্বারা যখন এই বিপদের কোন সুরাহা হচ্ছিল না, তখন রায় স্থির করলেন যে, ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের প্ররোচনা ছড়ানো ছাড়া এর আর কোন আশু সমাধান নাই। অথচ অবিলম্বে এর প্রতিবিধান না করলে সমূহ বিপদ। যে ভাবে চলেছে সে ভাবে যদি ব্রিটিশ কিছুদিন চালাতে পারে তবে তুর্কীস্তান সোভিয়েট ভেঙ্গে পড়বে এবং মধ্য এশিয়াতে সোভিয়েট সরকারের বিস্তৃতি ও স্থায়িত্বের আশাও লোপ পাবে। অবিলম্বে তিনি এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আস্কাবাদ থেকে এই অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি আস্কাবাদ রওনা হয়ে গেলেন।

এদিকে এনভার পাশাও তাশখণ্ডে আফগান সরকারের কনস্যুলেটে এসে উঠেছেন এবং আফগান সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে তার ঈপ্সিত মোসলেম রাজ্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা করছেন। রায় যে আস্কাবাদে যাবেন সে খবরও তিনি ব্রিটিশকে দিয়েছেন। ব্রিটিশও রায়কে অপহরণ করার ব্যবস্থা করেছে। এ সংবাদ সোভিয়েটের গুপ্তচর যথা সময়েই নিয়ে এল এবং রায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হ'ল।

যে সব পাঠান সৈন্য ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ বাহিনী ত্যাগ করে চলে এসেছিল তাদের অধিকাংশই গোঁড়া মুসলমান, তুর্কীর খলিফার জন্যে প্রাণ দেবে বলে সৈন্যদল ত্যাগ করে এসেছে। রায় তাদের স্বীয় জন্মভূমি ভারতকে স্বাধীন করার জন্যে তার বৈপ্লবিক বাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন। কিছু কিছু লোক শুনল। তাদের নিয়ে তিনি রেড্ আর্মির এক আন্তর্জাতিক বাহিনীর গোড়াপত্তন করলেন এবং প্রথমেই ক্রাসনোভোড্স্ক থেকে মার্ভ পর্যন্ত ট্রান্স্-কাস্পিয়ান রেলপথকে রক্ষা করার কাজে তাদের নিযুক্ত করলেন। পরে ব্রিটিশ বাহিনীকে ঐ অঞ্চল থেকে তাড়াবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। পারস্য থেকে পালিয়ে আসা বিপ্লবীরা ও কিছু রুশ কমিউনিষ্ট এই আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে একে পুষ্ট করে তুলল।

ভারতীয়রা যতদিন ব্রিটিশ বাহিনীতে ছিল তারা কেবল রাইফেল চালাতেই শিখেছিল, এবং কেউ কোন অফিসারের পদই পায়নি। এখানে তারা মেসিন-গান, কামান প্রভৃতি সবরকম অস্ত্রের ব্যবহারই শিখল এবং দায়িত্বপূর্ণ অফিসারের পদও পেল। ফলে একদিকে যেমন তারা প্রাণপণ করে লড়তে লাগল, অন্যদিকে তেমনি এই সব পলাতক সৈন্যদের পদোন্নতি ও সুযোগসুবিধা লাভের সংবাদে ব্রিটিশবাহিনী ছেড়ে ভারতীয় সৈন্যরা দলে দলে পালিয়ে আসতে লাগল। এই সব পলাতক ভারতীয় সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণে ব্রিটিশ বাহিনী পারস্য সীমান্ত ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য হ'ল। ভারতীর সৈন্যদের বীরত্বে শীঘ্রই ক্রাসনোভডস্ক-মার্ভ রেলপথ শত্রুমুক্ত হয়ে ককেসাস থেকে তেল কয়লা মধ্য এশিয়ায় বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম হ'ল। একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাহিনীর অতর্কিত গরিলা আক্রমণে ব্রিটিশ বাহিনী বিব্রত হ'তে থাকল, অন্যদিকে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারের ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর রসদের অভাব ঘটতে লাগল। ব্রিটিশ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হ'ল।

এক বৎসরের চেষ্টায় পারস্যের খোরাসান প্রদেশ ব্রিটিশ প্রভাব মুক্ত হ'য়ে গেল, কিন্তু বোখারা রাজ্য তখনো তুর্কীস্তান সোভিয়েট রিপাবলিকের গলায় কাঁটার মত বিঁধে রইল। ব্রিটিশের সামরিক বাহিনী সরে গেলেও বোখারার আমীরের দরবারে কূটনৈতিক তৎপরতা বেড়েই চলল। তাশখণ্ডের আফগানিস্তান দূতাবাস থেকে এনভার পাশা এই চক্রান্তের নেতৃত্ব করতে লাগলেন। আফগান সরকারও এ ষড়যন্ত্রের একজন অংশীদার হ'লেন।

মধ্য এশিয়া থেকে সোভিয়েট প্রভাব নষ্ট করার ষড়যন্ত্র ভয়াবহ হ'য়ে উঠল। ইসলাম জগতের সর্বজন মান্য উচ্চপদস্থ সব ইমামদের স্বাক্ষর সহ মধ্য এশিয়ার মোল্লাদের নিকট এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হ'ল। বোখারার রাজদরবারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় অনুষ্ঠিত এক ধর্মসম্মেলনে যোগদেবার জন্যে সকলকে আহ্বান করা হ'ল। উদ্দেশ্য নাস্তিক বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা।

চক্রান্তকারীরা জানত যে, কেবলমাত্র সম্মেলনের মারফৎ জেহাদ ঘোষণা করলেই সোভিয়েট সরকার বিনষ্ট হয়ে যাবে না। কৃষকরা জমি পেয়েছে, পল্লীর গরীব মোল্লারাও তাতে লাভবান হয়েছে। কতিপয় জমিদার ও উচ্চপদস্থ মোল্লারাই কেবল সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে আছে। সুতরাং যুদ্ধে জয় লাভ করা ছাড়া সোভিয়েটকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। খোরাসান থেকে বিতাড়িত হ'য়ে ব্রিটিশ-বাহিনী চিত্রল ও গিলগিটে এসে ঘাঁটি করেছিল। সেখান থেকে ব্রিটিশ ফরগণার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই চক্রান্তকারীদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছিল।

যদিও জনসাধারণ জমি খাদ্য ও যুদ্ধে শান্তি পেয়েছিল, তথাপি তাদের কাছে ধর্মের দোহাই তুচ্ছ নয়। যদি অবিলম্বে এই জেহাদ ঘোষণার ব্যবস্থাকে উপযুক্ত প্রতিব্যবস্থা দিয়ে ঠেকানো না যায় তবে হয়তো জনসাধারণকে আটকানো নাও যেতে পারে। অর্থাৎ বোখারাকে আমীরের হাত থেকে নিয়ে সোভিয়েট সরকারের অধীনে না আনা পর্যন্ত মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট সরকারের নিরাপত্তা-রক্ষার কোন ভরসা নাই, এশিয়ার অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন দেশ সমূহে বিপ্লবেরও কোন আশা নাই।

রায় বোখারা রেভোলিউসনারি কমিটি স্থাপন করলেন। তারপর বেছে বেছে লোক সংগ্রহ ক'রে প্রয়োজনীয় তালিম দিতে সুরু করলেন। সে যুগে বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মসূচী বোঝে এমন লোক সেখানে পাওয়াই ছিল মুস্কিল। ওরই

মধ্যে ফয়জুল্লা খাজের নামে এক সংস্কারমুক্ত শিক্ষিত যুবককে এই বৈপ্লবিক কমিটির প্রেসিডেন্ট করলেন এবং এমনই ভাবে তাকে তৈরি করতে লাগলেন যাতে সে প্রয়োজনের সময় অবিলম্বে দায়িত্ব ভার নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

বোখারা রাজ্যে তখন যন্ত্রশিল্প ও শ্রমিক শ্রেণী বলে কিছু ছিল না। ছিল অনগ্রসর কৃষক ও পশুপালক, আর কিছু ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। বিপ্লবী সমিতি বোখারার জনসাধারণের নিকট প্রচার কার্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে চলল। কমিটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে বলা হ'ল যেন মানুষের ধর্মবিশ্বাসের উপর কোন প্রকার কটাক্ষপাত করা না হয়। কেবল জমিদারদের শোষণের কথা ও জমির মালিক হ'বে কৃষক এই কথাই প্রচারিত হ'তে থাকল। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ও আফগানরা যে কি ভাবে মধ্য এশিয়ায় বৈপ্লবিক সরকারকে সরিয়ে পুনরায় জমিদার শাসনকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে এবং জন প্রতিনিধিদের সম্মেলনে নির্বাচিত সরকারই যে যথার্থ জন স্বার্থ রক্ষা করতে পারে তারই প্রচার চলল। রায় ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস স্মরণ করে পল্লীর দরিদ্র যাজক শ্রেণীকে কৃষকদের স্বার্থে স্বার্থবান করে তোলার জন্যে প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন এবং বিপ্লব যে মোসলেম শাস্ত্র বিরোধী নয় এ কথা জনসভায় প্রমাণ করার জন্যে কোরাণ ও মোসলেম শাস্ত্র সমূহ পড়তে সুরু করলেন। রায়ের স্বভাব অনুযায়ী শীঘ্রই তা ভাল ভাবেই আয়ত্ত করলেন।

বোখারার আমীরকে সিংহাসনচ্যুত করা মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সোভিয়েট সরকার মোটেই সেটা করতে চাইছিলেন না। তাঁদের তখনো স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ঐক্যবদ্ধ মোসলেম সাম্রাজ্য গড়ে তোলার আদর্শবাদ প্যান-ইসলামিজিম একটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। তা ছাড়া বোখারার আমীরের স্থান মোসলেম জগতে খুবই সম্মানীয়। তাঁর অধিকারের উপর সোভিয়েটের হস্তক্ষেপ হয়তো মোসলেম জগতে সোভিয়েট বিরোধী জেহাদ সুরু করার সুবিধা করে দেবে।

সেণ্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরোর সভায় এ নিয়ে আলোচনা চলল। রায় অবিলম্বে হস্তক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দিলেন। তিনি বললেন যে শত্রুকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না, শীঘ্রই হয়তো অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে; তা ছাড়া প্যান ইসলামইজিম আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভবনার প্রতি তাঁর আস্থা-হীনতার পুরোনো যুক্তিরও পুনরুক্তি করলেন। কিন্তু ব্যুরোর অপর দুইজন সদস্য

সৌফারোফ ও সোকোলনিকোভ্ উভয়েই পার্টির নির্ধারিত নীতি যে এ ক্ষেত্রে অচল তা জেনেও ডিসিপ্লিনের জন্যে রায়ের নীতিকে সমর্থন করতে পারলেন না। লেনিন যদিও রায়ের যুক্তিতে অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু পার্টির নীতি তখনো অপরিবর্তিতই ছিল। সেই জন্যে তাঁরাও পার্টির নীতিকেই আঁকড়ে থাকলেন। রায় তখন প্রস্তাব করলেন যে, এখানে যে সকল কমিউনিষ্ট আছেন তাঁদের এ বিষয়ে মতামত দেবার জন্যে ব্যুরোর সভায় ডাকা হোক, এবং বর্তমান সঙ্গীন অবস্থার বিবরণ ও এই সভার মতামত দিয়ে মস্কো থেকে পুনরায় নির্দেশ প্রার্থনা করা হোক।

এই বড় সভার অভিমত প্রায় সমান সমান হয়ে গেল। স্থানীয় কমিউনিষ্ট যাঁরা তুর্কীস্তান সোভিয়েট সরকারের মন্ত্রী স্থানীয় ব্যক্তি, তাঁরা রায়ের পক্ষে মত দিলেন এবং কিছু উচ্চ পদস্থ রুশ কমিউনিষ্টও রায়কে সমর্থন করলেন। তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে, অবস্থা যখন বড়ই সঙ্গীন তখন মস্কো থেকে সংবাদ আসার পূর্বেই রায় বোখারা সরকার ও আফগান সরকারের মনের কথাটা জানবার ভান করে সরাসরি দেখা করুন। তুর্কী বিদ্রোহীরা যে সব ভারতীয় মুজাহিরকে বন্দী করে রেখেছে তাদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রেড আর্মিকে বোখারা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে আফগান সীমান্ত পর্যন্ত যাবার অনুমতি দেবার জন্যে আমীরকে বলা হোক। এনভার পাশার সামনে আফগান য়্যামব্যাসাডারকে জিজ্ঞাসা করা হোক যে, পূর্বের পরিকল্পনানুসারে রায়ের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম অস্ত্র-শস্ত্র ও লোকজন নিয়ে আফগানিস্তান ভারত সীমান্তে ঘাঁটি করা সম্বন্ধে আফগান সরকারের কোন নির্দেশ পেয়েছেন কিনা।

এই প্রস্তাব অনুসারে রায় আফগান য়্যামব্যাসাডার ও এনভার পাশাকে এক ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ করলেন। ভোজ শেষে এনভার পাশা জানালেন যে তিনি শীঘ্রই তাশখণ্ড ছেড়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাবুল যাত্রা করছেন। য়্যামব্যাসাডার জানালেন যে, তিনিও সংবাদ পেয়েছেন যে, রায়ের সকল প্রস্তাবেই আফগান সরকার রাজী; আফগান সরকার রায়ের মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করবার সুযোগ পেয়ে পরম আনন্দিতই হবেন; এই সঙ্গে ভারতের মুক্তি যুদ্ধে আফগান সরকার সাধ্যমত সাহায্য করার অঙ্গীকারও করছে; আফগান সরকার এও জানাচ্ছে যে, রায়ের মত মাননীয় অতিথির পক্ষে গুরুভার সব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এই দুর্গম পথে যাত্রা করা কষ্টকর হবে; সেই জন্যে সেই সব সাজ

সরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র যদি তাশখণ্ডের আফগান এমব্যাসীতে জমা দেওয়া হয় তা হ'লে তা যথা সময়ে যথাস্থানে রায়কে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আফগান সরকারই বহন করবেন।

আফগান সরকারের আশাতিরিক্ত ভাল এই সব প্রস্তাবের মধ্যে যে কেবল প্যাঁচ ও চক্রান্তই আছে তা বুঝতে রায়ের একটুও দেরী হ'ল না। রায়কে একবার আফগানিস্তানে নিতে পারলেই হয়। তখন রায়কে দেখিয়ে আমানুল্লা ব্রিটিশের সঙ্গে দর-কষাকষি করবে এবং দরকার হ'লে বন্দী করে ব্রিটিশের হাতে তুলেও দিতে পারবে। অস্ত্রশস্ত্র ত আগেই হাত হয়ে গেছে। রায় বুঝলেন আফগানিস্তানে ঘাঁটি করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা রূপায়ণের আর কোন আশাই রইল না। আফগানিস্তানকে ব্রিটিশ হাত করে ফেলেছে। কিন্তু সেই কূটনৈতিক ভোজসভায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করা চলবে না। রায় অতিশয় বিশ্বাসীর মতই খুসী হয়ে উঠলেন এবং প্রচুর শুভেচ্ছা ও আনন্দ জানিয়ে সেদিনের মত ভোজসভা সাঙ্গ করলেন।

তারপরই অতি দ্রুতগতিতে নাটকীয় পরিবর্তন সুরু হ'য়ে গেল। কয়েক-দিনের মধ্যে সামান্য কিছু অনুচর নিয়ে বোখারার আমীর বোখারা ত্যাগ করে গোপনে ফরগণা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। এনভার পাশাও তাশখণ্ড থেকে অন্তর্ধান করলেন। কাবুলের সোভিয়েট এমব্যাসী খবর পাঠাল যে, আফগানিস্তান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের দেশ ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে হুকুমজারি করা হয়েছে। এইসব বিপ্লবীরা তৃতীয় আফগান-ব্রিটিশ যুদ্ধের সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সীমান্তের উপজাতিদের ক্ষেপাবার জন্যে ভারত ছেড়ে এসেছিল এবং এতদিন কাবুল সরকারই তাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। ১৯১৬ সালে সেখানে জার্মানীর সহায়তায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে যে ইণ্ডিয়ান প্রভিসনাল গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছিল এঁদের কেউ কেউ সেই সরকারেরও সদস্য ছিলেন!

এইসব ঘটনা প্রায় একই সঙ্গে ঘটে গেল! কিন্তু রায় বুঝলেন যে, শত্রুরা তাড়াতাড়িতে ভুলই করল। কারণ তখনো শত্রুদের আয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠেনি। যাইহোক রায়ের হস্তক্ষেপের পক্ষে আর কোন বাধা রইল না; শত্রুই সে সব বাধা সরিয়ে দিল! রায় অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ সেণ্ট্রাল এসিয়াটিক ব্যুরো ও তুর্কীস্তান রিপাবলিক সরকারের মন্ত্রীদের যুক্তবৈঠক বসল। স্থির হ'ল আমীর যখন চলে গেছে তখন হস্তক্ষেপ চলতে পারে।

সোফারোফ ও সোকোলনিকোভ্ উভয়েই পার্টির নির্ধারিত নীতি যে এ ক্ষেত্রে অচল তা জেনেও ডিসিপ্লিনের জন্যে রায়ের নীতিকে সমর্থন করতে পারলেন না। লেনিন যদিও রায়ের যুক্তিতে অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু পার্টির নীতি তখনো অপরিবর্তিতই ছিল। সেই জন্যে তাঁরাও পার্টির নীতিকেই আঁকড়ে থাকলেন। রায় তখন প্রস্তাব করলেন যে, এখানে যে সকল কমিউনিষ্ট আছেন তাঁদের এ বিষয়ে মতামত দেবার জন্যে ব্যুরোর সভায় ডাকা হোক, এবং বর্তমান সঙ্গীন অবস্থার বিবরণ ও এই সভার মতামত দিয়ে মস্কো থেকে পুনরায় নির্দেশ প্রার্থনা করা হোক।

এই বড় সভার অভিমত প্রায় সমান সমান হয়ে গেল। স্থানীয় কমিউনিষ্ট যাঁরা তুর্কীস্তান সোভিয়েট সরকারের মন্ত্রী স্থানীয় ব্যক্তি, তাঁরা রায়ের পক্ষে মত দিলেন এবং কিছু উচ্চ পদস্থ রুশ কমিউনিষ্টও রায়কে সমর্থন করলেন। তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে, অবস্থা যখন বড়ই সঙ্গীন তখন মস্কো থেকে সংবাদ আসার পূর্বেই রায় বোখারা সরকার ও আফগান সরকারের মনের কথাটা জানবার ভান করে সরাসরি দেখা করুন। তুর্কী বিদ্রোহীরা যে সব ভারতীয় মুজাহিরকে বন্দী করে রেখেছে তাদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রেড আর্মিকে বোখারা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে আফগান সীমান্ত পর্যন্ত যাবার অনুমতি দেবার জন্যে আমীরকে বলা হোক। এনভার পাশার সামনে আফগান য়্যামব্যাসাডারকে জিজ্ঞাসা করা হোক যে, পূর্বের পরিকল্পনানুসারে রায়ের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম অস্ত্র-শস্ত্র ও লোকজন নিয়ে আফগানিস্তান ভারত সীমান্তে ঘাঁটি করা সম্বন্ধে আফগান সরকারের কোন নির্দেশ পেয়েছেন কিনা।

এই প্রস্তাব অনুসারে রায় আফগান য়্যামব্যাসাডার ও এনভার পাশাকে এক ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ করলেন। ভোজ শেষে এনভার পাশা জানালেন যে তিনি শীঘ্রই তাশখণ্ড ছেড়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাবুল যাত্রা করছেন। য়্যামব্যাসাডার জানালেন যে, তিনিও সংবাদ পেয়েছেন যে, রায়ের সকল প্রস্তাবেই আফগান সরকার রাজী; আফগান সরকার রায়ের মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করবার সুযোগ পেয়ে পরম আনন্দিতই হবেন; এই সঙ্গে ভারতের মুক্তি যুদ্ধে আফগান সরকার সাধ্যমত সাহায্য করার অঙ্গীকারও করছে; আফগান সরকার এও জানাচ্ছে যে, রায়ের মত মাননীয় অতিথির পক্ষে গুরুভার সব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এই দুর্গম পথে যাত্রা করা কষ্টকর হবে; সেই জন্যে সেই সব সাজ

সরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র যদি তাশখণ্ডের আফগান এমব্যাসীতে জমা দেওয়া হয় তা হ'লে তা যথা সময়ে যথাস্থানে রায়কে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আফগান সরকারই বহন করবেন।

আফগান সরকারের আশাতিরিক্ত ভাল এই সব প্রস্তাবের মধ্যে যে কেবল প্যাঁচ ও চক্রান্তই আছে তা বুঝতে রায়ের একটুও দেরী হ'ল না। রায়কে একবার আফগানিস্তানে নিতে পারলেই হয়। তখন রায়কে দেখিয়ে আমানুল্লা ব্রিটিশের সঙ্গে দর-কষাকষি করবে এবং দরকার হ'লে বন্দী করে ব্রিটিশের হাতে তুলেও দিতে পারবে। অস্ত্রশস্ত্র ত আগেই হাত হয়ে গেছে। রায় বুঝলেন আফগানিস্তানে ঘাঁটি করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা রূপায়ণের আর কোন আশাই রইল না। আফগানিস্তানকে ব্রিটিশ হাত করে ফেলেছে। কিন্তু সেই কূটনৈতিক ভোজসভায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করা চলবে না। রায় অতিশয় বিশ্বাসীর মতই খুসী হয়ে উঠলেন এবং প্রচুর শুভেচ্ছা ও আনন্দ জানিয়ে সেদিনের মত ভোজসভা সাঙ্গ করলেন।

তারপরই অতি দ্রুতগতিতে নাটকীয় পরিবর্তন সুরু হ'য়ে গেল। কয়েক-দিনের মধ্যে সামান্য কিছু অনুচর নিয়ে বোখারার আমীর বোখারা ত্যাগ করে গোপনে ফরগণা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। এনভার পাশাও তাশখণ্ড থেকে অন্তর্ধান করলেন। কাবুলের সোভিয়েট এমব্যাসী খবর পাঠাল যে, আফগানিস্তান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের দেশ ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে হুকুমজারি করা হয়েছে। এইসব বিপ্লবীরা তৃতীয় আফগান-ব্রিটিশ যুদ্ধের সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সীমান্তের উপজাতিদের ক্ষেপাবার জন্যে ভারত ছেড়ে এসেছিল এবং এতদিন কাবুল সরকারই তাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। ১৯১৬ সালে সেখানে জার্মানীর সহায়তায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে যে ইণ্ডিয়ান প্রভিসনাল গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছিল এঁদের কেউ কেউ সেই সরকারেরও সদস্য ছিলেন।

এইসব ঘটনা প্রায় একই সঙ্গে ঘটে গেল! কিন্তু রায় বুঝলেন যে, শত্রুরা তাড়াতাড়িতে ভুলই করল। কারণ তখনো শত্রুদের আয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠেনি। যাইহোক রায়ের হস্তক্ষেপের পক্ষে আর কোন বাধা রইল না; শত্রুই সে সব বাধা সরিয়ে দিল! রায় অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ সেণ্ট্রাল এসিয়াটিক ব্যুরো ও তুর্কীস্তান রিপাবলিক সরকারের মন্ত্রীদের যুক্তবৈঠক বসল। স্থির হ'ল আমীর যখন চলে গেছে তখন হস্তক্ষেপ চলতে পারে।

বোখারার শাসনশূন্যতাকে নতুন শাসন ব্যবস্থার দ্বারা অবিলম্বে পূর্ণ না করলে বিপদ ঘটবে। বোখারার রেভোলিউসনারি কমিটি অবিলম্বে বোখারাতে গিয়ে পুরাতন শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করুক; এতদিন যে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের কথা প্রচার করে আসা হয়েছে তাকে রূপ দেবার জন্যে এক গণ-সম্মেলন আহ্বান করুক। রায় এই রেভোলিউসনারি কমিটির ও অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা রূপে কমিটির সঙ্গে বোখারা যাবেন।

তারপরই সুরু হ'ল রায়ের অভিযান। রায়ের পরামর্শে রেড আর্মি বোখারা দখল করতে এগিয়ে গেল। বিনা বাধায় তা দখল করে সেখানে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করা হ'ল।

রায় যখন পৌঁছলেন তখন বোখারাতে উত্তেজনা ও অরাজকতার চরম চলেছে। এবার রায়ের ও তাঁর নীতি কর্মপদ্ধতির চরম অগ্নিপরীক্ষার কাল সমাসন্ন হয়ে এল। বোখারা দখল করে তিনি কী কমিউনিষ্ট পার্টির গৃহীত নীতি বহির্ভূত কর্মই করলেন? যদি সাফল্য মণ্ডিত হ'তে পারেন তবেই রক্ষা; নতুবা এই খানেই রায়ের সমগ্র জীবনের সবকিছুর উপর যবনিকা নেমে আসবে! রায় অতি সতর্ক পদ-বিক্ষেপে চলতে লাগলেন।

তিনি প্রথমে দেখলেন যে, বিপ্লবী বাহিনীকে কেউ বাধা দিল না। তখন তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ করলেন এবং তাঁর পরামর্শে রেভোলিউসনারি কমিটিই অস্থায়ী সরকারে পরিবর্তিত হয়ে ক্ষমতা হাতে নিল। কয়েকদিনের মধ্যেই গণ-সম্মেলন আহ্বান করা হ'ল—উদ্দেশ্য স্থায়ী সরকার নির্বাচন। নতুন সরকারের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সবলিত বহু পোষ্টার সহরের দেওয়ালে প্রাচীরে এঁটে দেওয়া হ'ল। লেখা হ'ল: আমীর দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার ফলে তিনি দেশবাসীর নিকট আর কোনই আনুগত্য আশা করতে পারেন না—এখন দেশবাসীই দেশের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে: যে সব জমি এতদিন জমিদারদের ছিল তা নতুন সরকার বাজেয়াপ্ত করল এবং তা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হ'বে: আমীরের ব্যক্তিগত যে বিপুল সম্পত্তি আছে তা জাতীয় সম্পত্তি রূপে গণ্য হবে এবং দেশের মুখ্য ইমাম কর্তৃক তা পরিচালিত হ'বে: কোন মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করা বা শাস্তি দেওয়া হবে না।

রুশ বাহিনী বোখারার বৈপ্লবিক সমিতির অনুরোধেই এসেছে, নতুন সরকার

দেশের শাসনভার নিয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বোখারা ছেড়ে চলে যাবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই গণপরিষদের অধিবেশন বসল: কিছু কিছু মোল্লাও যোগ দিল। কমিউনিষ্টরা যে নাস্তিক এবং শীঘ্রই যে তাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে এই ধারণা যাতে সুরুতেই দূর হয়, সে জন্যে রায় সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। প্রেসিডেন্ট খাজেবকে তিনি আল্লা ও মহম্মদের নামে শপথ নিয়ে ঘোষণা করতে বললেন যে, তিনি কমিউনিষ্ট নন—তিনি অপর সকলের মতই মুসলমান। তাঁকে দিয়ে এ কথাও বলানো হ'ল যে, রুশ সরকার বোখারাতে কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠা করতে চান না। তবে এই নতুন সরকার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে বোখারার জনসাধারণের বৈপ্লবিক পার্টি নামে একটি পার্টি গড়ে তুলতে চান। রায়ের এই যুক্তি এতই হৃদয়গ্রাহী হ'ল যে, নতুন পার্টির সভ্যপদের জন্যে অনেকে তখনই এগিয়ে এল।

সেই সময় নমাজের সময় হওয়াতে নগরের মিনার থেকে আজান শোনা গেল। নতুন পার্টির অনুশাসন অনুসারে সভা ছেড়ে নামাজে যাওয়া চলবে কি না, এই ইতস্ততঃতার মধ্যে রায় উঠে বললেন: "দারিদ্র্য থেকে দরিদ্রদের মুক্তি দানই বিপ্লবের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্মের সঙ্গে বিপ্লবের কোন বিরোধ নাই। সেই জন্যে আমি প্রস্তাব করছি, সভা এখন বন্ধ রেখে সকলে নামাজে যোগ দিক। তবে মুসলমান নই বলে আমি যে নামাজে যোগ দিতে পারছিনে, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করা হোক।"

রায়েক সময়োচিত এই বক্তৃতা শ্রোতাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করল। গণপরিষদ এক বাক্যে নতুন সরকার গঠন করল এবং খাজেভকেই স্থায়ী প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচিত করা হ'ল। বোখারার বৈপ্লবিক সরকারের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রইল না।

অন্যদিকে ব্রিটিশ ও আফগান সরকারের সমর্থনে আমীর ও এনভার পাশা ফরগণার পার্বত্য অঞ্চলে এক সোভিয়েট বিরোধী তুর্কিস্তান সরকার গঠন করলেন। কিন্তু এদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। এরা ভেবেছিল, সোভিয়েট সরকার তাদের চক্রান্তের খবর রাখে না, বা একটু আধটু রাখলেও মুসলিম রাজ্য আক্রমণ যখন সোভিয়েটের নীতি নয় তখন তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণও

সম্ভব হ'বে না; আর বাধা দেবার পূর্বেই তারা তাদের কাজ গুছিয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু রায় যে সকল সংবাদই রাখতেন এবং প্যান ইসলামইজিমের সঙ্গে সোভিয়েটের মৈত্রী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, যে কারণে তাঁর আন্তর্জাতিক বাহিনী ও ব্যুরোর সকল শক্তি ও সংগঠন নিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, সেটি তারা অনুমান করতে পারে নি।

রায় বোখারা দখল করেই ফরগণা আক্রমণ করতে চললেন। এ কাজটি সহজ ছিল না। ফরগণা অঞ্চলের প্রায় ২০০ মাইল সীমান্ত আফগানিস্তানের পাশাপাশি এবং ব্রিটিশ ঘাঁটি চিত্রল ও গিলগিটের সঙ্গে যোগাযোগের পথও অতি সহজ। বিদ্রোহী টার্কম্যানরা খুবই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। রেড আর্মি দুই দলে বিভক্ত হয়ে এদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। এক দল বোখারার মালভূমি থেকে পূর্বাভিমুখে, আর এক দল আন্দিজান থেকে দক্ষিণ দিকে পূর্ব তুর্কীস্তান অভিমুখে যাত্রা করল। শেষোক্ত দল সুউচ্চ পর্বত ডিঙ্গিয়ে ঘুরে গিয়ে শত্রু সৈন্যকে পিছনে থেকে আক্রমণ করবে। প্রথম দল সামনের দিক থেকে আক্রমণ করতেই এনভার পাশা ও আমীরের বাহিনী অনেকটা পিছু হটে গেল। পিছন থেকে দ্বিতীয় দল সহজেই আক্রমণ করে তাদের সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করল। যেখানে এই যুদ্ধটি হ'ল সেখান থেকে ভারত সীমান্ত দূরে ছিল না। এই সুকঠিন অভিযানটির বিজয় উৎসব পালন করা হ'ল "পৃথিবীর ছাদ" পামীরের উপর লাল পতাকা উড়িয়ে। সেই পৃথিবীর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে রায় এক দূরবীনের সাহায্যে ভারত ভূমির পানে চেয়ে দেখলেন মাঝে আফগান রাজ্যের সরু এক ফালি ভূখণ্ড পার হ'লেই তার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ। সামরিক দিক থেকে তিনি এই মুহূর্তে তা অতিক্রম করে ভারত-ভূমিতে পৌছতে পারেন, কিন্তু কূটনীতির দিক থেকে এইটুকু জমিই হ'য়ে উঠল এক অনতিক্রম্য বাধা। ভারতের প্রাক্তন ভাইসরয় এবং তদানীন্তন ব্রিটিশ বৈদেশিক সেক্রেটারি লর্ড কার্জন আফগান রাজ আমানুল্লাকে হাত করে সে সময়ের জন্যে ভারতে বিপ্লবের প্রসার বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই সেদিন ঐ এক ফালি ভূখণ্ডই রায়ের সম্মুখে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে পড়ে রইল। দূরবীন নামিয়ে পিছন ফিরে দেখেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য মৃতদেহের মধ্যে পড়ে আছে ব্রিটিশ অফিসারের পোষাকে সজ্জিত এনভার পাশার মৃতদেহ—প্যান-ইসলাম-বাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার প্রতীক রূপে।

রায়ের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জ্ঞান, সাহস ও দক্ষতা, উদ্যোগ ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের জন্যে ব্রিটিশ, আফগানিস্তান, এনাভার পাশা ও বোখারার আমীরের সম্মিলিত চক্রান্ত ব্যর্থ হ'য়ে গেল। মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট সরকার দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ার পথে আর কোন বাধাই রইল না। মুসলীম ধর্ম গুরুরা যে বিপ্লব বিরোধী শক্তি এবং তাদের রাজ্য আক্রমণ করলে মুসলীম জগৎ সোভিয়েটের ভীষণ ক্ষতির কারণ হবে, এই অহেতুক আশঙ্কা যে অমূলক তা প্রতিপন্ন হওয়ায়, লেনিন যে এক বিদেশী যুবকের প্রতি এতখানি আস্থা স্থাপন করে সেণ্ট্রাল এসিয়াটিক ব্যুরোর মত সংস্থার দায়িত্ব অপাত্রে ন্যস্ত করেন নি, তা প্রমাণ হয়ে গেল। এরপর থেকেই সোভিয়েট রুশিয়ায় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থায় রায়ের মান-মর্যাদা প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা দ্রুত বেড়ে যেতে থাকল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হারেম বাসিনীদের মুক্তি

রায়ের বোখারার কাজ পূর্ব পরিকল্পনানুসারেই শেষ হ'ল। আমীরের সিংহাসনচ্যুতিতে কোথাও কোন বিক্ষোভ ঘটল না। কৃষকেরা জমি পেয়ে খুসী মনে চাষ আবাদে মন দিল। ব্যবসায়ীরা তাদের নানা করভার ও সেলামী থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন সরকারকে সানন্দে গ্রহণ করল। বোখারায় ভূমি বিপ্লব ও ধনতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে ব্যক্তি মানুষকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্বের অধিকার দিয়ে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাল। কিন্তু রায়ের বোখারা ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে এক মহাসমস্যার উদ্ভব ঘটল। সে সমস্যা সমাধানের জন্যে রায়ের উপদেশ প্রার্থনা করা হ'ল।

আমীরের হারেমে চারশ'র উপর পত্নী ও উপপত্নী ছিল। আমীর গেছে, কিন্তু ওরা কোথাও যেতে রাজি নয়। বর্তমান বৈপ্লবিক সরকার এখন ওদের নিয়ে কি করবে। ওদের ভরণ-পোষণও তো আর সামান্য খরচের ব্যাপার নয়। সমস্যা বই কি! রায় ভেবে চিন্তে যুক্তি দিলেন যে, ঘোষণা করা হোক যে আমীরের হারেম ভেঙ্গে দিয়ে মহিলাদের মুক্তিদান করা হ'ল। তারা এখন যেখানে খুসী যেতে পারেন, প্রয়োজন মনে করলে বিবাহ করে নতুন ঘর সংসার বাঁধতেও পারেন। এদিকে সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করা হ'ল যে, যে সৈন্য এই হারেম বাসিনী মহিলাকে বিবাহ করবে সে সরকার থেকে কিছু জমি ও টাকা পাবে।

কিন্তু বিপদ হ'ল, ভীতি বিহ্বলা হারেম বাসিনীরা কোথাও যেতে রাজী নয়। তখন রায় ঘোষণা করলেন যে, কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে এক একজন সৈন্য হারেমে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রী বেছে নিতে পারবেন। কোন প্রকার অশালীন আচরণ যাতে না ঘটে তার জন্যে বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হ'ল। যে সব মেয়েরা চিরকাল পর্দার আড়ালে ছিল, তারা যখন দেখল সুস্থ্য সবল যুবকরা ভদ্রভাবে তাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে, তখন তাদের ভয় দূর হল এবং অচিরেই হারেমও খালি হয়ে গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খোদার সেপাই

রায় বোখারায় এসে শুনলেন যে, একদল ভারতীয় বিপ্লবীকে তুর্কী বিদ্রোহীরা বন্দী করে অক্সাস নদীর তীরে একস্থানে আটকে রেখেছে। অবিলম্বে তাদের মুক্ত না করলে তারা অনাহারেই মারা যাবে। তিনি লাল ফৌজের অধিনায়ককে আদেশ করলেন তাদের মুক্ত করে আনার জন্যে। অধিনায়ক একটি গান বোটের সাহায্যে তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বন্দীদের উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। বন্দীরা তখন লুণ্ঠনে, অনাহারে, অত্যাচারে, অর্ধ নগ্ন ক্ষত-বিক্ষত মৃতপ্রায়। রায় তাদের আহার বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। এরা ভারতীয় খিলাফৎ কমিটির আহ্বানে কামাল পাশার পক্ষে লড়বার জন্যে ভারত ত্যাগ করে এসে বিপদে পড়েছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল গোঁড়া মুসলমান। এরা এসেছিল ধর্ম যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে বেহস্তে গিয়ে অনন্ত সুখের মধ্যে অমরত্ব লাভের লোভে। আর কেউ কেউ এসেছিল আফগান সরকারের মিথ্যা প্রলোভনে বিশ্বাস করে। তাদের মধ্যে যারা রায়ের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা গ্রহণে রাজী হ'ল তাদের নিয়েই তিনি তাশখণ্ডে এলেন।

তাশখণ্ডে তাদের এনে সোভিয়েটের সেই দুর্দিনেও দুষ্প্রাপ্য বাসস্থান, জ্বালানি, গরম কাপড়, জুতো, খাদ্য প্রভৃতি সংস্থান করে দেওয়া হ'ল। কিন্তু রায় বহু চেষ্টাতেও তাদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলেন না। তারা যেমন গোঁড়া মুসলমান ছিল তেমনই রয়ে গেল। তারই মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজন কমিউনিষ্ট হয়েছিল এবং সেই কয়জনেরই অতি মাত্রায় উৎসাহে তখন নামে মাত্র এক ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। এদের মধ্যে মহম্মদ সফিক, সওকৎ উসমানি ও আবদুল্লা সাফদার উল্লেখ যোগ্য। সওকৎ

উসমানি কয়েক বছর পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কানপুরে কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হ'ন। রায়ও এই মোকর্দমারই আসামী ছিলেন। আবদুল্লা সাফদার মস্কো গিয়ে প্রথমে রায় স্থাপিত "কমিউনিষ্ট-ইউনিভার্সিটি-ফর-দি-টয়লার্স-অব-দি-ঈষ্ট" বিশ্ববিদ্যালয়ে ও "ইনসটিটিউট-অব-রেড প্রফেসাস"-এ পড়ে মার্কসবাদে শিক্ষা লাভ করেন। তিনিও পরে একাধিকবার ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত রুশিয়ার যোগাযোগ রক্ষার কাজে ভারতে এসেছিলেন।

এই মুজাহিরদের মধ্যে খুব কম লোকই রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করত। কিন্তু সমরবিদ্যা শেখার ক্লাসে সকলেই যোগ দিয়েছিল। এরা দিনে পাঁচবার নমাজ করত। সেই জন্যে রুশ শিক্ষকরা এদের নাম দিয়েছিল Army of God—খোদার সেপাই।

এদের ধর্মভাব এতই প্রবল ছিল যে, এরা মার্কাসবাদ পড়া শোনার চেয়ে নমাজ পড়তে বেশী ভাল বাসত। সেজন্যেই রুশরা এদের "Army of God—খোদার সিপাই" বলে টাট্টা করত। এদেরই কয়েকজনের দ্বারা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বলে অদ্যাবধি এই সকল অর্ধপক্ক ব্যক্তিগণের প্রভাব ও সংস্কার ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে আছে বলেই ওরা এ পর্যন্ত কোন কালেই ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করবার মত জ্ঞান বুদ্ধি চরিত্রের পরিচয় দিতে পারে নি। মস্কোর সিংহাসনকেই অন্ধভাবে পূজো করে এসেছে। সেই জন্যেই রায় পূর্বেই এদের সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"আমি পিতৃত্বের অপরাধে অপরাধী হলেও ওদের বংশধর বলে স্বীকার করি না—I plead guilty only for the conception but must disown the progeny".

ভারতীয় বিপ্লবীদের সমর বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্যে ইণ্ডিয়ান মিলিটারী স্কুল নামে রায় যে বিদ্যালয় খুললেন, তার উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক উৎসব হল। তাশখণ্ডের বড় বড় কর্তাব্যক্তি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বক্তৃতা দিলেন এবং আশা প্রকাশ করলেন যে, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শীঘ্রই ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে পারবে। সে সময় বিদেশী রাষ্ট্রের বহু গুপ্তচর তাশখণ্ডে ছিল। তা ছাড়া আফগান দূতাবাস ত ছিলই। এ সংবাদ ব্রিটিশ সরকার যথা সময়েই পেলেন। সে সময় রুশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপন করার জন্যে কথাবার্তা চলছিল। বৈদেশিক

বাণিজ্য ছিন্ন হয়ে রুশিয়া খুবই অসুবিধার মধ্যে ছিল। এই সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রুশিয়ার জীবন মরণ প্রশ্নের মতই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ব্রিটিশ যখন তাশখণ্ডের ইণ্ডিয়ান মিলিটারি স্কুলের ব্রিটিশ বিরোধী কাজ কর্মের অজুহাতে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ পুনপ্রতিষ্ঠা করতে অস্বীকার করলেন তখন সোভিয়েট সরকারকে স্কুলটি বন্ধ করে দেবার জন্যে নির্দেশ দিতে হ'ল। বন্ধ এমনিতেই করতে হ'ত। কারণ এদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই ছিল সত্যিকারের বিপ্লবী, বাকী ছিল গোঁড়া অশিক্ষিত লোক।

তখন কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের তৃতীয় কংগ্রেসের সময় আসন্ন। রায়কে মস্কো ফিরতে হবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও রায় চরিত্রের অন্যদিক

আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের বেশ কিছু পূর্বেই রায় মস্কো ফিরে এলেন। তিনিও কর্তৃপক্ষের একজন, প্রস্তুতি পর্বে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। এবার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে, লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিশি নামে রুশিয়ার নতুন অর্থনীতি ও শ্রমিক একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্রে শ্রমিক ইউনিয়ান গুলির নীতি ও পদ্ধতি। এ ছাড়া দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির কার্য বিবরনীর আলোচনা ও মন্তব্য। এই বিষয়টিতে রায়ের মধ্য এশিয়া ব্যুরোর কার্য বিবরণীও থাকবে। রায় এই সকল কাজ কর্মের জন্যে মস্কোতে ফিরে এলেন।

এই সময় রায়কে ঘিরে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে একদিকে যেমন তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তার দিকটি প্রকাশ পেল, অন্য দিকে পাওয়া গেল তাঁর কোমল দরদী সংবেদনশীল হৃদয়ের পরিচয়।

যুদ্ধের সময় বার্লিনে যে ভারতীয় রেভোলিউসনারি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জার্মানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই কমিটির সভ্য বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও আরও বারজন ভারতীয় সে সময় মস্কোতে আসেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, রুশিয়া যাতে রায়ের পরিবর্তে তাঁদেরই ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেন, তার ব্যবস্থা করা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, রায় ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধি নয় এবং তাশখণ্ডে যে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছে সে কমিউনিষ্ট পাটিকেও যেন কোনরূপে স্বীকার করা না হয়।

প্রথমে তাঁরা রায়ের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা লেনিন বা চিচেরিণের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পর্যন্ত লাভ করতে পারেন নি।

লেনিন তাঁদের আবেদন পত্র কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সেক্রেটারি র‍্যাডেক-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁদের এসিয়াটিক ব্যুরোর সদস্য রায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেন—কারণ বিষয়টি তাঁরই দপ্তরের বিবেচ্য বিষয়। তাঁরা তখন বলেন যে, তাঁদের ভারতীয় বিপ্লবের নীতি পদ্ধতি বিষয়ে এক থিসিস আছে। র‍্যাডেক তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা থ্যালহাইমার, ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির টম্ কোয়েলচ্, ও বোরোদিনকে নিযুক্ত করেন।

তাঁদের থিসিস শুনে যখন এই কমিশন দেখলেন যে, এর মধ্যে গুরুত্ব দেবার মত কিছু নাই, তখন থ্যালহাইমার এঁদের জিজ্ঞাসা করেন রায়ের সঙ্গে তাঁরা একযোগে কাজ করতে রাজী আছেন কি না। রায়কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে, রায় বলেন যে, তার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তাছাড়া তিনি কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক-এ ভারতের প্রতিনিধি রূপে যোগ দেন নি, তিনি যোগ দিয়েছিলেন মেক্সিকোর প্রতিনিধি রূপে। আগেই এঁদের মস্কোতে এসে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কাজ কর্মের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁরা তা শোনেন নি। এখন যদি তাঁরা তা করেন তবে তিনি নিজেকে তাঁদের হাতেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করবেন।

এই কথায় বীরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাদের কোন বিবাদ নাই, তাঁর বিরুদ্ধেও তাদের কোন অভিযোগ নাই, তবে অবনী মুখার্জি নামে যে লোকটিকে তিনি প্রশ্রয় দিয়ে রেখেছেন সে লোকটি একটি ব্রিটিশ স্পাই; তারই স্বীকারোক্তির ফলে অনেকে ধরা পড়েছে, দ্বীপান্তরে গেছে, ফাঁসিতে মরেছে।

চট্টোপাধ্যায়ের এই কথায় রায় চমকিত হলেন। অবনীর কথা, অবনীর নিকট থেকে যতটুকু শুনেছেন তার বেশী তিনি কিছুই জানেন না। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে যে লেখা আছে, অবনীর নোট বুকের লেখা থেকে বহু লোককে ধরা হয়েছে, ফাঁসি দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি, তা তখনো রায় জানতেন না। যার নোট বই এত মারাত্মক অথচ সেই লোকটিকে ব্রিটিশ সরকার ফাঁসি বা জেল না দিয়ে সিঙ্গাপুরের সমুদ্রের ধারে বেড়াবার অনুমতি দিলেন এবং তিনিও বেমালুম পালিয়ে এলেন, এ কথাটা সন্দেহ জনক বই কি!

তিনি ধীর ভাবে বললেন, অবনীর উপর তার কোন পক্ষপাতিত্বই নাই এবং সেই সঙ্গে এও বললেন যে, এতদিন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রমাণ দেন নি বা অভিযোগ করে নি। আজ যখন অভিযোগ উঠছে তখন নিশ্চয়ই তা অনুসন্ধান

করতে হবে, কিন্তু যতক্ষণ না প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ একটা মানুষকে কেবল গুজবে বিশ্বাস করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সমীচীন হবে না। তবে সন্দেহ যখন হয়েছে তখন তাকে তাশখণ্ডের কাজ থেকে মস্কোতে এনে তার ওপর নজর রাখা হোক। তাছাড়া তাশখণ্ডের গঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির উপরও তাঁর কোন বিশেষ আকর্ষণ নাই। কারণ এটা তার সৃষ্টি নয় বা তার মতানুসারেও হয় নি। এটি কতিপয় অত্যুৎসাহী নতুন কমিউনিষ্ট যুবকদের দ্বারা গঠিত হয়েছে। তা ছাড়া ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি তাশখণ্ডে বসে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগও রাখতে পারে না বা তাদের পরিচালিত করতে পারে না। অতএব ওটি থাকা আর না থাকা দুইই সমান। তবে যারা গড়ে তুলেছে তারা সেটি তুলে দেবে, কি রাখবে, সেটা তাদের উপর নির্ভর করে।

রায়ের এই কথার পর কারুরই আর কিছু বলবার রইল না। কিন্তু এখানে এটিই লক্ষণীয় যে রায় অবনীর মত একটি তুচ্ছ মানুষকে রক্ষা করার জন্যে নিজের সুনাম, পদ মর্যাদা ও ভবিষ্যৎকে, এক কথায়, তাঁর সমগ্র কর্মজীবনকে ঝুঁকির মুখে দাঁড় করাতে দ্বিধাবোধ করলেন না। বড় হয়ে দেখা দিল একজন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুদণ্ডটা। রুশিয়ায় তখন গোয়েন্দা গিরির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। রায়ের চরিত্রে একদিকে যেমন ছিল সত্যানুসন্ধিৎসা অপর দিকে তেমনি ছিল স্নেহ মমতা, দয়া মায়া, মৈত্রী করুণা, গভীর সংবেদনশীলতা, যা সব বিপ্লবীদেরই কম বেশী থাকে। সেই জন্যেই দেখি, ক্ষমতার শীর্ষে উঠেও পথে দাঁড়াতে তার বাধে নি, মনুষ্যোচিত গুণ বিসর্জনের বিনিময়ে নিজজীবনের উন্নতি সূচক পদোন্নতি করে নিতে, Career গড়ে তুলতেও পারেন নি। রায় চরিত্রের স্নেহ কোমল দিকটির পরিচয় একবার পেয়েছিলাম তাঁর প্রিয় কুকুরের মৃত্যুর সময়, আর এবার দেখলাম অবনীর ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির উপর দৃঢ় নিষ্ঠা।

অথচ এই অবনী কোনদিন রায়কে শান্তি দেয় নি। কেবলই হুকুম অমান্য করে রুশিয়া গুপ্ত পুলিশের সন্দেহ ভাজন হয়েছে এবং রায়কে বাঁচাতে হয়েছে। সর্বশেষ প্রতিদান দিয়েছিল, রায় যখন তাকে তাঁর India in Transition পুস্তক লেখার জন্যে কিছু তথ্য খোঁজার কাজে লাগায়। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ পুস্তকে সাহায্যকারী হিসাবে অবনীর নাম ছাপার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু অবনী তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে যুগ্ম রচয়িতা হবার দাবী করে। এবং এই নিয়ে সে রুশিয়া সরকারের নিকট নালিশও করে। এই ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান হয়।

প্রমাণ প্রভৃতি ও মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যে সন্দেহাতীত ভাবেই প্রকাশ পায় যে অবনীর দাবী মিথ্যা। এই অপরাধের জন্যেও সে দণ্ড পেতে পারত কিন্তু রায়ের অনুরোধে সে ক্ষেত্রেও সে বেঁচে যায়। তারপর রাজনীতি থেকে বিতাড়িত হয়ে তার বাকি জীবন রুশিয়ায় সামান্য এক শিক্ষকতা করেই শেষ হয়।

শেষ পর্যন্ত নলিনী গুপ্ত ও গোলাম লুহানি নামে একজন ব্যারিষ্টারির ছাত্র ছাড়া ভারতীয় বিপ্লবীদের এই দলটি তাদের কোন দাবীই টিকল না দেখে শূন্য হস্তেই ফিরে যান। এদের মধ্যে একমাত্র নালিনী গুপ্তই তখনো বৈপ্লবিক কাজ কর্মে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ভারত থেকে রায়ের পুরোনো বন্ধু ও সহকর্মীদের সংবাদ তাঁকে দেবার জন্যে এঁদের সঙ্গে ভিড়ে মস্কো এসেছিলেন। অপর সকলে যখন গোপনে রায়ের বিরোধিতা করেছে, চক্রান্ত করেছে তখন এই নলিনী গুপ্তই রায়কে সে সব সংবাদ এনে দিয়েছে। তিনি রায়ের অনুরোধে মস্কোতে থেকে গেলেন এবং তারপর থেকে রায়ের নির্দেশে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে লাগলেন ও প্রয়োজন বোধে ব্রিটিশের সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে ভারতে যাতায়াতও করতে থাকলেন।

লুহানি যে রয়ে গেল, প্রথমে রায় তা জানতেন না। লুহানি বোরোদিনের সঙ্গে দেখা করে জানান যে, তিনি বার্লিন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রতি বিরক্ত হয়েছেন। তাই তিনি তাদের সঙ্গে ফেরেন নি। এখন মস্কো আসার জন্যে তাকে ব্রিটিশের কোপে পড়তে হবে। ভারতে ফেরা আর সম্ভব নয়। তাকে একটা কাজ দেওয়া হোক। বোরোদিন তাকে রায়ের কাছে যেতে বলেন। লুহানি জানান যে, রায়ের বিরুদ্ধে যতকিছু নিন্দা কুৎসা ও বিরোধিতা অন্য সকলের মুখপাত্র রূপে তিনিই করেছেন; অতএব রায় তাঁকে কখনোই কোন সাহায্য করবে না। বোরোদিন তাঁকে বললেন যে, তিনি যদি যান তবে তিনি হয়তো একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। লুহানি রায়ের সঙ্গে বাধ্য হয়েই দেখা করলেন, এবং সত্যই এক চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। রায় তার পূর্ব বৈরিতা ভুলে গিয়ে তাকে কমিউনিষ্ট ইনটার-ন্যাশন্যালের ইনফরমেশন বিভাগে একটি চাকরী দিয়ে দিলেন।

এই সময়েই আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লা ব্রিটিশের হুকুমে রুশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করে এবং মৌলানা ওবিদুল্লার ইণ্ডিয়ান প্রভিসন্যাল গভর্ণমেণ্টকেও বিতাড়িত করেন। এই আমানুল্লাই ব্রিটিশ

বিরোধিতার দোহাই দিয়ে সোভিয়েটের নিকট থেকে প্রচুর সাহায্য লাভ করে আসছিলেন। আমানুল্লার সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে রায় যে আফগানিস্তানে ঘাঁটি করে ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টা চালাবার পরিকল্পনা করেছিলেন তা এবার চূড়ান্তরূপে পরিত্যক্ত হল। আমানুল্লা যখন ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজ সিংহাসনকে রক্ষা করতে পেরেছিল এবং ভারতের বিপ্লবীদের এ যাবৎ স্থান দিয়ে এসেছে, মহাজরীণদের জমি দিয়ে বসবাস করার সুযোগ-সুবিধা দানের প্রলোভন দেখিয়ে ভারত ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তখন রায়ের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে তিনি যে সর্বপ্রকার সুবিধা দেবেন এ কথা রায় ভেবেছিলেন। কিন্তু লেনিনের সন্দেহ ছিল। তিনি রায়কে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয় যুদ্ধ মিটেছে, এখন সোনা ও রূপোর গোলাগুলি দিয়ে ব্রিটিশ আফগানিস্তানের সঙ্গে লড়বে। ব্রিটিশের মত রুশিয়ার ঔপনিবেশিক জমিদারী নাই, সুতরাং সোনা-রূপোর যুদ্ধে ব্রিটিশকে সে হারাতে পারবে না—আফগানিস্তান এবার ব্রিটিশের তাঁবে চলে যাবে।

এই অবস্থায় রায় ভারত তথা এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত করার জন্যে তাঁর কর্মকেন্দ্র মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপে স্থানান্তরিত করেন। কারণ পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার যোগা-যোগ ঢের বেশী নিবিড় ও সহজ।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি : তৃতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতি

রায় যখন মস্কোতে ফিরে এলেন তখন দেখলেন, মস্কোর অধিবাসীরা তাঁকে ঠিক আপনার জনের মতই স্বাগত জানাল। ইতিমধ্যে মধ্য এশিয়ার কাজ কর্ম ও বোখারা রাজ্যকে সোভিয়েট শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্বপূর্ণ সংবাদও যথা সময়ে রাজধানীতে সাড়ম্বরে প্রচারিত হয়েছে। সেই জন্যেই মস্কোবাসীরা আজ তাঁকে একজন নিজ দেশের সুসন্তানের প্রাপ্য সম্মানই দিচ্ছে। মধ্য এশিয়ায় রায়ের কাজকর্মের প্রতি এই গুরুত্ব প্রদানের অন্য একটি কারণও ছিল।

বিপ্লবের পর ও সর্বধ্বংসী গৃহযুদ্ধের পর রুশিয়ার সকলে আশা করেছিল ইউরোপে বিশেষতঃ জার্মানীতে বিপ্লব ঘটলে বিপ্লবী জার্মানীর সহায়তায় সোভিয়েটের ভেঙ্গে পড়া শিল্প বাণিজ্যকে পুনর্গঠিত করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু জার্মানীতে বিপ্লবের অসাফল্যে ও পোলাণ্ডে রেড আর্মির পরাজয়ে এবং ব্রেষ্টলিটভস্ক চুক্তি গ্রহণে বাধ্য হবার ফলে সে আশা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। তখন দেশের মনোবল জাগিয়ে রাখা হয় এই বলে যে, অচিরেই এশিয়ার বহু দেশে বিপ্লব ঘটে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহকে দুর্বল করে ফেলবে এবং গঙ্গা ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরেই লণ্ডন-ওয়াশিংটনের পতন ঘটবে। সেই সময়কার অশন-বসনের নিদারুণ কষ্টে জর্জরিত রুশ জনসাধারণ আকুল আগ্রহে এশিয়ার সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করত। সে সময় সংবাদের মত সংবাদ ছিল রায়ের কার্যকলাপ। সেই জন্যেই রায়ের প্রতি মস্কোবাসীর ঐরূপ সহৃদয় সম্বর্ধনা। নানা জন-সভাতে ভাষণ দেবার জন্যে রায়ের নিকট প্রতি নিয়তই সাদর আহ্বান আসতে লাগল এবং এই জন-প্রিয়তার স্থায়ী নিদর্শন মিলল একই সঙ্গে

মস্কো সোভিয়েটের দুটি প্রধান নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে। এর একটি হ'ল প্রেস ওয়ার্কারস্ ইউনিয়ান ও আর একটি হ'ল ক্রাশনা প্রেসনিয়া জেলা নির্বাচন কেন্দ্র। এখানেই ১৯১৭ সালে মস্কো অঞ্চলে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা তোলা হয়। এতদিন নেতাগণই রায়ের গুণগ্রাহী ছিল, এবার রুশিয়ার জনসাধারণও রায়কে তাদের প্রিয় নেতারূপে গ্রহণ করল।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস বসবার আগে রুশিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে। সেই পার্টি কংগ্রেসে এবার লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিশির উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'বে। এই পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে সকল পার্টি কমিটিতেও এই বিষয় নিয়ে খুবই ব্যাপক এবং উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলতে লাগল। রায় এখন আর বিদেশী নন, রুশ পার্টির সভ্য ও মস্কো সোভিয়েটের সদস্য বিধায় রুশ আইন সভারও সদস্য। তিনি এই সব পার্টি কমিটির সভাতেও যোগ দিতেন। এই সব সভাতে নিউ ইকনমিক পলিশির প্রশ্নে তিনি বিরোধী পক্ষ বামপন্থী কমিউনিষ্টদের সঙ্গেই একমত হতেন। তখন এই বামপন্থী কমিউনিষ্টদের নেতা ছিলেন বুখারিণ। মার্কসীয় তত্ত্বজ্ঞানে লেনিনের পরেই এঁর খ্যাতি ছিল। এই সময়ে রায় এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান এবং উভয়েই উভয়ের গুণমুগ্ধ হ'য়ে নিবিড় বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। বুখারিণকে লেনিন বড়ই স্নেহ করতেন এবং এক রকম নিজ মানস পুত্রের মতই দেখতেন। রায়ের বিদ্যাবুদ্ধি ও কাজকর্ম দেখে তাঁর উপরও লেনিনের খুবই স্নেহদৃষ্টি পড়েছিল। ঘরোয়া আলোচনার জন্যে লেনিন প্রায়ই বুখারিণ ও রায়কে ডাকতেন। শেষ পর্যন্ত রায় নিউ ইকনমিক পলিশির তাৎপর্য ও সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা লেনিনের নিকট শুনে তার বিরোধিতা ত্যাগ করেন এবং স্বপক্ষে ভোট দেন।

বিপ্লবের পর সমগ্র রুশিয়ায় ওয়ার কমিউনিজিম চলছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন করছিল না। কাঁচা মালের অভাবে ও মালিকদের বিরোধিতায় কারখানার উৎপাদন বন্ধ হচ্ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই জাতীয়করণ ও ব্যক্তিত্বের এই সমীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে এবং গৃহযুদ্ধের পরিণামে সমগ্র রুশিয়ায় এক মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ব্যক্তির সমষ্টিতেই সমাজ। সমাজের সকল ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সক্রিয়

ফলপ্রসূ সহযোগিতা থাকলেই তবে সমাজ চলে। রুশিয়ায় তখন এটিরই একান্ত অভাব দেখা দিয়েছিল।

লেনিন দেখলেন, জাতীয়করণ ও ব্যক্তিত্বের সমীকরণের ফলে সকল মানুষেরই উদ্যোগ প্রচেষ্টা বন্ধ হ'য়ে গেছে। উৎপাদন নাই, সুষ্টু বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে : সকলেই প্রাণের ভয়ে হুকুম মানতেই ব্যস্ত : প্রাণের ভয়ে নিজ প্রচেষ্টায় কেউ কিছু করতে রাজী নয়, যদি ভুল হয়, শাস্তি পেতে হবে। মানুষের মনের এই অবস্থাই এই মহা দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।

তদুপরি রাষ্ট্রে ও সমাজে সর্বহারার একাধিপত্য ডিকটেটরসিপ অব দি প্রলেতারিয়েৎ শ্লোগানটিই যে বিশ্বের, বিশেষতঃ ইউরোপ আমেরিকার অধিকাংশ মানুষকে ভীত ও কমিউনিজিমের প্রতি একান্তভাবে পরাঙ্মুখ করে তুলেছে, এরই ফলে যে রুশিয়াকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান বন্ধ ক'রে এক ঘরে হতে হয়েছে, সকল দেশের সঙ্গে শত্রুতার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, তাও তিনি বুঝেছিলেন। তিনি বুঝলেন বিপ্লবকে রক্ষা করতে হ'লে এর প্রতিবিধান করতে হ'বে। এই উদ্দেশ্যে তিনি এই নতুন অর্থনীতির প্রবর্তন করতে চাইলেন।

কিন্তু পার্টির সব গোঁড়া মার্কসবাদীরা স্মরণ করতে পারলেন না যে, মার্কস কেবল শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার কথাই বলে গিয়েছিলেন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সম্বন্ধে কোন কথাই বলে যান নি। অতএব তা সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের মধ্যে থেকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রচনা করে চলতে হ'বে। তাঁরা লেনিনের এই গ্রন্থের মধ্যে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জীবনের মধ্যে থেকে সেই সত্য সন্ধানের তাৎপর্যকে ধরতে পারছিলেন না। পার্টির মধ্যে এই নিয়ে খুবই তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা চলতে লাগল। কিন্তু ১৯২১ সালের ১লা মার্চ যে ক্রোনষ্টাডের নৌ-সৈনিকরা, স্থানীয় স্থলবাহিনী ও লেনিনগ্রাদের শ্রমিকরা (যারা ১৯১৭ সালে প্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বালে) ওয়ার কমিউনিজিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের অন্যান্য দাবীর মধ্যে প্রধান ছিল : (১) শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন সমূহের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বিধান; (২) কৃষকের নিজ শ্রমে ও মূলধনের সাহায্যে নিজ জমিতে চাষ করার ও তার ফল ভোগ করার পূর্ণ অধিকার প্রদান; (৩) নিজ প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র শিল্প

পরিচালনার অধিকার প্রদান। যদিও এ বিদ্রোহ দমন করা হ'য়েছিল, তথাপি লেনিনের অনুমান যে মিথ্যা নয় এবং বিপ্লবকে রক্ষা করতে হ'লে যে তাঁর নতুন অর্থনীতি গ্রহণ করতে হ'বে সে সম্বন্ধে পার্টির মধ্যে মনোভাব গড়ে উঠতে লাগল।

রুশ পার্টির দশম কংগ্রেসের অধিবেশনে লেনিনের ব্যক্তিত্বে ও সহজ সরল যুক্তিতে তা গৃহীত হ'লেও বিরোধী নেতারা তা কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের তৃতীয় কংগ্রেসে রুশ পার্টির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করলেন। এখানেও লেনিনের মত শেষ পর্যন্ত সমর্থিত হ'ল।

লেনিনের এই নতুন সংহিতা অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার পুনর্বাসন হ'ল। ব্যক্তিত্বের সমীকরণ প্রচেষ্টা বন্ধ হ'য়ে ব্যক্তির উদ্যোগ প্রচেষ্টার প্রকাশ ও বিকাশের অবকাশ সৃষ্টি হ'ল। রুশিয়ার সমাজ জীবনের অবরুদ্ধ আবহাওয়ার গুমট কেটে গিয়ে মুক্তির বাতাস বইল, মানুষের উদ্যোগ ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে রাষ্ট্র উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে সুরু করল।

বাহির বিশ্ব দেখল, সর্বহারার একাধিপত্য ভয়ানক রকম কিছু নয়। সমগ্র ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও লেবার পার্টি সমূহের আদর্শই কেবল অতি দ্রুততার সঙ্গে আনবার চেষ্টা চলেছে। এই ধনবৈষম্য দূরীকরণ প্রচেষ্টায় ব্যক্তি স্বাধীনতা নষ্ট হচ্ছে না, বরং ধনী শাসিত গণতন্ত্র অপেক্ষা উন্নততর সভ্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। প্রথম প্রথম রুশিয়ায় যে অনাচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার জন্যে দায়ী রাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সমর্থকগণ; তাদের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ ঘটেছে—ঠিক যেমন ঘটেছিল ফরাসী বিপ্লবে। বিদেশী রাজাদের সঙ্গে দেশের রাজা ও রাজতন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্যেই ফ্রান্সে রক্তপাত ঘটেছিল।

আন্তর্জাতিক জগৎ থেকে ধীরে ধীরে রুশিয়ার উপর বিমুখতা হ্রাস পেতে সুরু করল। বিশ্বের বহু সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক ও ইউরোপের শ্রমিক জগৎ রুশিয়ার সমর্থক হ'য়ে উঠতে লাগল।

লেনিনের এই নীতি অনুসারে যদি রুশিয়ায় বিপ্লব চলতে থাকত, তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাস অন্য রকম হ'তে পারত। সত্যিকারের এক আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠে জগৎকে উন্নততর সভ্যতার পথ নির্দেশ করতে পারত! কিন্তু তা হ'ল না!

রুশ পার্টি কংগ্রেসে ও কেন্দ্রীয় সোভিয়েট কংগ্রেসে, আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই নীতি সমর্থিত ও গৃহীত হ'লেও রুশ পার্টির মধ্যে এর বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক বাদ-বিতণ্ডা চলতেই থাকল।

আন্তর্জাতিকের তৃতীয় বিশ্ব-কংগ্রেসে রায়কে সেণ্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরোর কার্য বিবরণী ও সাধারণ ভাবে ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের পরিস্থিতি সম্বন্ধে লিখতে হ'ল, এবং যথা সময়ে লেনিনের কাছে তা পেশও করলেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর থেকে ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বিষয়ে লেনিন রায়ের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তা ইতিমধ্যে অনেকটাই মিটে এসেছে। কিন্তু ভারতে গান্ধীর ভূমিকা সম্বন্ধে তখনো দু'জনে একমত হ'তে পারেন নি। গান্ধী সম্বন্ধে লেনিনের ধারণা ছিল, ইউরোপের মধ্যযুগের বিখ্যাত সব বিদ্রোহীদের মত তিনিও একজন পরোক্ষ ভাবে বিপ্লবী। গান্ধী সম্বন্ধে রায়ের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রায় লেনিনের এ ধারণাকে খণ্ডন করেছিলেন এই যুক্তি দিয়ে যে, গান্ধীর ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শ নিতান্তই প্রতিক্রিয়াশীল, অতএব লেনিনের এ ধারণা যুক্তি সঙ্গত নয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা রূপে তিনি হয়তো পরোক্ষভাবে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করতেও পারেন, কিন্তু একজন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী হ'লেও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল হ'তে বাধবে না—যেমন বাধেনি রুশিয়ার সোশ্যাল রেভোলিউসনারীদের।

লেনিন রায়ের এ যুক্তি আগেও শুনেছিলেন, তখনো শুনলেন; বললেন, যদিও তিনি তখনো রায়ের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না, তবু রায়ের মতকে উড়িয়েও দিতে চান না। আরো কিছুদিন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাক, তখন অভিজ্ঞতার সাহায্যে স্থির করা যাবে সঠিক সিদ্ধান্ত।

তারপর তিনি পার্টির তরফের ঔপনিবেশিক ও জাতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ষ্ট্যালিনের সঙ্গে রায়কে আলোচনা করতে বললেন। অবশ্য তৃতীয় কংগ্রেসের পূর্বে অল্প ক্ষণের জন্যে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে রায়ের দেখা হয়েছিল। তারপর প্রকৃত পরিচয় হল এক বছর পরে। তখন লেনিনের ইচ্ছাক্রমে ষ্ট্যালিন পার্টির সেক্রেটারি হয়েছেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় কংগ্রেস ঃ রায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি

১৯২২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিকের তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। রায় এই কংগ্রেসের সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সভাপতি পদে নির্বাচিত হ'ন। তিনি যে একজন চিন্তা বীর তা দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রমাণ করেছিলেন। এবার ট্রট্স্কির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রমাণ করলেন যে তাঁর মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা এখনো নিঃশেষিত হয়নি।

তৃতীয় কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হয়েছিল ট্রট্স্কির বক্তৃতা। দ্বিতীয় কংগ্রেসে ট্রট্স্কি যোগ দিতে পারেননি। সীমান্তে তখনো তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন। তখন তাঁরই আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিকের তরফ থেকে যে ডেলিগেট দল রণাঙ্গন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে রায় ছিলেন। সে সময় ট্রট্স্কির সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হয়েছিল তা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। ট্রট্স্কির বাগ্মিতা ছিল অনবদ্য। যখন তিনি বক্তৃতা দিতেন তখন পাথরের মূর্তির মতই স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কিন্তু স্থির নিশ্চল মুখ থেকে অনর্গল যে বাক্যধারা নিঃসৃত হ'তে থাকত তা অগ্নিধারার মতই জ্বালামুখী, মানুষকে স্থির থাকতে দিত না। এবারে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন পুরো তিন ঘণ্টা ধরে। কিন্তু কারুরই কোন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না। প্রথমে বললেন, তিনি জার্মান ভাষাতে, তারপর ফরাসী ভাষায়, তারপর রুশ ভাষায়। সকলে সব ভাষা বুঝুক আর নাই বুঝুক, বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে শুনল। এই ভাবে মোট ন'ঘণ্টা ধরে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এমনি ধারা পাষাণ টলানো বক্তৃতার জোরেই তিনি যুদ্ধে পরাজিত নিরুদ্যম দুর্ভিক্ষ পীড়িত ছত্রভঙ্গ সৈন্যবাহিনী থেকে এক সুসংবদ্ধ মহোৎসাহী রেড আর্মি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এবার তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যে, বর্তমানে লেনিনের নির্দেশিত নীতি অনুসারে বিপ্লবকে সাময়িক ভাবে পশ্চাদাপসরণ করতে হচ্ছে এবং তা যথার্থ ই হচ্ছে। যদিও বিশ্ব-বিপ্লবের প্রবক্তা ট্রট্‌স্কির নিজস্ব এ মত ছিল না, তথাপি তাঁকে এই মতই কংগ্রেসে উপস্থিত করতে হয়েছিল। কারণ রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির পলেটিক্যাল ব্যুরোর এই সিদ্ধান্তই ছিল। তিনি এই ব্যুরোর একজন সদস্য হিসাবে সেই সিদ্ধান্তই যুক্তি ও বাগ্মিতা সহকারে কংগ্রেসের নিকট পেশ করলেন। তাঁর বক্তব্যের প্রধান কথা ছিল : পৃথিবীর ধনতন্ত্র যুদ্ধোত্তর সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে ; এর রাজনৈতিক তাৎপর্য হল, অনতিবিলম্বে বিশ্ব বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং মার্কস নির্দেশিত ইতিহাসের কোষ্ঠির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পরবর্তী সংকটের সুযোগের অপেক্ষায় শ্রমিক শ্রেণীকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হ'বে এবং সে সুযোগ আসতেও বেশী বিলম্ব হ'বে না।

ট্রট্‌স্কির এই বিবরণ কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে পেশ করার আগে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের কার্যকরী সমিতির সভায় আলোচিত হয়েছিল। সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে ট্রট্‌স্কির মত যে ভ্রান্ত তা রায় বলেছিলেন। রায়ের বক্তব্য ছিল : ১৯২১ সালেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ হ'ল তার অদৃশ্য রপ্তানি। এটি হ'ল উপনিবেশসমূহে নিযুক্ত মূলধন থেকে প্রাপ্ত লাভ ; যেমন জাহাজ কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি থেকে পাওয়া লভ্যাংশ। এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই ব্রিটিশ বহির্বানিজ্যের লাভ-ক্ষতির তুলনায় লাভের দিকটা বেশী রেখে যাচ্ছিল মূলধন রপ্তানী থেকে প্রাপ্ত এই অদৃশ্য লাভটি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারসাম্য রক্ষার এই কারণটি যুদ্ধোত্তর বৎসর কয়টিতে দ্রুত কমে আসতে আসতে ১৯২১ সালে প্রায় শূন্য অঙ্কে এসে পৌছায়। একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেই অনুমান করা যাবে যে, অচিরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েই চলতে থাকবে।

ট্রট্‌স্কির মূল প্রস্তাবের উপর রায়ের উপরিউক্ত সংশোধনীর এই রাজনৈতিক অনুসিদ্ধান্ত হ'ল যে, ব্রিটেনের এই অর্থ নৈতিক সংকটের ফলে সেখানে শীঘ্রই বিপ্লব ঘটবে। রায় বললেন, তা কিন্তু ঘটবে না ; কারণ বিপ্লব ঘটাবার জন্যে শক্তিশালী কমিউনিষ্ট পার্টি ব্রিটেনে নাই। ট্রট্‌স্কী বা অন্যান্য আরো অনেকের

মত ছিল আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ যুদ্ধ বাধবে। রায় বললেন যে, তা বাধবে না। ব্রিটিশ একই ভাষাভাষী জাতভায়ের সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে বরং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছোট তরফের নিরাপদ অস্তিত্বটাই বেছে নেবে; কারণ পৃথিবীতে ধনতন্ত্রবাদের পক্ষে সেটিই হবে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও শক্তিশালী সংগঠন।

লেনিন ছাড়া তার ভুল ধরতে পারে এমন কেউ যে আছে এ বিশ্বাস যার নাই, সেই অতি মাত্রায় দাম্ভিক ট্রট্স্কী রায়ের তথ্য সম্বলিত যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারলেন না। লেনিনের যুক্তিকেও ট্রট্স্কী মনে মনে সব সময় মানতেন না। কেবল রাজনৈতিক কারণে সর্বাধিনায়ক লেনিনকে না মেনে উপায় থাকত না বলেই মানতে বাধ্য হ'তেন। কিন্তু রায় সম্বন্ধে অন্য কথা। এখানে কোন রাজনৈতিক কারণই ছিল না। কোথায় অজ্ঞাত অখ্যাত বিদেশী রায় এবং যার সম্বন্ধে কুৎসা রটাতেও লোকের অভাব নেই, সেই রায়ের নিকট নতি স্বীকার রেড্ আর্মির সর্বময়কর্তা, লেনিনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী ট্রট্স্কির পক্ষে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু সে অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটল। তার কারণ রায়ের যুক্তি এতই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ছিল যে, তা সকলের নিকটই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল।

ট্রট্স্কী রায়কে আলোচনার জন্যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। রায়ের সঙ্গে ট্রট্স্কীর এটিই প্রথম সামনা সামনি আলাপ, রায় দেখলেন, ট্রট্স্কী কেবল বাগ্মীই নন, একজন অতিশয় ধীমান পুরুষও। ট্রট্স্কী বললেন যে, যারা তাকে সংখ্যাতথ্য সরবরাহ করেছে তারাই এই ভুলের জন্যে দায়ী।

রায়ের সংশোধনী অনুসারে ট্রট্স্কী তাঁর প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সংশোধন করলেন না বটে কিন্তু পরের বছরই তাঁর যে Whither Britain? নামে বিখ্যাত বইটি প্রকাশিত হ'ল, তাতে রায়ের মতটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলেন। এই বইতে তিনি লিখলেন যে, ব্রিটেনকে হয় সোস্যালিষ্ট হ'তে হবে, নতুবা আমেরিকার তাঁবে যেতে হবে।

রায়ের এই মতে আরো সাড়া জেগেছিল। পরে যখন দেখা গিয়েছিল যে, রায়ের অনুমান মিথ্যা নয়—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্য থেকে আর তেমন লাভবান হচ্ছে না, অদৃশ্য রপ্তানি কমে আসছে—তখন অনেকে তাঁকে এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করতে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি গিবনের আদর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কারণের সকল দিক দেখিয়ে,

"Decline and Fall of the British Empire—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন"—নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম সদস্য হিউ র‍্যাথবোনকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্যে সহকর্মীরূপে গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে যখন তিনি ভারত উদ্দেশ্যে গোপনে ইউরোপ ত্যাগ করেন তখন সেই সব তথ্যাদি ও পাণ্ডুলিপি বার্লিনে তাঁর প্রকাশকের নিকট রেখে আসেন। প্রকাশক ছিলেন একজন কমিউনিষ্ট। হিটলার ক্ষমতায় এসে তাঁর দোকানকে পুড়িয়ে দেয়। অন্যান্য সব কিছুর সঙ্গে রায়ের এবং র‍্যাথবোনের কয়েক বছরের পরিশ্রমলব্ধ সৃষ্টিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ১৯২৮ সালের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আলোচিত রায়ের De-Colonisation Thesis ও এই তত্ত্বের উপরই রচিত হয়, সে কথা আমরা পরে বলব।

ট্রট্স্কী কারুর সঙ্গেই ঘনিষ্টভাবে মিশতেন না। কাজের জন্যে কেতা দুরস্ত ব্যবহারই সকলের সঙ্গে করতেন। ব্যতিক্রম ঘটল রায়ের বেলায়। রায়ের সঙ্গে ব্যবহারে ক্রমে ট্রট্স্কী চরিত্রের সেই কঠিন আবরণ ভেঙ্গে পড়ল। ট্রট্স্কী রায়কে স্নেহের চোখে দেখতে সুরু করলেন। রায়ের মতে রুশ বিপ্লবের, লেনিনের পরই, ট্রট্স্কী ও ষ্ট্যালিন দুটি অনুপম অবদান। দু'জনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহান। ষ্ট্যালিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গেও রায়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতে যখন পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে ট্রট্স্কী-ষ্ট্যালিনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধ দেখা দেয় তখন রায় উভয়ের মধ্যে মীমাংসার জন্যে অনেক চেষ্টা করেন। তিনি বুঝেছিলেন উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ববিরোধ চলতে থাকলে রুশ বিপ্লবের ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক হবে। অবশ্য রায়ের প্রচেষ্টার ফল কিছু হয় নি। তারও কারণ ছিল। রায় লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিশি অনুসারে বিপ্লবের যে সম্ভাব্য ছবি দেখেছিলেন, সে ছবি ট্রট্স্কী ষ্ট্যালিন কেউই দেখেন নি। উভয়েই নিজ নিজ মত সম্বন্ধে যেমন ছিলেন আস্থাবান, তেমনই ছিলেন গোঁড়া। অতএব রায়ের মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হ'তেই বাধ্য ছিল, উভয়েই আশা করেছিলেন, রায়কে নিজ দলে পাবেন, কিন্তু রায় কারুকেই সন্তুষ্ট করতে পারেন নি।

এটিও রায় চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য যে তিনি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, লাভ-লোকসান, স্তুতি-নিন্দাকে কোনদিনই নিজ আদর্শের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে

দেন নি। সেই জন্যেই দেখি, বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তিরাও প্রত্যাশিত আশা-ভঙ্গের জন্যে আঘাত পেয়েছেন, ফলে শক্রতে পরিণত হয়েছেন, দুর্ণাম রটনা করেছেন, শক্রতা করেছেন। এ যে কেবল রাজনৈতিক জীবনেই ঘটেছে তাই নয়—ব্যক্তিগত জীবনেও ঘটেছে। তাঁর স্থির অবিচল লক্ষ্য, নির্মম-নিরহঙ্কার impersonal ও detached স্বভাবের জন্যে তাঁর স্ত্রীদের, বন্ধুদের, ভক্তদের অনেক সময়েই চোখের জল ফেলতে হয়েছে।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অস্ত্র নয়—বিপ্লবী মানুষ

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের তৃতীয় কংগ্রেসের পর ঠিক হয়, সেণ্ট্রাল এসিয়াটিক ব্যুরো (তুর্কীস্তান ব্যুরো) তু'লে দেওয়া হবে, পরিবর্তে মস্কোর কেন্দ্রীয় দপ্তরেই একটি প্রাচ্য বিভাগ খোলা হবে। এখান থেকেই ঔপনিবেশিক দেশ সমূহে বিপ্লব প্রচেষ্টা পরিচালিত হ'তে থাকবে। মধ্য এশিয়া থেকে অন্যান্য দেশ সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও বিপ্লব পরিচালনার অনেক অসুবিধা দেখে স্থির হয়, অতঃপর সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহের কমিউনিষ্ট পার্টির সাহায্যেই এই কাজ চালানো হবে। এই প্রাচ্য বিভাগ পরিচালনার ভার প্রথমে রায়কে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি পশ্চিম ইউরোপ থেকে ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টা পরিচালনার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে মস্কোতে থাকা সম্ভব নয় বুঝে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সোফারফের নাম প্রস্তাব করেন।

ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী লর্ড কার্জনকে খুসী করতে তাশখণ্ডের ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেবার যখন সিদ্ধান্ত হয় তখন তার মধ্যে থেকে কিছু ভাল ছাত্রকে ও ভারত তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশের বিপ্লবীদের উচ্চ পর্যায়ের তালিম দেবার জন্যে রায় মস্কোতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। লেনিন রায়ের এই পরিকল্পনা উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করেন।

এতদিন রুশ সরকারের বৈদেশিক শাখার তাশখণ্ড দপ্তর থেকেই এশিয়ার বিভিন্নদেশে বৈপ্লবিক প্রচার কার্য চালানো হ'ত। পশ্চিম ইউরোপ থেকে সেই প্রচার কার্য চালাবার যে পরিকল্পনা রায় করেছিলেন তাতে বৈদেশিক মন্ত্রী চিচেরিণ উৎসাহের সঙ্গেই সমর্থন দিয়েছিলেন।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি ভারতের অসহোযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সংবাদ মস্কোতে পৌঁছতে সুরু করে। এই সংবাদে রুশ কমিউনিষ্টরা সকলেই খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আশা করে যে অচিরেই ভারতে বিপ্লব ঘটবে। চিচেরিণও অনুরূপ আশা করতে থাকেন। অসহোযোগ আন্দোলন, গান্ধীর মতবাদ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে রায়ের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিল তা উল্লেখ করে চিচেরিণ রায়কে অতিমাত্রায় নিরাশাবাদী বলেন। রায়ের যুক্তি শুনে তিনি রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির বোঝার সুবিধার জন্যে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বিবরণ রচনা করতে তাঁকে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে এই বিবরণীতে যেন বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সামাজিক পটভূমিকার সম্যক পরিচয় থাকে। কিন্তু তাশখণ্ডের এসিয়াটিক ব্যুরোর ও সামরিক বিদ্যালয়ের পাট তুলে মস্কোতে ফেরা না পর্যন্ত সুবিস্তৃত রচনা রায়ের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেই জন্যে তিনি এই প্রস্তাবিত বিবরণীর একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করে চিচেরিণের হাতে দেন। তাতে থাকে তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর গঠন, ইতিহাস ও পারস্পরিক সম্বন্ধের বিবরণ এবং অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর যোগাযোগ। এতেই স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বৈপ্লবিক সম্ভাবনার একান্ত দৈন্য। পরবর্তী কালে এই বিবরণীই বিস্তৃত আকারে *India In Transition* নামে প্রকাশিত হয়।

তাশখণ্ডের সামরিক বিদ্যালয় তুলে দেওয়া হ'ল। শতাধিক ছাত্রর মধ্যে থেকে মাত্র বাইশ জন ছাত্রকে মস্কোতে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বেছে নেওয়া হ'ল। বাকি কেউ ভারতে ফিরতে, আর কেউ ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করতে চাইল। তাদের সকলকে প্রয়োজন মত অর্থ দেওয়া হ'ল।

দেড় বছর পূর্বে রায় অনেক আশা নিয়ে মস্কো থেকে মধ্য এশিয়ায় এসেছিলেন। যে অস্ত্র সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন ভারত ছেড়েছিলেন, যতীনদাকে বলেছিলেন, "অস্ত্র না নিয়ে এবার আর ফিরব না," সেই অস্ত্র, অস্ত্র-শিক্ষক, সমর বিশেষজ্ঞ, টাকা-সোনা পর্যাপ্ত পরিমাণেই সঙ্গে নিয়ে এবার পৌঁছেছিলেন। আর সেই সঙ্গে এনেছিলেন রুশিয়ার মত এক শক্তিশালী প্রতিবেশীর অফুরন্ত শুভেচ্ছা, সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা। কিন্তু সে অস্ত্র-সম্ভার গ্রহণের লোক পাওয়া গেল না। যদিও বা কিছু পাওয়া গেল, তারা বিদেশ বিভুঁয়ে ধর্মগুরুর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, পরকালে স্বর্গের লোভে জন্মভূমি

স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ত্যাগ ক'রে দুর্গমের পথে পা বাড়িয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু জন্মভূমির জন্যে, নিজ ঘর-সংসার অন্ন-বস্ত্রের সুখ-শান্তি মঙ্গলের জন্যে তাদের কোনও মাথা ব্যথা নাই। রায় বুঝলেন যে, এই ইহ জীবন বিমুখ আত্ম বিস্মৃত মানুষকে দিয়ে বিপ্লব ঘটানো যায় না। মধ্য এশিয়ায় এই সময়ের মধ্যে রায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তার মূল্য অনেক। সুতরাং রায় তাঁর এই অসাফল্যে হতাশ হ'লেন না। অবিলম্বে ভারতে বিপ্লব ঘটানো গেল না বটে, কিন্তু বিপ্লবের পথ যে আরো সুদূরে তাও যেমন বোঝা গেল, তেমনি তার দিগদর্শনও হয়ে গেল। রায়ের মধ্য এশিয়া অভিযানের এই ত ফল শ্রুতি, এটাই বা কম কি!

রায় বুঝলেন, মানুষকে আগে জীবনমুখীন করতে হবে, বৈপ্লবিক ভাবধারা দিয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে হবে, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, তারপর তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে। তিনি সামরিক বিদ্যালয় ভেঙ্গে দিয়ে মানুষ গড়ার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

পরবর্তী কালে রায় যে জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিজম পুরোনো আদর্শ বলে ত্যাগ করে বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এইরূপ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা আবাল্যের এমনি সব অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর অবচেতন মনে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল। মধ্য এশিয়ার অভিজ্ঞতা রায়কে সেই দিকে আরো অনেকখানি এগিয়ে দিলে।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্লবী মানুষ তৈরির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন

১৯২১ সালের শেষে রায় মস্কোতে ফিরলেন। রায়ের প্রধান কাজ এখন বিপ্লবীদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা। এই ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচনার জন্যে লেনিন রায়কে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছিলেন। কিন্তু ষ্ট্যালিনের অসুস্থতার জন্যে এতদিন সেটা সম্ভব হয় নি। রায় তাশখণ্ডে ফিরে যান। এখন ষ্ট্যালিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ষ্ট্যালিন তখনো পার্টির সর্বময় কর্তা হন নি বটে, কিন্তু পার্টির অন্যতম সেক্রেটারি ও সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব তাঁর হাতে থাকায় এবং লেনিনের সর্বাপেক্ষা বেশী আস্থাভাজন হওয়ায় তখনই পার্টিতে তাঁর প্রভাব হয়ে উঠেছিল সর্বাধিক।

রায় ষ্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করলেন। পূর্বে সামান্য সময়ের জন্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল। লেনিন রায় সম্বন্ধে আগেই তাঁকে জানিয়েছিলেন এবং রায়ের মধ্য-এশিয়ার কাজ কর্মের বিবরণীও তাঁর জানা ছিল। রায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তিনি সমর্থন করলেন। তিনি বললেন যে, রায়কেই এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল ডাইরেকটার হ'তে হবে। রায় দেখলেন, তার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই ষ্ট্যালিন বিচার-বিবেচনা করে দেখেছেন এবং পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করে তুলতে করণীয় ব্যবস্থাও সব করে রেখেছেন। ষ্ট্যালিন এও বললেন যে, প্যান ইসলাম সম্বন্ধে রায়ের ধারণাই ঠিক এবং এও জানালেন যে, লেনিনেরও সেই মত; সেই জন্যেই ত লেনিন তাঁর ঔপনিবেশিক থিসিসের পরিশিষ্ট রূপে রায়ের থিসিস গ্রহণ করেছেন। রায় যে ভারতীয় কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনকে বৈপ্লবিক আন্দোলন রূপে না দেখে ভারতে বৈপ্লবিক পার্টি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের শিক্ষা দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে চান তাও সঠিক সিদ্ধান্তই হয়েছে। এবং এই জন্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখা হয়েছে—The

Communist University for the Toilers of the East—প্রাচ্য শ্রমজীবী কমিউনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

রায় দেখলেন যে, তার থিসিসকে মেনে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করণ করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব আসবে ভারতের শ্রমশীল নরনারীর মধ্যে থেকে, এই নীতি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের সঙ্গে ছিল এই নিয়েই মতভেদ। ভারতীয় বুর্জোয়া-ধর্মীদের নেতৃত্বে যদি স্বাধীনতা আসে তবে ঐ সব ধনী শ্রেণীর হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হ'বে মাত্র, সমাজ বিপ্লব ঘটে জনসাধারণের মুক্তি আসবে না। যদিও এই অভিমত পুরোপুরি গ্রহণ করতে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেস পর্যন্ত লেগেছিল, তথাপি সে দিন ১৯২১ সালের ডিসেম্বরেই ষ্ট্যালিনের কথাবার্তায় রায় বুঝেছিলেন যে, তিনি ভুল করেন নি এবং বলশেভিক পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ক্রমেই তার ভাবেই ভাবিত হয়ে উঠছেন।

ষ্ট্যালিনের সঙ্গে এর পরে রায়ের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠতে থাকে। এর ফলে রায় ইতিহাসের আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে শুধু যে অনেককিছু মূল্যবান শিক্ষালাভ করেছিলেন তাই নয়, নিজেও মাঝে মাঝে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে বিতর্কে সাফল্য লাভ করতেন। লেনিনও যেমন তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনার জন্যে রায় বুখারিণকে ডাকতেন, তেমনি ষ্ট্যালিনও রায়কে ডাকতেন, এবং রায়ের স্বাধীন চিন্তায় তিনি কোনও দিন ক্ষুব্ধ হ'ন নি। রায়ের ধারণা ছিল, পরবর্তী কালে ষ্ট্যালিনের ভক্তরা যদি তাঁর চাটুকারিতা ও স্তাবকতা না করে, সহজ কথা সরলভাবে বলতে পারত, তা হ'লে হয়তো ষ্ট্যালিনের নেতৃত্ব এমনভাবে বিরক্তিকর ও ঘৃণ্য অন্ধ গুরুবাদে পরিণতি লাভ করত না। কিছু দিনের মধ্যেই রায় যে একজন "ষ্ট্যালিনের নওজোয়ানদের" অন্যতম, তা পার্টির মধ্যে রটে গেল।

ষ্ট্যালিনের সঙ্গের এই কয় বছরের সাহচর্যের উল্লেখ করে রায় লিখেছেন :

> "কিন্তু সেই ক' বছরে আমি যে মূল্যবান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তা আমি কখনো ভুলব না। এ সব যদি আমি না পেতাম, তবে হয়তো সেই রকম অর্বাচীন বিপ্লবীই রয়ে যেতাম; বড় জোর এক আধটা পুলিশ বা ইংরেজ মারার উদ্দেশ্যে দু' একটা পিস্তল রাখার পরিবর্তে হয়তো আজকালকার কমিউনিষ্টদের মতই ট্রাম-বাস পোড়াতাম, ট্রাম গাড়ীর যাত্রীদের দিকে এসিড্ বাল্ব ছুঁড়ে মারতাম।" * Ibid, pp, 537—538.

* এখানে রায় ১৯৪৮—৪৯ সালের ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির তেলেঙ্গানা কর্মনীতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এ লেখাটি ঐ সময়েই লেখা। —লেখক

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমেদাবাদ কংগ্রেসে কর্মসূচী প্রেরণ

রায়ের সাক্ষ্যদানের ফলে বোরোদিন জারের রত্ন বিক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে রুশিয়ার পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পোষ্ট্যাল ইউনিয়ান সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে মাদ্রিদ-এ যান। পথে ইউরোপের বিভিন্ন সহরে ভারতীয় সংবাদপত্র বিক্রীত হ'তে দেখেন। রায়কে উপহার দেবার জন্যে তিনি এই সব সংবাদপত্র প্রচুর পরিমাণে কিনে আনেন। ১৯১৭ সালে রুশিয়ায় বিপ্লব হবার পর এই প্রথম ভারতীয় সংবাদ পত্র সেখানে এসে পৌছল। রায়ও কয়েকবছর পরে ভারতীয় সংবাদ পত্র হাতে পেলেন। তাতে দেখলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতার ও নাগপুর অধিবেশনের বিবরণ: অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব, ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ: আইন জীবীদের আদালত বর্জন: আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি সব সংবাদ আছে। এর পূর্বে সামান্য সামান্য সব সংবাদ ব্রিটিশ সংবাদ পত্র মারফৎ পাওয়া গিয়েছিল। এখন সবিস্তারে সেই সব সংবাদ পড়ে রায় দেখলেন যে, এত বড় দেশব্যাপী জাগরণ ও আন্দোলনের পিছনে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও ফলপ্রসূ কর্মসূচী নাই। অসহযোগ আন্দোলন উপায় মাত্র কিন্তু লক্ষ্য কী? স্বরাজের তাৎপর্য কোথাও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না, এবং তার জন্যে কোথাও কোন চেষ্টা বা জিজ্ঞাসাও দেখা যাচ্ছে না। কংগ্রেসের আন্দোলন যে রাজনীতির দিক থেকে একান্তই অপরিণত তা প্রকাশ পাচ্ছে তার শত্রুর সংজ্ঞা নিরূপণে—"ব্যুরোক্র্যাসি—আমলাতন্ত্র"-ই হ'ল কংগ্রেসের শত্রু—ব্রিটিশ নয়। অসহযোগ করলে গভর্ণমেণ্ট অচল হয়ে যাবে, কিন্তু সেই অচল গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তে কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থা চালু হবে সে সম্বন্ধে কারু কোন ধারণাই নাই। রায় তখুনি ধরে নিলেন যে, যদি না এর লক্ষ্যকে একটি নির্দিষ্ট

রূপ দান করা হয় এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে যথাযোগ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয় তবে এধরণের উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন আন্দোলন বেশী দিন চলতে পারে না—স্তিমিত হয়ে আসবে, ঝিমিয়ে পড়বে—তারপরে থেমে যাবে।

তিনি দেখলেন যে এ আন্দোলনের মোটেই কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচী নাই। রাজনীতি সম্বন্ধে অতি ভাসা ভাসা ধারণাই এর কারণ। দেশাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এগিয়ে আসতে পারে, জনতাও গান্ধীর অবতার সুলভ মহিমা প্রচারে মুগ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কিন্তু কতদিন এই ভাবাবেগ স্থায়ী হবে? ক্ষুধার জ্বালা শীঘ্রই মানুষকে পুনরায় সহযোগী হয়ে উঠতে বাধ্য করবে।

রায় দেখলেন যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সারা দেশে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘটেছিল তার ফলে সারা দেশেই একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। গান্ধী সেই চাঞ্চল্যকে তার সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনে কংগ্রেসের লিবারেল নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছেন। ধর্মীয় ভাষা ও ভঙ্গীর সাহায্যে জনগণের মধ্যযুগীয় মনকে জয় করে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ মধ্যযুগীয় ভাবধারাই জনগণের বৈপ্লবিক কাজ কর্মের বিরুদ্ধাচরণ করবে। এবং প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ এক অতিশয় বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করে বিনষ্ট করে ফেলবে।

যুদ্ধ ফেরৎ সৈন্যরা গ্রামে ফিরে আসে; নিয়ে আসে সমরাঙ্গন থেকে যত সব বৈপ্লবিক ভাবধারা ও অভিজ্ঞতা। এরাই ছড়িয়ে দিতে থাকে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন। চতুর্দিকে কৃষক ও গণঅভ্যুত্থান দেখা দিতে থাকে। রুশ বিপ্লবের কথা, শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের কিছু কিছু সংবাদ ভারতে এসে পৌঁছায়। ১৯১৮ সালে অনেক কলকারখানাতেই ধর্মঘট ঘটে। কিন্তু গান্ধী এই সব ধর্মঘটের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কৃষকদেরও তিনি দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে যেতে নিষেধ করেন। ফলে কংগ্রেসের সংগ্রামী শক্তি দুর্বলই থেকে যায়।

রায় কংগ্রেসের এই দুর্বলতা দূর করার জন্যে এক কর্মসূচী প্রণয়ন করার মনস্থ করলেন।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন আমেদাবাদে। এই অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কাগজের মারফৎ দেখলেন যে, তিনি গান্ধীর সঙ্গে

ঠিক এক মত নন। রায় স্থির করলেন, আমেদাবাদ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে তার কর্মসূচীটি গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানাবেন।

লেনিন ও ষ্ট্যালিন রায়ের এই পরিকল্পনা সর্বান্তকরণে সমর্থন করলেন। কর্মসূচীটিতে ষ্ট্যালিন একটু সংশোধন করে দিলেন। কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবীর মধ্যে সুদী মহাজনী প্রথার অবসান দাবী করা হয়েছিল। ষ্ট্যালিন বললেন যে অবিলম্বে এই প্রথার অবসান ঘটান হ'লে, কৃষকরা প্রয়োজনীয় কৃষি-ঋণ পাবে কোথায়? তার চেয়ে সুদের হার কমানোর কথা বলা হোক এবং শতকরা ৬% হার বেঁধে দেওয়া হোক। ভারতের পল্লী অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে রায়ের জ্ঞান এতে খানিকটা বাড়ল, আরো বাস্তব হ'ল।

রায়ের এই কর্মসূচী ছিল বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লবের কর্মসূচী। জমিদারী প্রথার অবসান ও জমির উপর কৃষকের স্বত্বাধিকার অর্পণ; ব্যক্তির সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা। এক কথায় ফরাসী বিপ্লবের অবদানগুলিই এতে দাবী করা হয়েছিল।

ক্ষমতা দখলের কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল, রেল ও কলকারখানা প্রভৃতির সাধারণ ধর্মঘটে একদিনেই দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল করে দিয়ে সরকারকে দাবী গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের সম্মিলিত বিদ্রোহে সরকারের বাধা দান ক্ষমতা সর্বাংশে বিকল করে দেবে।

নলিনী গুপ্ত এই কর্মসূচী সম্বলিত ইস্তাহার বস্তাবন্দী করে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অধিবেশনের পূর্বেই ভারতের বহু প্রতিনিধির হাতে তা পৌঁছে দেন এবং ডাক মারফৎ বহু স্থানে প্রেরণ করেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বেই দেশবন্ধু ধরা পড়েন। আজমীর থেকে দু'জন প্রতিনিধি তাদের নাম দিয়ে এই কর্মসূচী কংগ্রেসের নিকট প্রস্তাবাকারে পেশ করেন। হসরৎ মোহানী এই কর্মসূচী অনুসারেই কংগ্রেসের নিকট পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করেন। কংগ্রেস হসরৎ মোহানীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং হসরৎ মোহানীকে এই অপরাধে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ও এক বৈপ্লবিক কর্মসূচীর ভাবনা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে, যা অবশেষে ১৯২৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ভারতে রায়ের গণবিপ্লব প্রচেষ্টার সুরু

১৯২২ সালে রায় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার কার্যকরী সমিতির বিকল্প সভ্য নির্বাচিত হ'ন এবং ১৯২৪ সালে সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সভাপতি ও সেক্রেটারিয়েটের অন্যতম পূর্ণ ক্ষমতা বিশিষ্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হ'ন। এটিই হ'ল কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সর্বোচ্চ পদ।

রুশের বিপ্লব তখনো দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে নি। গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক অবরোধ তখনো সম্পূর্ণরূপে উত্তোলিত হয় নি। সেই জন্যে রায় প্রথম কয়েক বছর রুশিয়ায় বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। যে কয়জন জগদ্বিখ্যাত বিশিষ্ট নেতা কমিনটার্ন বা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সঙ্ঘকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পুনর্গঠিত করেছিলেন রায় তাঁদেরই একজন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই একমাত্র দৃষ্টান্ত যে, পরাধীন দেশের একজন যুবক বিদেশে গিয়ে কেবল মাত্র নিজ প্রতিভা ও কর্মশক্তির দ্বারা সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি ও জনমণ্ডলীর হৃদয় জয় করে একাধিক দেশের তথা বিশ্বের রাজনীতিতে নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা লাভ করেছেন।

এই সময় রায় ভারতে ফিরতে চান কিন্তু লেনিন বাধা দেন। রায় লেনিনকে জিজ্ঞাসা করেন, রুশিয়া থেকে ভারতের বিপ্লব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করা যখন যাচ্ছে না, তখন তিনি ওখানে থেকে কি করবেন? লেনিন প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতে গেলেই ব্রিটিশ ধরে জেলে রেখে দেবে, তখন রায়ের পথে চলবার মত কতজনকে তিনি পাওয়ার আশা করেন? রায় বলেন, সম্ভবতঃ একজনকেও নয়। তখন তিনি বলেন, "First multiply yourself"—যখন দেখবে জেলে গেলেও

অন্ততঃ দু'শ জন বিপ্লবী থাকবে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে তখন তিনি যেন ভারতে যান, তার আগে যাওয়া বাতুলতা হবে। রায় তখন থেকে সেই চেষ্টাই করতে থাকেন।

পর বৎসর '২২ সালে গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালে রায় দেশবন্ধুর নিকট এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করে বলেন, "কংগ্রেস ব্রিটিশের অধীনে থেকে কিঞ্চিৎ শাসন সংস্কার পেলেই খুসী হয় কিংবা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়—সংস্কার না বিপ্লব-এর একটাকে বেছে নিতে হবে। বিপ্লবের পথে চলার সাহায্য হবে বলেই আইন সভায় প্রবেশ করা যায় নতুবা তা নিছক সংস্কার পন্থাই হবে।" (Repriented in Independent India 30/7/39)

গভর্ণমেণ্ট এই পত্রের কয়েকখানি হস্তগত করেন। রয়টার কর্তৃক প্রচারিত হ'য়ে সকল বড় বড় সংবাদ পত্রই রায় ও দাসের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্রের কথা খুব ফলাও করে ছাপে।

রায় ঐ বছরই জেনিভা থেকে "What we want ?" আমরা কি চাই ? নামে এক পুস্তিকা ছেপে গোপনে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেন, তাতে লেখেন :

আমরা কি চাই ?

আমরা চাই মুক্তি, স্বরাজ, জাতীয় স্বাধীনতা লাভই আমাদের লক্ষ্য।

আমরা স্বরাজ চাই, কারণ আমরা তা হলে সুখে থাকতে পারব।

ভারতের জনগণ দরিদ্র। কোটি কোটি মানুষের বছরের কোন সময়েই ক্ষুধা মেটাবার মতন দু'মুঠো জোটে না, মাথা গুঁজবার মত আচ্ছাদনের অভাব, শীত গ্রীষ্মে গা ঢাকবার আবরণের অভাব—অভাব—আর অভাব।

ভারতে জনগণের এই নিদারুণ অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে আমরা স্বরাজ চাই।

ভারতের জনগণের কেন এই অবস্থা ? কারণ তারা তাদের পরিশ্রমের ফল পায় না।

ভারতের কৃষক জমি চষে, বীজ বুনে, মাসের পর মাস ফসলকে আগলে রেখে বড় করে, পাকায়। তারপরই চলে ভাগ বাঁটোয়ারা। জমিদারের খাজনা দাও, গভর্ণমেণ্টের ট্যাক্স দাও, মহাজনের সুদ দাও,

গোমস্তা-মহুরীর তহুরি দাও, জমিদারের ছেলেমেয়ের বিয়ের মাথট দাও, দাও, দাও। দেওয়া যখন শেষ হ'ল, তখন কৃষকের ভাগে রইল সামনের বারোটা মাস, আর গুষ্টিশুদ্ধ লোকের পেটগুলো।

আমরা এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন চাই। যে মানুষ গম, ধান, জোয়ার, ডাল, কলাই ফলিয়ে সমস্ত দেশের অন্ন সংস্থান করে, তাকে উপবাসী রাখা চলবে না।

আজ যে ভারতের কৃষক অনাহারে দিন গুজরান ক'রে চলেছে, তার কারণ বিদেশী সরকার কর্তৃক ভারত শাসন। তাদের ভারত শাসন করার অধিকারটা জন্মেছে যেহেতু তারা ভারতের মানুষকে শোষণ করে।

কৃষকের এই জীবনের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হ'লে স্বরাজকে এমন ব্যবস্থা করতে হ'বে, যাতে কৃষকের উৎপন্ন ফসল, জমিদার মহাজন ব্যবসাদারদের বড়লোক না ক'রে, কৃষক নিজেই পায়।

সহরের শ্রমিকদেরও অনুরূপ অবস্থা, রায় লিখছেন ঃ

অনশন ক্লিষ্ট শ্রমিকদের উৎপন্ন পণ্যের লাভ থেকে ধনীর ধনই বেড়ে চলেছে। এটা এক প্রকারের দস্যুতা। ভগবান একে কখনো সমর্থন করে না। এ দস্যুতার অবসান আমরা চাই। ভারতের শ্রমিক আর কৃষক না খেয়ে না পরে থাকবে, আর বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত ধনে ধনীরা বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাবে এ চলতে পারে না। এর অবসান হোক, এই আমাদের কাম্য।

স্বরাজ্যের অবশ্য-পালনীয় প্রাথমিক কর্তব্য সম্বন্ধেও অতি পরিষ্কার ভাষায় লিখলেন ঃ

১। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'বে।

২। উৎপাদনের প্রধান উপায়সমূহ, বিশেষতঃ জমি, খনি, কলকারখানা, রেলওয়ে, জলযান ব্যবস্থা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পত্তি হবে এবং এই সকল সংস্থার শ্রমিকদের নির্বাচিত কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত হবে, এবং দেশের বণ্টন ও বাজারের ব্যবস্থা সমূহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীনে থাকবে।

৩। জমিদারী প্রথা লোপ ক'রে কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টিত হ'বে।

আমরা যে এই ব্যবস্থা চাই তার কারণ প্রত্যেক নরনারী যেন নিজ নিজ শ্রমের সম্পূর্ণ ফলভোগী হয়, মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষণের যেন অবসান ঘটে।

এই স্বরাজ পাবার উপায় কি? কার্যক্রম কি? রায় লিখছেন:

পল্লীতে পল্লীতে শোষিত মানুষের সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোল।

আমাদের আশু উদ্দেশ্য হ'ল বিদেশী শোষণের অবসান ঘটান। তা হ'লেই জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হ'তে থাকবে। তারপর শেষ উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষের উপর থেকে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটান। যুগ-যুগান্তর ধরে যারা কেবল খেটে খেটে ধনোৎপাদন করে চলেছে কিন্তু ফলভোগ করতে পারছে না, সামাজিক নানা উৎপীড়নে উৎপীড়িত সে সব শোষণ এবং শাসনের অবসান ঘটান।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে প্রত্যেকের মনে তাদের সম্মিলিত শক্তি সম্বন্ধে, তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। যখন তাদের মন থেকে অদৃষ্টবাদ ও হতাশা দূর হ'য়ে নিজেদের দাবী নিজেরাই লড়াই করে নেবার মত চেতনা জেগে উঠবে তখন তারা নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নেবে। *

* এইখানে লক্ষ্যনীয় যে, রেনেসাঁসের কথা জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৩৭ সালেই তাঁর প্রথম মনে হয় নি, প্রথম থেকেই সে কথা তাঁর মনে ছিল। *India in Transition* গ্রন্থখানা ভারতীয় রেনেসাঁসী লেখার নিদর্শন।
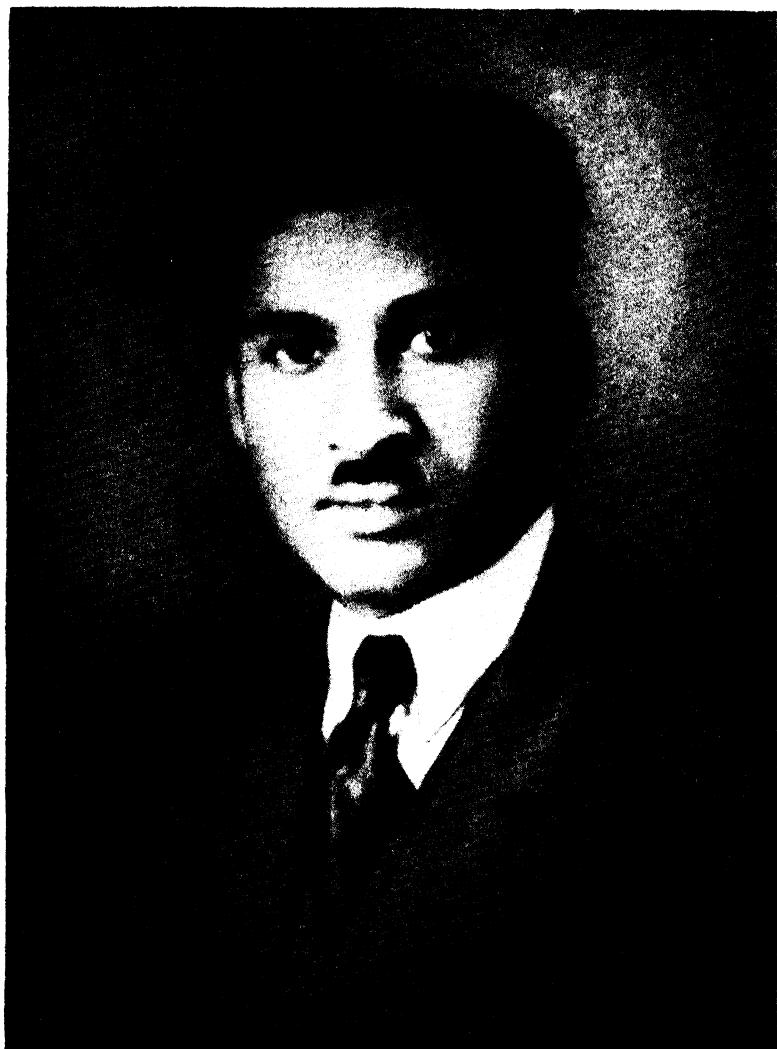
কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের অন্যতম সভাপতি

মানবেন্দ্রনাথ—১৯২৪

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক রায়ের নীতির পূর্ণ সমর্থন ও পদোন্নতি

রায় বিভিন্ন উপায়ে যে ভাবধারা, যে কর্মপন্থা ভারতে প্রচার করতে চাইছিলেন তার প্রধান কথাগুলি কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রায়ের প্রস্তাব অনুসারেই রচিত হয়। তাতে তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে জনগণ তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈপ্লবিক দাবী নিয়ে সম্মিলিত হয়েছে। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব আছে সংস্কারপন্থী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার ধনী ও জমিদার শ্রেণীর হাতে। গান্ধী তাঁদেরই নেতা। ঐ নেতৃত্ব সরিয়ে, জনগণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব স্থাপন করতে হবে। তখনই সম্ভব হবে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ। তখন জমিদারী-মহাজনী প্রথার বিলোপ সাধন করে—কৃষককে জমি দিয়ে তার দারিদ্রের অবসান ঘটান সম্ভব হবে; কলকারখানা খনি ব্যাংক প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে এনে শ্রমিক মধ্যবিত্তের জীবনধারনোপযোগী নিম্নতম মজুরি দেওয়া সম্ভব হবে; এবং কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সোভিয়েটের অনুকরণে সক্রিয় করে গণ-পঞ্চায়েতে রূপান্তরিত করে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান সম্ভব হবে।

এই কর্মসূচীর সর্বপ্রধান অংশ হ'ল, কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সোভিয়েটের অনুকরণে সক্রিয় করে গণ-পঞ্চায়েতে রূপান্তরিত করা এখানে লক্ষণীয়, সেদিনও রায় গণ-পঞ্চায়েতের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর আবাল্য আদর্শের প্রতি তিনি কোনদিনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ন নি। সর্বাঙ্গীন মুক্তির কামনা সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে এই আশাতেই তাঁর কমিউনিষ্ট হওয়া। তিনি দেখেছিলেন যে, বিকশিত ব্যক্তিত্বের সাধনার পথে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বাধা আছে তা অপসারিত হবে ব্যক্তি মানুষের হাতে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক

ক্ষমতা এনে দিয়ে এবং তা সম্ভব হবে মার্কস কথিত সমাজতন্ত্রের সাহায্যে। মার্কসের বাণী যে "ব্যক্তি মানুষই মানব সমাজের মূল"—"সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজও মুক্ত হবে ;" সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, "মুক্ত মানুষের স্বেচ্ছাবৃত সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে; সকলেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলবে; একটি নতুন সংস্কৃতি, নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে;" * সেই বাণী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই তা—সার্থক হয়ে উঠবে। তখন মানুষ তার পল্লীতে বসেই প্রত্যক্ষ-ভাবে সোভিয়েট বা গণ পঞ্চায়েৎ মারফৎ রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতে পারবে।

রায়ের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, ব্যক্তি মানুষের বিকশিত হ'য়ে উঠবার পথের বাধা দূর করার প্রচেষ্টাই তিনি আজীবন করে গেছেন। যতদিন ভেবেছিলেন, প্রত্যয় স্থাপন করতে পেরেছিলেন, যে কমিউনিজিমের সাহায্যে এ কাজ হবে, উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ হবে, ততদিন তিনি মার্কসবাদী ছিলেন। যখন দেখলেন, না তা হ'বে না, তখনি তিনি আত্ম-জিজ্ঞাসায় বসলেন—কেন তা হ'বে না তার কারণ খুঁজে বের করতে। বে'রও করলেন। মার্কসবাদী দর্শনে গোড়ায় গলদের জন্যেই মার্কসের যে আদর্শ—তা পূর্ণ হবে না। মার্কসের পদ্ধতিই মার্কসের আদর্শকে পেতে দেবে না, তা তিনি বুঝলেন। তিনি মার্কসবাদ পরিত্যাগ করে শেষ জীবনে মার্কসের ভুল ত্রুটি মুক্ত এক জীবন দর্শন দিলেন, যাতে ব্যক্তি মানুষের বিকশিত হ'য়ে উঠবার সব বাধা দূর করা সম্ভব হ'বে। নাম দিলেন—নব-মানবতন্ত্র (New Humanism)।

১৯২১-২২ সালে তুর্কীস্তানে থাকাকালীন রায় আফগানিস্তান ও ইরানের মধ্যে দিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে একেবারে পশ্চিম ইউরোপে চলে যান। প্রথমে জুরিখ, পরে এনেসি এবং শেষে প্যারিসে তাঁর কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপন করেন। সেখান থেকে জাহাজের খালাসি ও যাত্রীদের সাহায্যে ভারতের সঙ্গে ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশ-সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হয়।

---

* "Man is the root of mankind"—"...society will be free by freeing everyone of its members." that the social order will be "the voluntary association of free men, all contributing to the mutual subsistence and mutual progress ; there will be a new culture, a new civilisation. The human race will open a new chapter in its history."—Marx

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসে, রায়ের, "উপনিবেশে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন" বিষয়ক প্রস্তাবটি "ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিসন" নামক পুস্তকে যে তিনি সুন্দর ভাবে লিখেছেন সে কথা আমরা বলেছি। ১৯২২ সালে জেনেভা থেকে এটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং পাণ্ডিত্য ও মৌলিকত্বের জন্যে সর্বত্রই বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। পৃথিবীর বহু ভাষাতে এর অনুবাদ হয়েছিল, এই পুস্তকের জার্মান সংস্করণটিই এক বৎসরের মধ্যে তিনবার ছাপা হয় এবং একলক্ষ পুস্তক বিক্রয় হয়। এদেশে রায়ের সমস্ত পুস্তক ও পত্র পত্রিকা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রচার বন্ধ থাকে না। এর কিছুদিন পরে ***Aftermath of Non Co-operation*** পুস্তকখানি গোপন পথে এদেশে প্রচারিত হয়।

১৯২৪ সালের কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক সংঘের পঞ্চম বিশ্ব-সভায় রায় পুনরায় একটি থিসিস পেশ করেন। ১৯২০ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে রায়ের বিকল্প থিসিস গৃহীত হ'লেও সেই সঙ্গে লেনিনের থিসিসও যে গৃহীত হয়েছিল সে কথা আমরা বলেছি। লেনিনের থিসিসে ছিল, জাতীয় ধনীরাও বৈপ্লবিক শ্রেণী। রায় গত চার বছর ধরে সেই ধারণার বিরুদ্ধে লড়ে আসছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারেন নি। এই না পারার ফলে ভারতে বা অন্যান্য উপনিবেশ ও অধীন দেশে বৈপ্লবিক কর্মপন্থাও ঠিকমত নির্দেশিত হচ্ছিল না। ১৯২৪ সালের পঞ্চম কংগ্রেসে তিনি সফলকাম হ'লেন। রায়ের কথাতেই বলি :

> দেশীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবী শ্রেণী, সেই হেতু, কমিউনিষ্টরা অবশ্যই তাদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এই ধারণকে দূর করতে আমার ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সময় লেগেছিল। তারপর চার বছর ধরে সঠিক পথে চলবার পর আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) কৃষক-শ্রমিক দুই শ্রেণীর নীতি গ্রহণের ফলে কমিউনিষ্ট নীতির পেণ্ডুলাম পুনরায় বামে ঢলে পড়ে।

তারপর আন্তর্জাতিকের সপ্তম বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশনে ষষ্ঠ কংগ্রেসের নীতি পরিত্যক্ত হ'লেও নতুন নীতির পেণ্ডুলাম যে শীঘ্রই আবার চরম দক্ষিণে ঘুরে যাবে সে আশঙ্কাও তিনি করেছিলেন। *

* "Up to 1924, I had to combat the idea that the nationalist bourgeoisie was a revolutionary class and therefore the communists must make an alliance with them.

"After four years of fruitfully correct policy, the pendulum swung towards extreme leftism. [পরপৃষ্ঠায়]

এরপর রায়ের খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি প্রচুর সম্মান লাভ করেন। ষ্টালিন, ট্রটস্কি, বুখারিন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিও অন্যতম বলে গণ্য হন। তিনি মস্কো সোভিয়েটের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরে রেড আর্মির এক বিশেষ রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার নিযুক্ত হন।

এই সময়ে লেনিনগ্রাদের সিকিউরিটি প্রেস কর্মচারীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে রায় লেনিনগ্রাদ সোভিয়েটেরও সভ্য নির্বাচিত হ'ন।

রুশিয়ায় সে সময় গভীর রাত পর্যন্ত দপ্তরে দপ্তরে কাজ চলত। কাজের শেষে ক্লান্ত নেতাদের অনেকে এক কো-অপারেটিভ্ ক্যান্টিনে মিলিত হ'তেন, পান-ভোজনের সঙ্গে আড্ডা জমাতে। কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের বহু বিদেশী নেতাও এসে জুটতেন। বুখারিণ, র‍্যাডেক প্রভৃতিও আসতেন। নাচ-গান চলত। রায় যদিও এর কোনটাতেই পটু ছিলেন না, তবু এই আসরে রায় না থাকলে জমত না।

প্রাচ্য দেশসমূহে বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্যে, ইউরোপ থেকে প্রথমে Vanguard, পরে Masses ও Advance Guard পত্রিকার দ্বারা ভারত প্রভৃতি ঔপনিবেশিক দেশসমূহে তাঁর প্রচার ও সংগঠনী কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। প্রধানতঃ তিনি জোর দেন, জনগণের মধ্যে রাজনীতি শিক্ষা বিস্তারের উপর। ভারতে যুক্তিবাদী রাজনীতির প্রবর্তন করে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে তিনি প্রচার কার্য চালাতে থাকেন।

কিন্তু গান্ধীজির মিষ্টিসিজিম ও ইনটুইসন তখন সারা ভারতে অগ্রাধিকার লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ চৌধুরী ছাড়া সেই যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সারা দেশকে পরিচালিত করার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে আর কারুর সাহসও হয় নি, ইচ্ছাও হয় নি। সেই সময় রায়ের দ্বারা প্রচারিত প্লেখানভের কথাটি, "Not masses for the revolution but revolution for the masses, বিপ্লবের জন্যে জনগণ কেবল আত্মাহুতিই দেবে

When that happend, I was afraid that before long the swing may be again to the other direction.

What was feared is actually happening to day. We are again (1938) hearing about the 'revolutionary role of the nationalist bourgeosie.' I do not know if the leaders of the C. I. have actually reverted to this view. Some of their Indian followers however are preaching it to day (Vide—M. N. Roy. *Our Differences* (1938) Saraswati Library, Calcutta. pp 42)

না, বিপ্লব জনগণের হাতে রাজক্ষমতা এনে দেবে" বিপ্লবী যুবকদের মুখে মুখে ফিরেছে। কিন্তু শুধু ঐ পর্যন্তই। না গান্ধীবাদী নেতারা, না বিপ্লবী দাদারা কেউই তখন যুক্তিবাদী রাজনীতির ধার মাড়াতেন না। ফলে একটি যুগ ধরে তরুণ বিপ্লবীরা যুক্তিবাদী রাজনীতি শিখতে পারল না। এক দিকে চলল গান্ধীজির পূজা। আর এক দিকে চলল মস্কো প্রচারিত সু-সমাচারের অনুসরণ। এই কর্তা ভজা রাজনীতির ফল যা হ'ল তা পরবর্তী যুগের সারা ভারতের জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে চলেছে।

১৯২৩ সালে ভারত সরকার সওকৎ উসমানি ও মুজাফর আহমদ নামক দু'জন কমিউনিষ্টকে রায়ের সঙ্গে যোগ সাজসে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে গ্রেপ্তার করে। রায়কে না পাওয়ার জন্যে তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট ঝুলতে থাকে।

অন্যদিকে রায়ের ক্রমাগত প্রচার ও নানা প্রকার চেষ্টার ফলে, কংগ্রেসের মধ্যে একদল বিপ্লবী শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই দাবী ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদী রাজনীতি জ্ঞানের অভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার কর্মসূচী পেশও হয় নি, গৃহীতও হয় নি। তৎ-পরিবর্তে দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস সেবী থাকা সত্ত্বেও নিজেদের অক্ষমতা হেতু গুরু গান্ধীজির উপর স্বাধীনতা লাভের জন্যে উপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়নের সকল ভার অর্পিত হয়ে এসেছে। তারপর গান্ধীজির লবণ আন্দোলন ও এর পরিণতির ইতিহাস সকলে জানেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রায়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অভাবে বৈপ্লবিক কর্মসূচী এতদিন কংগ্রেসের মধ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নি। চিঠিপত্রের সাহায্যে ও পরোক্ষ প্রভাবের দ্বারা বেশী কিছু আর হচ্ছিল না।

রায় যে-সকল কমিউনিষ্টকে রুশিয়ায় ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিপ্লবের কলা-কৌশল শিখিয়ে ভারতে পাঠিয়েছিলেন তারাও বিশেষ কিছু করে নি। তাদের নিজেদেরই যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান এতই কাঁচা ছিল যে তাদের দ্বারা কিছু করা সম্ভব ছিল না। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র থেকে দেখা যায়, মুজাফর আহমদ ভারতীয় কমিউনিষ্টদের নেতা হিসাবে রায়ের সঙ্গে যে সব পত্রালাপ করেছেন তাতে সংগঠনের কোন সমস্যা বা রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণের কোন কথা নাই, আছে মাত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরো বেশী

টাকা পাঠাবার কথা। সেদিনকার কমিউনিষ্টদের পরিচয়ের জন্যে এই নমুনাই যথেষ্ট। এদের দ্বারা আর বেশী কী আশা করা যেতে পারত।

রায় পশ্চিম ইউরোপে থাকা কালীন জার্মানী ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে তিনি প্রথমে জার্মানী পরে সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স থেকেও বহিষ্কৃত হ'ন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

লেনিনের অকালমৃত্যু ও ষ্ট্যালিনের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা

এই সময়েই লেনিন আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হ'লেন এবং কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মারা গেলেন। একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল। পৃথিবীতে এক তমসাচ্ছন্ন যুগান্তর ঘটল।

সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে ব্যক্তি মানুষের মুক্তির আদর্শ লাভের যে প্রচেষ্টা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে, কত মনীষী, কত দার্শনিক কত উপায়, কত পদ্ধতি বলে গিয়েছেন, যে উদ্দেশ্যে রেনেসাঁস ও বিদগ্ধ যুগের (Age of Enlightenment) অবদানের অসম্পূর্ণতা দূর করবার অঙ্গীকার নিয়ে মার্কসের আবির্ভাব, সেই মার্কসেরই উত্তর সাধক অনাবিষ্কৃত দেশের অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, ভুলচুক সংশোধন ক'রে ক'রে সঠিক পথে চলে সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি না দিয়েই Man is the root of mankind মন্ত্রকে রূপায়িত করে তুলবার পূর্বেই অবসর নিলেন।

লেনিনের শূন্যস্থান পূরণ করলেন ষ্ট্যালিন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে এক অন্ধকার যুগ নেমে এল। সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে ঘুরে গেল। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা গ্রাস করার উদগ্র লালসায় লেনিনের নতুন সংহিতার সকল ব্যবস্থা ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে একেবারে বন্ধ করে দিলেন। শুধু কেবল রুশের কমিউনিষ্ট পার্টিকেই নয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থাকে কুক্ষিগত করে সারা দুনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিকেও কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা লিপ্সার প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগালেন।

ষ্ট্যালিনের আবির্ভাবে মার্কসের উদ্দেশ্য, লেনিনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। এর পরের ইতিহাস সবাই জানেন। পুনরায় রুশ সর্বহারার একাধিপত্যের

বিভীষিকা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। ইতালি, জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম-বিরোধিতার অঙ্গীকার নিয়েই ফ্যাসিজিমের অভ্যুদয় ঘটল। ক্রমে সারা জগতের প্রতিক্রিয়াশীলরা একযোগে সভ্যতার সকল অবদানকে, ব্যক্তির মুক্তির আদর্শকে নিঃশেষে শেষ করবার জন্যে সংঘবদ্ধ হ'ল। সমগ্র বিশ্বের মানুষ আগুনে পুড়ে, রক্ত সাগরে সাঁতরে ও ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধে জিতেও হয়তো কূল পাবার সম্ভাবনা থাকত না, যদি না ষ্ট্যালিন মারা যেতেন। লেনিনের মৃত্যুর পর, যে তমসাচ্ছন্ন যুগের সুরু হয়েছিল, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে সেই যুগের অবসান ঘটল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের ব্যর্থ চীন অভিযান

ষ্ট্যালিনের ক্ষমতা লালসার আগুনে রুশ বিপ্লবের সকল নেতাকেই মরতে হয়েছিল। সেই লালসার বহ্নি রায়কে দগ্ধ করতে না পারলেও স্পর্শ করতে ছাড়ল না। এর আগে স্বাভাবিক ভাবেই রায়ের উপর চীন সমস্যা সমাধানের এক গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে। সে সময় চীন এক বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই সন্ধিক্ষণে চীন কমিউনিষ্ট পার্টিকে পথ নির্দেশ করার দায়িত্ব ছিল কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের। এ যাবৎকাল চীনের জাতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব করে আসছিল কুও-মিন-টাং দল। কমিউনিষ্টরা কুও-মিন-টাং-এর সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলছিল। এর ফলে কমিউনিষ্টরাও বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই সহযোগিতা ঘটেছিল এই নীতির উপর যে, এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ত তন্ত্র বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। সুতরাং ধনী, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক এই চার শ্রেণী এক যোগে এই বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্যে লড়ে চলবে। এই নীতি অনুসারে চীনের কমিউনিষ্ট পাটিকে কুও-মিন-টাং-এ যোগ দেবার জন্যে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক থেকে পূর্বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মস্কো থেকে মাইকেল বোরোদিনকে পাঠান হয়েছিল প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পরামর্শ ও নির্দেশ দেবার জন্যে। এই সঙ্গে পাঠান হয়েছিল একদল সামরিক পরামর্শ দাতা। ১৯২৬ সালের প্রথম দিকেই এই মৈত্রী বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে এবং মার্চ মাসে চিয়াং কাই শেক অতর্কিতে বহু কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করেন। তখন প্রশ্ন জাগে, এর পরেও কী কমিউনিষ্ট পার্টি কুও-মিন-টাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে, কী চলবে না। কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের মধ্যে এই প্রশ্নে গভীর মতভেদ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়, সহযোগিতা

চলতে থাকবে, তবে সে সহযোগিতা বিশেষ করে কুও-মিন-টাং-এর মধ্যে যে বামপন্থী শক্তি আছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু এতেও সমস্যা মেটে না। তখন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে ১৯৬২ সালের নভেম্বরে কমিউনিষ্ট ইনটার-ন্যাশন্যালের কার্যকরী সমিতির পূর্ণ অধিবেশন বসে (সপ্তম অধিবেশন) এবং একটি নতুন থিসিস গ্রহণ করা হয়। এই নতুন নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল চীনে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই অধিবেশনে রায়কে কমিনটার্ণের অন্যতম সভাপতি রূপেও পুন নির্বাচিত করা হয়। এ সম্বন্ধে রায় তাঁর, ***Revolution and Counter Revolution in China*** (1931) গ্রন্থে লিখেছেন :

> ১৯২৬ সালের নভেম্বরে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের-এর কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে চীন সমস্যা সম্বন্ধে এক নতুন থিসিস গ্রহণ করা হয়। এই থিসিসের মূল বক্তব্য ছিল যে অতঃপর চীন বিপ্লব কৃষি বিপ্লব রূপেই গড়ে তুলতে হবে। চীন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের ও আন্তর্জাতিকের চীনা প্রতিনিধির মত ছিল ভিন্ন। পূর্বের মতই তাদের অভিমত ছিল যে, ধনীদের সঙ্গে মিলে মিশেই চলতে হবে—শ্রেণী সংগ্রাম বাড়তে দিয়ে জাতীয় সংহতিকে ব্যাহত করা চলবে না।। আমি একাই কেবল ভিন্ন মত পোষণ করছিলাম। আমার মত ছিল যে, চীন বিপ্লব তখন এমন এক সঙ্গীন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে অবিলম্বে এক নতুন পথ বেছে নিতে হবে, আর কুও-মিন-টাং-এর সহযোগিতা করার অন্ধ অভ্যাস ত্যাগ করতে হ'বে। কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের কার্যকরী সমিতি আমার মতই গ্রহণ করে। প্রথমে ষ্ট্যালিনের এতে মত ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনিও আমার নীতি সমর্থন করেন এবং আমার রচিত এই থিসিস কার্যকরী সমিতি গ্রহণ করে। এর পরই আমি চীন অভিমুখে যাত্রা করি।

ভ্লাডিভষ্টকের পথে রায় ক্যাণ্টন অভিমুখে যাত্রা করেন। সহযাত্রী ছিলেন, ফরাসী কমিউনিষ্ট নেতা দোরিও ও জার্মান নেতা টম্ ম্যান। এরা নিখিল চীন ট্রেড ইউনিয়ান সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যাচ্ছিলেন। রায় পৌঁছবার পূর্বেই কমিনটার্ণের নতুন চীন নীতির সংবাদ চীনে এসে পৌঁছেছিল। এই বিষয়ে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির সঙ্গে মস্কোর গভীর মতভেদ হয়।

অনেকেই কৃষি বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিল না। এই অবস্থায় রায়ের পক্ষে নতুন নীতি গ্রহণ করানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি বোরোদিন; তাঁর হাত দিয়েই রুশ সাহায্য বিতরিত হ'ত। সুতরাং চীন কমিউনিষ্ট পার্টির উপর তার প্রভাব ছিল অসামান্য। তিনিও নতুন নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ ক্যাণ্টনে অপেক্ষা করার পর রায় কুও-মিন-টাং-এর সদর দপ্তর হ্যাঙ্কাও অভিমুখে রওনা হ'ন। প্রথমে ঠিক ছিল, এরোপ্লেনে যাবেন, কিন্তু এঞ্জিন খারাপ হওয়ায় পাঁচ সপ্তাহ ধরে তাঞ্জামে চড়ে যেতে হয়।

১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল রায়ের দল চাঙ্গসাতে পৌছেন। সেখানে তিনি হুনান প্রাদেশিক সরকার এবং কৃষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন সমূহের দ্বারা অভ্যর্থিত হন। এই ঘটনার বর্ণনায় এক কুও-মিন-টাং পত্রিকা লেখেন :

> বৃষ্টি সত্বেও লক্ষ লোক কমিনটার্ণ প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করে। আজ গভর্ণমেণ্ট মিঃ রায়কে এক ভোজ সভায় আপ্যায়িত করছেন। তিনি আজ মধ্য রাত্রিতে এক স্পেশাল ট্রেনে হ্যাঙ্কাও রওনা হবেন এবং প্রাতে সেখানে পৌছবেন। কৃষি মন্ত্রী মিঃ তান পিং-সান মিঃ রায়ের সঙ্গে থাকছেন। *

রায়ের সঙ্গে বোরোদিনের মত পার্থক্য হচ্ছিল বিপ্লবের গতি-পরিণতির ব্যাপার নিয়ে। বিপ্লব ব্যাপকতর হবে, না গভীরতর হবে। বোরোদিনের অভিমত ছিল, বিপ্লব ব্যাপকতর হোক। রায় চাইছিলেন, বিপ্লব গভীরতর হোক। বোরোদিন চাইছিলেন, কুও-মিন-টাং-এর বামপন্থী দলের উত্তর অভিযানকে কমিউনিষ্টরা সমর্থন করুক এবং পিকিং দখল না করা পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লব স্থগিত থাকুক। পক্ষান্তরে রায়ের অভিমত ছিল "উত্তর অভিযান অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল।" তিনি সতর্ক করে দেবার জন্যে বলেছিলেন : "এই মুহূর্তেই আমাদের চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হ'বে। তা না করে আমরা ছুটেছি এক অজানা দেশে। সেখানে সম্ভবতঃ তার মত অনেক শত্রুর সঙ্গেই লড়তে হ'বে।" এই বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাণশক্তি আসবে কৃষি বিপ্লবের নামে। চীন বিপ্লবকে যদি জয়লাভ করতে হয়, তবে তা একমাত্র কৃষি বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই ঘটবে, নতুবা তা মোটেই ঘটবে না। বোরোদিন ও চীন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের মতের বিরুদ্ধে রায় বললেন, বৈপ্লবিক

* Vide—Robert North—*M. N. Roy's Mission to China.*

শক্তিকে সংগঠিত, কেন্দ্রীভূত ও দৃঢ়ভিত্তিক করে তুলতে হ'লে প্রথমতঃ কৃষি-বিপ্লবের উপর জোর দিতে হ'বে; দ্বিতীয়তঃ পল্লীতে কৃষকদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে; তৃতীয়তঃ এমন এক বৈপ্লবিক বাহিনী গড়ে তুলতে হ'বে, যে বাহিনী কার্যত কৃষি বিপ্লব সফল করে তুলবে।

এই মত বিরোধের মীমাংসার জন্যে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন বসে ১৯২৭ সালের মে মাসে হ্যাঙ্কাওতে। দীর্ঘ আলোচনার পর রায়ের মতকে সমর্থন করেই এক প্রস্তাব গৃহীত হল বটে, কিন্তু তাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হ'ল না। শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীন কাজকর্মেও বাধা দেওয়া চলতে থাকল এই অজুহাতে যে, এর দ্বারা বামপন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে। তথাপি বহু কৃষক-বিদ্রোহ ঘটতে লাগল। তারা কমিউনিষ্টদের নিকট থেকে কোন সমর্থনই পেল না। বামপন্থীদের পরিচালিত সৈন্যদলই এই সব কৃষক বিদ্রোহ নির্মম ভাবে দমন করে চলল। এই সময় যদি কমিউনিষ্টরা সাহসের সহিত দৃঢ়তার পরিচয় দিত, তা হলে হয়তো ঘটনার স্রোত বিপরীত দিকে ফিরতে পারত। রায় অনেক সাধ্য-সাধনা করে চললেন, কিন্তু কারও কানেই সে কথা ঢুকল না, কোন ফলই ফলল না। অবশেষে তিনি ষ্ট্যালিনের শরণাপন্ন হ'লেন এবং নতুন নীতি অনুসারে বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণের জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ পাঠাতে অনুরোধ করলেন। রায়ের কথা মত ষ্ট্যালিনও টেলিগ্রাম করে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে টেলিগ্রামেও কোন কাজ হ'ল না। বোরোদিন টেলিগ্রামকে "ludicious—জঘন্য" বলে অভিহিত করলেন এবং ষ্ট্যালিনকে উত্তরে জানালেন, "Orders received. Shall obey as soon as we can do so—নির্দেশ পাওয়া গেছে। যখন সম্ভব হবে তখনি তা প্রতিপালন করা হবে।"

এর পরই শেষ পর্যায়ের পালা সুরু হ'ল। কুও-মিন-টাং-এর বামপন্থীরা বলল, কমিউনিষ্টরা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে নিজেরাই কৃষকদের বিদ্রোহের পথে উত্তেজিত করে তুলছে। ষ্ট্যালিনের টেলিগ্রামকে তারা এই অভিযোগের প্রমান স্বরূপ তুলে ধরল।

চীন কমিউনিষ্টদের বামপন্থীদের সম্বন্ধে স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। কিন্তু অপরাধের বোঝা কে আর নিজের ঘাড়ে বইতে চায়। চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ও বোরোদিনের দলও তা চাইল না। তারা রায়ের ঘাড়েই সে দোষ চাপাতে চাইল। তারা বলতে সুরু করল, রায় ষ্ট্যালিনের টেলিগ্রামের কপি বামপন্থী নেতা ওয়াং চি উইকে দিয়েই বামপন্থীদের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের মিতালিটা ভেঙ্গে

দিলেন। এবং এই কথা এমনি তারস্বরে প্রচার করতে লাগলেন যে, রায়ের নামের সঙ্গে এই দুর্নামটা স্থায়ী হ'য়ে গেল। রায়ের কথা, রায়ের চেষ্টা, কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের নব-বিধানের কথা কেউ আর জানল না।

এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯২৭ সালে, প্রায় উনচল্লিশ বছর পূর্বে। তারপর মহাকাল ইতিহাসের অনেক পাতা লিখে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন গবেষক রায়ের জীবনী ও কার্যাবলী নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁরা রায়ের চীন অভিযান সম্বন্ধে বহু কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করে এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে সব কথাই স্পষ্টভাবে জানা গেছে। *

ওয়াং চি উইকে ষ্ট্যালিনের টেলিগ্রাম দেখানো একটা অজুহাত মাত্র। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে বামপন্থীদের সম্পর্ক তার অনেক পূর্ব থেকেই তিক্ততায় ভরে উঠেছিল। বামপন্থীরা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে আর চলতে চাইছিল না। পরিবর্তে তারা চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে তাদের বিরোধ মিটিয়ে তার সঙ্গেই হাত মেলাবার চেষ্টা করছিল। এই সময়েই চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে তাদের মিটমাট হয়ে যায় এবং কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাদের যুক্ত অভিযান সুরু হয়। কুও-মিন-টাং থেকে কমিউনিষ্টদের বিতাড়িত করা হয়, বহু কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হয়, কতককে হত্যা করা হয়। বামপন্থী বন্ধুদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অবশিষ্টদের পালিয়ে বাঁচতে হয়। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। বোরোদিন ও অন্যান্য রুশ পরামর্শ দাতাদের চীন ত্যাগ করার আদেশ জারি করা হয়। রায় জুলাই মাসের শেষে বা অগাষ্টের প্রথমে হাঙ্কাও ত্যাগ করেন। কমিনটার্ণ তিনটি বড় টুরিং মোটর গাড়ির ব্যবস্থা করে। রুশ গুপ্ত পুলিশ G. P. U-এর কর্মচারীরা এই গাড়ি মোঙ্গোলিয়ার মরুভূমির মধ্যে দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ানে নিয়ে আসে।

রায় মস্কো' ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কমিনটার্ণ সভাপতি মণ্ডলীর ও রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সম্মিলিত কমিশনের বৈঠকে চীন সম্বন্ধে রায়ের রিপোর্ট গৃহীত হয়। ষ্ট্যালিন রচিত এক প্রস্তাবে রায়কে তাঁর সঠিক কাযকলাপের জন্যে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

---

* Robert C. North and Xenia Eudin,—*M. N. Roy's Mission to China* Published by University of California Press 1963.

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ষ্ট্যালিনের লালসা বহ্নির বলি

রায় চীন থেকে ১৯২৭ সালের জুলাই-অগাষ্ট মাসে ফিরে দেখলেন, রুশিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। লেনিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যেটি এতদিন অপ্রকট ছিল, তা এখন ট্রট্স্কী-ষ্ট্যালিনের দ্বন্দ্বে প্রকট হয়ে উঠেছে। ট্রট্স্কী চীন কমিউনিষ্ট পার্টির বিপর্যয়ের সব দোষ ষ্ট্যালিনের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।

ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে ট্রট্স্কিকে পরাজিত করতে হ'লে একদিকে যেমন রুশ পার্টির মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন প্রয়োজন তেমনি কমিনটার্ণেরও সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কমিনটার্ণে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব তখন সামান্য নয়।

কুও-মিন টাং-এর হাতে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির পরাভবের জন্যে বোরোদিন ও চীন কমিউনিষ্ট পার্টি রায়কে Scapegoat করে তাঁর ঘাড়েই সব দোষ চাপাচ্ছিলেন। ষ্ট্যালিন চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন লাভের আশায় রায়ের বিরুদ্ধে আনীত ঐ পার্টির অভিযোগে সায় দিচ্ছিলেন। কিন্তু রায়ের নীতিতে তাঁর নিজেরই সমর্থন ছিল বলে প্রকাশ্যে রায়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলা হ'ল না।

অক্টোবর মাসে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টিতে ষ্ট্যালিন নিজ সমর্থকদের সাহায্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেন এবং ট্রট্স্কী ও জিনোভিয়েভ্‌কে পার্টি থেকে বিতাড়িত করেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেন দুই উপায়ে।

তিনি দেখলেন, উগ্র বামপন্থাই হ'ল দল ভারি করার সর্বোত্তম পন্থা। যারা ভেবে চিন্তে পথ চলে তারা মধ্যপন্থা গ্রহণ করে এবং সাধারণতঃ তারা হয় সংখ্যায় অল্প। সংখ্যায় হয় তারাই বেশী যারা উত্তেজনার বশে ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে

চলে—তারা ভাবে কম। তারাই উগ্র বামপন্থী কর্মসূচী গ্রহণ করতে চায়। লেনিনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এতদিন তারা বাধ্য হ'য়ে নিরস্ত ছিল। লেনিনের *Left Wing Communism Is An Infantile Disorder* এদের থামাবার জন্তেই লেখা। ষ্ট্যালিন এদের সমর্থন পাবার জন্তে প্রথমে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থা ও পরে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টিতে উগ্র বামপন্থা গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয়তঃ দেখলেন সকলের মধ্যেই কমবেশী ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, দলাদলি, রাগদ্বেষ, ঝগড়া মারামারি আছে। সুবিধামত বেছে বেছে, কিছুকে যদি তুষ্ট করা যায়, অধিক সংখ্যককে খুশি করতে যদি কিছু সংখ্যককে চেপে দেওয়া যায়, তা হ'লেও কিছু সমর্থক বাড়ে। তাতে যদি অন্যায় করতে হয়, বন্ধুকে, সৎলোককে, কাজের লোককে বিসর্জন দিতে হয়, তবে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তা দিতে হবে। কারণ end justifies the means ; আর তিনি ছাড়া নেতা হবার মত যোগ্যতাই বা কার আছে ?

এই দুই উপায়ে তিনি রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেন। রায় এই অযৌক্তিক উগ্র বামপন্থা গ্রহণের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিসির উদার নীতি জাহান্নামে যেতে বসেছে। তিনি বুঝলেন, এ সময় উগ্র বামপন্থা কমিউনিষ্ট পার্টিকে পুনরায় একঘরে করে ফেলবে। জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ফ্যাসিবাদকে যদি ঠেকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে নিয়ে ফ্যাসিবিরোধী ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে হবে। উগ্র বামপন্থা এ নীতির বিরোধী।

রায়ের এই নীতির জন্তে তাঁর শত্রুরা এবার সুযোগ নিলেন। তাঁরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ষ্ট্যালিনকে সমর্থন করার মূল্য দাবী করলেন—রায়ের ক্ষমতালোপ, রায়ের পদচ্যুতি, রায়ের বিতাড়ন।

রায় যে কেবল ষ্ট্যালিনের সহকর্মীই ছিলেন তাই নয়, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বও ছিল। ক্ষমতার লোভে ষ্ট্যালিন যে কেবল লেনিনের নিউ ইকনমিক্ পলিসি ত্যাগ করলেন তাই নয়, বৈদেশিক নীতিতেও উগ্র বামপন্থা গ্রহণ করলেন এবং ক্ষমতা লিপ্সার এই উদগ্র কামনানলে সব আত্মীয়তা, বন্ধুতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-নীতি ভদ্রতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কোটি কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাসে, চোখের জলে,

রক্ত স্রোতেও সে কামনানল নিভল না। যত দিন তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর ক্ষমতার আসন নিষ্কণ্টক করতে এক দিনের জন্যেও এই দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল, রক্তের স্রোত বন্ধ হয় নি।

বাল্যকালের অনুশীলন ধর্মের দীক্ষা রায়ের চরিত্রে অতি গভীরে প্রবেশ করেছিল, যার ফলে সততা তাঁর চরিত্রের প্রধানতম লক্ষণ হয়ে ফুটে উঠেছিল। এই সব অন্যায় সমর্থন করার জন্যে ষ্ট্যালিনকে তিনি যে শেষ পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি ষ্ট্যালিনের নীতির মধ্যে যে সততার একান্ত অভাব তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। *

ষ্ট্যালিনী কমিউনিজিমের কথা রুশিয়ার লোক ভোলে নি—ভুলবে না। কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় সে সুযোগ একবার এসেছিল। তারা ভেবেছিল, হিটলারের সাহায্যে ষ্ট্যালিন রাজের অবসান ঘটাবে। তাই তারা প্রথম আক্রমণের সময় লড়ে নি, ইচ্ছা করে ধরা পড়েছিল দলে দলে, ত্রিশ লক্ষের উপর রেড আর্মি হিটলারের হাতে ধরা দিয়েছিল। তাদের নেতা হয়ে জেনারেল ভ্লাসভ হিটলারের কাছে দশ লক্ষ বন্দী রুশ সৈন্য চেয়েছিলেন ষ্ট্যালিনের সঙ্গে লড়বার জন্যে। হিটলার পাঁচ লক্ষ দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন রুশিয়ার লোক দেখল যে, হিটলার সমগ্র রুশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, বন্দী সৈন্যদের অতি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করা হচ্ছে, তখনই রুশিয়ার দিক থেকে সংগ্রাম সুরু হ'ল এবং সুরু হ'ল হিটলারের পতন। হিটলার যদি নিজে মানুষ হ'ত, যদি বন্দীদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার করত, তা হ'লে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস অন্যরূপ হ'তে পারত। জেনারেল ভ্লাসভের রেড্ স্কোয়ারে ফাঁসি হয়েছিল, পরিবর্তে হয়তো ষ্ট্যালিনের ফাঁসি হ'তে পারত।†

---

*M. N. Roy—*New Orıetatıon*

† Vide—International Military Tribunal—*Trial of the Major War Criminals.*

(Nuremberg, 1948, XXIX pp 117—122

যুদ্ধে নৃসংশ অত্যাচারেব অপরাধে যে সব নেতৃ স্থানীয় নাৎসিদের বিচার নুরেমবার্গে হয় তাতে যে সকল দলিল পত্র পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে জেনারেল ভ্লাসভ ও রুশিয়ায় ষ্ট্যালিন বিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছে। তাব মধ্যে David J Dallin প্রণীত *The New Soviet Empire* (New Haven : Yale University Press 1951) দ্রষ্টব্য। Mr. Dallin লিখছেন :

"All the latent hatred of the regime—indignation at the Collectivization of the land, the purges, arrests, inquisitions,

তথাপি রুশিয়া ভোলে নি। রুশিয়ার মানুষ যে সে কথা ভোলে নি, সে কথা জানত একটি মানুষ—ক্রুশ্চেভ। একেই তিনি মূলধন করলেন তাঁর পদোন্নতির জন্যে। সমগ্র রুশিয়ার এই ক্ষুব্ধ মনকে খুশি করে দিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে এক বক্তৃতায়। সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার মিলল। রুশিয়ার জন সাধারণ তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি একে একে পদচ্যুত করলেন, অন্তরীণ করলেন এবং একচ্ছত্রাধিপ হলেন। একমাত্র মূলধন, ষ্ট্যালিন নিন্দা। কবর খুঁড়ে ষ্ট্যালিনকে বের করা এই নিন্দার চরম পরিণতি—রুশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্যের সিংহাসনের জন্যে রুশিয়ার জনসাধারণকে উপযুক্ত মূল্যদান। রুশিয়ার মানুষ খুশী হয়ে গেছে। *

রায় সবই বুঝলেন, তাঁর সুতীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যৎও খানিকটা দেখতে পেলেন। বুঝলেন, যে মতের জন্যে তিনি এতদিন বহু প্রশংসা পেয়েছেন, লেনিন প্রমুখ কত না মহা-মণীষীর গুণ মুগ্ধ মিত্রতা পেয়েছেন, সেই মতের জন্যেই এবার তাঁকে দুঃখ পেতে হবে। ক্ষমতার লোভ, প্রাণের ভয় তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে

---

deportations and shootings—suddenly erupted. Whole armies surrendered within a few weeks ; in a short time the Germans had rounded up two million prisoners. This was a rebellion led by Communists against Stalin's Communism. What had occured was a split in the Communist ranks probably the only form of political change could have taken under the repressive conditions of the Soviet Union." (pp 65—75)

এ ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিও এই সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করেছে :

1. *The Kremlin Vs. The People* (1953) by Robert Magidoff (Doubleday & Coy, Inc. Garden City, Newyork.

2. *It Takes a Russian to Beat a Russian*—Life ; December, 1949 ; pp 81.

3. *Piercing The Iron Curtain* by Lowell M. Clucas Yale Review, Summer 1950—pp 616

4. "*Vlasov and Hitler*—George Fischer—Journal of Modern History.

5. *Thirteen Who Fled*—Louis Fischer—(Newyork Harpert Bros. 1949.

*ক্রুশ্চেভের পদচ্যুতি জন সাধারণ ঘটায় নি। জন সাধারণ তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পদচ্যুতি ঘটিয়েছে সহকর্মীরা ; তাও আরো বেশী গণতান্ত্রিক (collective leadership) হবার অজুহাত দেখিয়ে। প্রকৃত পক্ষে কৃষকের খাস জোতের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং আবাসিক শিক্ষায়তনের পরিবর্তে পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে রেখে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ে নীতি গ্রহণের দ্বারা সেটা সমর্থিতও হচ্ছে।

পারল না। তিনি তাঁর মতে অটল রইলেন। ষ্ট্যালিনের সর্বময় কর্তৃত্ব তিনি মেনে নিলেন না। উগ্র বামপন্থার বিরোধিতা সমান তীব্রতার সঙ্গেই করতে লাগলেন।

রায় ক্ষমতার লোভে মার্কসবাদ গ্রহণ করেন নি। ব্যক্তি মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথের বাধা দূর করবার পদ্ধতি ও কর্মসূচী এই মতবাদে আছে এই বিশ্বাসেই তিনি কমিউনিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতাই যদি চলে গেল, ভিন্ন মতাবলম্বী হবার অপরাধে যদি ট্রট্স্কী, জিনোভিয়েভ প্রমুখ চিন্তাবীর ও কর্মবীরদের পার্টি থেকে বিতাড়িত হ'তে হয়, তা হ'লে এই পদ্ধতি ও কর্মসূচীতে ব্যক্তির বিকাশের পথের বাধা দূর হবার অঙ্গীকার কোথায়?

অথচ রায়ের বিরুদ্ধে বে-সরকারীভাবে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির বিপর্যয়ের জন্যে রায়কেই দোষী সাব্যস্ত করে কুৎসা রটনা চলতে থাকল।

ভারতে ফেরার পর জেল থেকে বেরিয়ে তিনি যখন প্রত্যক্ষভাবে কর্মক্ষেত্রে নামেন, তখনো ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি এই নিয়ে কুৎসা রটনা করে চলে। এর জবাবে রায় তাঁর "চীনে আমার অভিজ্ঞতা (*My experiences in China*) পুস্তিকাটি লিখেন.। পুস্তিকাটি ভারতে ১৯৩৮ সালে ছাপা হয়।

তাতে তিনি এই সব কুৎসা রটনাকারীদের চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন:

> Finally to expose the mendacity of the whispered propaganda carried on against me in this Country, I Challange the liars to produce one single sentence from any official document of the Communist International bearing out the charge they bring against me.—কুৎসা রটনকারী এই মিথ্যাবাদীদের আমি আহ্বান করছি তারা আমার বিরুদ্ধে যে সব মিথ্যা রটনা করে বেড়ায় তার সমর্থনে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার সরকারী কাগজ-পত্রে যদি কিছু থাকে তা বের করুন।

আজ পর্যন্ত কেউ এ আহ্বানে সাড়া দেয় নি। বরং মস্কো থেকে অফিসিয়াল কমিউনিষ্ট আনা লুই ষ্ট্রং ১৯৩৬ সালে লিখিত, চায়নার কোটি কোটি মানুষ—*Chinese Millions* নামক গ্রন্থে রায়ের সমস্ত কথা লিখে ঐসব মিথ্যা কুৎসা রটনার তীব্র প্রতিবাদ করে গেছেন। তা ছাড়া গত কয়েক বছর ধরে

বিশ্বের অনেক বিশ্ববিত্থালয় রায়ের কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ও তাঁর মতবাদ সম্পর্কে গবেষণার জন্যে ডক্টরেট্ ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিত্থালয়ের Hoover Library-তে রায় সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র, দলিল, পুস্তক-পুস্তিকা, ছবি প্রভৃতি সংগৃহীত হচ্ছে। জার্মান সরকার কমিউনিষ্ট কার্যকলাপকে খুব খারাপ চোখেই দেখতেন। সেই জন্যে তাঁরা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার খবরাখবর রাখতেন। হিটলারের পতনের পর জার্মান সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তর আমেরিকার হাতে পড়ে। সেখান থেকে যে সব দলিলপত্র আমেরিকায় আনা হয় তার মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার অনেক দলিল ও কাগজপত্র পাওয়া যায়। এই সকল কাগজপত্র বিশ্ববিত্থালয় সমূহের ছাত্রদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। সে সব কাগজপত্র থেকে এখনও পর্যন্ত এমন কিছুই পাওয়া যায় নি, যাতে রায়কে নিন্দাভাজন হ'তে হয়।

মস্কোতে কয়েকদিন থাকার পর রায় তাঁর সদর দপ্তর বার্লিনে ফিরে যান। তিনি সেখানে বসেই কমিনটার্ণের নিকট তাঁর চীনের কার্যাবলীর বিবরণী লেখেন। এই সময়েই তিনি চীন সম্বন্ধে তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ *Revolution & Counter Revolution in China* লিখতে সুরু করেন। এই গ্রন্থের জার্মান সংস্করণ ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা হিটলারের কোপাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর ইংরাজি সংস্করণটি ১৯৪৫ সালে ভারতে প্রকাশিত হয়। চীন সম্বন্ধে রায়ের রিপোর্ট রুশ ভাষায় ১৯২৯ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। রায়কে সে পুস্তকের কপি দেওয়া হয় নি। একটিমাত্র কপি আমেরিকার এক লাইব্রেরি থেকে পাওয়া যায়। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিত্থালয়ের ররাট নর্থ ও জেনিয়া ইউডিন এর ইংরেজি অনুবাদ তাঁদের *M. N. Roy's Mission to China* পুস্তকে ছেপেছেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কমিনটার্ণ কর্তৃক রায়ের ঔপনিবেশিক নীতি পরিত্যক্ত

রায় চীন থেকে ফেরার পর প্রায় এক বৎসর কমিনটার্ণের নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজেই লিপ্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ, সেই সময়ের এক বৎসর কাল পূর্বে শ্রীমতী এভলিনের সঙ্গে রায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। এর কারণ লেখকের অজ্ঞাত। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার নিজস্ব প্রতিনিধিরূপে ব্রুসেলসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলন শেষে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার কার্যকরী সমিতির নবম অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে মস্কোতে ফিরে আসেন। এই অধিবেশন চলার সময়েই তিনি ম্যাসটয়ডাইটিস রোগে আক্রান্ত হ'ন।

এই সম্মেলনেই ষ্ট্যালিনের সমর্থকরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং উপনিবেশ ও পরাধীন জাতি সমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে লেনিন-রায় নীতির পরিবর্তে শ্রমিক ও কৃষক এই দুই শ্রেণীকে নিয়েই ঔপনিবেশিক দেশ সমূহে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করা হয়, এবং লেনিনের চার শ্রেণীর যুক্ত ফ্রণ্ট নীতি (ধনী, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক) ও রায়ের তিন শ্রেণীর (মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক) যুক্ত ফ্রণ্ট নীতি ত্যাগ করা হয়।

রায়ের অসুস্থতার সুযোগে এই নীতি এক তরফা ভাবেই গৃহীত হয়। এবং যেহেতু কমিউনিষ্ট নীতিতে মতান্তরের অর্থ মৃত্যু, সেই হেতু রায়ের চিকিৎসা বন্ধ করা হয়। ধরে নেওয়া হয় যে, দু'এক দিনের মধ্যেই বিনা চিকিৎসার ফলে রায় মরবে।

তখনো ষ্ট্যালিন ও ষ্ট্যালিন-পন্থীদের শাসন রুশ রাষ্ট্রে ও জীবনে তেমন

কঠিন হয়ে চেপে বসতে পারে নি। রায়ের বন্ধুরা তখনো সকলে ক্ষমতাচ্যুত হ'ন নি। মস্কোর সেই সব বন্ধুরাই বার্লিনের বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে বিশেষ এরোপ্লেন বার্লিন থেকে আনিয়ে ছদ্মনামে ছদ্মবেশে হোটেল থেকে অর্ধচেতন অবস্থায় জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রায়কে "অপহরণ" করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। সেটা ১৯২৮ সালের মার্চ মাস।

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। রায় তখনো শয্যাগত। রোগ শয্যা থেকেই তিনি কংগ্রেসে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। তাতে লেখেন যে, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি সমূহের যুক্ত ফ্রণ্ট করাই সমীচীন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় নি।

কয়েক মাস পরে একটি কানের শ্রবণ শক্তি হারিয়ে রায় যখন ভাল হয়ে উঠলেন, তখন সব চুকেবুকে গেছে। উগ্র বামপন্থীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্যে কমিনটার্ণের কার্যকরী সমিতিতে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, কংগ্রেসেও সেই নীতিই গ্রহণ করা হয়। তার অনুপস্থিতির ফলে এর কোনরূপ সমালোচনা ও বিরোধিতাও করা হয় নি। শুধু যে কেবল ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের জন্যেই এই রূপ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহের জন্যেও ঐরূপ উগ্র বামপন্থী নীতি অবলম্বিত হয়েছে।

রায় তাঁর অভ্রান্ত দূর দৃষ্টি দিয়ে বুঝলেন যে, কমিনটার্ণ কর্তৃক লেনিনের NEP নীতি বর্জন ও এই উগ্র বামপন্থা গ্রহণের ফলে সারা পৃথিবীর সকল দেশেই প্রগতিশীল জনগণের যে বিরাট মিছিল পথ চলা সুরু করেছিল, তার থেকে কমিউনিষ্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সভ্যতার মহাশত্রু ফ্যাসিবাদ নাৎসিবাদের অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সমগ্র প্রগতিশীল মানুষের যে ঐক্য গড়ে তোলা দরকার ছিল তা আর হবে না। ফলে ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ জয়ী হ'য়ে উঠবে।

ভারত সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করা হ'ল, তাতে লেনিন-রায় নীতি পরিত্যক্ত হ'ল। নতুন নীতিতে বলা হল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় কায়েমী স্বার্থের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কমিউনিষ্টরা জাতীয় কংগ্রেসকে সরাসরি বাধা না দিলেও তা থেকে তফাৎ থাকাই শ্রেয় মনে করল।

রায়ের অভিমত ছিল, যদিও কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুদ্ধিজীবী ও ধনীদের হাতে, তথাপি কংগ্রেসের শক্তির উৎস হ'ল জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। সুতরাং

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রকৃতই জাতীয়। সেই জন্যে কমিউনিষ্টদের উচিত কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করা এবং ধীরে ধীরে কংগ্রেসকে মার্কসবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করানো। কমিনটার্ণের সম্পাদক মণ্ডলীর নিকট কিছুদিন আগেই তিনি ষষ্ঠ কংগ্রেসে আলোচনার জন্যে ভারত সম্বন্ধে এক রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। ষষ্ঠ কংগ্রেসের পূর্বে ফেব্রুয়ারী মাসে যে কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসে তাতেই সে রিপোর্টের আলোচনা হয়। তখন থেকেই উগ্র বামপন্থীরা এই নীতির বিরোধিতা করার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকে।

তিনি এই থিসিসে তাঁর স্বভাব সিদ্ধ অতি তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে দেখান যে, কি ভাবে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা লাভবান হয়ে ব্রিটিশ নিজ দেশের আর্থিক ভারসাম্য এতদিন রক্ষা করে চলেছে। এই ভারসাম্যরক্ষার জন্যেই ব্রিটিশ প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে অপেক্ষাকৃত গরীব হ'য়ে পড়ায় দেশের বাড়তি মূলধন আর ভারতে নিয়োগ করতে পারছে না। ফলে সেই স্থান পূরণ করছে দেশীয় ধনীদের মূলধন। গড়ে উঠছে স্বদেশী ও স্বদেশী বিলাতী মিশ্রিত শিল্প-বাণিজ্য। ব্রিটিশ নিজ স্বার্থেই ভারতীয় ধনীদের বখরাদার করে ভারতের শিল্পায়নে সাহায্য করছে। তিনি দেখালেন যে, এই নীতির ফলে যদিও ব্রিটিশের সাময়িক সুবিধা হচ্ছে কিন্তু আখেরে দেশীয় ধনীরা ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে ব্রিটিশ শাসনেরই অবসান ঘটাবে এবং সেই ব্রিটিশ শোষক-শাসকের স্থান এরাই গ্রহণ করবে। এখনো যেমন ধনী ও নতুন শিল্প পতিরা ভারতের শ্রমিক-কৃষককে শোষণ করছে, স্বাধীন ভারতেও ওদের হাতে এরা তেমনই শোষিত হ'বে। অতএব কর্তব্য হ'ল, বর্তমান ধনিক-বণিকের নেতৃত্বের হাত থেকে কংগ্রেসকে উদ্ধার করে মধ্যবিত্ত-শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করা এবং এই শক্তির সাহায্যেই স্বাধীনতা লাভ করে মধ্যবিত্ত-শ্রমিক-কৃষকের সরকার গঠন করা।

রায়ের এই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির ব্যাখ্যার সমালোচক ও শত্রুরা বলতে লাগলেন, রায় বলেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা উদারতা দেখিয়ে স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে চলে যাবে এবং সেই ছেড়ে যাবার জন্যেই বর্তমানে তারা ডি, কলোনাইজেসন (De-Colonization) নীতি গ্রহণ করে চলেছে। রায়ের এই থিসিসের De-Colonization নাম করণও বুখারিণ করেছিলেন। রায় নিজে করেন নি।

এইখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পরবর্তী কালের ইতিহাসের ঘটনা প্রমান করে দিয়েছে যে, রায়ের এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উক্তি কতখানি সত্য ছিল।

রায়ের থিসিস যদিও জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কংগ্রেস নাকচ করল, তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে রায় সম্বন্ধে কিছু বলা হ'ল না। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের নিজস্ব পত্রিকাতে তাঁর লেখা বেরুতে লাগল। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের পর তাঁর লেখা ছাপা একরকম বন্ধই করা হ'ল। তখন তিনি তাঁর লেখা বন্ধু ব্র্যাণ্ডলারের কাগজ *Gegen den Strom*-এ "কমিনটার্ণের সংকট" নাম দিয়ে ধারাবাহিক লিখে চললেন। ব্র্যাণ্ডলার তাঁর দলবল নিয়ে ইতিপূর্বেই জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির উগ্র বামপন্থী নীতি গ্রহণের বিরোধিতা করছিলেন। সেই জন্যে তিনি কমিনটার্ণের নতুন কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। বিরোধী পক্ষের কাগজে রায়ের এই লেখাকেই আন্তর্জাতিকের কর্তৃপক্ষ একটা অপরাধ বলে ধরেন। জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির যে সব ভুলের জন্যে পরে তাদের হিটলারের নিকট পরাজিত হ'তে হয়েছিল, রায় ১৯২৮ সাল থেকেই সেই সব ভুল ও গোয়ার্তুমির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন।

এরপর আরো কয়েক মাস তিনি জার্মানীতে ছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সঙ্গে রায়ের বিচ্ছেদ

রায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু হ'ল কমিনটার্ণের এই ষষ্ঠ কংগ্রেস থেকে। উগ্র বামপন্থীদের সমর্থন লাভের জন্যে এই কংগ্রেসেই ষ্ট্যালিন উগ্র বামপন্থা গ্রহণ করেন। রুশিয়ায় যেমন লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিসি পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে দ্রুত শিল্পায়ন ও কৃষিতে বলপূর্বক ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, তেমনি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনেও অনুরূপ বামপন্থী নীতি গ্রহণ করা হয়।

উপনিবেশ সমূহে এ যাবৎ যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম তথা ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট এর নীতি চলে আসছিল তা বিনা কারণেই পরিত্যক্ত হয়।

ভারত সম্বন্ধে লেনিন-রায় নীতি পরিত্যাগ করে নতুন বামপন্থী নীতি সমর্থনের জন্যে তথা কথিত এক ভারতীয় প্রতিনিধি দল আনা হয়। রায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারা বলে যে, রায়কে ভারতে কেউ চেনে না। অথচ তার আগে ভারতে রায়কে প্রধান আসামী করে কয়েকটি কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা হয়ে গেছে। এবং প্রত্যেক কংগ্রেসের অধিবেশনে ও দেশের শিক্ষিত মহলে তাঁর পুস্তক-পুস্তিকা ও *Vanguard*, *Advance Guard* ও *Masses* নামক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রচারিত হয়ে আসছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে রুশ বামপন্থীদের রায় বিরোধিতার অন্ধ আতিশয্য ব্রিটিশের উদ্দেশ্য সফল করতে সাহায্য করে। ব্রিটিশ এত বছর ধরে রায়কে জব্দ করতে পারছিল না। সেদিন তারা কমিনটার্ণের মত শক্তিশালী অস্ত্রটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল। উক্ত বামপন্থীদের রায়-বিরোধী প্রতিনিধিদল সংগ্রহের অতি আগ্রহের সুযোগ নিয়ে

তাদের মধ্যে তারা নিজেদের স্পাই ঢুকিয়ে দেয়। অবশ্য রুশ গোয়েন্দার কাছে তা চাপা থাকে না। কিন্তু রায় বিরোধিতার কাজটি অবশ্য তারা তাদের দিয়ে ঠিকই করিয়ে নেয়। পরে তাদের গ্রেপ্তারও করে। যে লোকটিকে ভারতে ফিরতে দেওয়া হয়েছিল তিনিও পরে আর কখনো রাজনীতি করেন নি।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত নীতির সঙ্গে রায়ের সম্পূর্ণ মতান্তর থাকলেও তিনি প্রায় এক বৎসর বার্লিনে নীরবে অবস্থান করছিলেন এবং চীন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইতিমধ্যে এই নীতি গ্রহণের ফলে বহু দেশেই কমিউনিষ্ট আন্দোলন এক সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই সংকট বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল জার্মানীর কমিউনিষ্ট আন্দোলনে। ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট নীতি পরিত্যাগের ফলে বহু বিখ্যাত নেতাদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়। এর ফলে শ্রমিক সমাজের মধ্যে থেকেই নিজেদেরই বিচ্যুত হয়ে এক-ঘরে হয়ে পড়তে হয়। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের এই পরিণতি সহ্য করতে না পেরে রায় যে কমিউনিষ্ট পার্টির বিতাড়িত মধ্যপন্থী নেতাদের পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই সব প্রবন্ধ লেখার অজুহাতে কমিনটার্ণের নেতারা রায়কে সরকারীভাবে শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতি নিন্দাসূচক বা অনাস্থা সূচক বা বিতাড়িত করার কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি। ১৯২৯ সালের প্রথমেই কমিনটার্ণের কার্যকরী সমিতির যে অধিবেশন বসে তাতেই কেবল সেক্রেটারী কুশিনেন বলেন যে, "জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট করার স্বপক্ষে ব্র্যাণ্ডলার দলের পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে রায় নিজেই কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের বাইরে চলে গেছেন।" এই কথাটি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের INPRECOR-এও (*International Press Correspondence*) ছাপান হয়।

রায় সে সংবাদ পেয়ে কমিনটার্ণের সাধারণ সদস্যদের নিকট এক খোলা চিঠি লেখেন। তাই "My Crime—আমার অপরাধ" নামে পরে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। এই আকর্ষনীয় পত্র খানির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

> কিছুদিন যাবৎ আমি পবিত্র গিলোটিনের (হাড়িকাঠ) সামনে বলিদানের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। এই গিলোটিনের উন্মত্ত প্রয়োগে আজ সারা জগতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন ধ্বংস হ'তে বসেছে। বৎসরাধিককাল ধরে আমাকে বলিদানের জন্যে জিয়িয়ে রাখলেও আমি

আমার মাথাটা কাটা পড়ার ভয়ে তত ভীত নই, যত না বিরক্ত হচ্ছি আন্তর্জাতিক সংস্থার দখলকারী সব নতুন নেতাদের অযোগ্যতায় এবং বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি এইসব নেতাদের হঠকারিতা দেখে। এইসব দায়িত্বহীন নেতার কুকর্মের জন্যে আজ সারা দুনিয়ার কমিউনিষ্ট আন্দোলন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। অবিশ্বাস্য রকমের দেরীর পর অবশেষে আমার পালা এসেছে। কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের কার্যকরী সমিতির দশম পূর্ণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুশিনেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দায়িত্ব এড়িয়ে চলার অভ্যাস মতই বিনা যুক্তিতে আমার মস্তক দাবী করেছেন। জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির বামপন্থা-বিরোধী পক্ষের পত্রিকায় লিখে আমি যে "ঘৃণ্য অপরাধ" করেছি, তার পরেও কি করে আর আমার পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে থাকা সম্ভব তা ভেবে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আগে থেকেই ব্যবস্থা সব পাকা ছিল। কুশিনেন এই কথা বলা মাত্র (ফরাসী বিপ্লবের জনতা আদালতের মত—লেখক) "জনতার" এক কোন থেকে A la guillotine—গিলোটিনে দাও ধ্বনি উঠল, আর "জনতাও" মাথা নেড়ে সায় দিল। যে মানুষটি কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের গোড়া থেকে জড়িত ছিল, তারো আগে বহু বৎসর ধরে বৈপ্লবিক আন্দোলনে যে সক্রিয় অংশ নিয়ে এসেছে, এ যাবৎকাল যাকে "বামপন্থী ঘেঁসা" বলে সমালোচনাও করে আসা হয়েছে, সেই আজ একটা প্রবন্ধ লিখে নিজেই কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের বাইরে চলে গেল! রুশ প্রতিনিধিদের সমর্থন পেয়ে লজোভস্কি ও সুবিন দলের কতকগুলো নিন্দা ও গালি-গালাজের পর মেনুইলস্কি আমায় সরাসরি দলত্যাগী (রেনিগেড) আখ্যায় আখ্যায়িত ক'রে ব্যাপারটিকে শেষ করে দিলেন। ব্যাপারটাকে অতি সহজেই চুকিয়ে ফেলা হ'ল। একজন পুরাতন "বামপন্থী" কীভাবে হঠাৎ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী হয়ে গেল, বিশ বছরের বেশী পুরাতন একজন বিপ্লবী অকস্মাৎ কী করে "দলত্যাগী" হয়ে গেল, সে সব বিষয়ে কোন নথিপত্র বা সাক্ষী সাবুদ দেওয়া হ'ল না, কেউ সেসব দাবীও করল না। কুশিনেন মাত্র বললেন আমার নীতি হ'ল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্ট রচনা

করা এবং সেই কথা শুনেই ম্যান্থুইলস্কি বললেন আমি হলাম একজন "দলত্যাগী"।

এই চিঠিতে রায় তাঁর অভিমত সবিস্তারে বর্ণনা করে শেষে বলছেন যে:

হ্যাঁ, অপরাধ আমি করেছি, কিন্তু যে অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপান হচ্ছে, তা আমি করি নি। আমার অপরাধ, আমি স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী এবং কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল এ যাবৎ একে অপরাধরূপে গণ্য করে নি। অবশ্য এখন সে অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে। গত বৎসরাধিক কাল ধরে যতদিন আমি নীরব ছিলাম, যতদিন আমি আমার মতান্তরের কথা মুখ ফুটে বলি নি, ততদিন আমাকে "দলত্যাগী" আখ্যায় আখ্যাত করা হয় নি বা কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের বাইরেও আমার অবস্থিতি ঘটে নি। কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সর্বশক্তিমান শাসনব্যবস্থা আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে রেখেছিল—আমার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ আমি যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এই অমার্জনীয় অপরাধটি না করতাম, যদি না আমি আমার বক্তব্য বলবার সাহস সঞ্চয় করতে পারতাম, তবে চিরতরে আমাকে বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে বিলীন করে দেবার ব্যবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু কখনো কখনো অযৌক্তিক শৃঙ্খলাবোধের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ভেঙ্গে এগিয়ে চলাও বিপ্লবীদের অন্যতম কর্তব্য।...

....শেষ পর্যন্ত আমাকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা হয় যে, আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হই। যে নেতৃত্ব আজ কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশ-ন্যালকে ধ্বংসের মুখে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে চলেছে, সেই নেতৃত্বকে বাধা দেবার জন্যে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে হাত মেলানো আমার বৈপ্লবিক কর্তব্য।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত কেবল ভারত সম্পর্কিত প্রস্তাবটিতেই নয়, অন্য সকল প্রস্তাবেও আমার আপত্তি। যদি কেবল মাত্র একটি বিষয়েই ভুল হ'ত তা হলে অপেক্ষা করা যেতে পারত এই ভেবে যে, অভিজ্ঞতার দ্বারা কালে এ ভুল সংশোধন হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতে যে ভুল করা হচ্ছে, সে ভুল এক মহাভুলেরই অংশমাত্র। সুতরাং নীরব থাকা আর চলে না। কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল যে আজ এক মহাসংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তা তার নেতৃবর্গের পরিচয় ও কাজকর্মের দ্বারাই প্রকট হয়েছে।

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের কৃতিত্ব রায়ের

উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কসের সময় সাম্রাজ্যের ও উপনিবেশের যে রূপ ছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই ধনতন্ত্রের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সে রূপের পরিবর্তন ঘটে। মার্কসের জীবনকালে উপনিবেশ ছিল শিল্পপতিদের কাঁচা মাল সংগ্রহ ও তৈরি মাল বিক্রয়ের বাজার।

লেনিনের সময়ে তার আরও রূপান্তর ঘটে। উপনিবেশ ও শিল্প অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি কাঁচা মাল সংগ্রহ ও তৈরি মাল বিক্রয়ের বাজার হিসেবে ত বটেই, উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশের বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবেও মর্যাদা লাভ করে। এই নীতির ফলেই ইউরোপের অনেক স্বাধীন দেশেও ফ্রান্স-আমেরিকার টাকা খাটতে থাকে এবং মুনাফা আসতে থাকে। লেনিনের যুগ বাড়তি মূলধনী সাম্রাজ্যবাদের যুগ। লেনিন নিম্নোক্তভাবে ইম্পিরিয়ালিজিমের সংজ্ঞা দিলেন :

"ধনতন্ত্রের যে পর্যায়ে শিল্পে বাণিজ্যে একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে এবং লাভের উদ্দেশ্যে লগ্নীর জন্যে মূলধন বিদেশে রপ্তানী হ'তে থাকে সেই পর্যায়কে ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী রূপ বলা হয়।"*

লেনিনের '*Imperialism* বইখানি লেখা হয়েছিল, পেট্রোগ্রাডে, ২৬শে এপ্রিল ১৯১৭ সালে। এই সময় তিনি সেখানে আত্মগোপন করে নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন। তারপরই তিনি বিপ্লবের

---

*"Imperialism is Capitalism in that phase of its development in which the domination of monopolies and finance capital has established itself, in which the export of capital has acquired very great importance."

(Lenin—*Imperialism*, Chapter VII

ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে এমনই জড়িয়ে পড়েন যে, তত্ত্বমূলক গ্রন্থ লেখার বোধ হয় আর সময় পান নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে, যুদ্ধোত্তর জগতে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির জন্যে উপনিবেশে ও করদ রাজ্য সমূহে যখন মূলধন রপ্তানি করতে অক্ষম হবে, তখন সেই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশের শোষণ চলবে কোন্ পথে, কী উপায়ে, সে প্রশ্নের উত্তর লেনিন দেন নি—বোধ হয় সময় পান নি।

এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন রায়। লেনিন যদি প্রথম যুদ্ধ-পূর্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান দিয়ে থাকেন তবে রায় যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন। এবং যেহেতু এই বিশ্লেষণের মধ্যে উপনিবেশ-সমূহের অনেকখানি রাজনৈতিক গতি-পরিণতির পূর্বাভাস ছিল সেই হেতু পরবর্তী বিশ্ব-ইতিহাস রায়ের এই তত্ত্বের নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে। যদিও কমিউনিষ্ট জগতে এই তত্ত্ব রায়ের "উপনিবেশবাদ পরিত্যাগের" (De-colonisation) নীতি নামে কুখ্যাত হয়ে এসেছে।

রায়ের জীবনের এই অন্যতম মহান কীর্তির কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সেই জন্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর থিসিসের বিতর্কের উপর তিনি "On the Indian question in the World Congress of the C. I. শীর্ষক যে প্রবন্ধ ১৯২৯ সালে বার্লিন থেকে লেখেন, তা' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

> আমি এটাই দেখাতে চেয়েছিলাম যে, ঘরে ধনতন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতির জন্যে সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে আরো নিবিড় ভাবে শোষণ করার উপায় ও পদ্ধতির সন্ধান করতে বাধ্য হ'বে এবং এর ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করবে যার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের ভিত্তিকেই দুর্বল করে তুলবে। (*M. N. Roy—Our Differences pp, 45—46*)
>
> ব্রিটেন যে ভারতে কম পরিমাণ মূলধন রপ্তানী করছে তার কারণ যুদ্ধ পূর্ব কালে তার যে পরিমাণ রপ্তানীযোগ্য মূলধন ছিল যুদ্ধোত্তর কালে আর সে পরিমাণ নাই। (Ibid—pp 58)
>
> এই ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আসল কাঠামোটাই ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে……এই ধ্বংসোন্মুখ কাঠামোকে খাড়া রাখবার উদগ্র আগ্রহই একে আরো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।…তথাপি এদের

চেষ্টার ত্রুটি হবে না। তা যদি না করে, তবে তাদের নামই মিথ্যা—তারা আর তখন বুর্জোয়া থাকবে না। (Ibid-pp 59)

ঘরের কলকারখানার উন্নতি যে স্তিমিত হয়ে এসেছে তার কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দিতে পারছে না। এখন এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ভারতের মূলধনকে সংহত করে তুলতে চায়। কাজটা যেমন দুঃসাহসিক, তেমনি বিপজ্জনক। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা অবশ্যই খুব সাবধানে পা ফেলে চলবে।

(Ibid-pp 60)

ঠিক যেমন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণতি ঘটে সমাজ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠায়, ঠিক তেমনি এটাও সম্ভব যে, সাম্রাজ্যবাদের শেষ দশায় এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'তে হয়, যার ফলে উপনিবেশবাদেরই অবসান ঘটে। (Ibid-pp 61)

আমদানী অপেক্ষা অধিক রপ্তানী করেই অনুন্নত ভারত সাম্রাজ্যবাদকে তার সেলামী প্রদান করে। এই যে আমদানী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানী, এর জন্যে ভারত কোন সেলাই পায় না। সর্বপ্রথম ১৯২০ সালেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই বাঁধাধরা উদ্বৃত্ত অংকটির পরিবর্তন ঘটে। ঐ বৎসর ভারতের রপ্তানী অপেক্ষা ৭৯ কোটি টাকার বেশী দ্রব্য আমদানী হয়।

এর আগের পাঁচ বছরের গড় রপ্তানী ছিল বাৎসরিক ৭৮ কোটি টাকা বেশী। ১৯২০ সালের পর থেকেই আমদানী বাড়তে থাকে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক দেখা দেয়। ভারতের দেউলে হওয়ার উপক্রম দেখা দেয়। তার "সেলামীর ঋণ" শোধ করা বন্ধ হয়। যুদ্ধ-পূর্ব যুগের ঔপনিবেশিক শোষণ-ব্যবস্থার অবৈজ্ঞানিক সেকেলে পদ্ধতির গলদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যদি ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে লোভনীয় রাজ্য রূপেই রাখতে হয় তা হ'লে তার উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়াতে হ'বে।

১৯২০—২১ সালের যে দু' বৎসরে ভারতের দারিদ্র্য প্রকট হয়ে ওঠে, সে সময়েই ভারত-শোষণের পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন এবং উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ...... (Ibid-pp 71-72)

এইখানে রায় স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের অনেক নজির উদ্ধৃত করেছেন। তারই একটি নীচে উল্লেখ করা হল :

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৯১৯ সালের ভারত রিফর্ম এক্ট ভারতকে এমন কিছু ক্ষমতা হস্তান্তর করে, যা ব্রিটিশ এর আগে হাতছাড়া করে নি। এই সময়েই ভারত-শোষণের নতুন নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট অনুসারেই এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাতে লেখা হয় :

'ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন ভারত সরকার ভারতীয় নেতাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সুবিধার দাবী সম্বন্ধে একমত, যার ফলে দেশীয় কাঁচামালের উৎপাদকগণ লাভবান হতে থাকবে। দেশের ধন-সম্পদ যদি বাড়াতে হয় তা হ'লে গভর্ণমেণ্টকেই এগিয়ে আসতে হবে। যুদ্ধের পর ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আরো গভীর ভাবে অনুভূত হ'তে থাকবে।

'সব দিক দিয়েই ভারতের অর্থনৈতিক ভারসাম্য গড়ে তুলতে হ'লে শিল্পোন্নয়নের জন্যে এক প্রগতিশীল নীতি গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তা আছে। সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্যেও অতঃপর ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে। শিল্পে উন্নত ভারত সাম্রাজ্যের কতখানি শক্তি বৃদ্ধি করবে তা আমরা ভাবতেও পারি না। গভর্ণমেণ্টকে আজ একথা স্বীকার করতেই হবে এবং ভারতকে শিল্পে উন্নত করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হ'বে।' (Ibid-pp 73-74)

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রায় কোন দিনই মার্কসের অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদ স্বীকার করেন নি

মানব মনের সৃজনী ক্ষমতার উপর আস্থা যে রায়ের প্রথমাবধিই ছিল একথা আগে একাধিকবার বলেছি। ১৯২০ সালে ঔপনিবেশিক নীতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিশ্ব-কংগ্রেসে গৃহীত তাঁর নীতিতে এই আস্থারই প্রমাণ ছিল এবং মার্কসবাদের অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদের নীতি থেকে সেটা যে অনেকখানি সরে যাওয়া, সে কথাও আমরা বলেছি।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে তাঁর সাম্রাজ্যবাদীদের "উপনিবেশ পরিত্যাগ নীতি" সম্বন্ধে আলোচনা কালেও যে এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলব সে কথাও বলেছিলাম। কারণ এটা প্রমাণ করতে না পারলে প্রথমাবধি বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদই যে তাঁর আদর্শ ছিল, যার অর্থ হ'ল মানুষের সৃজনী ক্ষমতার উপরই একান্ত আস্থা, মার্কসবাদ গ্রহণেও তার যে কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটে নি, সেটা প্রমাণ করা যাবে না।

এ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি লেখা নিয়ে *Our Differences* গ্রন্থটি রচিত হয়। তার বহু অংশ থেকেই পাওয়া যাবে মানুষের মনের সৃজনী ক্ষমতার উপর রায়ের প্রত্যয়ের নিদর্শন। যথা:

> বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হিসেবে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে যে অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার ফলে, ব্রিটেন ভারতে আর মূলধন প্রেরণ করতে পারছে না। ফলে লাভের বেশ কিছু অংশ সে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ভারত থেকে "পাওনা-গণ্ডা—Tributes" বৃদ্ধি পেতে পারে একমাত্র ভারতের শ্রমশীল জন-সাধারণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে। এই উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে পারে যদি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে উন্নততর উপায়-পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

অর্থাৎ মান্ধাতা আমলের কৃষি ব্যবস্থার একমাত্র সম্বল দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এমন কিছু বেশী অর্থ দিতে পারা যায় না, যার ফলে তার ক্ষয়িষ্ণু মরণোন্মুখ কাঠামোর পুনরুজ্জীবন সম্ভব। সুতরাং ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান নীতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই নীতির ফল যে কী দাঁড়াবে তা একজন মার্কসবাদীর কাছে অতি সুস্পষ্ট। এর ফলে কেবল যে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'বে তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসই ত্বরান্বিত করবে। সুতরাং বলা চলে যে, এই নীতির মধ্যে একটি "উপনিবেশবাদ ধ্বংসের বীজ (ডি, কলোনাইজিং)" নিহিত আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সংকটাবর্তে পড়ে বাধ্য হ'য়ে যে অর্থনীতি গ্রহণ করছে, তার সুদূরপ্রসারী ফল হবে সাম্রাজ্যবাদের অবসান। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমি সাম্রাজ্যবাদের প্রগতি-পরায়ণতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি, একথা যারা বলে তারা অতি বাজে কথাই বলে। গলার জোরে মানুষ ক্ষেপানো বক্তৃতায় এ সব যুক্তি চলতে পারে, কিন্তু এতে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। (pp 67-68)

রায় দ্বান্দ্বিক নিয়ম বলতে যা বোঝেন, যাদের উদ্দেশ্যে রায় এই প্রবন্ধ লিখলেন তারাও কি তাই বোঝেন? সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের মত মানসিকতার অস্তিত্ব রায় এখানে স্বীকার করছেন। এবং যেহেতু রায় তখনো কমিউনিষ্ট শিবিরে এবং তখনো নব-মানবতাবাদ দর্শন রচনা করেন নি, সেই হেতু তিনি মনের সৃজনী ক্ষমতার সমর্থন মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মধ্যেই পেতে চেয়েছিলেন। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির থিসিস, এন্টিথিসিস, সিন্থসিস বোঝাবার জন্যে বলা হয়—Nature acts upon man, man reacts upon nature, thereby changeth the nature and himself—পারিপার্শ্বিক মানুষের উপর ক্রিয়া করে, মানুষ প্রতিক্রিয়া জানায়, ফলে পারিপার্শ্বিক ও সেই সঙ্গে নিজেরও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এইখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, নির্জীব বস্তুর প্রতিক্রিয়া, জন্তু-জানোয়ারের প্রতিক্রিয়া এবং মানুষের প্রতিক্রিয়া কি একই? তা যদি না হয়, অর্থাৎ মানুষের প্রতিক্রিয়া যদি বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথে না দেখা হয়, তবে পারিপার্শ্বিক নির্দেশ্যবাদ মানুষের বেলায় খাটবে না।

নির্জীব বস্তুর প্রতিক্রিয়া ও জন্তু জানোয়ারের প্রতিক্রিয়া এক না হ'লেও মোটামুটি নির্দিষ্ট। আলো, বাতাস, জল, মাটি, লোহা সোনা প্রভৃতি নির্জীব বস্তুর প্রতিক্রিয়া একেবারে নির্দিষ্ট; কেবল বস্তুর পরমাণু স্তরে অনির্দিষ্ট; আবার বৃহৎ স্তরে নির্দিষ্ট। জন্তু-জানোয়ারের প্রতিক্রিয়া হয় মস্তিষ্কের থেলেমাস নামক কেন্দ্র থেকে। এই থেলেমাসের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নাই। এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে নার্ভতন্ত্রের পরবর্তী স্তরে, যার নাম সেরিব্রাল হেমিসফিয়ার, যা মানুষের ছাড়া আর কোন প্রাণীর নাই। মানুষের মস্তিষ্কেরই আছে প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ঃ

কোন ক্ষুধার্ত বিড়াল যদি সম্মুখে খাবার পায় তবে না খেয়ে পারবে না। কিন্তু একজন ক্ষুধার্ত মানুষ ইচ্ছা করলে সে খাবার না খেয়েও থাকতে পারে। জন্তুর প্রতিক্রিয়া বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথে। আর মানুষের প্রতিক্রিয়া কোন বাঁধাধরা ছক্‌কাটা পথ ধরে চলে না—তার প্রতিক্রিয়া অনির্দিষ্ট। এই যে মানুষের মস্তিষ্কের স্বাতন্ত্র্য, যাকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি বলি, সৎ-অসৎ বিবেচনা শক্তি বলি, বিবেক বলি, মনের সৃজনী ক্ষমতা বলি, সেই মনের অধিকারী মানুষের প্রতিক্রিয়া কখনোই নির্দিষ্ট হতে পারে না। আমরা দেখেছি, একই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব পারিপার্শ্বিক নির্দেশ্যবাদ বা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ মনুষ্য সমাজে খাটে না। খাটে না বলেই মার্কস-এঙ্গেলস-এর "অতীতে যেমন 'অনিবার্য' ভাবে শ্রেণী সমূহের উদ্ভব ঘটেছিল তেমনি 'অনিবার্য' ভাবেই লুপ্ত হয়ে যাবে—Classes will vanish as they '*inevitably*' arose in the past" অথবা "শ্রেণী বিরোধের 'অপরিহার্য' পরিণতি সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায়—Class War '*indispensably*' leads to the dictatorship of the proletariat" কথাগুলি মনুষ্য সমাজের গতি-পরিণতির দিক্‌-নির্ণয়ে সঠিক নির্দেশ দানও করে না। জন মেনার্ড কীন্‌স-এর অর্থনীতি ও ফ্যাসিবাদের উদ্ভব তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধনতন্ত্রের সংকটে সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও উক্ত শ্রেণীর একনায়কত্বের ভিতর দিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হওয়া উচিত ছিল। মানুষ যদি জন্তুর মতোই একই অবস্থায় একই ভাবে আচরণ করতো তবে হয়তো মার্কসের এই ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'তো। এমন কি মানুষের চেতনা যদি কেবল তার সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা

ও শ্রেণী বিন্যাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'তো তবে হয়তো ধনতন্ত্রের সংকটে সব দেশেই একই ভাবে সর্বহারার অভ্যুত্থান ও সমাজবাদের জন্ম হ'তো। কিন্তু মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হ'ল। প্রথমতঃ সর্বহারার বিপ্লব ঘটল না ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে ধনতন্ত্র সমুন্নত। বিপ্লব ঘটল অনুন্নত রুশিয়ায়। লেনিন দেখালেন ধনতন্ত্রের সংকটে ইংল্যাণ্ডের ধনতন্ত্র নষ্ট না হওয়ার কারণ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ। এতে কিন্তু প্রমাণ হয়ে যায় যে, ইংল্যাণ্ডের পুঁজিপতিদের উদ্ভাবনী শক্তি (ভালই হউক বা মন্দই হোক) সংকট থেকে পরিত্রাণের নতুনতর পন্থা বেছে নিয়েছে। সংকট থেকে পরিত্রাণের অন্যতর পন্থা হ'ল ফ্যাসিবাদ।

রায় দেখালেন, ধনতান্ত্রিক দেশের পুঁজিপতিরা, অন্ততঃ ইংল্যাণ্ডে একদিন নিজেদের স্বার্থেই উপনিবেশগুলির উপর থেকে রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব সরিয়ে নেবে। রাষ্ট্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের মূল্যে উপনিবেশে তাদের আর্থিক আধিপত্য বজায় রাখার এই যে প্রচেষ্টা, এর মধ্যেও মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও মার্ক্সীয় নির্দেশ্যবাদ অতিক্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য উপনিবেশের উপরে রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার মূলে শুধু পুঁজিপতিদের স্বার্থবুদ্ধিই কাজ করেছে তা নয়, পুঁজিপতি দেশগুলির মধ্যেও জনসাধারণ সচেতন হ'যে ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সাধারণ মানুষের জাগ্রত শুভবুদ্ধি অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের অনিবার্যতা খণ্ডন করেছে।

বস্তুতঃ মানুষের চেতনা ও ভাব শুভবুদ্ধিও যে আর্থিক ব্যবস্থার (উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রেণী বিন্যাসের) উপরে প্রভাব বিস্তার করে, মার্কস তা লক্ষ্য করেন নি। ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে ধনতন্ত্রের সংকট এড়াতে সাহায্য করেছে ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্র ও কীনস্ প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সংস্কার। সেখানে শ্রমিক শ্রেণী আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থে নিরন্তর সংগ্রাম ক'রে তাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করেছে। পুঁজিপতিরাও শ্রমিক শ্রেণীর দাবি ও স্বার্থ সর্বদা উপেক্ষা না করে খাপ খাইয়ে নিয়েছে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে। ফলে ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্র সংশোধিত হ'য়ে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু বিপ্লব বা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মানুষের চেতনা, মানুষের শুভবুদ্ধি অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের অমোঘ বিধানের উপরে জয়ী হয়েছে। পরবর্তী কালের চিন্তায় ইতিহাসের এই সাক্ষ্যকে মানবেন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

মানুষের সক্রিয় ও সচেতন চেষ্টাই যে সমাজকে পরিবর্তিত করে, উৎপাদন শক্তি ও শ্রেণী সংগ্রামের অমোঘ নিয়ম করে না, এই সত্য তার মানবতাবাদ দর্শনের অন্যতম প্রত্যয়। কিন্তু আমি দেখাতে চেয়েছি যে, রায়ের ডি-কলোনাইজেসন থিসিস-এ প্রথম এই সত্যটি অস্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। মার্কসবাদের সংশোধনের বীজ এই থিসিসেই নিহিত ছিল। এখন বোঝা যাবে, গোঁড়া মার্কসপন্থীরা ডি-কলোনাইজেসন থিসিসকে কেন প্রথম থেকেই আমল দিতে চান নি—ইতিহাসের সাক্ষ্য মানবেন্দ্রনাথের পক্ষে থাকলেও। যে ইতিহাসকে গোঁড়া মার্কসবাদীরা ভগবানের মতই মানে, সেই ইতিহাস বিধাতাই এমনি করে বহুবার মার্কসবাদীদের ভ্রান্তত্তা প্রতিপন্ন করেছে।

মার্কস-এঙ্গেলস যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন, তা হ'লে নিশ্চয় তাঁরাও আধুনিক শারীর বিদ্যার আবিষ্কার সমূহের সঙ্গে পরিচিত হ'তেন এবং হয়তো তাঁদের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের প্রভাব থেকে মানুষকে ও মানুষের সমাজকে মুক্তি দিতেন। রায় এ যুগের মানুষ, মার্কসের অসম্পূর্ণ কাজটিই তিনি করেছেন। তিনি মানুষকে অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এবং প্রথমে যা ছিল শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে Empirical, পরে তাকেই এক পৃথক দর্শনে রূপ দান করেছেন।

অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের বার্লিনের চিঠি

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচেছে। আর তাঁকে এর কাজের জন্যে ইউরোপে থাকতে হবে না। এবার ভারতে আসবার প্রস্তুতি আরম্ভ হ'ল। লাহোর কংগ্রেস শেষ হয়েছে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় রায়ের দশ বছরের চেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছে, সবটা হয় নি। এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে তিনি ভারতের জাতীয় বিপ্লবের এক কর্মসূচী রচনা করলেন। তারপর কয়েকজন ইউরোপ প্রবাসী ভারতবাসীর স্বাক্ষরসহ ১৯৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বার্লিন থেকে তা প্রচার করলেন। যথা-সময়ে তা ভারতেও এসে পৌঁছল। এই ইস্তাহারে সে দিন জাতীয় বিপ্লবের যে কর্মসূচী তিনি দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতেও তিনি ঠিক সেই কর্মসূচীকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং সেই ইস্তাহারের পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক আছে। নিম্নে এটির মুখ্য অংশের অনুবাদ দেওয়া হ'ল :

> পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে, 'পূর্ণ স্বাধীনতাই যে কংগ্রেসের লক্ষ্য' তা ঘোষণা করার জন্যে কংগ্রেসকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এবং তা অর্জনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত একটি পরিকল্পনা রচনা ও তা রূপায়িত করার জন্যে উপযুক্ত শক্তি গড়ে তোলার কথাও বলেছিলেন।
>
> লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা ক'রে এ কর্তব্যের অর্ধেক পরিমাণ পালন করেছে, কিন্তু তা লাভ করার পক্ষে উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা না করে অপর অর্ধেকটি পালন করে নি, এবং তা যদি না-করা হয়, তবে স্বাধীনতার প্রস্তাব শুধু কাগজে-কলমেই থেকে যাবে,

তাকে ঘিরে যত ঢাক ঢোলই পেটানো হোক, তাতে কোলাহলই বাড়বে, কাজের কাজ কিছু হবে না।

লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবকে নেতিবাচক প্রস্তাবই বলব। কারণ এতে কী চাই না, কী করব না, কেবল তাই বলা হয়েছে; কী চাই, কী করব, তা বলা হয় নি। প্রস্তাবে যেটুকু ইতিবাচক অংশ আছে, তা হ'ল আইন অমান্য ও কর বন্ধের কথা। কিন্তু আইন অমান্য ও কর বন্ধ আন্দোলন তখনই কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে, যখন তাদের পিছনে জনগণের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক চেতনা, প্রচারশক্তি, আন্দোলন সৃষ্টি করার ক্ষমতা ও দৃঢ় সংগঠনের প্রস্তুতি থাকে। বর্তমানে এ সবের একান্ত অভাব। প্রস্তাবের আর দু'টি অংশ হ'ল, গোল টেবিল বৈঠকে যোগ না দেওয়া, আর আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করা।

গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দিলেই কি ব্রিটিশ রাজত্ব আটকে থাকবে? মণ্ট-ফোর্ড রিফর্ম বা সাইমন কমিশন বয়কট করেই বা কতটুকু কি ফল হয়েছে? ভারতের পক্ষে যোগ দেবার জন্যে শাস্ত্রী, সেথ্না, মালব্য, জিন্না, কেলকার, জয়াকরের কি অভাব আছে? আইন সভা, বৈঠক, কমিশন প্রভৃতি শুধুমাত্র বয়কট ও তার সাথে অসহযোগিতা ক'রে যে বিশেষ কিছু হয় না তাতো দশ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে। তাতে ব্রিটিশ রাজত্বের কোন ক্ষতিই হয় নি। বরং নেহেরুর কল্পিত "Real struggle—সত্যিকারের যুদ্ধ" যদি সুরু করা যেত তাহ'লে এই "Sham legislatures—ভুয়ো আইন সভা" হাতে থাকলে, তা দিয়েই অনেক সাহায্য পাওয়া যেত।

পক্ষান্তরে, কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবে খুশি না হ'য়ে যাঁরা বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তাঁদের কর্মসূচীও খুব কার্যকরী নয়। সভাপতি নেহেরু ও বামপন্থীরা যে সর্বাত্মক ধর্মঘট ও কর বন্ধ অস্ত্রের কথা বলেছিলেন তার পিছনেও প্রচার ও সংগঠন গড়ে তোলার দীর্ঘ প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন, সুতরাং এই প্রস্তুতির জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এক সংগ্রামী কর্মসূচী (Programme of Action); নতুবা সর্বাত্মক ধর্মঘটে শ্রমিকরা সাড়া দেবে না। সর্বাত্মক ধর্মঘট রাজনৈতিক অস্ত্র। শ্রমিকরা রাজনৈতিক কারণে দু'একদিন হরতাল করলেও দীর্ঘদিন ধ'রে

করবে না। কারণ স্বাধীনতার দ্বারা তাদের খাওয়া পরার কী সুবিধা হ'বে তা না জানালে তারা এগিয়ে আসবে না।

অবশ্য কর বন্ধের আন্দোলন অপেক্ষাকৃত সহজে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু এর ফলে আন্দোলন দানা বাঁধবার পূর্বেই সরকারের সঙ্গে সংঘাত বাধবে, এবং পূর্বাহ্নে সংগঠন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রস্তুতির অভাবে অচিরেই সব কিছু দমিত ও ধ্বংস হ'য়ে যাবে। সুতরাং প্রস্তুতি পর্বের শেষে এবং সময় ও সুযোগ বুঝে এই দুই অস্ত্র ব্যবহার করতে হ'বে।

বিরোধী পক্ষের সুভাষচন্দ্র বসুর প্রস্তাব ছিল, "কংগ্রেস কর্তৃক প্যারালাল গভর্ণমেণ্ট স্থাপন। এ প্রস্তাব শুনতে খুবই চরমপন্থী। কিন্তু অবিলম্বে এই পন্থা গ্রহণের ফলে কয়েকজন রোমান্টিক মানুষের কারাবাসেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে—তার বেশী কিছু হ'বে না। বেশ বোঝা যায়, প্রস্তাবক আইরিশ দৃষ্টান্ত থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের মত ভারতে অনুরূপ শক্তিশালী রিপাবলিকান আর্মি কি গড়ে উঠেছে? বিশ্বের ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই, যে বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করে বা উচ্ছেদ ক'রতে চায়, তা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের (Insurrection) মধ্যে দিয়েই সম্ভব। ঠিক অনুরূপভাবে ভারতের জনগণের সফল অভ্যুত্থান ঘ'টে যখন ক্ষমতা পরিচালন করার সংগঠন গ'ড়ে উঠবে তখনই কেবল জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা ভাবা যায়। তার আগে প্যারালাল গভর্ণমেণ্টের কথা রোমান্টিসিজিম মাত্র।

বর্তমানে প্যারালাল গভর্ণমেণ্টের কথা প্রচার ক'রে কোন ফলই হ'বে না। তার আগে ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারের রূপ, গঠন, ও উদ্দেশ্য কী হ'বে তা স্পষ্ট ভাষায় সাধারণের কাছে প্রচার করতে হ'বে, যার ফলে অধিকাংশ মানুষ উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহান্বিত হ'য়ে জাতীয় সরকার স্থাপন করতে এগিয়ে আসবে। স্বাধীনতা লাভ ক'রে জাতীয় সরকার সাধারণ মানুষকে কী দেবে সে কথাটাই সর্বাগ্রে সকলকে বুঝিয়ে দিতে হ'বে। যখন তারা বুঝবে, এই স্বাধীনতা বস্তুটি আসার সঙ্গে সঙ্গে

তাদের বর্তমানের দুঃখদুর্দশা দূর হ'য়ে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে চলার সব বাধা অপসারিত হবে, তখনই তারা জীবন পণ ক'রে জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

লাহোর কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য হ'ল, সাধারণ কর্মীদের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাবের ব্যাপক প্রকাশ। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সেখানকার আকাশ-বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল অধিবেশনের ক'দিন। সমগ্র ভারতের মনোভাবই এতে প্রস্ফুট হয়েছে। একে কাজে লাগাতে হ'বে, কেবল মাত্র জাতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে নয়,—জাতীয় বিপ্লবকে জয়যুক্ত করে তোলার জন্যে। অর্থাৎ বিদেশী শাসককে বিতাড়িত করলে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ হ'তে পারে, কিন্তু তাতে "The relics ot a bygone age"—(Nehru) ভারতের জনগণকে শোষণ ও শাসন করার জন্যে দেশীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার ও মধ্যযুগীয় রীতিনীতি এবং সামাজিক ব্যবস্থা সমূহ দূর হবে না,—তা দূর হবে জাতীয় বিপ্লবের দ্বারা। বর্তমানে এই জাতীয় বিপ্লব ঘটানোর ও তা পরিচালনার জন্যে একটি বৈপ্লবিক পার্টির আশু প্রয়োজন। এ চেষ্টা আগেও হয়েছে। মাদ্রাজ কংগ্রেসের পর নেহেরুর নেতৃত্বে রিপাবলিকান পার্টি গঠিত হয়েছিল। পরের বছরই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করা হয়। কয়েকবছর ধ'রে 'Workers' & 'Peasants' Party কিছু কিছু কাজ ক'রে আসছে। এই চেষ্টারই সর্বশেষ পরিণতি হ'য়েছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বামপন্থীদের বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ৬০ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যের সভামণ্ডপ ত্যাগে এবং Democratic Party নামে এক সংস্থা সংগঠনে। পূর্বের মতই এবারের এই চেষ্টাও একই পরিণতি লাভ করবে কিনা তা অবশ্য সময়ে বোঝা যাবে। ফল যাই হোক এই সব প্রচেষ্টার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈপ্লবিক সংহতি গ'ড়ে তোলার জন্যে একটি আকুতি দেশের মধ্যে আছে। সেই জন্যে এই নতুন Democratic Party-কে স্বাগত জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে তাদের সতর্ক করছি, সেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী শক্তি সম্পর্কে, যাঁরা তাদের এইপথে আসতে বাধ্য করেছে।

কোন রাজনৈতিক পার্টি কেবলমাত্র কতকগুলি ব্যক্তি নিয়েই গঠিত হ'তে পারে না। সমাজের কোন এক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই একটি পার্টি গড়ে ওঠে। সেই জন্যে রাজনৈতিক পার্টির প্রথম কাজই হ'ল, যে শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সে রূপ দেবার অঙ্গীকার করছে সেই শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে পূর্ণ হয় সেই রূপ এক কর্মসূচী প্রণয়ন করা। আগেকার প্রচেষ্টা যে ফলবতী হয় নি, তার প্রধান কারণই হ'ল তাই। এতদিন তাঁরা এরূপ কোন কর্মসূচী প্রণয়ন করেন নি। এই কর্মসূচীতে যে সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা থাকবে, সেই সকল মানুষ সে কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে সেই পার্টির পতাকাতলে এসে সমবেত হ'বে। তখন সেই পার্টি জনগণের বৈপ্লবিক ইচ্ছার সংহত রূপের আকার ধারণ করবে।

যাঁরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে বিপ্লব কামনা করেন, তাঁদের বিবেচনার জন্যে নিম্নে জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীর একটি খসড়া পেশ করা হ'ল ঃ

(১) উন্নত মানের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর ফেডারেল রিপাবলিক অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হ'বে ; এর শাসনকার্য পরিচালন বিভাগ (মন্ত্রিবর্গ) ভারতের সকল পূর্ণবয়স্ক নর-নারী কর্তৃক নির্বাচিত এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন ;

(২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা স্থানীয় শাসন কার্য পরিচালনা করবে। ভাষা ও ধর্মভিত্তিক নীতি অনুসারে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হ'বে, প্রাদেশিক সরকারগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের মতই গণতান্ত্রিক হ'বে ;

(৩) গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকারের হুকুম বলে বিনা ক্ষতিপূরণে দেশীয় রাজ্য সমূহের ও জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন এবং কৃষি জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে কৃষকগণকে ক্ষমতা প্রদান ;

(৪) সমস্ত জমি জাতীয় করণ ; নেট আয়ের শতকরা ১৫% ভাগ হিসাবে খাজনা দেবার অঙ্গীকারে কৃষকগণকে জমির দখলী সত্ব প্রদান ;

(৫) কৃষকের দেয় অন্যান্য সকল কর, যথা, সেচ কর প্রভৃতি ও অন্যান্য পরোক্ষ কর, যথা, লবণ কর, একসাইজ কর, রক্ষণ শুল্ক প্রভৃতি হ'তে রেহাই দানের ব্যবস্থা ;

(৬) যে কৃষক অত্যল্প পরিমাণ (Uneconomic holding) জমি চাষ ক'রে তাকে সর্বপ্রকার কর থেকে মুক্তিদান ;

(৭) যে সকল কৃষক দেউলে অবস্থায় উপনীত তাদের কৃষি ঋণ হ'তে মুক্তি দান ;

(৮) সুদের হার যাতে শতকরা ১০ টাকার বেশী না হয়, সেইরূপ আইন প্রণয়ন ;

(৯) কৃষকদের অল্পসুদে ঋণ দানের জন্যে সরকার কর্তৃক কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন ;

(১০) খনি ও যানবাহন সমূহের জাতীয় করণ ;

(১১) ৮ ঘণ্টায় দিন মজুরের রোজ ধার্য ;

(১২) নিম্নতম মজুরির হার নির্দেশ ও জীবন ধারণের ক্রমবর্ধমান মানের ব্যবস্থা ;

(১৩) রাষ্ট্র ও নিয়োগকারীগণের তিন-চতুর্থাংশ দেয় অর্থভাণ্ডার থেকে বেকার, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও প্রসূতিগণের জন্যে বীমার ব্যবস্থা ;

(১৪) ট্রেড্ ইউনিয়ান ও শ্রমিকদের ধর্মঘট করার ও রাজনৈতিক পার্টি গড়ার অধিকার রক্ষার জন্যে আইন প্রণয়ন ;

(১৫) মত প্রকাশের ও সভা সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ;

(১৬) ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ;

(১৭) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষার ব্যবস্থা ;

(১৮) বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ;

(১৯) অস্ত্রবহনের অধিকার।

জাতীয় বিপ্লবের এই কর্মসূচীর প্রথম ও দ্বিতীয় ধারাতে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে যে শাসনতন্ত্র গড়ে উঠবে তাতে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপেই রক্ষিত হবে। যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের সুবিধা হ'চ্ছে, ভাষা-সংস্কৃতি ও ধর্মভিত্তিক

প্রদেশের পুনর্বিন্যাস ও স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার ফলে সেই বিরোধের অবসান ঘটবে। বহুযুগ সঞ্চিত অন্ধ সংস্কারের ফলে যে সব সংখ্যা-লঘুদের মনে ভীতি আছে, রক্ষা-কবচের ব্যবস্থার ফলে তা-দূর হবে।

তারপর কৃষকের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ভূমি-বিপ্লবের যে সব ব্যবস্থা আছে সে সব ছাড়া জাতীয় বিপ্লব ঘটবে না। দেশের অধিকাংশ উৎপাদক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি না হ'লে সমগ্র-ভাবে জাতির উন্নতিই ঘটবে না।

জাতীয় আন্দোলনের সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা দেশের ব্যাপক শিল্পায়ণ। ভূমির মালিকানা স্বত্ব কৃষকের হাতে এনে ভূমি বিপ্লব না ঘটালে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। দেশের শিল্পায়ণে যে কেবল সাম্রাজ্যবাদই বাধা সৃষ্টি করে তাই নয়, দেশের ভূমি-ব্যবস্থা এবং সামন্ত যুগের নানা বিধিনিষেধও বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং এই উভয় বাধাই দূর করতে হবে।

ভারতকে আধুনিক শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে হ'লে প্রয়োজন: (১) জমির উপর থেকে ভিড় কমিয়ে সেই মানুষকে শিল্পে নিয়োগ; (২) সঞ্চিত অর্থ ও সম্পদকে কাঁচা টাকায় পরিবর্তন; (৩) জন-সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

উপরিউক্ত কর্মসূচীতে যে কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে তার সবগুলির রূপায়ণের দ্বারাই কেবল এই উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব।

এই কর্মসূচীর উপর ভিত্তি ক'রে জনগণকে সংঘবদ্ধ করা আর কঠিন হ'বে না; সেই জন্যে প্রথমতঃ এই কর্মসূচীটিকে দেশব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করতে হ'বে। প্রত্যেক মানুষকে এটি সম্যকভাবে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যে এগিয়ে এসে এই পার্টিতে যোগ দেবে তারা যেন নিজেদের এক বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর অংশ রূপে মনে করে। জনগণের উপর নিত্য-নৈমিত্তিক যে শোষণ, উৎপীড়ন, এবং দুঃখ-দুর্দশা চলছে তার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ ও লড়াইয়ে এরা সমর্থন জানাবে, পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। এই সব ছোটখাট সংগ্রামই ক্রমে দেশব্যাপী এক মহা-শক্তিতে সংহত হ'য়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানবে। দ্বিতীয়তঃ

প্রমাণ করতে হবে, এই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দাবীর পিছনে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন আছে। এখানেই এক কাজে দুই কাজ হবে। গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করার সঙ্গে সঙ্গে গণ-পরিষদের* দাবী ঘোষণা করতে হ'বে, এই ব'লে যে, ভারতের সংবিধান রচনার একমাত্র অধিকার ভারতের সকল পূর্ণবয়স্ক নর-নারী কর্তৃক নির্বাচিত গণ-পরিষদের—ভারতের সংবিধান রচনার অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নাই।

এই গণ-পরিষদ নির্বাচনের জন্যে জনগণকে সচেতন ক'রে তোলার আন্দোলন বা গণ-পরিষদের নির্বাচন কিংবা গণ-পরিষদের অধিবেশন কোনটাই অবৈধ বা বে-আইনি হ'তে পারে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও তার ধামাধরা ব্যক্তিগণ লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবকে "মুষ্টিমেয় বাক্যবীর—Vociferous minorities"-এর মত ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছে। এর জবাব আমাদের দিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে যে, এ প্রস্তাবে ভারতের মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সকল মানুষেরই স্বার্থ বিজড়িত ও এটি তাদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার অভিব্যক্তি। সে ইচ্ছাই রূপ নেবে গণ-পরিষদ নির্বাচনের মধ্যে।

কেবল বয়কট ও প্রত্যাখ্যান দিয়ে লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবকে কার্যকরী করে তোলা যাবে না, একথা ব্রিটিশও যেমন বোঝে, ভারতে তাদের ধামাধরারাও তেমনি জানে। উপরিউক্ত বৈপ্লবিক কর্মসূচীর দাবীর উপর গণ-পরিষদ নির্বাচনের দাবীতে ওঁরা বুঝবেন যে, এ দাবী শূন্যগর্ভ নয়।

যথেষ্ট পরিমাণ প্রচার ও আন্দোলনের পর যখন দেশে প্রয়োজনানুরূপ সচেতনতা দেখা যাবে তখন গণ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে গ্রামে গ্রামে নির্বাচনী কমিটি স্থাপন করতে হবে। এই কমিটি জনগণের দৈনন্দিন দাবী সমূহ (বেতন বৃদ্ধি, খাটুনির সময় হ্রাস, ধর্মঘটের অধিকার ও কৃষকদের জন্যে কর হ্রাস, দখলি স্বত্বের স্থায়িত্ব বিধান, সুদের হার হ্রাস প্রভৃতি) নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের

* ভারতের রাজনীতিতে গণপরিষদের পরিকল্পনা রায়ই প্রথম বার্লিনের চিঠিতে ঘোষণা করেন।

সঙ্গে লড়তে সুরু করবে। তার ফলে এই কমিটিকে ঘিরে জনগণ সংহত হয়ে উঠতে থাকবে; তখনই সেই শক্তি ক্রমে সারা দেশব্যাপী নির্বাচনী কমিটি সমূহের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে এক জাতীয় মহাশক্তিতে পরিণত হবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম সুরু করবে। তারপর এইভাবে আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লে ঠিক সময়ে জনগণের অভীপ্সিত বস্তু লাভের অস্ত্র রূপে গণ-পরিষদ গড়ে তোলার জন্যে নির্বাচন আরম্ভ হ'বে। এই গণ-পরিষদের প্রস্তাব তখন অবশ্যই "জাতীয় দাবী" বলে গ্রাহ্য হ'বে, কারণ তখন এর পিছনে থাকবে সংগ্রামী জনগণের সক্রিয় পোষকতা। এবং এই গণ-পরিষদের রচিত আইনই দেশের একমাত্র আইন কানুন বলে গণ্য হ'বে এবং গ্রাহ্য হবে।

সরকার এই আয়োজনে ও আন্দোলনে হয়তো বাধা দেবে। কিন্তু সত্যিকারের বৈপ্লবিক আন্দোলন বাধা পেয়ে আরো বেড়ে ওঠে,—এটাই হ'ল ইতিহাসের শিক্ষা। আমরা কেবল দেখব প্রস্তুতি পর্ব শেষ হওয়ার আগেই যেন সংঘাত না বাধে। শত্রু যেন সুরুতেই ধ্বংস করার সুযোগ না পায়। আমাদের উদ্দেশ্য যেন চোখের সামনে সর্বদাই স্পষ্ট থাকে। সর্বদা যেন যুক্তিসঙ্গত পথে চলি, সকল সময়েই যেন শক্তি সঞ্চয় করতে পারি। এতটুকু শক্তিও যেন বৃথা অপচয় না হয়, এবং সাহস, বিশ্বাস ও উদগ্র ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে যেন এগিয়ে চলতে পারি—জয় আমাদের অনিবার্য।"

(বার্লিন, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০)

[প্রথম সংস্করণ M. N. Roy Archives-এ রক্ষিত আছে; *Independent India*—8th March, 1939 সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত]

উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

ভারতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১৯৩০ সালের মে মাসে বার্লিনে লেবার ও সোশ্যালিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের কার্যকরী সমিতির এক পূর্ণ অধিবেশন বসে। ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রধান প্রধান নেতা এই অধিবেশনে যোগ দেন। রায় এই সময় ভারত সম্বন্ধে তাঁদের কাছে এক "খোলা চিঠি" পাঠান। তাতে লেখেন যে, কীভাবে লেবার পার্টি পরিচালিত ইংল্যাণ্ডের সরকার ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করে চলেছে এবং তা যে লেবার পার্টির ঘোষিত নীতি বহির্ভূত সে সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রতিবিধান দাবী করেন।

সে সময় তিনি জার্মান প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক জার্মান শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকেন।

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের নতুন নীতির ফলে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন একঘরে হয়ে পড়ে এবং সে সময় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার উপলক্ষ্যে নেতৃস্থানীয় অভিজ্ঞ কর্মীদের গ্রেপ্তারের ফলে রায় বহু চেষ্টায় যে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা অনভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়ে ও ইনটার-ন্যাশন্যালের নতুন নেতৃত্বের ভুল নির্দেশে একেবারেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। নতুন কমিউনিষ্টরা নতুন নীতি অনুসারে কংগ্রেস বিরোধী প্রচার ও কাজ কর্মের দ্বারা দেশদ্রোহীরূপে নিজেদের তুলে ধরছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নে অনর্থক ধর্মঘট বাধিয়ে, শ্রমিক আন্দোলনে সংহতি নষ্ট করে দলাদলির সৃষ্টি করছিলেন। তাঁরা প্রচার করতে থাকেন যে, বিপ্লব অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে, এখন হে শ্রমিকগণ, "সোভিয়েট" গড়ে তুলতে প্রস্তুত হও। এই সব প্রচার ও কার্য কলাপের ফলে সে সময় কমিউনিষ্টরা অচিরেই সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়।

রায় এ সব সংবাদ অতি বেদনার সঙ্গেই পেতে থাকলেন। তিনি অবিলম্বে ভারতে ফেরাই স্থির করলেন। যেমন করেই হোক ধ্বংসের হাত থেকে তার সৃষ্টিকে বাঁচাতে হবে। তা ছাড়া লাহোর কংগ্রেসের সময় থেকে ভারতে যে বৈপ্লবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তাকে সঠিক পথে চালাবার জন্যে ভারতেই যে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন সেটা অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু ভারতে ফেরা সহজ ছিল না। পূর্বেকার ওয়ারেন্টগুলো নতুন ভারত সংস্কার আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাকচ হয়ে গেলেও কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ওয়ারেন্ট তখনও ঝুলছিল। ব্র্যাণ্ডলার, থেলহাইমার প্রমুখ অনেক বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও রাজনীতিক তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁরা তাঁকে ভারতে ফিরতে নিষেধ করলেন। তিনি নিজেও জানতেন এবং তারাও জানতেন যে ভারতে ফেরা মাত্র তাঁকে ইংরেজের জেলে যেতে হবে। তাঁদের যুক্তি ছিল, ভারতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব সম্বন্ধে রায় অতিমাত্রায় আশাবাদী হচ্ছেন। ভারতের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এমন অবস্থায় আসে নি যা পরিচালনার জন্যে রায়ের সাক্ষাৎ উপস্থিতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। রায় সে সম্বন্ধে খুব বেশী দ্বিমত না হ'লেও তাঁকে যে যেতেই হ'বে এবং প্রয়োজন হ'লে যাবজ্জীবন জেল খাটতেও হবে, সেটা বললেন। তথাপি ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার এটা একটা অনিবার্য পদক্ষেপ বলেই তিনি মনে করলেন এবং তা থেকে তাঁর পশ্চাদাপসরণ করা চলবে না।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীমতী এলেনের সঙ্গে রায়ের পরিচয় ও রায়ের ভারত অভিমুখে যাত্রা

সেই সময় তিনি ইউরোপীয় কৃষক সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী এলেন গট্‌সচক-এর সঙ্গে পরিচিত হ'ন। রায় তখন ইংরেজি থেকে জার্মান অনুবাদের কাজ করে জীবিকার্জন করতেন। সে কাজ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে এই মহিলা সংগ্রহ করে আনতেন। সে সময় রায়ের প্রাণনাশের সম্ভাবনাও ছিল। সেজন্য তাঁকে সাবধানে এবং গুপ্তভাবেই থাকতে হ'ত। ব্র্যাণ্ডলার প্রমুখ বন্ধুরা এবং এই এলেন গট্‌সচক সে সময় তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য না দিলে তাঁর পক্ষে নিরাপদে থাকা, "চীনের বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব"-এর মত গবেষণামূলক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা,—সর্বোপরি অনুবাদের কাজ করে জীবিকার্জন একই সঙ্গে চলতে পারত না।

এই শ্রীমতী এলেনই রায়ের ভারত আগমনের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেন। ইনিই রায়ের গ্রেপ্তারের পর ইংল্যাণ্ডে তাঁর মামলার তদ্‌বির ও সারা ইউরোপে প্রচারের কাজ করেন; এবং জেলে থাকাকালীন রায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতেন, টাকা, পয়সা, বই প্রভৃতি পাঠাতেন। সেই সময়কার শ্রীমতী এলেনকে লেখা রায়ের অনেকগুলি চিঠি ***Letters from Jail*** নামে ছাপা হয়েছে।

তারপর সাতবছর পর রায় জেল থেকে মুক্ত হ'লে, ১৯৩৭ সালে ইউরোপ থেকে এসে রায়কে স্বামিত্বে বরণ করেন।

জীবনের শেষ পর্যন্ত এই মহীয়সী বিদুষী নারী প্রকৃত সহধর্মিনীর মতই রায়ের সর্বকর্মে সহযোগিতা করে গেছেন। যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে, শ্রীমতী এলেন রায়ের পাশে না থাকলে রায়ের কর্মের পরিমাণ কত কমে

শ্রীমতী এলেন রায়

যেত ; কত বই, কত লেখা, সর্টহ্যাণ্ডে লিখে না রাখলে প্রকাশিতই হ'ত না বা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনাই থাকত না। সময়ে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, অসুস্থ হ'য়ে হয়তো মারাই যেতেন।

রায়ের মৃত্যুর পর ইনিই রায়ের প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা *The Radical Humanist*-এর সম্পাদনা করতেন ; রায় প্রতিষ্ঠিত The Indian Renaissance Institute, Dheradun-এর সম্পাদিকা থেকে রায়ের দর্শন প্রচারের জন্যে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মুভমেণ্ট ও মানবতন্ত্রী আন্দোলন পরিচালিত করতেন; রায়ের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ, সম্পাদন ও প্রকাশনের জন্যে দেরাদুনে M. N. Roy Archives গ'ড়ে তোলেন।

শ্রীমতী এলেনের কর্মক্ষেত্র যে কেবল ভারতেই ছিল তাই নয়, সারা দুনিয়ায় যাতে এই আন্দোলনের প্রসার ঘটে সেই জন্যে তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করে আসেন। ১৯৬০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর আততায়ীর হাতে এই মহীয়সীর জীবনান্ত হয়।

জার্মানীতে সেই সময় রায় তাঁর প্রণীত "চীনের বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব" গ্রন্থের জন্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রিত হ'ন এবং বইখানির প্রথম জার্মান সংস্করণের জন্যে ৭০০ পাউণ্ড রয়্যালটি পান। সেই ৭০০ পাউণ্ড (প্রায় ১০০০০৲ টাকা) সম্বল ক'রে তিনি ভারতে ফেরার আয়োজন সুরু করেন।

রায়ের ভারত আগমনের প্রস্তুতি পর্ব পূর্ব থেকেই সুরু হয়েছিল। যে সব ভারতীয় ছাত্র ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রায়ের ভক্ত হ'য়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে অনাদি ভাদুড়ি, তায়েব শেখ, সুন্দর কাবাদি ও ব্রজেশ সিং প্রধান। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আগেই ইউরোপ থেকে চলে আসেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখেন। ভাদুড়ি ইউরোপে থেকে রায়কে সাহায্য করতে থাকেন। রায় ইটালি, মিশর প্রভৃতি দেশ ঘুরে বিভিন্ন জাহাজে চড়ে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি করাচীতে অবতরণ করেন। তারপর করাচী থেকে বোম্বাই আসেন। রায়ের এই প্রত্যাবর্তন অভিযান এমনই সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে করা হয়েছিল যে, প্রায় দু'মাস পর্যন্ত ইউরোপের ও ভারতের পুলিশ তা টের পায় নি।

১৯৩০ সালের শেষে ডাঃ মামুদ নাম নিয়ে জাল পাশপোর্ট পকেটে করে রায় ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ফেলে রেখে আসেন বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি ও কাগজপত্র। বিশেষতঃ *The Rise & Fall of the British Empire* নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের বহু পরিশ্রমে লেখা তথ্যবহুল এবং নতুন আলোক সম্পাতে উদ্ভাসিত এ যুগের ইতিহাসের অতি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। ইচ্ছা ছিল সুবিধা হ'লে আমেরিকায় বা অন্য কোথাও সেটি ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর আসে নি। হিটলারের ঝটিকা বাহিনী রায়ের সমস্ত সংগ্রহ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রায়ের ভারতে প্রত্যাবর্তন

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরফে ফাদার মার্টিন, ওরফে হরি সিং, ওরফে মিঃ হোয়াইট্‌, ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়, ওরফে এম এন রায়, ওরফে ভি, গার্সিয়া, ওরফে ডাঃ মান্দ চৌদ্দ বছর পরে পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের বিভিন্ন দেশে সামান্যতম অবস্থায় প্রবেশ করে সর্বোত্তমদের অন্যতম হ'য়ে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মাথামাখি ক'রে নিশ্চিন্ত আরামের ও বহু সম্মানিত জীবন ছেড়ে ব্রিটিশ সিংহের বিবরে ঢুকে তার গোঁফে টান মেরে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বান জানাতে করাচী বন্দরে অবতরণ করলেন ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরের এক প্রভাতে।

তাঁর বিরুদ্ধে রাজরোষ উদ্যত হয়েই ছিল। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই এই ছ'ফুট দু'ইঞ্চি দীর্ঘকায় বিরাট মানুষটি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আত্মগোপন করলেন। তিনি জানতেন গোপন পথে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হলেও, বিপ্লব ঘটিয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে সব জিনিষের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তার জন্যে মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে হয়, ভাব ও ভাবনাকে নতুন খাতে বহাতে হয়। এ কাজ গোপনে, নিষিদ্ধ পথে হয় না। প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে, সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, লেখা-লেখির মাধ্যমেই করতে হয় এবং তা করতে হ'লে প্রথমেই তাঁকে জেলে যেতে হবে। জেল থেকে যদি পুনরায় বেরিয়ে আসতে পারেন, তবেই সেটা সম্ভব হ'বে। যদি তা না পারেন, যদি ব্রিটিশ একবার হাতে পেয়ে পঁচিশ বছরের রাগের শোধ তুলতে সারা জীবনই কোনও না কোনও আইনের পাকে ফেলে আটকে রাখে তা হ'লে আর সেটা

হবে না। তবু ঝুঁকি তাকে নিতেই হ'বে। আর যদি জেল থেকে নাই ছাড়ে, তখন একমাত্র সান্ত্বনা থাকবে—যদি কিছু সংখ্যক লোকও তাঁর আদর্শ অনুসারে কাজ করে চলে। সুতরাং ধরা পড়ার আগেই কিছু সংখ্যক লোক নতুন করে তৈরী করে যেতে হবে।

পুরোনো যারা ছিল তারা ত' তাঁর কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে আন্তর্জাতিক সংঘের নতুন কর্তাদের নির্দেশে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা সুরু করেছে, কুৎসা রটনা আরম্ভ করেছে। তারা যুক্তির পথে না চলে রুশিয়ার সিংহাসনে যিনি থাকবেন তাঁরই নির্দেশ মেনে চলাই যে লাভজনক তা বুঝে ফেলেছে,

"নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
"বাকীর খাতায় শূন্য থাক,
"দূরের বাদ্য কাজ কি শুনে,
"মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক," এই হয়েছে তাদের নীতি।

যতদিন পারা যায় গোপনে থেকে কিছু নতুন মানুষ সংগ্রহের কাজে তিনি লেগে গেলেন।

এতদিন যে তিনি ভারতে কতটুকু কি করতে পেরেছিলেন তার মোটামুটি হিসেব ভারত সরকারের সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরো (C. I. B.) যে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস লিখেছিল তা থেকে পাওয়া যাবে:

"ভারতে কমিউনিজম প্রচারের ভার ভারতীয় কমিউনিষ্টদের প্রথম নেতা এম. এন. রায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে মস্কো ভাল ফলই পেয়েছিল। নেতা হবার মত সকল গুণ ছাড়াও তাঁর ছিল একজন দেশভক্ত ও সন্ত্রাসবাদীর তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব। সেই সঙ্গে ছিল উপনিবেশসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। প্রথম থেকেই তিনি কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল কর্তৃক সম্মানিত হয়ে এসেছেন। বিনা চেষ্টাতেই তিনি নেতৃত্বের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নিজ মতের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তিনি এমনই আস্থাবান ছিলেন যে, উচ্চতমদের সামনেও তা তিনি যুক্তি সহকারে উপস্থিত করতে পারতেন। অতি অভিজ্ঞ দক্ষতার সঙ্গে গোপন পথে তিনি ভারতের বাছা বাছা যুবকদের নিকট কমিউনিজিমের নতুন বাণী পাঠিয়ে দিতেন এবং তাদের সুসংগঠিত করে ধীরে ধীরে, ভেবেচিন্তে, সুশৃঙ্খলার সঙ্গে অতি সুনিশ্চিত-

ভাবে তাদের বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা জানা গেছে যে, রায় ভারতে একদল একনিষ্ঠ কমিউনিষ্ট গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব জাগিয়ে তুলতেও সক্ষম হচ্ছিলেন।”

বার্লিন থেকে কংগ্রেসের মধ্যে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক দল গ'ড়ে তোলার যে কর্মসূচী প্রেরণ করেছিলেন, সেই কার্যক্রমকে রূপ দেবার জন্যে একদল বিপ্লবী কাজ করছিলেন। রায় প্রথমেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন—ফলে তাদের প্রভাব ও কার্যকারিতা বেড়ে চলল।

বোম্বাইতে তিনি অনতিবিলম্বেই একদল উৎসাহী যুবক ও রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহ করলেন। তাদের কেউ যুবসংঘের কর্মী, কেউ ট্রেড ইউনিয়ানের, কেউ কংগ্রেসের। তারা অবশ্যই প্রথমে জানত না এই নতুন মানুষটির প্রকৃত পরিচয়। তারা মানুষটির সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই একত্রিত হয়েছিল। শীঘ্রই তাঁরা রায়ের আদর্শ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

রায়ের নিরবকাশ ব্যস্ততার দিন সুরু হ'ল। জার্মানীর কিছু প্রত্যাগত ছাত্র তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা পূর্বে তাঁরই নীতি অনুসারে কাজ ক'রে চলত তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নেতা ষষ্ঠ কংগ্রেসের নির্দেশিত নীতি গ্রহণ না ক'রে রায়ের নীতি অনুসারেই চলতে লাগলেন।

শ্রমিক আন্দোলন তখনো সংহত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভারতের কোথাও গড়ে ওঠে'নি। শ্রমিকদের ধাপ্পা দিয়ে মিথ্যা দরদীরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যে আন্দোলনকে কাজে লাগাচ্ছে। এ যাবৎ তিনি ইউরোপ থেকে ডাক ও বাহক মারফতেই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ ও শ্রেণী সচেতন করবার চেষ্টা করে এসেছেন। এবার প্রত্যক্ষভাবে সে কাজ সুরু করলেন। সেই জন্যে প্রথমেই তিনি শ্রমিক আন্দোলনের মূল নীতিগুলি বিবৃত করে এক ইস্তাহার প্রচার করলেন। বোম্বাই-এর কয়েকটি ইউনিয়ান সঙ্গে সঙ্গেই ইস্তাহারটির প্রতি সমর্থন জানাল। নিম্নে এর অনুবাদ দেওয়া হ'ল :

শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যবিধানের মূলনীতি

I. ট্রেড ইউনিয়ান হ'ল শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার। এর প্রধান কর্তব্য হ'ল এক একটি শিল্পে বা বাণিজ্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত ক'রে

তাদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা। অতএব কোন অবস্থাতেই ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থকে এক ক'রে দেখা কিংবা ধনিক-শ্রমিকের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের চেষ্টা কোন ট্রেড ইউনিয়ানের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না।

II. ভারতের সকল ট্রেড্ ইউনিয়ানের আশু দাবী :

(১) সকল শিল্প ও বাণিজ্যে কাজের সময় ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ, তারই মধ্যে থাকবে ১ ঘণ্টা বিশ্রাম ;

(২) প্রত্যেক শ্রমশীল নর-নারীর জীবন ধারণের একটি ন্যূনতম মান যেন হ্রাস না পায় সে জন্যে একটি সর্বনিম্নবেতনের হার নির্ধারণ ;

(৩) সাপ্তাহিক বেতন দানের ব্যবস্থা ;

(৪) স্ত্রী-পুরুষ অথবা জাতি নির্বিশেষে সমান শ্রমের সমান মজুরি ;

(৫) পুরো বেতনে বৎসরে একমাস ছুটি ;

(৬) ধনীর খরচে বেকারি, রোগ, জরা ও প্রসবকালীন বীমা ;

(৭) সকল শ্রমিকের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহের ও কর্মশালার ব্যবস্থা ; বাসগৃহের ভাড়া মজুরির শতকরা ১০ ভাগের বেশী হ'বে না ;

(৮) প্রত্যেক কারখানা, কর্মশালা, মিল, খনি, বন্দর, ডকইয়ার্ড, চা, কফি, রবার বাগান, এবং যেখানেই বহুলোক কাজ করে সেখানেই শ্রমিকদের যাতে নিয়মবিরুদ্ধভাবে খাটান না হয় সে জন্যে স্বাধীনসত্তাবিশিষ্ট শ্রমিকদের কমিটি গঠন;

(৯) ১৪ বৎসরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের কর্মে নিয়োগ বে-আইনী ঘোষণা ;

(১০) খনি অভ্যন্তরে নারী ও শিশুগণকে প্রেরণ বে-আইনি ঘোষণা ;

(১১) প্রসবের এক মাস পূর্বে ও পরে এক মাস ছুটি ;

(১২) ট্রেড ইউনিয়ানের মাধ্যম ব্যতিরেকে শ্রমিক সংগ্রহের অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান ; চা-বাগান প্রভৃতিতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংগ্রহের অবসান ;

(১৩) ধনী ও সরকার কর্তৃক শ্রমিকের উপর জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থার বিলোপ সাধন ;

(১৪) প্রভিডেন্ট ফণ্ডের উপর ধনীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিলোপ।

III. দেশের সমূহ ট্রেড্ ইউনিয়ানকে এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে এনে উল্লিখিত দাবী আদায়ের জন্যে দেশব্যাপী এক শক্তিশালী, বিরামহীন, সুশৃঙ্খল আন্দোলন পরিচালনা করতে হ'বে। বর্তমানে ধনিক বা সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে বর্তমানে যে স্ব-নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধিগণ কাজ

ক'রে আসছেন সে প্রথা অকার্যকরী ও ক্ষতিকর বলে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হ'বে। গ্রামসভা, মিছিল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে এই আন্দোলন চালান হ'বে।

IV. যখনই কোন শিল্প বা বাণিজ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে ধনীর বিরোধ বাধবে তখনই যেন দেশের সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন সেই শ্রমিকদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানায়। এই সমর্থন প্রকাশ লাভ করবে শ্রমিক ঐক্য ঘোষণায়, আর্থিক সাহায্য দানে ও সহানুভূতি মূলক ধর্মঘটে।

V. ধনীর সঙ্গে সকল বিরোধের মীমাংসাই কোন নেতা নিজের ইচ্ছামত করতে পারবেন না, শ্রমিকদের সাধারণ সভার অনুমতিক্রমেই সেটা করতে হ'বে।

VI. প্রত্যেক ইউনিয়ানই প্রতিবছর নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন ডাকবে, সেখানে সারা বৎসরের কার্য বিবরণীর আলোচনা, হিসাব-নিকাশের আলোচনা ও কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হ'বেন; কোন ইউনিয়ানের কর্মকর্তাগণ যদি তা না করেন তবে ইউনিয়ানের সভ্যরাই এই সভা আহ্বান ক'রে কর্মকর্তাদের হিসাব দাখিল করার দাবী জানাবে। এইসব ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই দায়িত্বহীন কর্মকর্তাদের পদচ্যুত্য করার জন্যে শ্রমিকদের সাহায্য করবে।

VII. ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের অধিবেশন প্রতি বৎসরই বসবে। ইউনিয়ানের সাধারণ সভ্যরা সাধারণ সভা ডেকে এই কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

VIII. ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি কোন শিল্প বা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তি না করে বা তাদের মতামত না নিয়ে সরকার বা ধনীদের সঙ্গে সেই শিল্প বা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন চুক্তি করতে পারবে না।

[১৯৩৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর রায় অল ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্যে যে আবেদন প্রচার করেন সেই আবেদনে এই দলিল খানি গ্রথিত করেন, এবং সে সময় আর প্রয়োজন না থাকায় IX, X, ও XI ধারা আবেদন পত্র থেকে বাদ দেন।]

XII. ভারতের ট্রেড্ ইউনিয়ান আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বীয় শ্রেণীর দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়েই সক্রিয় ভাবেই যোগ দেবে; তারা বিশ্বাস করে যে, বিদেশীয় ও দেশীয় ধনিকদের মধ্যে আপোষ মীমাংসার ফলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া যাবে (সংস্কারপন্থী সরকার বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন) তাতে শ্রমশীল শ্রেণীর দুঃখ ঘুচবে না। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দাবী হ'ল,

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান, ধনতন্ত্রের পরিসমাপ্তি, উৎপাদনের উপায় সমূহের জাতীয় করণ।

XIII. ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস অবিলম্বে দ্বিতীয় ধারার দাবী-গুলিসহ নিম্নলিখিত দাবীগুলির জন্যেও অবিলম্বে সংগ্রাম সুরু করবে ;

(ক) মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতা ; (খ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা ; (গ) সভা ও সম্মেলনের স্বাধীনতা ; (ঘ) সংঘ-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা।

[প্রথম মুদ্রন M. N. Roy Archives-এ সংরক্ষিত। ১৯৩৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর রায় সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক Independent India-তে পুনর্মুদ্রিত।]

এই সকল লেখাতে বৈপ্লবিক রাজনীতি ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক জ্ঞানের প্রখরতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় থাকায় ব্রিটিশ পুলিশের যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ সব লেখার পিছনে মানুষটি কে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

করাচী কংগ্রেসের প্রাক্কালে রায়ের তৎপরতা

সারা ভারতে রায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। কংগ্রেসের প্রায় সকল নেতার সঙ্গেই দেখা করলেন গোপনে। উত্তর প্রদেশে নাম নিলেন ডাঃ ব্যানার্জি। পল্লী অঞ্চলে অনেক কৃষক সমাবেশেও যোগ দিলেন। এলাহাবাদে নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ নেহেরু তাঁর জীবন স্মৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। নেহেরুর আমন্ত্রণে রায় করাচী কংগ্রেসে যোগ দান করবেন স্থির করলেন।

তখন গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন তাল পাতার আগুনের মত দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গিয়েছে, কোন শিখাই আর বিশেষ জ্বলছে না। বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে গান্ধীজির শান্তি স্থাপনের সর্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে। শীঘ্রই গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হবে। রায় এই প্রস্তাবিত চুক্তিকে সমালোচনা ক'রে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে "গণ-পরিষদ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছদ্মনামে প্রকাশ করলেন। প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ দেওয়া হ'ল :

"গান্ধী ও আরউইনের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ হয়ে আসছে। কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের এক বৃহৎ অংশ এই আলোচনা ভাল চোখে দেখে নি। অবশ্য কংগ্রেসের মধ্যে এই অসন্তোষ প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকারে দেখা দেয় নি। নেতাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের জন্যেই তাঁদের বারবার ভুল করা সত্ত্বেও সেটা হ'তে পারছে না। তারা আশা করেছিল শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা ভেঙ্গে যাবে এবং পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকবে। কিন্তু তাদের সে আশা নির্মূল হ'ল।

"অবশ্যই কোন কোন মহলে গান্ধীজির প্রতি বিশ্বাস চির দিনই অটুট থাকবে। এই "সন্ধি"-কে কংগ্রেসেরই জয় জ্ঞানে জয়ধ্বনি দিতেও বাধবে না। গর্বভরে প্রচার করা হবে যে, জনমতের চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষের "হৃদয়ের পরিবর্তন" ঘটল। অবশ্যই যাঁরা "হৃদয়ের পরিবর্তন" নীতিতে আস্থাবান অর্থাৎ যাঁরা চিতা বাঘের গায়ের দাগের পরিবর্তন সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, তাঁরা অবশ্যই এই প্রচারে খুসী হয়ে উঠবেন, নিজেদের বিশ্বাসের সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা হবেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেসের শত্রুহস্তে আত্মসমর্পনের বিনিময়েই এই "সন্ধি" হ'ল। আলোচনার সুরুতে গান্ধীজি যে সব দাবী পেশ করেছিলেন তা আলোচনা চলায় পথে ক্রমেই কমে আসতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত শূন্যে পর্যবসিত হয়। কেবলমাত্র সত্যাগ্রহী বন্দী মুক্তির দাবীটি গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তি দাবী প্রত্যাখ্যাত হয় এবং অন্য সব দাবীই পরিত্যক্ত হয়। সরকার কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধের দাবী মেনে নেওয়ার অর্থই হ'ল কংগ্রেসের অতি শোচনীয় পরাজয় এবং শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের সর্তে সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি প্রদান কোন রকম সুবিধা পাওয়াই নয়।

"এক কথায়, সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত সর্ত স্বীকার করে নিয়েই এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'বে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে কংগ্রেস এক গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হ'তে যাচ্ছেন, অথচ তাঁরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।"

"কংগ্রেসের এই আত্মসমর্পণে যাঁরা অসন্তুষ্ট তাঁরা হয়তো ভাবছেন, লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেই গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়া হচ্ছে, তাঁদের ভুল হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবেই এই আত্মসমর্পণের পথ খোলা রাখা হয়েছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে লাহোর কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এই বলে যে, তখন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে কোন উপকার হবে বলে কংগ্রেস মনে করে না। সে দিনের সে প্রত্যাখ্যান সর্তহীন ছিল না। বোঝা যাচ্ছে, বর্তমানে নেতাগণ মনে করছেন, সে দিনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে তাঁরা "স্বাধীনতার সার—substance of independence" আবিষ্কার করেছেন ব'লে তাঁরা জানিয়েছেন। অবশ্যই এই "স্বাধীনতার সনদ—Charter of liberty"-রূপ শাসনসংস্কার ব্যবস্থায় ধামাধরা বীর

পুঙ্গবরা ছাড়া কেউ খুসী নন। সেই জন্যে গোল টেবিল বৈঠকের শেষ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক হাত থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা হবে। কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র। আত্মসমর্পনের পর আর সর্ত দেওয়া চলে না। নতুন গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের আচরণ যাই হোক, কংগ্রেস যে গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হয়েছে তাইতেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার কংগ্রেস মেনে নিয়েছে। এর ফলে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

"কংগ্রেস যে আজকের এই লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তার কারণ কংগ্রেসের আদর্শের অস্পষ্টতা এবং আদর্শ লাভের উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী গোলমেলে ধারণা। স্বাধীনতার আদর্শকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয় নি, সেই জন্যে ইচ্ছামত এর ব্যাখ্যা দেওয়া ও সংজ্ঞা আরোপ করার অবকাশ রয়ে গেছে। এই অবস্থায় যতক্ষণ না 'স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করার যোগ্য প্রতিষ্ঠানের' বিকল্প প্রস্তাব তুলে ধরা হচ্ছে ততক্ষণ ভারত লুণ্ঠনকারী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অন্যায় দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

"এই অবস্থায় কংগ্রেস নেতাগণ সম্ভবতঃ ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস পর্যন্ত পৌছতে পারেন। কিন্তু সে সম্বন্ধেও যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে। সাম্রাজ্যবাদ সর্বাপেক্ষা অল্প কিছু ক্ষমতা ছাড়া বেশী কিছু ত্যাগ করবে না। কংগ্রেস যদি সাম্রাজ্যবাদের দেওয়া এই অত্যল্পে খুসী না হয়, তবে তাকে ক্ষমতা দখলের জন্যে বিপ্লবের পথই ধরতে হবে। কিন্তু অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, সে পথ একেবারে পরিত্যাগ ক'রে এখন সাম্রাজ্যবাদ দয়া করে যা দেবে তাকেই মাথা পেতে নিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ ধনিক-বণিকদের সম্বন্ধে যতই উদারতা দেখাক্, তারা কিন্তু কখনো ভারতীয় জনসাধারণকে শোষণ ক'রে যে সম্পদ আহরণ করছে তার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হবে এমন কাজ করবে না।

"সুতরাং সেই পুরাতন প্রশ্নে ফিরে যেতে হয়—জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ কিংবা সকলপ্রকার বিদেশী সম্পর্কবিহীন পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা? অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তর কোন দিনই স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া হয় নি। আজ সেই সময় সমাগত এবং তার উত্তরও দিতে হবে।

"অবশ্যই আসন্ন করাচী কংগ্রেসে নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিদের কাছে এই আত্ম-সমর্পণের সমর্থনের জন্যে আবেদন জানাবে না। তাঁরা বিজয়ী বীরের ভেক ধারণ করেই আসরে অবতীর্ণ হবেন। তাঁরা বলবেন, কংগ্রেস আজ সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতে স্বীকৃত হয়েছে নিজেদের সর্তে। খুশিমত চলা-বলার পথ কংগ্রেসের সামনে সর্বদাই খোলা আছে। যদি দেখা যায়, নতুন শাসনতন্ত্রে "স্বাধীনতার সার—Substance of Independence" দেওয়া হয় নি, তবে তা প্রত্যাখান করার অধিকার তাদের সর্বদাই থাকবে। এ ছাড়াও তাঁরা ভুয়ো এবং চরমপন্থীদের মত গরম গরম ভাষণের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ইচ্ছামত বেরিয়ে যাবার অধিকারকে (Right of Secessation) এক মহামূল্য অধিকাররূপে অভিহিত ক'রে সাধারণ কর্মীদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন। তাঁরা বলবেন, স্বায়ত্ব শাসিত ভারত স্বাধীন ভারতেরই সমতুল্য, কারণ যে কোন সময় ইচ্ছামত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসবার অধিকার তখন ভারতের থাকবে। এই বিতর্কমূলক অধিকারের মোহে বিমুগ্ধ হ'য়ে কংগ্রেস ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাসকেই গ্রহণ করতে রাজি হ'য়ে যাবে।

"এই অবস্থায় সত্যিকারের মুক্তি সংগ্রামের যাঁরা যোদ্ধা তাঁদের পথ অতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তাঁদের উদ্দেশ্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে। তাঁরা স্বাধীনতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলবেন যে, সাম্রাজ্যবাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুমতিক্রমে সে জিনিস পাওয়া যায় না। সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন যে ক্ষমতার প্রশ্ন, তাই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হ'বে।

"সুস্পষ্ট কর্মসূচী ও যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা এই আপোষ ও আত্মসমর্পণের নীতিকে বাধা দিতে হ'বে। মুক্তি সংগ্রামকে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর পর্যায়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে। বৈপ্লবিক আদর্শে আদর্শবান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বের নির্দেশে আরও কার্যকরী পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে অতি স্বচ্ছ ভাষায় বর্ণিত এক রাজনৈতিক কর্মসূচী অনুসারে এই সংগ্রাম পরিচালিত করতে হ'বে। ঋণাত্মক সংকল্প গ্রহণের নিষ্ফল পরিক্রমা থেকে বেরিয়ে আসতে হ'বে, গরম গরম বুলি দিয়ে আইন সভার মধ্যে সংগ্রামের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যে মোহ সৃষ্টি করা হয়েছিল তা ভেঙ্গে ফেলতে হ'বে; অযৌক্তিক আর প্রতিবিপ্লবী সব মতবাদ ঝেড়ে ফেলে সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

"যাতে আত্মসমর্পণকেই জয় বলে গৌরবান্বিত না করা হয়, সোনার শিকলকেই "স্বাধীনতার সনদ" বলে আদরে গলায় পরা না হয়, সেই জন্যে জাতীয় স্বাধীনতার স্বরূপকে ব্যাখ্যা করতেই হ'বে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত রেখে বিদেশী মূলধনের সাহায্যে দেশের অধিকাংশ মানুষকে যে শোষণ করা হয়, তার থেকে মুক্তির নামই জাতীয় স্বাধীনতা। আরো স্পষ্ট করে বললে এই দাঁড়ায় যে, দেশে এমন সব ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে, যার ফলে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের অবস্থার যেন আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং দেশের এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করবার জন্যে তাদের হাতে যেন যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। বলাই বাহুল্য যে, এ ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের অনুমতিক্রমে কদাচ ঘটতে পারে না। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা আসবে সেই দিন, যেদিন জনগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে আনতে পারবে।

"এই ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনীয়তা যখনই স্বীকার করা হ'বে তখনই ক্ষমতা ছিনিয়ে আনার উপযুক্ত অস্ত্র নির্মাণও সুরু হয়ে যাবে। শোষিত নিপীড়িত জনগণই এই অস্ত্র গড়ে তুলবে। তারপর সেই অস্ত্র দিয়ে বর্তমান সরকারকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করবে। অর্থাৎ স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে তুলতে হ'বে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রফা ক'রে দরিদ্র ভারতের জনগণের স্বার্থ কোন দিনই সিদ্ধ হ'বে না, সুতরাং তাদের দাবী পূর্ণ করার জন্যে তাদেরই পথ খুঁজে বের করতে হবে। ক্ষমতা দখলের জন্যে যে সংগ্রাম চলবে তা চালাবার জন্যে তাদের গণ-পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলতে হ'বে। এই সব গণ-পঞ্চায়েৎ সক্রিয় হয়ে উঠলেই জাতীয় সার্বভৌম পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্যে এদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হ'বে। এই পরিষদই জনগণের স্বার্থে স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা ক'রে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের উদ্বোধন করবে। এই জাতীয় গণপরিষদের (Constituent Assembly) প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্দেশই হ'বে ক্ষমতা দখলের জন্যে গণ-বিক্ষোভ সুরু করার ইঙ্গিত। কেবল মাত্র এই পথেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। এই গণ-বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে যে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ক্ষমতার যন্ত্র গড়ে উঠবে কেবলমাত্র তার সাহায্যেই প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা লাভ হতে পারে।"

[১৯৩১ সালের মার্চ মাসের প্রথমে লেখা, প্রথম মুদ্রণের নিদর্শন M. N. Roy Archives-এ রক্ষিত, ১৯৩৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর I. I. তে পুনর্মুদ্রিত।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

করাচী কংগ্রেসে রায়

এদিকে পুলিশ সংবাদ পেয়েছে, ইউরোপ থেকে রায় কোনও এক অজ্ঞাত পথে, ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। এবং স্বদেশে পদার্পনও করেছেন। সমগ্র ভারতের পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। পুলিশ আরও সংবাদ পেয়েছে, রায় করাচী কংগ্রেসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁর সাক্ষাৎ সেখানেই মিলবে এই সম্ভাবনায় পুলিশ সচকিত হয়ে উঠল।

ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতাদের কার্যকলাপের মধ্যে, নানা লেখা ও প্রবন্ধে অনেক শ্রমিক ও কংগ্রেস নেতাদের কথাবার্তায় স্পষ্ট বোঝা গেল যে, রায় এসেছেন, এবং খুবই কর্মব্যস্ত। পুলিশ ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না, কেবলি ফস্‌কে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সিংহের লেজ মাড়িয়ে যাচ্ছে, চমকে পিছন ফিরে আর হদিস্ মিলছে না; গোঁফে টান পড়ে, মুখব্যাদন আর গর্জনই সার হয়, ধরা পড়ে না। এমন সময় খবর এল রায় করাচী কংগ্রেসে যোগদান করছেন।

সমস্ত ভারতবর্ষের বাছা বাছা পুলিশ অফিসারদের সমাবেশ করা হল এবং কলিকাতা পুলিশের একজন অতিদক্ষ অফিসারের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হ'ল— "অপারেশন রায়"।

ছ'ফুটের উপর লম্বা, রোগাও নয় মোটাও নয়, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতন মর্যাদাব্যঞ্জক চলন, বহুভাষাবিদ, গায়ের রং শ্যাম। ইউরোপ, আমেরিকা, মেক্সিকোতে তোলা খানকয়েক ছবিও এই বর্ণনার সঙ্গে গোয়েন্দা বাহিনীর প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে।

এই সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী নানা বেশে, নানা ফিকিরে সমস্ত কংগ্রেস ছেয়ে ফেলেছে। ডেলিগেট শিবির, দর্শক শিবির, প্রদর্শনী এলাকা, শত শত দোকান— কোথাও যেন কোন রন্ধ্র না থাকে।

নাঃ—কিছুতেই কিছু হল না। তিনি এলেন, প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন, আবার চলেও গেলেন। যারা জানবার তারা সবাই জানল, করাচী কংগ্রেসে গৃহীত মৌলিক অধিকারের (Fundamental Rights) প্রস্তাব এম, এন, রায়ের সম্পূর্ণ রচনা না হ'লেও তাতে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। রায়ের প্রচেষ্টা কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হ'ল। কিন্তু কোথায় সেই "মিষ্টিম্যান" এম, এন, রায়?

এই কংগ্রেসের আগের অধিবেশন বসেছিল ১৯২৯ সালে লাহোরে। সেই অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের ঈপ্সিত আদর্শ "স্বরাজ" এর পরিবর্তে "পূর্ণ স্বাধীনতার" আদর্শ গ্রহণ করা হয়।

তারপর ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে সকলে কারামুক্ত হ'ন, এবং করাচীতে ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন ডাকা হয়; মূল আলোচ্য বিষয় ছিল গান্ধীজির বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার প্রস্তাব। রায়ের পূর্বোল্লিখিত ইস্তাহারখানি কংগ্রেসের মধ্যেও প্রচারিত হয়েছিল। রায়ের যুক্তিতে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিল। সাধারণ কর্মীদের তাই কেবল গরম বক্তৃতা দিয়ে আর ভোলান যাচ্ছিল না। সুতরাং কিছু একটা দিতে হয়।

রায়, কংগ্রেসের নেহেরু, সুভাষ প্রভৃতি বামপন্থী নেতৃবৃন্দকে বললেন, "স্বরাজের" মতই "পূর্ণস্বাধীনতা"ও ধোঁয়াটে র'য়ে যাবে,—যদি একে ব্যাখ্যা করা না হয়, এবং এই ব্যাখ্যার সহজ উপায় হ'ল, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হ'লে সকল মানুষ ব্যক্তিগতভাবে কী পাবে তার উল্লেখ করা। স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করে সেটি প্রস্তাবাকারে অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত, নতুবা ভারতকে মাত্র ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ পর্যায়ের স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতাটুকু দিয়ে ইংরাজ বণিক ও ভারতীয় ধনিকদের মিশ্র শোষণ-শাসনকেই "পূর্ণ স্বাধীনতা" বলে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার সম্ভাবনা আছে এবং তাকেই পূর্ণ স্বাধীনতা বলে গ্রহণ করবার মত নেতারও অভাব নাই।

কিছু ফল হ'ল। নেহেরুর চেষ্টায় রায় এবং দক্ষিণপন্থীদের মাঝামাঝি এক খিচুড়ি প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল—যা পরে "করাচী প্রস্তাব" নামে খ্যাত হ'ল। বিলাতের সেই গোলটেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে এই মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবটির গুরুত্ব খুবই বেশী। এর একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই প্রস্তাবের ফলে ভারতের

জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তেমনি স্বাধীনতাযুদ্ধও একধাপ এগিয়ে একটা শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করল। রায় চেষ্টা না করলে ঠিক ঐ সময়ে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হ'ত কিনা সন্দেহ। সে হিসাবে বলতে হয়, প্রথম রাউণ্ড লড়াইয়ে ব্রিটিশ সিংহ রায়ের কাছে হারল।

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। পাঁচ লক্ষ নাগরিকের যে নগর পাঁচ দিন আগে গড়ে উঠেছিল, পাঁচ দিন পরে তেমনি রাতারাতি শূন্য হ'য়ে গেল। কোথাও রায় নাই। কোন্ পথে এলেন, আর কোন্ পথেই বা গেলেন! তবে কি রায় মোটেই আসেন নি? দূর থেকেই কাজ সারলেন। তাই বা কেমন করে হয়! পরোক্ষ প্রমাণ ত' তেমন কথা বলে না। সে দিন সবশেষে কংগ্রেস শিবির ত্যাগ করেছিল পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনী, অবশ্য মাথা হেঁট ক'রে।

১৯০৫-১৯১৬ সালের যুগে রায়ের আত্মগোপন দক্ষতার কাছে হার মেনে গোয়েন্দা পুলিস বলত, রায় যখন সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে যোগ শিখত তখনই মারণ, উচাটন, বশীকরণ, চন্দন, মোহন, বিস্মাপন, প্রশমন, বর্ষণ, সন্তাপন, বিলাপন, মাদন, মানব, তামস, সৌমন প্রভৃতি অনেক তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছিল। এতে শত্রু কখনো ঘুমোয়, কখনো কাঁদে, কখনো ভুল দেখে, কখনো বিস্ময়ে চোখ কপালে তোলে। সেই ফাঁকে রায় কাজ গুছিয়ে সরে পড়ে। পুলিসের মধ্যে সাধারণতঃ তুকতাক, তন্ত্র-মন্ত্র, জড়িবটি, মাদুলি-কবচের উপর বড় বেশী আস্থা। এত বড় জাল কেটেও যখন রায় বেরিয়ে গেলেন তখন তাঁরা ভাবলেন, হয়তো রায় এখনো সে সব মন্ত্র ভোলেন নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

করাচী কংগ্রেসের পরে

করাচী কংগ্রেসের পরেই রায় এই অধিবেশনের কার্যাবলী ও ফলাফলের আলোচনা করলেন এক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি অতি সঙ্গোপনে মুদ্রিত ক'রে ছদ্মনামে প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধটির প্রধান প্রধান অংশের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হ'ল :

"এগার বৎসর পূর্বে কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করে। অজান্তেই তখন কংগ্রেস বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অচিরেই দেখা যায় যে, সে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ এক মহা বিপ্লবের অগ্নিকাণ্ডে পরিণতি লাভ করার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এক দশকের অসংখ্য ঝড়ঝঞ্ঝা সংঘাতের পরে বিদ্রোহের সেই গর্বোন্নত পতাকা অবনমিত হয়েছে এবং এই লজ্জাকর ঘটনা ঘটেছে করাচীতে। বিপ্লবের রক্ত-পতাকা, যার তলায় ক্রমেই জনগণ দ্রুত এসে জমায়েৎ হচ্ছে, সেই রক্ত পতাকাকে সরিয়ে শান্তির পবিত্র শ্বেত পতাকা উড়ান হয়েছে, এবং মিষ্টি করে বলা হয়েছে, "এটাই সত্যের পথ।" অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার যে চিরন্তন অধিকার তা হিংসার দোহাই দিয়ে কেড়ে নেওয়া হ'ল। বিদ্রোহেরই অনিবার্য পরিণতি বিপ্লব, আর বিপ্লব ঘটতেই পারে না যদি এই অহিংসার নীতিকে কাপুরুষের নীতি বলে পরিত্যাগ করা না হয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে উত্যক্ত হ'য়ে যে বিদ্রোহের আগুন মানুষের মনে জ্বলেছে, আত্মসমর্পণের লজ্জা ও ধিক্কারে তাকে নিভিয়ে দিতে হ'বে—এই হোল মহাত্মাজির ইচ্ছা। কংগ্রেসও তার ডিক্‌টেটর-এর ইচ্ছা শিরোধার্য করেছে।

"১৯২০ সালে কংগ্রেসের যে নতুন অধ্যায় লেখা সুরু হয়েছিল তা শেষ হ'য়ে গেল। মাত্র এক বৎসর আগে লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী মানুষের ইনক্লাব জিন্দাবাদ

শান্তির বাণী তুচ্ছ করেই বিপ্লবী কংগ্রেসরই অধিবেশন বসেছিল। সেদিন, মহাত্মার ধ্বনির মাঝে লাহোরে এই শক্তি, যদিও তখনো তেমন সচেতন ও সংগঠিত হয়ে ওঠেনি, অনিচ্ছুক নেতাদের বিপ্লবের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে যাত্রা সুরু করতে বাধ্য করেছিল; সেদিন শুধু যে কেবল বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল তা নয়, সভাপতির মুখ দিয়ে 'ভারতে 'অতীত যুগের বর্বর প্রথা ও তার নিদর্শন' সমূহ সমূলে উচ্ছেদ করবার সংকল্পও ঘোষণা করা হয়েছিল। করাচীতে কংগ্রেস তার এই সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে ভুলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অনিচ্ছাকৃত বৈপ্লবিক পাপকার্যের ফলে মহাত্মাজি যে "হিমালয় সদৃশ ভুল" করেছিলেন তার জন্যে তিনি অবশ্যই অনুতপ্ত হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি বরং সিন্ধুকে হিমালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু করাচীর জল দিয়ে লাহোরের আগুন নেভাতে পারবেন না।

"করাচী কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক সমাবেশ ছিল না। অন্ধ ভক্তগণ এসেছিলেন দেবতা দর্শনে, যে দেবতা তাঁর খেয়াল খুশিমত একটা জাতির ভাগ্য নিয়ে লীলা খেলা করছেন। তোষামোদ ক'রে মহাত্মার মাহাত্ম্য আরো খানিকটা বাড়াবার জন্যে কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক ও কিছু মানসিক দৈন্যে ভরা পেটি বুর্জোয়া চরমপন্থীর উপস্থিতি ধর্মমেলার আবহাওয়ায় বিশেষ কোন তারতম্য ঘটাতে পারে নি। এই রাজনৈতিক কুম্ভমেলায় মাঝে মাঝে অনিচ্ছার সঙ্গে উচ্চারিত ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিও যেন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। রাজনৈতিক তোষামোদ, মানসিক দৈন্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি ভরা আবহাওয়ায় "সেনাপতিকে অনুসরণ কর" এই আধা সামরিক বুলিই ছিল করাচী কংগ্রেসের সর্বাধিক পছন্দ সই ধ্বনি।

"কংগ্রেস কিন্তু সব জেনেশুনে উটপাখীর মতই বালিতে মুখ লুকিয়ে বাস্তবতাকে এড়াতে চাইছিল। শান্তির বুলি ছিল যখন তার মুখে, তখন দেশ এক বৈপ্লবিক সংকটের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছিল। মহাত্মার মন্দিরে সেদিন ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি কদাচিৎ শোনা গেছে। কিন্তু সারা দেশে এই ধ্বনি ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। সেখানে শান্তি নাই, আছে কেবল শুধু দুটো অন্ন খুঁটে টিকে থাকার জন্যে কঠিন জীবন সংগ্রাম।

"উপরের অন্ধবিশ্বাস ও রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার তলায় আছে অন্ধ আক্রোশের গলিত লাভা। কংগ্রেসের মোহান্ত মহারাজ এই চাপা অসন্তোষের

আগুনকে আরো চেপে রাখার জন্যে বড় বড় বুলির ধূলি জাল সৃষ্টি করেন। অন্ধ ভক্তে ঠাসা কংগ্রেসের অধিবেশনকে একদিকে যেমন দিল্লী চুক্তিকে (গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট) সমর্থন করার জন্যে আবেদন জানান, আবার সেই সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শ যে পূর্ণ স্বাধীনতা তাও ঘোষণা করেন। ভেড়ার পাল অমনি মাথা গুঁজে মেষপালকের হুকুম তামিল করে।

"করাচী কংগ্রেস একদিকে যেমন মহাত্মার ব্যক্তিগত জয়ের বিজয় স্তম্ভরূপে পরিগণিত হ'বে, অপর দিকে তেমনি তাঁর ভক্তদের মানসিক দৈন্যের চূড়ান্ত নিদর্শন রূপেও চিহ্নিত থাকবে। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ত্যাগ করে ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস তথা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আদর্শে নির্লজ্জ প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে যারা ছিলেন, তাঁদের সম্পূর্ণ পরাভবের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্ররূপে কংগ্রেসকে আর গণ্য করা সম্ভব হ'বে না। কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতার যুদ্ধ থেমে যাবে না। বরং ভারতের অধিকাংশ জনগণের ক্রমবর্ধিত দারিদ্র্যের ফলে এই যুদ্ধ আরো ব্যাপক ও প্রবল হ'য়ে উঠতে থাকবে। অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে করাচী কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের খুব বেশী মূল্য নাই। এ কেবল বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান বন্যাকে আটকাবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা মাত্র, কিন্তু এ প্রচেষ্টায় কর্তাদের ক্লৈব্যই প্রস্ফুট হয়ে পড়েছে।

"ঔপনিবেশিক শোষণের অসহনীয় অবস্থা ভারতের জনগণকে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলছে। এই অবস্থার অন্ততঃ কিছুটা উপশম না হলে এই বিদ্রোহ শান্ত করা যাবে না। ঔপনিবেশিক শাসন যদি অটুট থাকে তবে তা হ'তে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস এই উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচী পরিত্যাগ করেছে। যে ব্যবস্থা ভারতের জনগণকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে সেই ব্যবস্থারই অংশীদার হয়ে কংগ্রেস সেই ব্যবস্থাকেই বাঁচিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করেছে, ফলে দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিও জোরালো হয়ে উঠছে। মহামান্য ব্রিটিশ রাজের ডোমিনিয়ান হিসাবে গণ্য হ'লেই ভারতের ঔপনিবেশিকত্ব ঘুচ্‌বে না। আর যদি কোন লাভই না থাকে তবে ভারতকে তার সাম্রাজ্যের অংশ রূপে গণ্য করার গরজই বা থাকবে কেন? ব্রিটিশ পার্লমেণ্টের অনুমোদিত শাসনতন্ত্রের সাহায্যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে—এ কথা কেবল রাজনৈতিক শিশুরাই ভাবতে পারে। ভারতে বৈপ্লবিক শক্তির সহিত মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে আজ

একটি রফা করতে চাইছে ; উদ্দেশ্য—এদের সাহায্যে নিজের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থাকে পুনরায় দৃঢ় করে তুলবে। কিন্তু এই রফার ফলে সত্যিকারের কোন ক্ষমতাই হস্তান্তরিত হবে না। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের দানরূপে পূর্ণ ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাসও পাওয়া যাবে না। ভারতের জনগণ ঔপনিবেশিক শোষণের শিকাররূপেই থেকে যাবে। ফলে তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তনই হ'বে না। ' যে ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার নবরূপায়ণে ভারতের উচ্চ শ্রেণীকে অংশীদার করে নিয়ে শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে যাচ্ছে সেই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতে জনগণকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হ'বেই। কংগ্রেস শান্তির বাণী প্রচার করতে পারে, কিন্তু ভারতীয় জনগণকে এই বিপ্লবের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

"সাম্রাজ্যবাদ যদি কংগ্রেসের সব দাবী মেনেও নেয় তা হ'লেও ভারতের অধিকাংশ মানুষের জীবন মরণ সমস্যার মীমাংসা হ'বে না। এ সমস্যার মীমাংসা আলোচনা-বৈঠকে বসে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে হবে না। ভারতের ভাগ্যের লড়াই চালাতে হ'বে ভারতের অগণিত পল্লীতে পল্লীতে। এই লড়াই ক্রমেই তীব্রতর হ'য়ে উঠছে। কংগ্রেসের শান্তি রক্ষার এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই সংগ্রাম পরিশেষে শোষণের সমগ্র ব্যবস্থাকেই নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে।

"বিদ্রোহী জনতার দৃঢ় কণ্ঠস্বরকে করাচী কংগ্রেসের কুম্ভমেলার নাম সংকীর্তন কিন্তু একেবারে চেপে দিতে পারে নি। জনগণের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্যে বিরামহীন সংগ্রামের এক কর্মসূচীর প্রস্তাব আমরা কংগ্রেসে পেশ করেছিলাম। মহাত্মার বাছাই ভক্তদের মধ্যে থেকেই প্রায় একশ ডেলিগেট এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। যারা ডেলিগেট নন এমন বহু দর্শকও সমর্থন জানিয়েছিলেন। যদিও কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র অনুসারে মাত্র ২৫ জন ডেলিগেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে কোন প্রস্তাব আলোচনার জন্যে গৃহীত হ'বে তথাপি এই প্রস্তাবটি চেপে দেওয়া হ'ল। তথাপি কর্তৃপক্ষ যে একটা চাপ অনুভব করছেন সেটা বেশ বোঝা গেল। তার প্রমাণ পাওয়া গেল করাচীর মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব নামে খ্যাত অসম্পূর্ণ প্রস্তাবটি অপ্রত্যাশিতরূপে গ্রহণে। কিন্তু জনগণের স্বার্থের প্রতি কৃত্রিম দরদ দেখাতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই যে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হ'ল, তাতে আর একটি জিনিষ বেশ প্রকট হ'য়ে উঠল—সেটি হ'ল, ঐহিক অশন, আসন, বসন, ভূষণে বীতরাগ মহাত্মার ভক্তদের ঐহিক স্বার্থপরতার উলঙ্গ মূর্তিখানা। ওয়ার্কিং কমিটির ছোট মহাত্মারা এই প্রস্তাবটি আলোচনা না করেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। এবং যদি না স্বয়ং পোপ তাঁর ক্রুদ্ধ

কার্ডিন্যালদের হাত থেকে এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক বেচারা জওহরলালকে রক্ষা না করতেন তবে বেচারীকেও রক্তলোলুপ কমিউনিষ্ট আখ্যায় আখ্যাত হ'তে হ'ত। ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় অর্ধেক এই অতি সাধারণ প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ছিলেন।

"করাচী কংগ্রেসে যা ঘটেছে তা বিশ্লেষণ ক'রে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করবে। তারা যদি এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তবে তাদের হতাশ হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ার কারণ নাই। তাদের সামনে পথ পরিষ্কার। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছেই। যারা প্রাণের দায়ে এই ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে মহাত্মাজির বাধা সত্ত্বেও লড়ে চলেছে তাদের সঙ্গে এই সব কংগ্রেস কর্মীরা যোগ দিতে পারে। ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক শক্তিকে দমনে রাখার জন্যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেশীয় ধনিক ও উচ্চ শ্রেণীর যে মিতালির চক্রান্ত হয়েছে তাকেই করাচী কংগ্রেসে সমর্থন জানানো হয়েছে। করাচী কংগ্রেসের এই অভিসন্ধির সম্যক অর্থ যারা বুঝবে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে সকল নিপীড়িত ও শোষিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ, সংহত ও সংগঠিত ক'রে তোলার কাজে লেগে যাবে।"

[প্রথম মুদ্রণ M. N. Roy Archives-এ সংরক্ষিত, ১৯৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী I. I-তে পুনর্মুদ্রিত]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রায়ের গ্রেপ্তার

সাতমাস নিরলস কঠিন চেষ্টার পর রায় বুঝলেন, যদি ধরা প'ড়ে বাকি জীবনটা কারাকক্ষেই কাটাতে হয়, তবু তার আদর্শের প্রচার বন্ধ হ'বে না, কিছু লোক তৈরি করা গেছে। তা ছাড়া যদি মীরাট বা কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামীদের মত দু'তিন বছর কারাবাসের উপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে যায়, তা হ'লে জেল থেকে মুক্ত হয়ে গোপন পথ ছেড়ে প্রকাশ্যেই রাজনীতি করতে পারবেন, অনেক অসুবিধা দূর হ'য়ে যাবে। অতএব এবারে ধরা দেওয়া যেতে পারে।

১৯৩১ সালের ২৭শে জুন বোম্বাই-এর এক হোটেলে মাননীয় অতিথি ডাঃ মামুদ গ্রেপ্তার হলেন। সচকিত হয়ে সমগ্র পৃথিবী জানল, বিশ্ব বিখ্যাত বিপ্লবী, সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাস, পঁচিশ বছরের রহস্যে ঘেরা মানুষ এম, এন, রায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। সমগ্র ভারত এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়িত হ'য়ে উঠল। মানুষটির সম্যক পরিচয় জানা থাক্ আর না থাক্ নামটাই এক রোমান্টিক রহস্যে মণ্ডিত হ'য়ে আছে সকল মানুষের কাছে!

সরকারী সিডিসন কমিটির রিপোর্টের সব চেয়ে সেরা রোম্যান্টিক চরিত্র, আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের নেতা জে, লাভষ্টোনের বন্ধু, সেই ভয়ঙ্কর হিন্দু বিপ্লবী, মেক্সিকোর সোস্যালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি, রুশিয়ার বাইরে প্রথম কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার বিশিষ্ট বন্ধু ও উপদেষ্টা, কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম, মধ্য এশিয়া, চীন, ভারত প্রমুখ সমগ্র প্রাচ্য দেশ সমূহের বিপ্লব সংগঠনের পরিচালক এম, এন, রায় বৃটিশ পুলিশের বিশ বৎসরের ঐকান্তিক চেষ্টার পর ধরা পড়লেন। ঘটনাটা আলোড়ন সৃষ্টি করবার মতই।
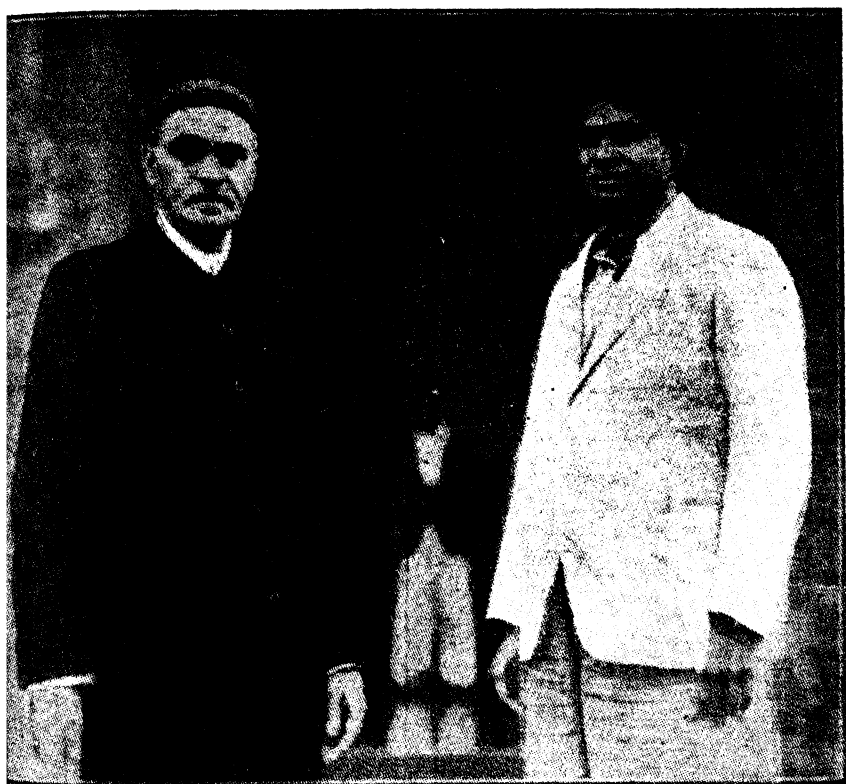
বোম্বাই পুলিশ কমিশনার সহ ধৃত মানবেন্দ্রনাথ—২৭শে জুন, ১৯৩১

১৯২৪ সালে কানপুরে যে কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল, সেই মামলারই পলাতক আসামী হিসাবে এক গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ছিল। সেই পরওয়ানার বলেই তাঁকে ধরা হ'ল এবং কয়েক মাস পরে বিচার আরম্ভ হ'ল।

তাঁর মামলা চালাবার জন্যে ডিফেন্স কমিটি গঠিত হ'ল। ভারতের সব দিক থেকেই সাহায্য এসে পৌঁছল। ভুলাভাই দেশাই, নেহেরু, কৈলাস নাথ কাটজু, বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বামী মিঃ পণ্ডিত প্রমুখ আইনজীবীরা তাঁর মামলা পরিচালনা করলেন।

তিনি এক বিবৃতি রচনা করলেন। তাতে লিখলেন, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের যে ১২১-এ ধারা অনুসারে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই ধারাটিতে ইংলণ্ডের রাজা ও ভারত সম্রাটের আইন সম্মত ভারত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধের শাস্তির কথা লেখা আছে। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট হলেন কবে? ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্র ক্ষমতা ইংলণ্ডের রাজার হাতে গেল কী ভাবে; কী পদ্ধতিতে? ইংলণ্ডেশ্বর যদি দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে সেই যুদ্ধে জিততেন তবে সার্বভৌম রাষ্ট্র ক্ষমতা ইংলণ্ডেশ্বরের হস্তে হস্তান্তরিত হতে পারত; কিংবা সমগ্র ভারতকে বা তার কোন অংশকে বিক্রয় বা হস্তান্তরের চুক্তি পত্রের দ্বারাও হতে পারত। এর কোনটাই হয় নি। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী নিয়েছিল, আর ভারতের এখানে সেখানে বানিজ্য কুঠি ছিল, দেশীয় রাজাদের সঙ্গে সুযোগ-সুবিধার চুক্তি ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনীর হাতে ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্র ক্ষমতা কোনও দিন হস্তান্তরিত হয়নি। সুতরাং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, যা তার নাই, সে বস্তু সে ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে তুলে দেয় কী করে? অতএব ভারতের আইন সঙ্গত রাজা যখন ইংলণ্ডেশ্বর নন তখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় অপরাধ হয় না এবং এহেতু ভারতীয় পেনাল কোডের ১২১-এ ধারাও অসিদ্ধ ধারা।

রায় তাঁর এই যুক্তির পক্ষে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন রচনার সময় গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মেকলের সভাপতিত্বে যে রয়েল কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তাদের অভিমত উল্লেখ করেন। এই কমিশনও উক্ত ধারা বিধিবদ্ধ করবার সময় এই যুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ঐ ধারা বিধিবদ্ধ করেছিলেন।

রায়ের পক্ষের ব্যারিষ্টাররা অবশ্য এই দিক দিয়ে রায়কে সমর্থন করেন নি। কয়েক মাস মোকদ্দমা চলার পর বিচারক ১৯৩২ সালের ৯ই জানুয়ারী তাঁকে ১২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পরে আপীলে তা হ্রাস পেয়ে ৬ বৎসর হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কারাগারে রায়

১৯১০ সালে রায়ের প্রথম কারাবাস। কারান্তরালের সে নির্জনতার মধ্যে আমরা তাঁকে দেখেছি মন জয়ের সুকঠিন তপস্যায় মগ্ন রাজযোগী রূপে।

এবার রায় বসলেন তাঁর ১৯১২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আঠার বছরের ঝড়-ঝঞ্জাময় জীবনের হিসাব নিকাশ করতে।

মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির আদর্শ নিয়ে জীবনের প্রথম পথ চলার সুরু।

বিদেশী শাসন মুক্ত হয়ে স্বাধীন না হ'লে কোন মুক্তিই সম্ভব নয়, সেই জন্যে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজন।

শুধু ব্রিটিশ রাজের অবসানেই ব্যক্তি মানুষের মুক্তি আসবে না, দেশীয় রাজা-মহারাজা শাসিত সামন্ততন্ত্র ও দেশীয় ধনিক-বণিক শাসিত ধনিকতন্ত্র থাকতে ভারতের জন সাধারণের দারিদ্র্য ঘুচবে না, দারিদ্র্য দূর না হলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তির কথা ওঠেই না। অতএব সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে কৃষক-শ্রমিকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দিতে হবে। মার্কস সে পথ দেখিয়েছেন। তাই তিনি মার্কসপন্থী।

রুশিয়াও মার্কস নির্দেশিত পথে চলেছে। ষ্ট্যালিনও মার্কসপন্থী। সেখানে সামন্ততন্ত্র লোপ পেয়েছে, ধনতন্ত্রও নাই, তথাপি মানুষের মুক্তি মিলল কই? পরে মিলবে? কিন্তু উঠ্‌তি গাছের পাতাতেই ত' গাছ চেনা যায়, প্রভাতেই ত' দিনের আভাস মেলে। যে জিনিষ দিতে চাই তা কেড়ে নিয়ে দেওয়া যায় কি করে? মানুষের মুক্তি কেড়ে নিলেই কি সে মুক্তি পেয়ে যাবে, তবে কি বিপ্লবীদের নীতি end justifies the means—উদ্দেশ্য দিয়েই উপায়ের বিচার, অর্থাৎ উদ্দেশ্য

ভাল হলে উপায় মন্দ হলেও দোষ নাই—এই সাধ্য-সাধন নীতির মধ্যে কি কোন ভুল আছে? মার্কসবাদকে পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে।

মার্কসবাদে যেমন Man is the root of mankind সূত্রে ব্যক্তিত্ববাদের স্বীকৃতি আছে, তেমনি এর বিরোধী সূত্রে সমষ্টিবাদের সমর্থনও আছে—অর্থ-নৈতিক নির্দেশ্যবাদও আছে। লেনিনের NEP নীতি যদি একটি সাময়িক সুবিধাবাদ মাত্র না হয়ে একটা নীতি হয়, তা হ'লে মার্কসবাদের সর্বহারার একাধিপত্য প্রভৃতি স্ব-বিরোধী নীতিই বা কী করে চলে। মার্কসবাদের মধ্যে এই স্ব-বিরোধী নীতির জন্যেই আজ বিপরীত ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে এবং স্ব-বিরোধী কর্মসূচীর প্রয়োগ-প্রচেষ্টায় বিষময় ফলের উদ্ভব সম্ভব হচ্ছে।

ব্যক্তি-মানুষের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও সুখ-শান্তির মাপকাঠি দিয়েই সভ্যতার মূল্য নিরূপিত হয়েছে। মানব সভ্যতার সেই রক্তিম রেখাটি যা মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে এগিয়ে চলেছে তারই অগ্রগতিতে কে কতটুকু সাহায্য করলে তা থেকেই মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের এবং নেতৃত্বের বিচার হয়ে এসেছে। রেনেসাঁসের ও বিদগ্ধ যুগের (Age of Enlightenment) পথিকৃৎরা সে বিচারেই নমস্য। মার্কস-লেনিন কি সেই পূর্বসূরীদেরই অন্যতম? এঁরা কি সেই একই রক্তিম রেখাটিকে প্রশস্ত করতে, বেগবান করতে সাহায্য করেছেন? তাই যদি হবে তা হলে তাঁদের তত্ত্বের মধ্যে এত পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তই বা কেন? আর সে দাবী টেকেই বা কী করে? সমগ্র সভ্যতার ইতিহাস, মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস পর্যালোচনা না করলে সে কথা ত' বোঝা যাবে না। এবার তিনি কারাভ্যন্তরের প্রায়ান্ধকার কোঠরে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আসন পাতলেন। সুরু হ'ল মার্কসবাদের বিচার বিশ্লেষণ—একেবারে গোড়া থেকে। মেটিরিয়ালিজিম বস্তুবাদই ছিল মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি। সুরু হ'ল সেখান থেকে।

তাঁর চিন্তার সমর্থনে তাঁকে পড়তে হ'ল সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান গ্রন্থ। শুধু ভারতের বিভিন্ন লাইব্রেরি ও বন্ধু বান্ধব বা ভক্তদের নিকট থেকেই নয়, ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও বই আনানো হ'তো। আমেরিকা থেকে জে, লাভষ্টোন, আমষ্টারডম থেকে স্নীভ্‌লীট, জার্মানী থেকে ব্র্যাণ্ডলার, থেলহাইমার প্রভৃতি পাঠাতে থাকলেন, আর নিয়মিত ভাবে পাঠাতে থাকলেন শ্রীমতী এলেন। পড়ার সঙ্গে চলল লেখা, এবং রাশি রাশি লেখা। আসলে কিন্তু রায় জেলে ব'সে কোনো একখানি বিশেষ গ্রন্থ লেখেন নি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের নানা Notes ও প্রবন্ধ লেখেন। পরে তার কিছু কিছু অংশ গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হয়েছে—যেমন *Fragments of a Prisoner's Diary, Historical Role of Islam, Fascism, Materialism* ইত্যাদি। এই Note-এর একটি প্রধান অংশ বিজ্ঞানের দার্শনিক ব্যাখ্যা সংক্রান্ত। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, এইগুলিকে গুছিয়ে বাড়িয়ে একটি বই লিখবেন—নাম দেবেন *Philosophical Consequences of Modern Science*। শেষ পর্যন্ত তা আর ক'রে উঠতে পারেন নি। এই Notes-গুলিই এখন প্রকাশ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

জেল থেকে ভারতের ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বন্ধুকে অনেক পত্রাদি লিখেছিলেন রায়। তার মধ্যে তিনি শ্রীমতী এলেনকে মাসে একখানি পত্র লিখতেন। তারই একখানিতে লিখলেন ঃ

"আমাদের এটুকু মনের জোর থাকা উচিত যাতে আমরা স্বীকার করতে পারি, একশ বছর আগে আমাদের দর্শনের সব কিছুই বলা হয়ে যায় নি, এবং বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের কয়েকটি মূলসূত্রের পুনর্বিবেচনা, পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে। এঙ্গেলসের সেই কথা স্মরণ কর। ডুয়েরিংএর সমালোচনায় যখন তিনি দশনের মধ্যে সবজান্তার ভাব নিয়ে 'এক ছকে বাঁধার ব্যবস্থা' (rounded up system) প্রচার করার জন্যে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। আর সেই ধিকৃত ছকে বাঁধা ব্যবস্থার (system-shaping) মনোভাবই এ যুগের গোড়া মার্কসবাদীদের গুণ বলে গণ্য হচ্ছে।....আমি আজ এ কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, মার্কসবাদ একটি ধরা-বাঁধা অনুশাসনের গুচ্ছ নয় (not a body of doctrines)—এটি একটি চিন্তার পদ্ধতি বিশেষ—a system of method" (Vide-*Letters From Jail*)

মার্কস ১৮৪৮ সালে প্রথম কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো প্রচার করেন। পরবর্তী প্রায় একশ' বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতি হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে রায় দেখলেন, একদিকে মার্কস-প্রমুখ জড়বাদীদের দাবী যেমন টেকে না, তেমনি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অনির্দেশ্যবাদের ফলে সাধারণভাবে সকল বস্তুবাদেরই ভিত্তি শিথিল হ'য়ে পড়েছে। তিনি এক নতুন দর্শনের সূত্রপাত করলেন। মেটিরিয়ালিজম নাম পরিত্যাগ করে নতুন মূল্য ও নতুন সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন দর্শনের নাম দিলেন ফিজিক্যাল রিয়ালিজম (Physical Realism)'।

মার্কসপ্রমুখ জড়বাদীদের মতে, জড় থেকেই যখন প্রাণের উদ্ভব ও মনের বিকাশ, তখন মনও জড়ের দ্বারাই নির্দেশিত হয়ে চিন্তা করে। **Man is the**

creature of circumstances—মানুষ পারিপার্শ্বিকের দাস। মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ এই তত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

রায় বললেন, জড় থেকেই প্রাণের উদ্ভব হয় সত্য, কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক সেরিব্র্যাল হেমিস্ফিয়ার এমনি এক অভিনব গুণে গুণান্বিত যে তা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে প্রভাবিত না হ'য়ে তার উর্ধে উঠে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে এবং পারিপার্শ্বিককেও পরিবর্তন করে চলার ক্ষমতা তার আছে। ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্রে, মতবাদ গঠনের সময়ে যদিও সে পারিপার্শ্বিক থেকেই খোরাক সংগ্রহ করে তথাপি ভাব, ভাবনা ও মতবাদ একবার গঠিত হ'য়ে গেলে তখন আর তার উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থাকে না, তখন সে নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধিতেই (own logic) এগিয়ে চলে।

এই যে মানুষের মন, তা কিন্তু কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় সত্তাবান নয়। এর সত্তাও বাস্তব—real। মনের এই গুরুত্ব স্বীকারের ফলে রায়কে জড়বাদ (Materealism) থেকে তাঁর দর্শনকে পৃথক করার জন্য Physical Realism নাম দিতে হয়। Physical matter (জড়) ও মনের reality-র সমগ্রতাকে একই সঙ্গে প্রকাশ করার জন্যেই এই নাম।

Physical Realism-এর মতবাদ দিয়ে তিনি কেবল জড়বাদকেই খণ্ডন করেন নি, অন্যান্য সকল প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে Direct Realism প্রত্যক্ষ বস্তুবাদকেও খণ্ডন করেছেন। জড় ও মনের সম্পর্কের এক অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার সাহায্যে নব্য-বস্তুবাদীদের (Neo-Realism) 'দ্বৈতবাদ', তাদের 'নিরপেক্ষ পদার্থ', 'শুদ্ধ সত্তা', 'অমূল প্রত্যক্ষণ' প্রভৃতির ধারণা-সমূহ খণ্ডন করেছেন।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে পরমাণু বিজ্ঞানের উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের মূল গঠন সম্বন্ধে পুরাতন ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। যে কার্য-কারণ নিয়মের নির্দেশ্যবাদের উপর সমগ্র বিজ্ঞান জগৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই কার্য-কারণ নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ দেখা দেয়।

দেখা যায় যে, যে সকল ইলেকট্রন দিয়ে পরমাণু গঠিত সে সকল ইলেকট্রন কোন নিয়ম মেনেই চলে না, এবং কখন যে কীভাবে বিচ্ছুরিত হ'বে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মূল বস্তুর এই খেয়াল খুশী মাফিক আচরণের উপর নির্ভর ক'রে বিজ্ঞানের কার্য-কারণ নিয়মের নির্দেশ্যবাদের উপর সন্দেহ প্রকাশ

করা আরম্ভ হয়। Heisenberg, Morgan, Planck, Jeans, Eddington Shoddy, Niel Bohr প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ তখন মিষ্টিক হয়ে ওঠেন। এঁরা নিজ নিজ গ্রন্থাদিতে লিখতে থাকেন যে, এ ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক পরিচয় জানবার এবং সেই অনুসারে কিছু গড়ে তোলবার সাধ্য মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

পদার্থ বিজ্ঞানীদের এই মতবাদের ফলে সাধারণ দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিও টলে ওঠে।

এ বিশ্বের সকল বস্তুই যদি কোন নিয়ম-কানুন না মেনে অনির্দিষ্ট পথেই চলে তবে গণতন্ত্রের মূলনীতি—আইনের শাসন (Rule of Law) টেকে কি করে, এবং তা যদি না টেকে তবে সমাজ ও রাষ্ট্র চালাবার জন্যে এই সকল সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা সেই মহাস্রষ্টার প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, রাজা, ডিক্‌টেটর ছাড়া আর ভরসা কি ?

দর্শন-বিজ্ঞানের এই সংকট দূর করার জন্যে রায় তাঁর গ্রন্থাদিতে যা লিখলেন, তার মর্মার্থ হ'ল, ইলেকট্রনের আচরণ খেয়াল খুশীমত চলে বটে কিন্তু এই খেয়াল-খুশীর মধ্যেও মোটামুটি একটি নিয়ম আছে। মোটামুটি এই নিয়ম মেনে চলার ফলেই বৃহৎ ক্ষেত্রে গড়ের নিয়ম ও সম্ভাবনার নিয়মের (Theory of Average and Theory of Probability) সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, কার্য-কারণ নিয়মের নির্দেশ্যবাদ নীতি অনুযায়ীই প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহ ঘটে। বহু এটমের সমষ্টি পেণ্ডুলাম ঠিকই নিয়ম মেনে দোলে ; চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ, দিন-রাত্রি নিয়ম অনুসারেই ঘটে ; ইউরেনিয়ামের বিশেষ এটমটি কখন কীভাবে ভেঙ্গে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিক্রিয়া (chain reaction) সুরু করবে সেটি জানা না গেলেও, এটা জানা থাকে যে, এটম বোমার ঘোড়া টিপলেই অসংখ্য এটম ভাঙ্গার ব্যবস্থা হবে, এবং এই অসংখ্যের মধ্যে কিছু না কিছু নিশ্চিতই ভাঙবে এবং সেই সঙ্গেই শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে যাবে, এবং এটম বোমাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ফাটবে।

সুতরাং সমাজ-রাষ্ট্রেও অনুরূপ গড়ের নিয়ম ও সম্ভাবনার নিয়ম সমান ভাবে কার্যকরী হবে। ব্যক্তি মানুষ Erratic (খেয়ালী) হলেও বৃহৎ ক্ষেত্রে, সংঘে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সে সাধারণত নিয়ম মেনেই চলবে এবং তা চলেও। অতএব সমাজে ও রাষ্ট্রে আইনের শাসন সম্ভব অর্থাৎ গণতন্ত্র অবাস্তব নয়।

রায় বললেন, আপেক্ষিকবাদ (Theory of Relativity) পারমাণবিক বিজ্ঞানে প্রয়োগ করলেই উপরিউক্ত সমস্যার সমাধান হবে। শ্রীমতী এলেনকে লিখলেন, "I have actually written that the uncertainty of Quantum phenomena, would be eventually explained by the application of the physical principle of Relativity to the microcosmic world and that Einstein's United Field Theory was moving in that direction of a grand synthesis of modern knowledge."

আইনষ্টাইন রায়কে তাঁর একজন উপযুক্ত সমজদার বলে স্বীকার করতেন। এবং তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল।

মার্কসবাদের সমস্ত মূল সূত্রকে তিনি একে একে বিচার-বিশ্লেষণ করলেন দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নব উদ্ভাবিত সত্যের আলোকে। কিন্তু তার ফলে মার্কসবাদের মধ্যে কী যে পেলেন এবং কী যে পেলেন না, তা তখন কেউ জানল না। যে সত্য তিনি ১৯৪৬ সালে উদ্ঘাটন করলেন সে সত্যের সন্ধান সম্ভবতঃ তিনি লৌহ কারার অন্ধকার গুহাভ্যন্তরেই পেয়েছিলেন। তখনো হয়তো তাঁর সত্যের শেষ যাচাই বাকি ছিল। সে যাচাই হবে ষ্ট্যালিনের কী করার আছে তা দেখে। কিন্তু ষ্টালিনের তখনো করার সময় আসেনি। এই জন্যে রায় তখনো ষ্ট্যালিনের সব দোষ ধরেও ধরছেন না। ষ্ট্যালিনের সাফাই ছিল, ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক রুশিয়া অচিরেই আক্রান্ত হ'বে। সেই শেষ সংগ্রামের সমরায়োজনে ব্যাপৃত বলেই তাকে একছত্রাধিপ সাজতে হয়েছে—এটা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই আখেরি হিসাবের আর বড় বেশী দেরীও নাই। ততদিন রায় তাঁর সত্য তাঁর মনের গোপনেই রাখবেন। তিনি ষ্ট্যালিনের প্রতি তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি রেখে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত নীরব রইলেন।

জেলখানাতে তিনি কেবল দর্শনের চর্চা নিয়েই মগ্ন ছিলেন না, অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। দীর্ঘ বার বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও তিনি জীবনের রস হারান নি। আপীলে কমে তা ছ'বছর হ'ল বটে, কিন্তু সে তো কয়েকবছর পরের ঘটনা। বিকশিত ব্যক্তিত্বের সাধনা তাঁর, অনুশীলন ব্রতের ব্রতী তিনি, তাঁর তা' হবেই বা কেন ?

একটা বিড়ালছানা কোথা থেকে এসে জুটল। একটু দুধ দিলেন। আবার আসে, আবার দুধ দেন। আশা যাওয়া আর বন্ধ হয় না। সুরু করলেন বিড়াল মনস্তত্ত্বঃ সম্বন্ধে গবেষণা। দীর্ঘ দিন ধরে সেই বিড়ালের এবং তারই বংশধরদের আচরণ ও ব্যবহার বিশ্লেষণ ও আশ্লেষণ করে দেখলেন যে, কী ভাবে জন্তু জগৎ থেকে বুদ্ধিবৃত্তি ধীরে ধীরে বেড়ে, মানুষে এসে অকস্মাৎ তা সীমাহীন প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে। এই অনুসন্ধান পরে তাঁর Physical Realism দর্শনের ব্যাখ্যায় কাজে লাগিয়েছেন। এই বিড়ালের বংশধরদের এখনো দেরাদুনে রায়ের বাস ভবনে দেখা যাবে।

তাঁর সেলের সামনে এক ফালি জমি। তাতে কিছু ফুলের গাছ। রায় ফুল-চাষে মন দিলেন। নতুন রকম ফুল ফোটাতে হবে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র নাই, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী ছুরি কাঁচি যন্ত্রপাতি নাই, কি করে কি হবে। শুধু চোখ, ব্লেড্, পেন-নাইফ্ ত' আছে, তাতেই হ'বে। নতুন বর্ণসুষমা নিয়ে সৃষ্টি হ'ল কস্‌মস্ ফুলের নতুন এক জাত। ইউরোপে শ্রীমতী এলেনকে লিখলেন, মাইক্রস্কোপ নাই, এর বেশী আর কিছু করা যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতি থাকলে আরো কিছু করা যেত।

বিকশিত ব্যক্তিত্ব ত' কেবল দশন বিজ্ঞান আর ফুলের ফসল তুললেই হ'বে না, সঙ্গীত চিত্রকলাও চাই। মেক্সিকোতে ইউরোপে সুযোগ পেলেই এ সবের চর্চা করেছেন তিনি। জেলখানাতেই বা বন্ধ থাকে কেন? এ সম্বন্ধেও বই আসে। পুরাতন বিদ্যার অনুশীলন চলে। শ্রীমতী এলেনকে লেখেন প্রিয় সঙ্গীতের দু' একখানা রেকর্ড পাঠাতে। ছবির আলোচনাও চলে। ইউরোপে থাকাকালীন কবে কোথায় পিকচার গ্যালারিতে কী ছবি দেখেছিলেন সে কথা লেখেন চিঠিতে।

কারাবাস কালে তার অধিকাংশ সময় এইভাবেই ব্যাপৃত থাকত। রুটিন-মাফিক কাজ। এক দিনের জন্যেও ব্যতিক্রম নাই। অথচ কীই বা হ'বে? বাকি জীবনটা হয়তো জেলেই কেটে যাবে, এ মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ সালের তিন আইন আছে। তবে আর প্রতিদিন বারো চৌদ্দ ঘণ্টা খাটা কেন—কোন্ কাজে লাগবে? না, এ চিন্তা তাঁর কোনও দিন আসেনি। পরম যোগীর নির্লিপ্ততা, বীতরাগভয়ক্রোধঃ, Stoic indifference যেন তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল। বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের সাধক তিনি। সে সাধনা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

তাঁকে করে যেতেই হ'বে। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তি অনন্ত সম্ভাবনাময়—তার বিকাশের সাধনাও তাই অনন্ত! এই অনন্তের সাধনাই তাঁকে করে চলতে হবে অহর্নিশ—শ্মশানে, মশানে, রাজদ্বারে, সাগরে, অরণ্যে, পর্বতে, লোকারণ্যে কিংবা নির্জনে। এ নিষ্কাম কর্ম নয়, নিতান্তই সকাম, এ সাধনার ফল লাভ হাতে হাতে।

তাই বলে শুধু এ সব নিয়েই থাকা নয়, রাজনীতিও সেই সঙ্গে চলত। ব্রিটিশ রাজের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রুকে আবদ্ধ রাখবার জন্যে সব চেয়ে ধুরন্ধর ও দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা পুলিশ সকল নিযুক্ত ছিল। এ সবের সদা-জাগ্রত সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গোপন পথে সে কাজ চলত অব্যাহত গতিতে।

তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি যে দল গড়ে গিয়েছিলেন, সেই ছোট্ট দলটিকে তিনি জেলে বসে পরিচালিত করতেন। তারা সংখ্যায় খুব সামান্য হ'লেও রায়ের পরিচালনা গুণে তাঁদের কাজকর্ম এতই ফলপ্রসূ হয় যে তাঁরা সমস্ত ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি ক'রে রায়পন্থী বা Royist নামে পরিচিত হন।

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেসে তাঁরা আধিপত্য করেন। রায়ের পুরাতন দাবী "সার্বজনীন ভোটের দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদই (Constituent Assembly) স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র রচনা করবে", কংগ্রেস এতদিন গ্রহণ করে নি। ১৯৩০ ও ৩১-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পর আর এ দাবী ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ১৯৩৪ সালে তা' গ্রহণ করল, কিন্তু গণপরিষদ গড়বার বৈপ্লবিক কৌশলটি গ্রহণ করল না, এড়িয়ে গেল। রায়পন্থীরা তখন একটি পৃথক কর্মসূচী ও বৈপ্লবিক নীতি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দল সৃষ্টি করল। ভারতের রাজনীতিতে বামপন্থী দলের অভ্যুদয়ের এই হল সূত্রপাত।

এই সময় শ্রমিক সংগঠনের দখল নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে রায়পন্থীদের প্রবল প্রতিযোগিতা সুরু হ'য়। রায়ের পরিচালনায় রায়পন্থীরা কমিউনিষ্ট পার্টিকে এই প্রতিযোগিতায় অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। ভারত সরকার লিখিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে লেখা আছে:

"কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের আশঙ্কা ছিল,—রায় ভারতে গিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি, সাংগঠনিক শক্তি এবং নেতৃত্ব দেবার

যোগ্যতা এবং সর্বোপরি তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব বামপন্থীদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে, ফলে "অফিসিয়াল" কমিউনিষ্ট আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে—এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না এবং কার্যতঃ তাই হয়েছিল। ইউরোপে থাকতে তিনি যে সব কমিউনিষ্ট তৈরী করেছিলেন, তাদের প্রায় সবই রায়কে ত্যাগ করে কমিনটার্ণের প্রতি অনুগত থাকে। তথাপি ১৯৩৪ সালের শেষে রায়ের নতুন অনুগামীরা চমৎকার ফল দেখায়। তারা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসে তাদের আসন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে, ৪০টির উপর নতুন শ্রমিক ইউনিয়ানকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং কলকাতায় স্থায়ী অফিস গড়ে তোলে। রায় পন্থীদের নেতৃত্বে এই ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস ক্রমে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পূর্ব মর্যাদা ফিরে পেতে থাকে।"

পুনরায় আর এক স্থানে লিখছেন :

"ভারতে ফেরার পর যে ক'দিন তিনি বাইরে ছিলেন তার মধ্যে একা একাই যা করেছিলেন তা কেবল রায়ের প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব! এমন কি তিনি জেল থেকেও তাঁর অনুগামীদের পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, রায়ের নীতি কত সঠিক ছিল। কমিনটার্ণ যদি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকে ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আদেশ দিত, তাহ'লে আজকাল কমিউনিষ্টদের প্রতি যে অভিযোগ করা হয়, তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ ছিল, সে নিন্দা থেকে তাঁরা বাঁচতে পারত। তা'ছাড়া তারা যদি সে সময় সেই আন্দোলনে যোগ দিত তা'হলে তারা সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের উপরই নিজেদের মতবাদ, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ছড়িয়ে দিতে পারত ও সমগ্র নেতৃত্বের উপরও উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বৈপ্লবিক শৃঙ্খলাবোধ সঞ্চারিত করতে পারত।"

ইতিমধ্যে আপীলের ফল বের হয়ে গেছে। কারাদণ্ড বার বছর থেকে ছ'বছরে নেমেছে।

গান্ধীজি উপর্যুপরি দুটি আইন অমান্য সংগ্রামে হেরে গিয়ে পুনরায় নিয়মতান্ত্রিকতার পথ ধরেছেন। সন্ত্রাসবাদীরাও তাদের পথ ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসে যোগদান করে কংগ্রেসকে একটি সর্বমতের প্ল্যাটফরমে পরিণত করতে চাইছে। কমিউনিষ্টরা সপ্তম কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসে ঢুকতে চাইছে। কংগ্রেস

বৈধ হয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে নতুন একদল বামপন্থী দল গড়ে উঠছে, তার মধ্যে অনেক রায়পন্থীও আছেন। তাঁরা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট নামে অভিহিত। রায় জেল থেকে তাদের এক দীর্ঘ চিঠি পাঠালেন। ছেপে তা প্রকাশ করা হ'ল। রায় তাতে লিখলেন, জমি, কল, কারখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ধানোৎপাদনের উপায় সমূহকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি করা বর্তমানে বিপ্লবের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তদ্‌পরিবর্তে জমিদার, রাজা ও মহারাজাদের নিকট থেকে জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে, তাদের মালিক করতে হবে। সুতরাং এ সংগ্রাম ব্যাপক অর্থে বহু মালিকের স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম। একে বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব বলা যেতে পারে, কিন্তু সোস্যালিষ্ট বিপ্লব বলা চলবে না। সুতরাং ঐ নাম যেন তারা বদলে ফেলে, নতুবা ভুল বোঝা বুঝির সম্ভাবনা থাকবে; কংগ্রেস সোস্যালিষ্টরা একঘরে হয়ে যেতে পারে। তাঁরা অবশ্য সে কথায় কর্ণপাত করেন নি।

ওদিকে ১৯৩৫ সালে মস্কোতে কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। ভারত থেকে রায়পন্থীগণ রায়ের লেখা এক পত্র পুস্তিকাকারে উক্ত কংগ্রেসে প্রেরণ করেন *। এতে ষষ্ঠ কংগ্রেসের ভুলের জন্যে কীভাবে পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেছে তারই বিচার বিশ্লেষণ করে, বিপ্লব বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট নীতি কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম থেকে ষষ্ঠ কংগ্রেস অবধি অনুসৃত হয়েছিল, তাই পুনরায় গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ করা হয়।

ইউরোপে নাৎসি ও ফ্যাসিষ্টদের জয়-জয়কারে ইতিমধ্যেই যে সকল অর্বাচীন, অকর্মণ্য ও মূর্খ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব শুধু ষড়যন্ত্রের দ্বারা লাভ করেছিল, তাদের মুখোস খুলে গিয়েছিল। জার্মানীতে কমিউনিষ্টরা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট ভেঙ্গে শত্রুতা করার ফলে উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অতি সহজেই হিটলার ক্ষমতায় আসতে পারে ও কমিউনিষ্টদের ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য দেশেও উগ্রবামপন্থা অনুসরণ করে, এবং অন্য সকলকে ধনীদের দালাল আখ্যায় আখ্যাত ক'রে নিজেরাই এক ঘরে হয়ে পড়ে।

ভারতেও ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস থেকে কমিউনিষ্টরা বের হয়ে যায়, এবং অতি সামান্য কয়েকজনে মিলে লাল ঝাণ্ডা ট্রেড ইউনিয়ান গড়ে তোলে। সেই কয়েক

* মূল M. N. Roy Archives-এ সংরক্ষিত ও *Our Differences* 1938. Saraswati Press—Calcutta গ্রন্থে *A Letter to the Communist International* নামে পুনর্মুদ্রিত।

বছরের মধ্যে কমিউনিষ্টদের উপর এত বিতৃষ্ণা দেখা গিয়েছিল যে, ইতিপূর্বে তেমনটি আর দেখা যায়নি।

সপ্তম কংগ্রেসে ষষ্ঠ কংগ্রেসের নীতি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। এবং ষষ্ঠ কংগ্রেসের নেতাদেরও পদচ্যুত করা হয়। যদিও ষ্টালিনের প্রশ্রয়েই এই সব উগ্র বামপন্থীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনকে জাহান্নমে পাঠিয়ে ফ্যাসিষ্ট নাৎসিদের ক্ষমতা দখলের সুবিধা ক'রে দিয়েছিল, তথাপি ষ্ট্যালিন সে সব কথা চেপে গিয়ে নিজের সকল দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এদের ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দেন। পরে এদের প্রায় সকলকেই হত্যা করা হয়।

শেষ পর্যন্ত রায়ের বহু নিন্দিত নীতি (বিপ্লববিরোধীদের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রন্ট গড়ার নীতি) সপ্তম কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়! কিন্তু রায়ের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য নতুন নেতারা এ নীতিকে নিজস্ব বলে চালাবার জন্যে মৌলিকতা দেখাতে গিয়ে উপনিবেশ সম্বন্ধে বহু ভুল ক্রটি করে বসে। যাই হোক, মন্দের ভাল হিসাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন যখন ধ্বংসপ্রায় তখন ইউনাইটেড ফ্রন্ট নীতি প্রয়োগ করে শেষ চেষ্টার ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু গলদ বহুস্থানেই ঘটতে থাকল ; পৃথিবীর কোথাও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ইউনাইটেড ফ্রন্ট গড়ে উঠল না—কোথাও তারা নেতৃত্ব পেল না, সর্বত্রই লেজুড় হয়ে পিছু পিছু চলতে থাকল।

এদিকে সময় হ'য়ে এল কারামুক্তির। ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া দেখে রায় বুঝলেন, ব্রিটিশ সম্ভবতঃ তাকে ছেড়েই দেবে—কারামুক্তির সময় জেল গেটে পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করবে না। অনুমান সত্য হ'ল।

মানবেন্দ্রনাথ—১৯৩৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রায়ের কারামুক্তি ও কংগ্রেসে যোগদান

১৯৩৬ সালের ২০শে নভেম্বর রায় কারামুক্ত হয়ে পূর্ণ উদ্যমে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকাশ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। অনেক বিপদ কাটিয়ে অসংখ্য আঘাত সয়ে বহুদিনের আশা পূর্ণ হ'ল। কারামুক্তির দিনই তিনি কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা পত্রে সই করে প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হ'লেন।

যেদিন থেকে রায় প্রকাশ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে নামলেন সেদিন থেকেই ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটল।

একমাস পরেই ফৈজপুরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সভাপতি। কারামুক্তির পর থেকেই রায় ও নেহেরু খুবই ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করছেন। ফৈজপুরেও সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা দেখা গেল।

সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও ইউনাইটেড্ প্রেস অব্ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত এই সময়কার কথা তাঁর "সাংবাদিকের স্মৃতিকথা"য় লিখেছেন:

"ফৈজপুর অধিবেশনে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম বাংলা দেশের অনেক সাংবাদিক। সেই অধিবেশনে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন এক বাঙালী বিপ্লবী নেতা, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নরেন্দ্রনাথের পিতৃদত্ত নামটা কবে মুছে গেছে কিন্তু জ্বল জ্বল করছে তাঁর স্বনির্বাচিত নাম, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সংক্ষেপে এম, এন, রায়।

"ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মতো মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া হলো তাঁকে। তাঁর জন্য সংরক্ষিত রইলো নির্দিষ্ট আলাদা কুটীর। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকেরা তাঁর

কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, সকলেরই কৌতূহল তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে। সকলেই জানতে চায় তিনি কায়মনোবাক্যে কংগ্রেসে যোগদান করবেন কিনা।

"একজন সাধারণ বিপ্লবীর মতো যৌবনের প্রারম্ভে তিনি অস্ত্রের সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা তাঁর। বিপদসঙ্কুল জীবন যাত্রায় পৃথিবীর নানা দেশে পরিভ্রমণ করেছেন, ভারতের বিপ্লবের বার্তা দেশে বিদেশে প্রচার করেছেন, সংগঠন করেছেন। তাঁর জীবন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো বিচিত্র। বিদেশী পুলিসের শৃগালচক্ষু থেকে নিজেকে গোপন রেখেছেন, আবার তারই মধ্যে বিপ্লবী অভিযাত্রাও সঙ্কুচিত করেন নি। মেক্সিকোতে তিনি কমিউনিষ্ট বিপ্লব পরিচালনা করেছেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থায় নেতৃত্ব করেছেন, মহাচীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের পুরোধা অংশ গ্রহণ করতে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট নেতৃবর্গের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতের বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনে আবির্ভূত হয়েছেন।

"মেক্সিকো, রাশিয়া ও চীনে এম, এন, রায় যে ঐতিহাসিক ভূমিকা অভিনয় করেছেন তা একজন বিদেশীর পক্ষে একান্ত অভূতপূর্ব। শুধু অভূতপূর্ব নয়, প্রায় অসম্ভব পর্যায়ের। তিনি অসধারণ প্রতিভাবলে সেই গৌরবময় অধিকার অর্জন করেছিলেন।

"এম, এন, রায় শুধু বিপ্লবী বা কুশলী সংগঠক নন, তাঁর মণীষা ও পাণ্ডিত্যের পরিধি ছিল না। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে তাঁর এমন উঁচু স্তরের জ্ঞান ছিল যে, মনে হয় সমুদ্রের মতো তা অতলস্পর্শ। পৃথিবীর বহু ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

"তাঁর বইগুলিতে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মানুষটির মনীষা ও প্রজ্ঞা ভবিষ্যৎ মানুষদের জন্য সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কার্ল মার্কস যেখানে শেষ করেছিলেন তারপরে হয়তো একমাত্র তিনিই নতুন কথা সংযোজন করতে পেরেছেন।"

"ফৈজপুরে এম, এন, রায় একজন কংগ্রেসের সেবকরূপে যোগদান করেছিলেন। মনে হয়েছিল, তিনি পৃথিবীর বিপ্লবী জয়যাত্রা ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন মাতৃভূমির সেবায় তা কংগ্রেসের পতাকা তলে সমর্পণ করবেন। কংগ্রেস

অধিবেশনে কৃষক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের খসড়া রচনার জন্য জওহরলাল তাঁকে অনুরোধ করেন। সকলের ধারণা হয়েছিল, পরবর্তী কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটিতে এম, এন, রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।"

কংগ্রেসের কয়েকটি প্রস্তাবের খসড়া রায় লিখে দিলেন। কংগ্রেস সদস্যের বাৎসরিক চার আনা চাঁদা কৃষক ফসল দিয়েও শোধ করতে পারবে—তাঁর এ প্রস্তাবও গৃহীত হ'ল।

গণ-পরিষদ গঠনের প্রাথমিক মহড়া হিসাবে আসন্ন আইন পরিষদের নির্বাচনে যে সব কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, তাদের নিয়ে একটি সম্মেলন (convention) সম্পর্কেও রায়ের এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল।

এই প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় ব্যাখ্যা করবার সময় সকলে একান্ত একাগ্রচিত্তে শুনল বটে কিন্তু কম লোকেই বুঝল। যারা বুঝবার, তারা বুঝলেন যে, বৈজ্ঞানিক রাজনীতি ভারতে কত নতুন! ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত বক্তৃতাই এ যাবৎ সকলে শুনে এসেছে। এ আবার কি! শুধু যে বৈজ্ঞানিক রাজনীতিই অভিনব তাই নয়, বৈপ্লবিক পদ্ধতি, কর্মসূচী ও কৌশল সম্বন্ধে আলোচনাটাও যে এদেশে কত নতুন তা বেশ বোঝা গেল, যখন দেখা গেল, পরিকল্পনাটির তাৎপর্য প্রায় কেউই বোঝে নি। শ্রোতার সংখ্যা ছিল, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য, কংগ্রেস প্রতিনিধি ও দর্শকদের সংখ্যা মিলিয়ে দশ হাজারের উপর।

কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও জনসাধারণের উপর রায়ের প্রভাব দেখে সকলে অনুমান করল, রায় এবার কংগ্রেসের প্রধান সম্পাদক হবেন এবং আগামী কংগ্রেসে সভাপতি হবেন।

গান্ধীজির সঙ্গে রায়ের দেখা হ'লেও আলাপ-আলোচনা কিছু হয় নি। দু'এক দিনের মধ্যেই হ'ল। প্রথমেই গান্ধীজি রায়কে তাঁর প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করলেন। রায় অস্বীকার করলেন। গান্ধীজির জীবনে এই অভিজ্ঞতা প্রথম। প্রার্থনান্তে গান্ধী-রায় আলোচনা চলল বেশ কিছুক্ষণ।.

উদ্দেশ্য দু'জনেরই এক—ভারতের স্বাধীনতা, কিন্তু পথ ভিন্ন।

রায় বললেন, গান্ধীজির পথে তা আসবে না। এলেও তা জনসাধারণের তথা শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের স্বাধীনতা হবে না, হবে ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধনিক-বণিকের যৌথ স্বাধীনতা।

গান্ধীজি বললেন, তা হ'তে পারে কিন্তু তাই বলে বিপ্লবের পথে তিনি যেতে পারবেন না।

রায় সম্বন্ধে সকল আনুমানিক আলোচনা থেমে গেল। লোকে বুঝল, রায়-গান্ধীর মিল হ'ল না। দু'জনের পথ দু'দিকে! একজনের পথ বিপ্লবের সাহায্যে ক্ষমতা দখল, আর একজনের অহিংসা আন্দোলনের দ্বারা চাপ দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর। রায়ের পথ বিপদ সঙ্কুল—সে পথে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার একান্ত অভাব। গান্ধীজির পথ একান্ত নিরাপদ, ছ'মাসের বেশী জেল হবার সম্ভাবনা কম এবং তারই মধ্যে আবার গান্ধী-আরউইন চুক্তির ন্যায় কোন চুক্তির ফলে মুক্তির ব্যবস্থা।

গান্ধীজির ইঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নেতারা মুখ ফেরালেন। নেহেরুর ঘনিষ্ঠতা বন্ধ হয়ে গেল। চকিতেই সব ঘটে গেল। ক'দিন পরে রায় বোম্বাই ফিরলেন—রিক্ত হস্তে। তবে ঠিক রিক্ত নয়, আছে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত একখানা রেলের টিকিট। সুরু হ'ল একাকী পথ চলা। রায়, রবীন্দ্রনাথের এই গানটি বড় ভালবাসতেন,

> "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
> তবে একলা চল রে ঃ
> *　　*　　*　　*
> তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
> একলা চল রে।
> একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।"

এই যে তিনি একাকী কপর্দক শূন্য হস্তে, মাত্র কতিপয় বিত্তহীন সহকর্মী নিয়ে গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষ, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট, কৃষাণ সভা, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকলের বিরোধিতা মাথায় নিয়ে বিপ্লব গড়ে তোলার কাজে নামলেন, রায়ের জীবনে সে এক স্মরণীয় ঘটনা। জীবনে যে সব সুকঠিন সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে এটিই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক এবং সর্বোত্তম। তিনি বললেন ঃ এই সবগুলিই বিপ্লব বিরোধী দল। বৈপ্লবিক দলের বৈপ্লবিক নীতি চাই। এদের কারুরই বৈপ্লবিক নীতিও নাই, তা প্রয়োগ করবার কৌশলও জানা নাই। ঠিক সেই জন্যেই এরা যখন বৈপ্লবিক সংকটে পড়বে তখন পথ খুঁজে পাবে না, প্রতিবিপ্লবের পথ ধরবে। সুতরাং বৈপ্লবিক পার্টির প্রয়োজন পূর্ণ

করতে হ'লে ভারতে নতুন করে বৈপ্লবিক দর্শন, নীতি ও কর্মপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে একটি দল গড়তে হ'বে। তিনি তাই করবেন।

এ যে কত বড় দুঃসাহস, আত্মশক্তির উপর কী বিরাট আস্থা, কতখানি শক্তির দ্যোতক তা সাধারণ বুদ্ধির অনধিগম্য। সে দিন সমগ্র ভারত রায়কে বুঝতে পারে নি। আজও তাঁকে সম্যক বুঝবার সময় আসে নি। কিন্তু কেউ কেউ বুঝল, ভারতের গগনে এক নতুন সূর্যের আবির্ভাব ঘটল। যদিও তখনো সে সূর্য দিকচক্রবালের বিলীয়মান রেখার কাছে ক্ষুদ্র তারকার চেয়ে বেশী কিছু নয়, তথাপি একদিন হয়তো ভারতের রাজনৈতিক সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে পারে। কোন কোন সংবাদপত্র এই মর্মে কার্টুনও ছেপেছিল।

তখন কংগ্রেসী মহলে শোনা যেত, গান্ধীজি বেণে—হিসাবে ভুল হবার জো নাই। সারা ভারতের শিক্ষিত তরুণ ও যুবকদের মধ্যে রায়ের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা দেখে গান্ধী রায়কে খুব খানিকটা নির্বাচনী সফর করিয়ে নিলেন।

১৯৩৫ সালের ইণ্ডিয়া এক্ট অনুসারে ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন হ'ল, তাতে সাধারণ আসনের প্রায় সব আসনই কংগ্রেস পেল। মোসলেম লীগ তখনো শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি। মুসলমান আসন ভাগাভাগি হয়ে গেল বিভিন্ন দলে ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে।

> ["নির্বাচনে কংগ্রেসের আশাতীত সাফল্য লাভ ঘটল। কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করল, যথা যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই। এই গুলি সবই হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ। আসাম, বাংলা ও নর্থ ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলেও একক সংখ্যা গরিষ্ঠ পার্টির মর্যাদা লাভ করেছিল। নর্থ ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ যদিও মোসলেম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ তথাপি সেখানে কংগ্রেসের জয় লক্ষনীয়। বাকি যে দুটি মোসলেম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাব ও সিন্ধু তাতে কংগ্রেসের সুবিধা হ'ল না।
>
> "এটি লক্ষনীয় এবং স্মরণীয়ও বটে যে, ১৯৩৭ সালের এই নির্বাচনে মোসলেম লীগ বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করতে পারেনি। সারা ভারতে মোসলেমদের জন্যে যে ৪৮২টি আসন সংরক্ষিত ছিল তার মধ্যে মোসলেম লীগ মাত্র ৫১টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস ৫৮টি মোসলেম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং ২৬টি জিতেছিল।

পাঞ্জাবের ইউনিয়ানিষ্ট পার্টি ছিল সেখানকার মুসলমান, হিন্দু এবং শিখ জোৎদারদের পার্টি। এই পার্টি ১৭৫টি আসনের মধ্যে ১০৬টি আসন দখল করেছিল। এই পার্টিতে যদিও মুসলমান সংখ্যাধিক্য ছিল তথাপি এদের উপর লীগের কোন প্রভাব ছিল না। বাংলায় মুসলমানদের তিনটি পার্টি ছিল। তার মধ্যে মোসলেম লীগের ছিল ৪০টি আসন। স্বতন্ত্র মোসলেমদের ছিল ৪১টি আসন, আর কৃষক প্রজা পার্টির ছিল ৩৫টি আসন।

এই সকল সংখ্যার দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ১৯৩৭ সালে হিন্দুদের মধ্যে কংগ্রেসের যে প্রভাব ছিল মোসলেমদের মধ্যে মোসলেম লীগের প্রভাব সে তুলনায় কিছুই ছিল না। অথচ কয়েক বছর পরে সে প্রভাবই কতই না বেড়ে গিয়েছিল। সে সময় লীগ মোসলেম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ অপেক্ষা হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহেই বেশী শক্তিশালী ছিল।]

Vide—Prof. Jyoti Prosad Suda, M.A—*Indian Constitutional Development.* (*1960*) Jaico-Meerut-*pp. 349*

ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার জন্যে পাঁচটি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলেও বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ক'রে ঐ তিনটি প্রদেশেও মন্ত্রিত্ব গঠনের অধিকার লাভ করল। মুসলমানদের মধ্যে লীগের প্রভাব তখন বেশী নয়। বাংলার ফজলুল হকের মত উদার মনোভাব-সম্পন্ন মুসলমান নেতারা অন্যান্য প্রদেশেও বেশ কিছু অনুগামী নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করতে তাঁরা রাজি। কিন্তু গান্ধীজির নির্দেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। রায় গান্ধীজিকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু তিনি তা কানেও তুললেন না। দেশের সর্বনাশের গোড়াপত্তন হয়ে গেল। কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যানের পর অধিকাংশ প্রদেশেই মোসলেম লীগকে ডাকা হ'ল মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে। মন্ত্রিত্বের নামে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির অবসান হ'ল। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই লীগ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল এবং এই ক্ষমতা সর্বাগ্রে প্রয়োগ করল লীগের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে। বিদ্যুৎ গতিতে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সর্বত্র মোসলেম লীগের সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। অন্য কথায়, ভবিষ্যতে ভারত বিভাগের বীজ বপন হয়ে গেল।

কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ—১৯৩৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া"

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করার ফলে ভারতে যে সর্বনাশের সূচনা হল রায় তা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি রায়ের এই কংগ্রেসের নীতিবিরোধী লেখা ছাপতে চাইছিল না। কংগ্রেসের এই আত্মঘাতী বন্ধ্যা নীতির বিরুদ্ধে জনমত না গড়লে ত' চলে না। তিনি নিজস্ব একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের করতে চাইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়? কে দেবে? গরীব ভক্তরা চাঁদা ক'রে দু'টি খেতে দিতে পারে, কিন্তু কাগজ বের করবার মত টাকা তাদের ত নাই। তিনি গান্ধীজিকে লিখলেন, কিছু টাকা তুলে দেবার জন্যে। প্রত্যুত্তরে গান্ধীজি লিখলেন, "না তোমার কাগজ বের করাটা আমি পছন্দ করি না, তুমি নীরবেই থাক—I prefer your silence"। সে চিঠি এখনো রক্ষিত আছে রায়ের বাড়ীতে। (M. N. Roy Archives)

তবু কাগজ বের হ'ল। বন্ধুবান্ধব ভক্তরাই কিছু কিছু দিলে! মোট ৩০০৲ টাকা সংগ্রহ হ'ল। কাগজের নাম রাখা হ'ল Independent India। ব্রিটিশ সরকার প্রথমেই একটা মোটা অঙ্কের টাকা জামানৎ হিসাবে দাবী করলেন। অতিকষ্টে তাও সংগ্রহ করা হ'ল। ১৯৩৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল প্রথম সংখ্যা বের হ'ল বোম্বাই থেকে। আজ পর্যন্ত সে কাগজ চলে আসছে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে। পৃথিবীর সর্বত্রই এর গ্রাহক, বিশ্বের বহু প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি এর নিয়মিত লেখক ও গ্রাহক। বর্তমানে কাগজের Independent India নাম আর নাই। ১৯৪৯ সালে তা বদলে The Radical Humanist নাম হয় এবং পরে তা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া বেরুচ্ছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। শুধু বার্তা বহনই নয়, পন্থা-নির্দেশও সেই সঙ্গে চলেছে।

এই পত্রিকাখানির প্রথম থেকে রায়ের মৃত্যু অবধি সমস্ত সংখ্যাগুলি থেকে দেখা যাবে, এর মধ্যে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তৃতীয় দশকের প্রাক্কালেই গান্ধীজি কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময়েই রায়ও কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে ভারতে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রবর্তন করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। এই প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখা যাবে, এই দুই নেতার দুই পন্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব।

শাদা চোখে মনে হবে, এ যেন ম্যাজিকের সঙ্গে লজিকের, অযুক্তির সঙ্গে যুক্তির, সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার, মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব।

কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলেই স্পষ্ট দেখা যাবে যে, গান্ধীবাদের মধ্যযুগ-সুলভ ধর্মীয় রাজনীতি স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে যতই নিস্ফলা হোক, বৈপ্লবিক রাজনীতির প্রভাব থেকে জনগণকে আগলে রাখতে এবং সেই হেতু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট ক'রে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে শাসন সংস্কারের মাধ্যমে কিছু ক্ষমতা কায়েমী স্বার্থের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে খুবই ফলপ্রদ।

আর দেখা যাবে, যদি ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ব্রিটিশ লেবার পার্টি ক্ষমতায় না আসত এবং ভারতকে স্বাধীনতা দান না করত তা হ'লে ম্যাজিক, অন্ধ বিশ্বাস, অযৌক্তিক পন্থায় স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে সামান্য শাসন সংস্কার ব্যতীত কিছুই পাওয়া যেত না। হয়তো আরো দশ-পনর বছর অপেক্ষা করতে হ'ত। এবং আফ্রিকার দেশসমূহ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতা মিলত। তখন হয়তো শুধু পাকিস্তান নয়—দ্রাবিড়িস্তান, শিখিস্তান, রাজস্তান, গুর্জর, মহারাষ্ট্র, অযোধ্যা, কাশী, কাঞ্চি, মিথিলা, নাগ বিদর্ভ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে ভারত খান খান হ'য়ে যেত, কিংবা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসী অযৌক্তিক রাজনীতি আরও কী দুর্ভাগ্য নিয়ে আসত তা কে জানে!

"ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ ইণ্ডিয়া" তার প্রথম সংখ্যায় জাতীয় স্বাধীনতার ব্যাখ্যা ও তা লাভ করার বৈজ্ঞানিক উপায় সম্বন্ধে সম্পাদকীয় নিয়ে যাত্রা সুরু করল। রায় তাতে লিখলেন:

"১৯২৯ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি জাতীয় স্বাধীনতার মূল নীতি হিসাবে এক প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে:

'ভারতের জনগণের নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণ কেবল মাত্র বৈদেশিক শোষণ নয়, ভারতের মধ্যেই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত তাও অপর এক কারণ।

বৈদেশিক শক্তি সেই আভ্যন্তরীণ কারণটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যাতে তাদের শোষণ-শাসন অব্যাহত গতিতে চলতে পারে। সুতরাং ভারতের জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে সমাজের পুরাতন আর্থিক ব্যবস্থার ও বর্তমানের বিপুল বৈষম্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অবসান ঘটান একান্ত আবশ্যক।'

"কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হ'লে, কৃষকের হাতে জমির মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করতে হ'বে। এতে যে শুধু আর্থিক উন্নতি হ'বে তাই নয়, দেশের শতকরা ৮০ ভাগ যখন কৃষক, তখন তাদের উন্নতিতে দেশে শিল্প বানিজ্য বৃদ্ধির জন্যে বিরাট বাজারের সৃষ্টি হ'বে। ফলে সমগ্র ভাবে দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটবে। জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়ে জমির মালিকানা স্বত্ব কৃষকের হাতে তুলে দেওয়ার ঐতিহাসিক নাম গণতান্ত্রিক বিপ্লব। জনগণই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবে, এবং জনগণের প্রতিনিধিই এই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এই জনগণের রাষ্ট্র জাতির সর্ব প্রধান উৎপাদনের উপায় যে জমি, তা' উৎপাদক শ্রেণীর হাতে তুলে দিয়ে সমগ্র জাতিকে ঐশ্বর্যবান করার স্বাধীনতা পাবে বলেই একে জাতীয় স্বাধীনতা বলব। এই রূপ গণতান্ত্রিক বিপ্লবই ভারতে অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে।

"যে আর্থিক সমস্যা আজ আমাদের আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তা মান্ধাতা আমলের চরখা ও গোরুর গাড়ীর যুগের অর্থনীতির প্রবর্তন করে হবে না কিংবা শুধু বাজারে বিক্রী করে লাভ করার উদ্দেশ্যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারাও হবে না। সমাজের সকল শ্রমশক্তিকে সার্থক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে নিযোগ করতে হবে তবেই জাতীয় সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি লাভ ঘটবে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সেটি হয় না, কারণ বাজারে লাভ না হলে ধনীরা উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, এবং দরিদ্র দেশে বাজার সঙ্কীর্ণ, অতএব ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাও সঙ্কীর্ণ। ফলে দেশের অধিকাংশ শ্রমশক্তি বেকার থেকে যায়, সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগে না। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা যদি কেবল বাজারের উদ্দেশ্যে না হ'য়ে মানুষের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে হয় তা হ'লে বেকারত্বও ঘুচে, এবং সকল মানুষের দারিদ্র্যও দূর হয়।

"হস্তচালিত কুটির শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। যে জাতির শ্রম শক্তির এই ভাবে অপচয় ঘটে সে জাতির সম্পদ বাড়ে না। উল্লিখিত কংগ্রেস প্রস্তাব যদি কার্যকরী করতে হয়, তবে মান্ধাতা আমলের অর্থনীতির পুনঃ প্রবর্তন করলে তা হ'বে না।

"ভারত আজ এক বিরাট সামাজিক বিপ্লবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাই বলে সোস্তালিষ্ট বিপ্লব ঘটছে না। এ বিপ্লবের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি ঘটবে না। এ বিপ্লবের কাজ এক শ্রেণীর হাত থেকে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব অপর এক শ্রেণীর হাতে হস্তান্তরিত করা। একে সোস্তালিজিম ব'লে না। সোস্তালিজিমের অর্থ হ'ল উৎপাদনের উপায় সমূহের উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের বিলুপ্তি এবং তা রাষ্ট্রের হাতে বর্তানো। বর্তমানে তা হচ্ছে না। বর্তমানে প্রয়োজন ভূমি বিপ্লব, কৃষকের হাতে জমি তুলে দেওয়া এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা।

"জন সাধারণের দুঃখ দুর্দশা দুর করবার উদ্দেশ্যে যাঁরা জাতীয় স্বাধীনতা চান তাঁদের নিম্নলিখিত কর্মসূচীটি অবশ্যই গ্রহণ করতে হ'বে :—

(১) প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের "দ্বারা" ও জনগণের "সাহায্যে" গঠিত হবে, কিন্তু তা যে 'জনগণের জন্যে' এ কথা যেন বলা না হয়। (A government of the people, by the people, not for the people) কারণ এই "জনগণের জন্য" নীতিই গণতন্ত্রের সর্বনাশ সাধন করে। মুষ্টিমেয় লোক সরকার দখল ক'রে রাজত্ব করতে থাকে। সরকার পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের আর কোন হাতই থাকে না। জনসাধারণের হাতে থাকে কেবল সংবিধানে লিখিত নামে মাত্র অধিকার। সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের, ব্যস ঐ পর্যন্ত। যে রাষ্ট্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বক্ষনের জন্যেই জনগণের হাতে থাকবে, এবং সেই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রযুক্ত হ'বে। জনগণ এই ক্ষমতার বলে নিজ নিজ গ্রাম সভায় বসে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও কার্য পরিচালন বিভাগকে (মন্ত্রিদের) নিয়ন্ত্রিত করবে, ট্যাক্স ধার্য ব্যাপারে এবং খরচের ব্যাপারে মতামত দেবে। নির্বাচনের সময় প্রতিনিধির হাতে কেউ সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে দেবে না। রাষ্ট্রের গঠন হ'বে পিরামিডের মতন। সর্ব নিম্নে থাকবে পল্লীতে পল্লীতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মানুষের গ্রাম-সভা, তার পরে উঠে যাবে অঞ্চল, জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের সংগঠন সমূহ। এই রাষ্ট্রই প্রকৃত পক্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা জনগণের দ্বারা গঠিত এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করতেও সমর্থ।

(২) জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সকল বাধা-বিপত্তি দূরীকরণ, এবং একমাত্র আধুনিক যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রবর্তনের দ্বারাই তা সম্ভব হ'তে পারে ;

(৩) একটি নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেবার সর্তে সরকার কর্তৃক কৃষকের হাতে জমির স্বত্ব হস্তান্তর;

(৪) যে সকল কায়েমী স্বার্থ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জনে বাধা স্বরূপ, জাতীয় সম্পদের অপচয়কারী, দেশের মঙ্গলের প্রতি বিরূপ, সেই সেই স্বার্থের বিলোপ সাধন;

(৫) সঞ্চিত ধন সম্পদ কাঁচা টাকায় রূপান্তরিত ক'রে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়োগ এবং নূতন ধন সম্পদ এমনভাবে বণ্টণ করা, যাতে তা পুনরায় উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পুনর্নিয়োজিত হ'য়ে জাতীয় সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায়।"

এইখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৬ সালে তিনি তাঁর নতুন মতবাদ নব-মানবতন্ত্র সর্বসমক্ষে প্রচার করেন বটে কিন্তু এর খসড়া কারাগারে বসেই রচনা করেছিলেন একথা আমরা বলেছি। এর দার্শনিক দিকটি Physical Realism নাম দিয়ে প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক দিকটি অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপটি তখন প্রকাশ করেন নি। তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সেই রূপেরই আভাসটি দিলেন, অবশ্য জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বরূপ বর্ণনাচ্ছলেই তা দিলেন।*

এই তো গেল তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলনীতি ও আদর্শের কথা। কিন্তু তার সমরকৌশল—Strategy and tactics—সে তো শত্রুর গতিবিধি অনুসারেই নির্ধারণ করতে হয়। তিনি আন্দোলনের তখনকার পরিস্থিতি আলোচনা ক'রে সেই সংখ্যাতেই The Constitutional Deadlock—What Next? (আইন পরিষদের অচল অবস্থা—ততঃ কিম?) শীর্ষক এক প্রবন্ধে তাঁর যুদ্ধ-কৌশল বিবৃত করলেন।

*এখানে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ সালে রায়ের নব-মানবতাবাদ দর্শন ঘোষণা করার সময় কোন কোন মহল থেকে প্রচার করা হয়েছিল, ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ হয়ে রায় এই নতুন মতবাদের অজুহাত দিয়ে রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, নব-মানবতাবাদের দর্শন Physical Realism রায়ের কারাগারে থাকাকালীনই প্রকাশিত হয়েছিল এবং নব-মানবতাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটি প্রচারিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল, Independent India-র প্রথম সম্পাদকীয় রূপে, যখন তিনি ভারতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা রূপে অভিনন্দিত হচ্ছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

কংগ্রেসে যোগদানের পর রায়ের সংগ্রাম কৌশল

রায় যে নির্বাচনের পর থেকেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন সে কথা আমরা আগেই বলেছি। * কিন্তু গান্ধীজি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন না। গান্ধীজি সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিলেন যে, জনসাধারণের নির্বাচিত মন্ত্রিদের "আইন সম্মত" (constitutional) কার্যাবলীতে সরকার কোন হস্তক্ষেপ করবেন না, এই নিশ্চয়তা পেলেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে। সরকার তাতে রাজি হচ্ছিলেন না, এবং কংগ্রেস গরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে আইন পরিষদের অচল অবস্থাও দূর হচ্ছিল না। এই অচল অবস্থা দেখে রায় লিখলেন ঃ "ততঃ কিম্?

"এত শীঘ্র যে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দেবে তা ভাবা যায়নি। প্রাদেশিক গভর্ণরদের অনমনীয় মেজাজের জন্যেই নতুন শাসন সংস্কার তরণীর তলা ফুটো হয়ে গেল।

"এটা কিন্তু নিতান্তই ছেলে মানুষী আবদার যে, প্রাদেশিক গভর্ণরগণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতা ও তা প্রয়োগের অধিকার পরিত্যাগ করুক। এ ক্ষমতা ঐ আইনেরই একটি অঙ্গ। এই আইন অনুসারে

---

* রায় তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে পরে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছিলেন :

"The tactics of non-co-operation and civil disobedience having exhausted their possibilities, and having regard for the fact that the congress was not yet so reorganised as to lead a higher form of mass movement with more effective revolutionary tactics, etc- etc.......Therefore I supported the pol'cy of office acceptance.
(Vide—I. I. 8. 3. 1939)

জনসাধারণের কোন প্রয়োজনই যে মন্ত্রিরা মেটাতে পারবেন না এ কথাটি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম হয় নি বলেই আমাদের আজ এমন এক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে, যা থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে অবিলম্বে আক্রমণের এক নতুন দিক বের করতে হ'বে, নতুবা এখনকার মত আমরা হেরে যাব।

"মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, না বর্জন এই গৌণ সমস্যাটি নিয়ে দীর্ঘ দিন সকলে মগ্ন থাকার ফলে আমাদের মুখ্য সমস্যাটিই ভুলতে বসেছি। আমরা ঘোষণা করেছিলাম, ভারত শাসন আইন বাতিল করে দেব। কিন্তু তখন ভাবা হয় নি, সেটি বাতিল করে দেবার পর কী করা যাবে। আইন পরিষদে অচল অবস্থা সৃষ্টি করলেই অবাঞ্ছিত আইনটি বাতিল হয়ে যাবে না, যদি না সেই সঙ্গে একে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন সৃষ্টি করার সহায়করূপে ব্যবহার করা হয়।

"১৯৩৪ সাল থেকেই আমাদের সংগ্রাম কৌশল ছিল আইন পরিষদে প্রবেশ ক'রে শত্রুর বিবরের মধ্যেই যুদ্ধকে প্রসারিত করে দেওয়া। এখন আমরা যখন শত্রুর বিবরে ঢুকতে পেরেছি তখন অস্ত্র চালনার জন্যে শত্রুর অনুমতি লাভের চেষ্টা করছি। স্বভাবতঃই শত্রু সে অনুমতি দিতে পারে না।

"আইন পরিষদের মধ্যে লড়াই সম্বন্ধে আমাদের বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে। নিষ্ফল এই সমর কৌশল। অতএব আমাদের বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান সুরু করতে হ'বে। এই যে অচল অবস্থা এটাকে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগাতে হ'বে।

"কংগ্রেসীরা অবিলম্বে তাঁদের পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করবেন। এবং এই কারণ দর্শাবেন যে, গভর্ণরদের স্বৈরাচারী ক্ষমতার জন্যে তাঁরা নির্বাচকগণের নিকট যে অঙ্গীকার বলে নির্বাচিত হয়েছিলেন তা পূরণ করতে পারবেন না।

"তারপরই তাঁরা পুনঃ নির্বাচন ব্যবস্থার জন্যে দাবী করবেন। নতুন নির্বাচনের অঙ্গীকার হবে, স্বাধীন ভারত গড়ে তোলার জন্যে এমন এক কর্মসূচী যা সফল করে তুলতে জনগণ সানন্দে এগিয়ে আসবে এবং ক্রমে তা পূর্ণ ক্ষমতা দখলের শেষ সংগ্রামে পরিণতি লাভ করবে। জনসাধারণকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ব্রিটিশ সরকার জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেশ শাসনের অধিকার দিল না। কারণ তারা জনসাধারণের যাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। ঠিক যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন ও আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তা জনসাধারণকে নির্বাচনের প্রাক্কালে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং তাই হবে নির্বাচনী ইস্তাহার, তারই উপর নির্বাচন হবে।

"সর্বাগ্রে থাকবে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারত শাসন আইন রচনা করবার অধিকার অস্বীকার ক'রে। ভারতের জনগণের নির্বাচিত গণ-পরিষদের দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার ঘোষণা।

"দ্বিতীয়তঃ থাকবে, নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর গণ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্পণ। প্রতিনিধিগণ এক সম্মেলনে (convention) মিলিত হ'য়ে গণ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

"এই নির্বাচনী প্রচারের সময় দেশের অবস্থা এমন স্তরে তুলে নিতে হ'বে যাতে জনগণের দ্বারা ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে গণ-পরিষদ গঠনের আবহাওয়া ও পরিস্থিতি গ'ড়ে ওঠে। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল ভোট পাওয়া নয়, আমাদের উদ্দেশ্য জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দফাওয়ারী দাবী অর্জনের জন্যে সমগ্র জনগণকে সংহত ও উদগ্র ক'রে তোলা। প্রচার ও আন্দোলনের পিছনে যেন একটি নিখুঁত পরিকল্পনানুযায়ী সংগঠনও গড়ে উঠতে থাকে।

"কংগ্রেস যে ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংস্থা, একথা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জানে। তথাপি যে তার ন্যায্য দাবী তাঁরা মানতে চান না, তার কারণ, তাঁরা মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুর্ব্যবহারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার সামর্থ্য কংগ্রেসের নাই। এই দুর্বলতা দূর হ'য়ে যাবে তখনই, যখনই জনগণের রাজনৈতিক জাগরণ ও অসন্তোষকে সংগঠনের মধ্যে এনে সংহত করে তোলা হ'বে। দেশব্যাপী প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলি গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হ'য়ে জনগণকে তাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে পরিচালিত করতে থাকুক। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো গড়ে উঠবে, তারই ভিত্তিস্বরূপ হবে এই সকল প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলি। এই কমিটিগুলি সংগঠিত হ'য়ে না উঠলে, ক্ষমতা দখলের অস্ত্ররূপে গণ-পরিষদও গড়ে তোলা যাবে না।

"বর্তমানের অচল অবস্থার ফলে দেশে সকল রাজনৈতিক কাজকর্ম যেন বন্ধ হয়ে না যায়। সাম্রাজ্যবাদের হুমকিতে যেন আমরা ঘাবড়ে না যাই। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সব রকম আলাপ-আলোচনা বন্ধ হোক, মীমাংসার সূত্র সন্ধানের অবসান ঘটুক। যদি আমরা অচল অবস্থাকে জনগণের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ দিয়ে সচল ক'রে তুলতে না পারি, তবে অচল অবস্থা চলতে দিয়ে কোন লাভই হ'বে না।" (Vide—Independent India—4th April, 1937)

২৩ বৎসর পর (১৯১৫-৩৭) বাংলায় প্রত্যাবর্তন (হাওড়া ষ্টেশন)

দশম পরিচ্ছেদ

গান্ধীজির নিকট রায়ের খোলা চিঠি ও কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

আইন পরিষদ অচল হ'য়ে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজকর্মও বন্ধ হয়ে রইল। প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সক্রিয় ক'রে তোলার কোন চেষ্টাই হ'ল না। ব্রিটিশ সরকারের অনুমান সত্য হ'ল। তাদের ঔদ্ধত্যের যোগ্য প্রত্যুত্তর কংগ্রেস দিতে পারল না। গান্ধীবাদ যতদিন কংগ্রেসের নীতি থাকবে ততদিন কংগ্রেস বৈপ্লবিক পথ নেবে না—নিতে পারে না। ধনী ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি কংগ্রেস নেতারা জানেন, জনসাধারণের সাহায্যে ক্ষমতা যদি ছিনিয়ে আনা হয়, তবে সে ক্ষমতা জনসাধারণের হাতেই রয়ে যাবে। অতএব বিপ্লবের পথ কংগ্রেসের পথ নয়। অচল অবস্থাই চলল, আর চলল আলাপ-আলোচনা।

রায় কিন্তু জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের কথাই প্রচার করে চললেন এবং তদুপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃবর্গও তাঁদের জনপ্রিয়তা বজায় রাখার জন্যে গরম গরম কথা বলতে লাগলেন। কংগ্রেসের প্রধান সম্পাদক কৃপালনীজি বললেন, "যদি কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করত, তা হ'লে স্বাধীনতা লাভের শেষ যুদ্ধ ঘোষণায় দেরী হ'য়ে যেত, মিছামিছি কিছুটা সময় নষ্ট হ'ত মাত্র।

(I. I. Notes,—11. 4. 37)

কংগ্রেস গরিষ্ঠ প্রদেশে পরিষদ না বসলেও মোসলেম লীগের মন্ত্রিদের দ্বারা প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব চলছে। তা ছাড়া নতুন ভারত শাসন আইনে মন্ত্রিসভা না থাকলেও গভর্ণরের শাসনের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে সকল কংগ্রেস কর্মী আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন এই ভেবে যে, কংগ্রেস গরিষ্ঠ প্রদেশে

পরিষদ আহ্বান করতে না পারার ফলে নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল করে ফেলা গেছে, রায় তাঁদের ভুল ভেঙ্গে দিচ্ছেন। বলছেন, শাসনতন্ত্র অচল হয়েছে বলা চলত তখনই, যখন সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের সদস্যগণের সক্রিয় সহায়তা ব্যতিরেকে সরকারের শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে যেত।

তা ছাড়া "জনগণের মঙ্গল করতে গেলে যেন বাধা দেওয়া না হয়" এই অঙ্গীকার আদায়ের আবদার না তুলে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে ভাল ভাল কয়েকটি আইন পাশ ক'রে গভর্ণরকে পাঠালেই হ'ত। তারপর তিনি যখন তাতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করতেন তখন পদত্যাগ ক'রলেই রাজনীতির দিক থেকে লাভ হ'ত বেশী। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ভালভাবেই প্রকট হয়ে উঠত। (I. I. May-June, 1937)

শেষ পর্যন্ত রায় বুঝলেন, কংগ্রেস বৈপ্লবিক পন্থা নেবে না। এদিকে দেশব্যাপী নৈষ্কর্মের ফলে জনগণের মধ্যে উৎসাহহীনতা এবং কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিচ্ছে। সেই সুযোগে ব্রিটিশ সরকার আর তাদের ধামাধরারা মন্ত্রিত্ব দখল ক'রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটিয়ে, দু'হাতে অনুগ্রহ বিলিয়ে নিজেদের সুবিধা করে নিচ্ছে। সুতরাং এই ক্ষতি বন্ধ করতে হ'লে অবিলম্বে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতেই হয়। অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মী ও কংগ্রেস কমিটির তাই মত। কেবল গান্ধীজি ও ওয়ার্কিং কমিটির ভয়ে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। রায় যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় এই মর্মে প্রস্তাব দিলেন। (I. I., 27. 6. 37)

বোম্বাই প্রাদেশিক কমিটির সভায় মনিবেন কারাও এই মর্মে প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির হাত বেঁধে দেওয়া উচিত হবে না, এই ওজুহাতে কেউই প্রস্তাবটি সম্পর্কে মতামত দিলেন না। অগত্যা রায় গান্ধীজিকে এক খোলা চিঠিতে লিখলেন :

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি মন্ত্রিদের আইন সম্মত কাজকর্মে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয় এই মর্মে যে প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন, তা পাওয়া গেলেও বেশী কিছু লাভ হ'বে না। কংগ্রেসী মন্ত্রিরা জনগণের জন্যে সত্যিকারের মঙ্গলজনক কাজকর্ম করতে পারবেন এই যে ধারণা, এটি ভুল। নতুন শাসন সংস্কারে সত্যিকারের কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। এমনকি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত অর্থাভাবের ওজুহাতে করা যাবে না। নতুন

ট্যাক্স ধার্য করে টাকা জোগাড় করবার ক্ষমতা খুবই সীমিত। সুতরাং দেশকে উন্নত করবার অঙ্গীকারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার অর্থ হবে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার অবসান। আমার বিকল্প প্রস্তাব কিন্তু মন্ত্রিত্ব বর্জন নয়। তাতেও খুব ক্ষতি হবে। তাতে দায়িত্ব এড়ানোর দোষে দোষী হতে হবে।

"যে ছটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠ সেখানে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে নিজেদের কর্মসূচী অনুসারে কাজ করে চলবে তাতে গভর্ণররা হস্তক্ষেপ করবেন না, এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই তাঁরা দেবেন না। সুতরাং কংগ্রেসী মন্ত্রিদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবেন না, এ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে না। ফৈজপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করবে না, কংগ্রেস যদি এই অঙ্গীকার করে, তা হলে ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের প্রস্তাব অনুসারে তাঁরাও হস্তক্ষেপে বিরত থাকবেন। কংগ্রেস অবশ্যই তা করতে পারে না। তৎ সত্ত্বেও এই অঙ্গীকার আদায়ের চেষ্টা করলে তা পাওয়াও যাবে না, আর পাওয়া না গেলে, মানের দায়ে বর্তমানের অপ্রস্তুত অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। অবশ্যই সেটা ক্ষতিকর হবে। এইসব দিক বিবেচনা করে কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে বর্তমান শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ওয়ার্কিং কমিটিকে আপনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্যে সুপারিশ করবেন, এই আমার অনুরোধ।

"ব্রিটিশের তৈরী শাসনতন্ত্র ধ্বংস হতে পারে তখনই, যখন ভারতের জনগণ গণ-পরিষদ গড়ে তোলার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। জনগণের বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যেই সেই শক্তি পাওয়া যাবে। সংগঠিত গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সে চেতনা জেগে উঠবে। এই গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে যখন মন্ত্রিরা তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারকে রক্ষা করতে আইন প্রণয়নে অগ্রণী হবেন; তখনই বিটিশ হস্তক্ষেপ করবে এবং তখন আরো ব্যাপক ও গভীর অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। আরম্ভ হবে তখন শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সংগ্রাম। তখনই সুরু হবে পূর্ণ ক্ষমতা দখলের শেষ লড়াই। অনেক সময় আমরা ক্ষেপন করেছি। এইবার ওয়ার্কিং কমিটিকে নতুন কায়দায় সংগ্রাম করবার নির্দেশ দিন।" (I. I. 4-7-37)

শেষ পর্যন্ত গান্ধীজি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হ'লেন। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। শীঘ্রই ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। কয়েক মাস পরে উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশে ও আসামে কংগ্রেস লীগকে হটিয়ে মন্ত্রিত্ব দখল করেছিল। পক্ষান্তরে পাঞ্জাব আর বাংলায় লীগ এই কয় মাসের মধ্যেই অন্যান্য মুসলমান সদস্যদের দলে ভিড়িয়ে কংগ্রেসের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নষ্ট করে নিজেরাই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। এই সব প্রদেশের মন্ত্রিত্বের উপর নির্ভর করে লীগ কয়েক বছরের মধ্যেই কংগ্রেসের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠল।

যুদ্ধ অন্তে ১৯৪৬ সালে যখন সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল, মুসলমান আসনে সারা ভারতে একটি আসনও জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী মুসলমান পায় নি। সমগ্র ভারতে মোসলেম লীগের এই শক্তি গড়ে উঠেছিল একান্তভাবে কংগ্রেসেরই বন্ধ্যা নীতির ফলে।

অনেকে বলে থাকেন, ব্রিটিশই মোসলেম লীগকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে, নিতান্ত সংখ্যালঘু দল মোসলেম লীগকে সমগ্র ভারতে মন্ত্রিত্বের আসনে ছয়মাসের জন্যে এবং কয়েকটি প্রদেশে দীর্ঘকালের জন্যে আসীন রেখেছিলেন ব্রিটিশ সরকার নয়, স্বয়ং গান্ধীজি। যদি তিনি প্রথমেই কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুমতি দিতেন, তা হ'লে মোসলেম লীগ কোন প্রদেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারত না, এবং নিশ্চিতই ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ হ'ত। আসল্ কথা ব্রিটিশ মোসলেম লীগকে শক্তিশালী করে নি, ব্রিটিশ কেবল হিন্দু-মোসলেম বিরোধের সুযোগ নিয়েছে, এবং তা পুরো মাত্রায়—যতটা পেরেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজবন্দী মুক্তি প্রচেষ্টায় রায়

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে রায় তাঁর কাগজে দেশীয় ও বৈদেশিক রাজনীতিকে এমন ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তুলে ধরতে লাগলেন যে, তাতে পুরাতন ভাবালুতা মেশানো, জাতিবিদ্বেষপুষ্ট, সাম্প্রদায়িক ভাবাচ্ছন্ন, নেতাদের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাস ও ভক্তি মেশানো রাজনীতির পরিবর্তে ভারতে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির চর্চা প্রথম সুরু হ'ল।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল বটে, কিন্তু রায়ের আশা পূর্ণ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মন্ত্রিরা, কংগ্রেসী সদস্যরা, ওয়ার্কিং কমিটি ফৈজপুর কংগ্রেসের গণ-পরিষদের প্রস্তাবটি পরিষদে প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করেই কর্তব্য শেষ করলেন। নির্বাচনী ইস্তাহারকে রূপায়িত করার জন্যে কোন প্রস্তাব এনে মন্ত্রিরা শাসন সংকট সৃষ্টি ক'রে জনসাধারণকে নিয়ে গণ-পরিষদ গড়ে তোলার বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়িত করতে এগিয়ে এলেন না। এইসব দেখে রায়ের আফশোসের আর সীমা রইল না। (I. I. 19-9.-37-Editorial)

১৯৩৭ সালে ভারতের সকল প্রদেশেই কমবেশী দণ্ডিত ও বিনা-বিচারে আবদ্ধ রাজবন্দী কারান্তরালে মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন। তাঁদের এবং সমগ্র দেশবাসীর একান্ত আশা ছিল, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সকল রাজবন্দী মুক্তি পাবেন। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পরেও বেশ কয়েকমাস কেটে গেল, রাজবন্দীরা মুক্তি পেলেন না। কারণ লাটসাহেব সে অনুমতি দিচ্ছেন না।

রায় বললেন, এই বন্দীমুক্তির প্রশ্নের উপরই মন্ত্রিরা পদত্যাগ করুক, লাট-সাহেব অনুমতি না দিয়ে পারবেন না। কেউ কানে তুলল না, সেকথা। প্রথমে

হিংসামূলক কাজ করে যাঁরা দণ্ডিত হয়েছেন তাদের রাজবন্দীর সংজ্ঞা থেকে বাদ দেবার চেষ্টা চলল। তারপর অনেক লেখালেখির পর যদিও তাঁরা রাজবন্দীরূপে গণ্য হ'লেন, কিন্তু মুক্তি ব্যবস্থার কোন হদিস মিলল না।

(I. I., 19-9-37-Notes)

শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিরা যুক্তপ্রদেশের কিছু বন্দীকে ছাড়লেন বটে, কিন্তু অধিকাংশেরই বন্দিদশা ঘুচল না। বিশেষতঃ বাংলার রাজবন্দীদের কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। দণ্ডিত বন্দীদের অধিকাংশই আন্দামানে জীবন্ত 'কবরিত'। কয়েক মাস কেটে গেল। তখন সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিরা রাজত্ব করছেন, তথাপি তাঁদের কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না দেখে আন্দামানের বন্দীরা অনশন ধর্মঘট সুরু করলেন। এই সংবাদে সারা দেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠল। গান্ধীজি ও ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের অনশন ত্যাগ করতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করলেন। গান্ধীজি পুনরায় টেলিগ্রাম করলেন:

"সমগ্রজাতির অনুরোধ রক্ষা করলে আপনাদের সৌজন্যই প্রকাশ করা হ'বে। এই সঙ্গে আপনারা যদি আমায় এই নিশ্চয়তা দেন যে যাঁরা এতদিন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করতেন তাঁরা বর্তমানে তা আর করেন না তা হ'লে আপনাদের মুক্তি প্রচেষ্টা করতে আমার হাত শক্তিশালী করবেন।"*

গান্ধীজির টেলিগ্রামের উত্তরে আন্দামান থেকে বন্দীরা জানাল:

"আমাদের মধ্যে যারা পূর্বে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করত এখন আর তারা তা করে না, এখন তারা মনে করে, রাজনৈতিক অস্ত্র বা মতবাদ হিসাবেও ইহা মূল্যহীন। আমরা ঘোষণা করছি যে, এ পথ দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে না দিয়ে পিছিয়েই দেয়।"†

তথাপি মাসাধিক কাল কেটে গেল। মাত্র কিছু বন্দীকে আন্দামান থেকে ভারতের জেলখানাতে ফিরিয়ে আনা হ'ল। ব্যস, আর কিছু নয়।

* "It would be graceful on your part to yield to the nation-wide request. You will help me personally if I could get an assurance that those who believed in terrorist methods no longer believe in them.

† "Those of us who ever believed in terrorism do not hold to it any more and are convinced of its futility as a political weapon or creed. We declare that it definitely retards rather advances the cause of our country".

রায় এক সম্পাদকীয়তে লিখলেন :

"সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব করছে। গান্ধীজি ও ওয়ার্কিং কমিটি যে বন্দীদের মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এই সব নেতাদের সেই দায়িত্ব থেকে রেহাই দেবার জন্যে মন্ত্রিরা তাঁদের ক্ষমতাকে কাজে লাগাচ্ছেন না কেন ?....কথা উঠতে পারে অপর প্রদেশের মন্ত্রিরা ত বাংলা সরকারের উপর হুকুম জারি করতে পারেন না। না পারলেও তাঁরা বাংলার বন্দীদের মুক্ত করতে পারেন। তাঁরা যদি একযোগে পদত্যাগের ভয় দেখিয়ে বাংলার বন্দী মুক্তির দাবী করেন তা হ'লে কী হয় ? এবং এটা করাই তাদের উচিত। কারণ সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার একটিই ছিল এবং তাতে রাজবন্দী মুক্তির অঙ্গীকার ছিল। অতএব আজ সাতটি প্রদেশের মন্ত্রিরা যদি পদত্যাগের ভয় দেখায় তা হ'লে ভারত গভর্ণমেণ্ট সাতটি প্রদেশে শাসন সঙ্কট এড়াবার জন্যে বাংলার বন্দিদের মুক্তি না দিয়ে পারবেন না।" (I. I., 10/10/37, Editorial & Roy resolution submitted to the A I. C. C. in Calcutta, October 19 & 20, 1937).

কিন্তু কংগ্রেস তক্ষুণি তা করল না। অনেক আন্দোলন অনেক জল ঘোলা করার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে সুভাষবাবুর সভাপতিত্বে হরিপুরা অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রিরা বন্দিমুক্তির প্রশ্নে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। ফলে দক্ষিণপন্থীরা 'হীরো' হ'য়ে যায় এবং বামপন্থীদের কথায় আর কেউ কান দেয় না। বামপন্থীরাও দক্ষিণপন্থীদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর টুঁ শব্দটি করল না। বন্দিমুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে রায়ের সুবিখ্যাত প্রস্তাব (I. I., 20 2/38) আলোচনার জন্যে তোলা পর্যন্ত হ'ল না। তথাপি বাংলা দেশের দণ্ডিত রাজবন্দিগণ বন্দীই রইলেন। তবে ধীরে ধীরে কিছু মুক্তি পেতে লাগলেন। অবশিষ্টদের স্বাধীনতার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল। সময়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও বন্দিমুক্তির প্রশ্নে পদত্যাগের হুমকী দিলে যাঁরা মুক্তি পেলেন, অন্ততঃ তাদের বৎসারাধিককাল বেশী কারাদণ্ড ভোগ করতে হ'ত না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কংগ্রেসে রায়ের প্রভাব

১৯২১ সাল থেকে রায়ের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের ফলে কংগ্রেসী রাজনীতি কতটা প্রভাবিত হয়েছিল তা সঠিক বলা সহজ নয়। স্বতঃই যেটা চোখে পড়ে সেটা হ'ল, ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসে যে কয়টি প্রগতিমূলক রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তা রায়ের পূর্বকল্পিত। যেমন পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব, করাচীর মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব, ফৈজপুরে গণ-পরিষদ কর্তৃক স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার পরিকল্পনা, গণ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থাপনার জন্যে "কনভেনসনের" পরিকল্পনা, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রস্তাব, বন্দিমুক্তির উপায় বিষয়ক প্রস্তাব, ভারত শাসন আইনের ফেডারেল পরিকল্পনা বরবাদ করার উপায় প্রভৃতি।

এই সময়কার ইতিহাস আলোচনাকালে, ইতিহাসের একটি শিক্ষার কথা মনে পড়বে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ স্বাভাবিক সহজ যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে নিজ জীবনের ও সমাজ জীবনের সকল সমস্যারই একটা মীমাংসা মনে মনে ভাবে। কিন্তু জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাদীক্ষার অভাবে সবসময় সংস্কার কাটিয়ে উঠতে না পারার জন্যে তাকে কার্যকরী ক'রে তুলতে বা তত্ত্বাকারে প্রকাশ করতে পারে না; যে মানুষটি পারে তাকেই সকলে "ঠিক মনের কথাটি বলেছ" বলে নেতা বানায়।

দেখা যাবে, রায় ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মনের কথাটি গুছিয়ে বলছেন। প্রচার যন্ত্রের অপ্রতুলতার জন্যে সে সংবাদ দেরীতে হ'লেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়ছে, এবং তাতে যখন মানুষ মনের মত কথা পেয়ে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠছে, তখনই কংগ্রেস নেতৃবর্গ রায়ের নামটি না করে

রায়ের কর্মসূচীর ফেনাটুকু গ্রহণ ক'রে একদিকে যেমন জনপ্রিয় হচ্ছে, অপর দিকে প্রয়োগ ব্যবস্থাটিকে রূপায়িত করার চেষ্টা না ক'রে, তা ধামাচাপা দিয়ে কর্মসূচীটিকে বিফল করে দিচ্ছে। তখন মনে হ'বে, ভারতের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত অসহায় মূক মূঢ় জনতা তাদের মনের মানুষকে কাছে পেতে পারছে না—শ্রেণী-স্বার্থের কী দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর পথ আগলে রেখেছে।

এ কথার যাথার্থ কংগ্রেসের দুই দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই প্রমাণিত হ'বে।

কংগ্রেস যখন গান্ধীজির নেতৃত্বে ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করে, তখন রায় রুশিয়ায়। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ভালভাবে গ'ড়ে না উঠলেও যুগান্তর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা কিছু কিছু গড়ে ওঠে, এবং তিনি পুস্তক-পুস্তিকা ইস্তাহার প্রভৃতি বাছা বাছা লোকের নামে পাঠাতে থাকেন। এই ভাবে বৈপ্লবিক গণ আন্দোলনের ভাব-ভাবনা ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে।

পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও অনেকে পোষণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'টি দশকে যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছিল তারও উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেসের প্রস্তাবে অবশ্য সে উদ্দেশ্য ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত হয়। কংগ্রেসের মধ্যে এবং বাইরে ইতিমধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ও তা লাভ করার জন্যে যে চেষ্টা হয় তাতে রায়ের প্রভাব যে খুবই বেশী ছিল তা আমরা বলেছি। আহম্মদাবাদ কংগ্রেস থেকে সুরু করে লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উঠেছে, আলাপ-আলোচনা হয়েছে. তারপর ভোটের জোরে বাতিল হ'য়েছে। ফলে দেশব্যাপী যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ত, তাতে রায়ের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রচেষ্টা থাকত। তারপর কংগ্রেসের বাইরেও এই প্রচেষ্টা কম চলত না। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় কানপুর ও মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলায়।

১৯২১ সালে মাত্র কয়েক মাস অসহযোগ আন্দোলন চলার পরই চৌরি-চৌরা রক্তারক্তির ফলে বারদৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুসারে গণ-আন্দোলন বন্ধ করা হয় এবং কংগ্রেসের যে চারটি গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল, তাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকার জন্যে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সেই চরকা, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, হিন্দু মোসলেম মিলন ও মাদকতা বর্জন! এই চার নীতির একটির মধ্যেও কোন রাজনৈতিক মূল্য না থাকায় দেশে কংগ্রেসী রাজনীতির চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। থাকে মাত্র আইন পরিষদে স্বরাজ পার্টির বেনামিতে বিরোধী দলের রাজনীতি। এ দিকে ভারতের বাস্তব অবস্থার তাগিদে বিপ্লবীদের নানা কার্য-কলাপে ও প্রচারে দেশ বৈপ্লবিক ভাব ও ভাবনায় ভরে উঠতে থাকে। সাইমন কমিশন বয়কটে এবং কলিকাতা কংগ্রেসের বৈপ্লবিক পরিবেশে সমগ্র দেশের অবস্থা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে রায়ের সমর কৌশল তখন বিপ্লবীদের মধ্যে খুবই প্রসার লাভ করেছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের বুঝতে দেরী হ'ল না দেশের অবস্থা। লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল—কিন্তু রায়ের কর্মসূচী ও গণ-পরিষদ গড়ে তোলার কৌশলটি গ্রহণ করা হ'ল না।

রায় তখন বার্লিনে। সে সময় তিনি এই অসম্পূর্ণ লাহোর প্রস্তাবের সমালোচনা করে যে বিবৃতি প্রেরণ করেন, তা আমরা পূর্বে দিয়েছি। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উপযুক্ত কর্মসূচীর অভাবে, লাহোরের গোলটেবিল বয়কট করার প্রস্তাব ধামাচাপা দিয়ে, গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান ক'রে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের দাবীতে নেমে এসেছে। এসব আমরা রায়ের "গণ-পরিষদ" শীর্ষক লেখা ও অন্যান্য লেখা তুলে ধরে দেখাবার চেষ্টা করেছি। তাতেই দেখা যাবে, কী ভাবে লাহোর কংগ্রেসের ইনক্লাব জিন্দাবাদী আবহাওয়া ধীরে ধীরে বিনষ্ট করা হয়েছে। সে দিনকার বিপুল গণজাগরণ বৃথাই হয়েছে। নুন তৈরি করে, তকলি কেটে, জেলে গিয়ে, মার খেয়ে জনগণের পূর্ণ-স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান ঘটেছে।

গোলটেবিল বৈঠকেও যখন এমন কিছু মিলল না যাতে কংগ্রেসের বৈপ্লবিক শক্তিকে তুষ্ট করা যায়, তখন আবার সেই সত্য ও অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন চলল, যেন সচ্ছিদ্র কুম্ভে জল আনা। অচিরেই কংগ্রেস শূন্যগর্ভ হয়ে গেল। কিন্তু জনপ্রিয়তা রক্ষার কৌশলে নেতারা সিদ্ধহস্ত। তাঁরা জানেন, কয়েক মাসের জন্যে জেলে যেতে পারলেই ভারতীয় জনগণের নিকট তা ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠারূপে পরিগণিত হ'বে। অতএব জেলে যাবার ব্যবস্থা হ'ল।

এ দিকে গান্ধীবাদের একচেটিয়া প্রভাব নষ্ট হয়ে কংগ্রেস রাজনীতিতে সোস্যালিজিম ঘেঁসা রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে। গণ-পরিষদের ভাব ও ভাবনায় কংগ্রেসের আবহাওয়া মুখর হ'য়ে উঠেছে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে এই মনোভাবের

প্রভাব পড়ল সভাপতি নেহেরুর ভাষণে। অতএব নেতারা এই গণ-পরিষদের কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করলেন। ৩৪-৩৫ সালেই কংগ্রেসের বিভিন্ন বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা চলল। ১৯৩৬ সালের শেষে ফৈজপুর কংগ্রেসে গণ-পরিষদের পূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হ'ল কিন্তু সে যেন কেবল নিয়মতান্ত্রিকতার জালে ফেলে এই কর্মসূচীকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করার জন্যেই।

কংগ্রেসের কর্মসূচীতে ছিল, আইন পরিষদের সদস্যরা এক বিশেষ কনভেনসনে মিলিত হ'য়ে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচনের আহ্বান জানাবেন। রায়ের কর্মসূচীতে এই আহ্বানই বিপ্লব সুরু করার আহ্বান। এই আহ্বান জানাবার পূর্বে পল্লীতে পল্লীতে জন সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য নিবারণের এক কর্মসূচী নিয়ে সংগ্রামশীল নরনারী প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে তুলবে। এরাই নির্বাচন করবে গণ-পরিষদের সদস্য। কিন্তু এই কর্মসূচী চাপা রইল। কংগ্রেস কমিটিগুলিকে জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করার অস্ত্ররূপে শক্তিশালী না করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা যা পাওয়া যায় তারই চেষ্টা চলল। আড়াই বছর ধরে কংগ্রেসী মন্ত্রিরা কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রথই টানল। পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্যে ফৈজপুর ও হরিপুরা কংগ্রেসের কর্মসূচী অনুসারে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করল না।

ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব দখল ক'রে, এবং পরে সিন্ধু ও আসামে প্রভাব বিস্তার ক'রে সে ক্ষমতা এক রকম করায়ত্ব করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) অংশে যাতে কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠ না হয় সেই জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কূটনীতির চরম পরিচয় দিয়েছিল দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজাদের প্রতিনিধিত্ব দিয়ে। তাঁরা এই ফেডারেল পরিষদের সাহায্যে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জনগণের উপরও প্রভুত্ব করতে পারবেন, তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের-উপকারই হ'বে। কংগ্রেস এই ফেডারেল আইন পরিষদ গঠনের পরিকল্পনাটি বাতিল করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। উপায় স্থির হ'ল, প্রাদেশিক আইন পরিষদ থেকে যখন এই ফেডারেল পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হ'বে, তখন তাতে অংশ গ্রহণ না করা। এই কার্যক্রমের উপর রায় লিখলেন: *

*ফেডারেল অংশসহ সমগ্র আইনকেই বাতিল করবার কৌশল সম্বন্ধে জেল থেকেই তিনি লিখতে সুরু করেন। ১৯৩৫ সালে লেখা How to combat federal scheme তার মধ্যে অন্যতম। (M. N. Roy Archives—Reprinted in I. I., 24/4/38)

"প্রশ্ন হ'ল, এখন এই ফেডারেসন পরিকল্পনাকে প্রতিহত করা যায় কী করে? বলা হচ্ছে যে, প্রাদেশিক পরিষদগুলি থেকে সদস্য নির্বাচন করতে অস্বীকার করলেই একে প্রতিরোধ করা যাবে। এটি হ'ল সেই ধরণের কথা, 'গবর্ণরদের যদি ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করে আইন পরিষদ বাতিল করতে বাধ্য করা যায় তা হ'লেই প্রাদেশিক অংশটা প্রতিরোধ করা যাবে।' শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাদেশিক পরিষদ সমূহ সদস্য নির্বাচন করতে অস্বীকার করলেও ফেডারেল অংশটি বাতিল হ'য়ে যাবে না। শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত ইতিহাসও সমর্থন করে। শাসনতন্ত্র কাগজে লেখা একটি গ্রন্থ মাত্র নয় যে, তাকে ছিঁড়ে ফেললে বা পুড়িয়ে ফেললেই সব শেষ হয়ে যাবে। [এই সম্পাদকীয় লেখার কয়েকদিন পূর্বে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নেহেরু এক সংবাদ পত্র প্রতিনিধি সম্মেলনে বলেছিলেন, "আমরা একে রুখব, একে ছিঁড়ে ফেলব, পুড়িয়ে দেব,"—লেখক।] শাসনতন্ত্র হ'ল শাসক শ্রেণীরই ইচ্ছার প্রকাশ। একে রুখতে হ'লে প্রয়োজন, শাসক শ্রেণী অপেক্ষা বৃহত্তর শক্তি। ফেডারেসন বা সমগ্র আইনটিকে রুখতে হ'লে দেশে অনুরূপ বৃহত্তর শক্তির উদ্বোধনের ব্যবস্থা করতে হবে, এই শক্তিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সংগ্রামে আহ্বান করবে।

"ফেডারেসন পরিকল্পনাকে রুখবার জন্যে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে হ'বে। গত কয়েক বছর ধরে দেশীয় রাজ্য ও দেশীয় রাজার প্রজাদের সংগ্রামের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব সম্পর্কে খুবই সমালোচনা চলেছে। দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে কংগ্রেসের নিরপেক্ষ নীতির প্রতি বহু সভা ও সম্মেলনে বিরুদ্ধতা ও বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে, এবং ক্রমেই তা বেড়ে যাচ্ছে। এখন এই নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের নীতি অবলম্বন করার সময় এসেছে। ফেডারেসনের প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন নীতির অবসান হ'য়ে এই নতুন নীতির প্রবর্তন হোক। দেশীয় রাজ্যের লোকেরাও ব্রিটিশ ভারতের লোকেদের মতই ফেডারেসন সমস্যার সঙ্গে সমান ভাবে জড়িত। দেশীয় রাজ্য সমূহে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে (ফেডারেল এসেম্বলী) দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী নিয়ে অবিলম্বে এক গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করা যায়। স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ

ভারতের জনগণের ও কংগ্রেসের সাহায্য করা অবশ্যই উচিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলতে হ'লে দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা প্রদেশের অনুরূপ হবে কি না হবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় রাজাদের নাই ; তা আছে একমাত্র প্রদেশের জনগণের ও দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের। এইরূপ উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করেই ব্রিটিশ ভারতে ও দেশীয় রাজ্যে একটি আন্দোলন কংগ্রেস যেন অবশ্যই গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই যে ফেডারেসন পরিকল্পনার দ্বারা দেশীয় রাজা-মহারাজার সাহায্যে ভারতকে নতুন ক'রে শোষণ শাসন করবার ষড়যন্ত্র, তা ব্যর্থ করার এই একমাত্র পথ।" (I. I., 5/9/37—Editorial)

রায়ের এই প্রস্তাব খুব শীঘ্র গ্রহণ করা হ'ল না ; তবে ক্রমেই যখন চাপ বাড়তে থাকল তখন কংগ্রেস খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে দেশীয় প্রজাদের আন্দোলনকে কিছু কিছু সহানুভূতি জানাতে আরম্ভ করলেন। সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, দেশীয় রাজারা এই ফেডারেসনকে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ সুরু করেছিলেন এবং সেই জন্যে এই অংশ কার্যকরী করে তুলতে ব্রিটিশ সরকারের দেরী হয়ে যায়। তখন ১৯৩৯ সাল—ইউরোপের আকাশ মহাযুদ্ধের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠছে। ফেডারেসন পরিকল্পনা তখনকার মত মুলতুবী থাকে। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে অন্ততঃ কংগ্রেসের এমন ইচ্ছা বা কর্মসূচী ছিল না যার ফলে তা রোখা যেত। এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন কর্মসূচীর যা দশা ঘটেছে এরও যে তাই ঘটত সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ না করার হেতু নাই। এই অনুমান সত্য হয়ে উঠতে থাকবে যখন দেখা যাবে কংগ্রেস নেতাদের ও মন্ত্রীদের ব্রিটিশের রচিত নিয়মতান্ত্রিকতার উপর কী গভীর শ্রদ্ধা ও অবিচল আস্থা। তাঁদের উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল নয়—'হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারা ক্ষমতার হস্তান্তর'। অথচ ফৈজপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল এর বিপরীত :

"কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হ'ল, ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে হস্তান্তরিত হ'বে, এবং সরকারের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এই সকল জনগণের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণ-পরিষদই দেশের সংবিধান রচনা ও চালু করার অধিকার ও ক্ষমতা রাখে। এই প্রকার রাষ্ট্র এইরূপ গণ-পরিষদের দ্বারাই গড়ে উঠতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই

কংগ্রেস পল্লীতে পল্লীতে কাজ করে চলেছে, জনগণকে সংগঠিত করছে এবং আইন সভায় যে সব কংগ্রেসী সদস্য আছেন তাঁরা যেন কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্যটি সর্বদা স্মরণে রাখেন"।*

সেই জন্মেই বলেছিলাম যে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণ যে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় ধনী-বণিকদের মিলিত শোষণ তা বন্ধ করার জন্মে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্য কংগ্রেস নেতাদের কোন দিন আন্তরিক ভাবে ছিল না। একদিকে জনগণের উদগ্র বৈপ্লবিক ইচ্ছাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিফল করে দেওয়া, আর একদিকে, ব্রিটিশকে চাপ দিয়ে, জনগণের ভয় দেখিয়ে ওপরের তলার মানুষদের হাতে কিছু ক্ষমতা আদায় করার কৌশল মাত্র ছিল। এবং সেই কাজে কংগ্রেস নেতাদের রুখতে রায় ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

রায় বলেছিলেন, কংগ্রেসে থাকব কংগ্রেসের ধনিক-বণিক জমিদার শ্রেণী পুষ্ট বিপ্লব বিরোধী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে জনগণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব স্থাপন করার জন্মে। অন্য কোন দলের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল নিজ দলের সাহায্যেই ক্রমাগত সেই চেষ্টাই করেছিলেন। কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর এই নীতি কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকও সমর্থন করে আসছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালে রায়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিকের যখন মতান্তর ঘটে তখন তাঁরা এই নীতির পরিবর্তন ক'রে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের উপরও অনুরূপ আদেশ জারি করেন। সেই থেকে ভারতীয় কমিউনিষ্টরা মস্কোর আদেশ অনুসারে কংগ্রেস ছেড়েছিল। ১৯৩৫ সালে পুনরায় সেই বন্ধ্যা নীতি ত্যাগের পর মস্কোর আদেশে পুনরায় তারা কংগ্রেসে ঢুকেছিল। কিন্তু কংগ্রেসে যোগদানের তাৎপর্য মস্কোর তদানীন্তন নেতারা ধরতে

* "The Congress stands for a genuine democratic State in India, where political power has been transferred to the people as a whole and the *government is under their effective contro.* * Such a state can only come into existence through a Constituent Assembly elected by adult suffrage and having the power to determine finally the Constitution of Country To this end, the Congress works in the country and organises the masses, and this object must be kept in view by the representatives of the Congress in the legislatures."

• ফৈজপুরে কিংবদন্তি ছিল, এই প্রস্তাবটি রায় রচনা করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে এইখানে রায়ের হাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। Italics—লেখকের।

না পারায়, ভারতীয় কমিউনিষ্টদেরও কেবল গান্ধীবাদের পোষকতা ও বিপ্লবের আত্মশ্রাদ্ধ করতেই দেখা গেল।

রায় প্রথমাবধি বলে আসছিলেন, এ দেশে পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে হ'লে সর্বাগ্রে ভাব জগতে বিপ্লব ঘটাতে হবে। মানুষের মনে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের পরিবর্তে যুক্তিবাদী মন সৃষ্টি করতে হ'বে, নতুবা বিপ্লব ঘটিয়ে নতুন মূল্যের উপর নতুন সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলা যাবে না। জেল থেকে বেরিয়ে সে কাজের জন্যে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে রেনেসাঁস আন্দোলন সুরু করেন! বিভিন্ন পুস্তক লিখে ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিকের দ্বারা শীঘ্রই উচ্চশিক্ষিত মহলে সাড়া জাগালেন। ভারতে সত্যিকারের রেনেসাঁস আন্দোলনের তিনি প্রবর্তক।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরিপুরা কংগ্রেস ও রায়

ফৈজপুর কংগ্রেসের পর হরিপুরা কংগ্রেস। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি। হরিপুরা কংগ্রেস হয়ে গেল। রায় এই কংগ্রেসের কার্যাবলী আলোচনা ক'রে সাধারণ কংগ্রেস সেবীদের প্রতি নিম্নলিখিত আবেদনটি প্রচার করেন ঃ

"আর একটি কংগ্রেসের অধিবেশন হ'য়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে যে উদ্দীপনা জাগান হয়েছিল, তা শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে। সাধারণ কর্মীদের পুনরায় তাদের রাজনৈতিক কাজ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কথা। কিন্তু কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচী অনুযায়ী সাধারণ কর্মীদের করণীয় দৈনন্দিন কোন কার্যের ব্যবস্থা নাই। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে সব ক্ষমতাই শীর্ষে কেন্দ্রীভূত। গঠন তন্ত্রটি কাগজে পত্রে গণতান্ত্রিক হ'লেও সাধারণ কর্মীদের কর্মারম্ভ ও উদ্যোগকে সমর্থন করা হয় না। কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের মাত্র কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন, বৎসরে চারি আনা চাঁদা দান, ও মাঝে মাঝে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রায় যোগদান ছাড়া বিশেষ কিছু নিয়মিত কাজ করান হয় না। তাদের অধিকার যে কতটুকু, আর দায়িত্বই বা কতখানি তার কিছুই স্পষ্ট করে কোথাও বলা হয় নি। এই সব ত্রুটির ফল কমবেশী ইতিমধ্যেই আমরা অনুভব করতে সুরু করেছি। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান, তাঁরা কংগ্রেসের এই সব ত্রুটির জন্যে ক্রমেই অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠেছেন।

"এই সব ত্রুটি নিবারণে যাতে সাহায্য হয় সেই উদ্দেশ্যে হরিপুরা কংগ্রেসের বিবেচনার জন্যে আমি দু'টি প্রস্তাব পেশ করেছিলাম *, কিন্তু রাজবন্দী মুক্তির উদ্দেশ্যে বিহার ও উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের ফলে যে শাসন-

* হরিপুরা কংগ্রেসে রায়ের প্রস্তাব (I. I., 29/2/38)

সংকট কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাতেই সমগ্র কংগ্রেসের আবহাওয়া চঞ্চল ছিল। ফলে কংগ্রেসের মূলনীতি বিষয়ক কোন প্রশ্ন তোলাই সম্ভব ছিল না—আলোচনা ত দূরের কথা।

"বে-সরকারী প্রস্তাব কোন দিনই যথোপযুক্ত মর্যাদা পায় না, তা কি কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে, কি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে। এ বৎসর ত পাওয়ার কথাই নয়। এ বৎসর বে-সরকারী প্রস্তাবের জন্যে কোন সময় দেওয়াই সম্ভব ছিল না। আমার উদ্দেশ্যও ছিল না যে, আমার প্রস্তাব আলোচনা হোক এবং মতামতের জন্যে ভোটে দেওয়া হোক। আমার উদ্দেশ্য হ'ল, আমার প্রস্তাব দু'টি কংগ্রেসের সকল কর্মীর মধ্যে ভাল ভাবে আলোচিত হোক, কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেসের অধিবেশন যে রীতিতে চলে তাতে তা হওয়ার উপায় নাই। সুতরাং আমি যে ভাবে চাই, সেই মত সম্যক রূপে আলোচনা করতে হলে, তা সারা দেশে দীর্ঘ দিন ধরে চালাতে হ'বে। আমি যে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে এই দু'টি প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, তা কেবল কয়েকটি রাজনৈতিক ও সংগঠন মূলক প্রশ্নের প্রতি ডেলিগেটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে এবং যে প্রশ্নগুলির মীমাংসা আজ হোক, কাল হোক করতেই হবে।

"এখন আমি কংগ্রেসের সকল প্রাথমিক সমিতিগুলির নিকট আমার প্রস্তাব দু'টি আলোচনার জন্যে পাঠাব। সেই সঙ্গে আবেদন করব, আমি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছি তা যেন সকল কংগ্রেস কর্মী ভালভাবে আলোচনা করেন। এই আলোচনার মধ্যে দিয়েই আমার প্রস্তাবের উপর মতামত গড়ে উঠবে। যদি প্রস্তাবের পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থক পাওয়া যায়, তা হ'লে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে সরকারী প্রস্তাবের মধ্যে আমার প্রস্তাবটি স্থান পেতে পারে এবং আলোচনার জন্যে উপস্থাপিত হ'তে পারে। সাধারণ কর্মীদের পক্ষে কর্মারম্ভের (initiative) এটি একটি সূত্রপাত। আমার প্রস্তাবের অন্যতম উদ্দেশ্য এই পদ্ধতির প্রবর্তন। অর্থাৎ কংগ্রেসের সকল প্রস্তাবই সর্বাগ্রে প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিতে সাধারণ কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যে সম্যকরূপে আলোচিত হয়ে, তাদের মতামত সংগ্রহ ক'রে, তারপর প্রস্তাব সমূহ কংগ্রেসের সামনে পেশ করা।

"আমার প্রস্তাব দুটি এতই স্পষ্ট যে, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আলোচনা যাতে সম্যক ভাবে চলতে পারে তার জন্যে আমি ভাল ভাবেই ব্যাখ্যা ক'রে দেব। এই সঙ্গে সকল কংগ্রেস কর্মীকে আরো দু'একটি কথা বলে রাখি।

"আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাঁরা বৈপ্লবিক কর্মী তাঁরা আমাদের নেতাদের নিয়মতান্ত্রিক পদস্খলনের জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। এই পদস্খলন ইচ্ছাকৃত নয়। এটা ঘটেছে আমাদের আন্দোলনের অস্পষ্ট ঘোলাটে কর্মসূচীরই যুক্তিসঙ্গত অনিবার্য পরিণতির ফলে। কর্মসূচীর এই অস্পষ্টতা ও ঘোলাটে ভাব দূর করতে হ'বে। আমাদের কর্মসূচীর বৈপ্লবিক অর্থটিই সুপরিস্ফুট করে তুলতে হ'বে। ফৈজপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবে দেশের কাছে জনগণের কঠোর সংগ্রামের দ্বারা ক্ষমতা দখলের যে প্রাণ মাতানো ছবি তুলে ধরা হয়েছিল, ব্রিটিশের হাত থেকে ধীরে ধীরে ক্ষমতা হস্তান্তরের অলীক ধারণার ধোঁয়ায় সে ছবি অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ধারণার ফলে নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কার পন্থাই আজ আমাদের আন্দোলনের আদর্শ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মূল নীতির পুনরালোচনা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

"পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝি? অতঃপর এ আদর্শকে আর একটি শূন্যগর্ভ আদর্শ ক'রে রাখা যাবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা এলে কি কি বস্তু সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে তা একটি একটি ক'রে এখনি স্থির করে ফেলতে হ'বে। এবং তা ঠিক হ'য়ে গেলে, তা লাভ করার জন্যে উপযুক্ত কর্মসূচীও ঠিক হ'য়ে যাবে।

"পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লাভ করতে হ'লে যে গণতান্ত্রিক জাতীয় বিপ্লবের প্রয়োজন তা কেবল জনগণের সুসংগঠিত উদ্যোগ ও ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই সম্ভব। কংগ্রেসের প্রচার ও আন্দোলনের দ্বারা জনগণ দলবদ্ধ হয়েছে। এখন তাকে এক বৈপ্লবিক সেনা-বাহিনীরূপে সুসংগঠিত করে তুলতে হ'বে। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট দৈনন্দিন কর্মসূচী অনুসারে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ করে যেতে হবে। এই দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়েই সাধারণ কংগ্রেস কর্মী রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতে থাকবে, যার ফলে তার বৈপ্লবিক চেতনা দ্রুত বেড়ে চলবে। প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি-গুলির সক্রিয়তা, সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষা সমগ্র কংগ্রেসকেই বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে—কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটে যাবে। তখন বর্তমান নেতৃত্ব কংগ্রেসের সর্বনিম্নতলা থেকেই চাপ অনুভব করবে। তখন আন্দোলন জনগণের সুচিন্তিত মতামত ও ইচ্ছার দ্বারাই পরিচালিত হ'তে থাকবে।

"সাধারণ কর্মীদের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করা হোক; সাধারণ সভ্যগণকে সক্রিয় ক'রে তোলা হোক; মূলনীতির প্রশ্ন উত্থাপন করে তা আলোচনার

ব্যবস্থা করা হোক ; সুনির্দিষ্ট নির্দেশসহ পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হোক ; নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি পদস্খলন বন্ধের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক ; স্বাধীনতার যুদ্ধ আপোষহীন পথে চালাবার জন্যে দাবী জানান হোক—এই হ'ল আমার আবেদন।" (I. I., 6/3/38)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রফা করে যথাসম্ভব বেশী ক্ষমতা যাতে ভারতের উচ্চশ্রেণীর হাতে আসে তার জন্যে কংগ্রেস নেতাগণ মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর থেকে এমনই উদগ্র হয়ে উঠেন যে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা নানা ছলে নেতাদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা চলতে থাকে। ইউরোপে যুদ্ধ সম্ভাবনার দোহাই দিয়ে প্রকৃত যুদ্ধের এক বছর পূর্বেই ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তার নিজ ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটির উপর তথা গান্ধীজির উপর ন্যস্ত করে। তখন সুভাষবাবু সভাপতি। কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার প্রচেষ্টাকে সুভাষবাবু তখন বাধা দেন নি। কিন্তু রায় দিয়েছিলেন—অবশ্য অচিরে সুভাষবাবুই এর ফল ভোগ করেছিলেন।

রায় লিখলেন :

"যুদ্ধ বিষয়ক প্রস্তাবের উল্লেখ করছি।.... যে ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হ'ল তা অচিরেই গান্ধীজির উপর ন্যস্ত হ'বে। বিপদ হ'ল এর দ্বারা গণতন্ত্র ত্যাগ ক'রে একনায়কত্বকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। .... আমাদের মতে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও অবিলম্বে তা ঘটবে না।........ সুতরাং এ সন্দেহ অমূলক নয় যে, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নষ্ট ক'রে স্বৈরাচারী একনায়কত্ব স্থাপন করার জন্যেই এই ইউরোপীয় যুদ্ধের মিথ্যা ভয়ের দোহাই দেওয়া হয়েছে, এবং এতই তাড়া হুড়ো করা হয়েছে যে, তা নোংরামির পর্যায়ে পড়ে গেছে।" (I. I., 2/10/38—Editorial)

সুরু হ'ল কংগ্রেসের উদীয়মান বৈপ্লবিক শক্তিকে ঠেকিয়ে রেখে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এক স্বৈরাচারী স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর কুক্ষিগত রাখার খোলাখুলি প্রচেষ্টা, আর এই প্রচেষ্টা প্রথম ও শেষ ধাক্কা খেয়েছিল সুভাষবাবুর সাফল্য মণ্ডিত বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহের শেষ সমাধি রচনা হয়েছিল ত্রিপুরিতে।

রায় কংগ্রেসের মধ্যে বহুদিন ধরে যে জনগণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে আসছিলেন, তা সফল হ'ল গান্ধী-জওহরলালের সঙ্গে বিরোধিতা ক'রে সুভাষবাবুর জয়লাভে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরী কংগ্রেস ও রায়

হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র পরের বছর ত্রিপুরি কংগ্রেসেরও সভাপতি হ'তে চাইলেন। তিনি বললেন, ভারত শাসন আইনের ফেডারেল অংশ নাকচের সংগ্রামের জন্যে এবং কংগ্রেসের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে তার প্রতিরোধের জন্যে এই বৎসরও তিনি সভাপতির পদে আসীন থাকতে চান। কিন্তু গান্ধীজি তাতে রাজী ন'ন। গান্ধীজির তথা ওয়ার্কিং কমিটির প্যাটেল গ্রুপের প্রার্থী ডাঃ পট্টভি সীতারামায়া। গান্ধীজির ও ওয়ার্কিং কমিটির বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রীসুভাষ চন্দ্র জয়লাভ করলেন। গান্ধীজি তাতে বললেন ঃ

"পরাজয় যত না পট্টভির তার ঢের বেশী আমার। আমার একটা নির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি আছে। সুতরাং এটি আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ডেলিগেটরা আমার নীতি ও পদ্ধতিকে সমর্থন করেন না। সুতরাং আজ যারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকতে অসুবিধা অনুভব করবেন তাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি কোন বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ছেড়ে আসা চলবে না, আরো বেশী করে দেশের সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়ে আসতে হবে।"*

গান্ধীজির এই গণতন্ত্র বিরোধী উক্তি ও মনোভাবের উত্তরে রায় বললেন "সংকট" শীর্ষক এক প্রবন্ধে ঃ

---

*"the defeat is more mine than his. And I am nothing if I do not represent definite principles and policy. Therefore it is plain to me that the delegates do not approve of the principles and policy for which I stand. Those therefore who feel uncomfortable in being in the Congress may come out, not in a spirit of ill will, but with the deliberate purpose of rendering more effective service."

"এই রকম ভয় দেখানো এই প্রথম নয়। এ যাবৎ এই ভয় দেখানোতেই কাজ হয়েছে, এবং কংগ্রেসের উদীয়মান বৈপ্লবিক শক্তি বারবার পুরাতন নেতৃত্বের নিকট আত্মসমর্পন করেছে। এই সময়টি কংগ্রেসের মধ্যে নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয়ের পক্ষে খুবই অনুকূল। সুতরাং এই ভীতি প্রদর্শনকে অতি স্থির ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার সংগ্রামে যদি সম্ভব হয় তবে পুরাতন নেতাদের সঙ্গে রেখে—আর যদি প্রয়োজন হয় তবে তাদের বাদ দিয়েই চলতে হ'বে। এই হবে গান্ধীবাদী নেতাদের ভয় দেখানোর যোগ্য প্রত্যুত্তর।

"সভাপতি নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভই শেষ নয়। কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যদের বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে নেতাদের সংস্কারবাদী আপোষমূলক নীতির যে দ্বন্দ্ব তার মীমাংসা এখনো বাকি আছে। এ দ্বন্দ্বের জয়ে দেশের বৈপ্লবিক শক্তিকে সংহত ও সংগঠিত ক'রে তোলার সুযোগ এসেছে। ভারত শাসন আইনকে নাকচ ক'রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যোদ্ধাদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দ্বারা সে কাজ সুগম হ'বে। বাবু সুভাষচন্দ্র বসু আজ আর কারুর অনুগ্রহে সভাপতি নির্বাচিত হ'ন নি, অধিকাংশ ডেলিগেটের আস্থাভাজন হওয়ার ফলেই তিনি তা হয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি সেই পন্থাই অবলম্বন করবেন। এই পন্থা গ্রহণের ফলেই বিপ্লবী শক্তির দ্বারা কংগ্রেস অধিকার করা সম্ভব হ'বে এবং একে ভারতের জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে গড়ে তোলাও যাবে।" (I. I., 5/2/39)

এ ছাড়াও বললেন ঃ

"এ বৎসরের কংগ্রেস অধিবেশনের গুরুত্ব খুবই বেশী। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অবশ্যই এটি স্মরণযোগ্য হ'য়ে থাকবে। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতি, কর্মসূচী ও কর্মকৌশলের (principle, programme and policy) মূল প্রশ্নগুলি স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত ছিল না, এবার তার নিরাকরণ করতে হ'বে। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসে কেবল কতকগুলি অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক বহুবিধ বিশেষণ সর্বস্ব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাকে প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রেখে সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রশ্রয় দেওয়া হ'য়েছে। এবারের কংগ্রেসেও তা করলে চলবে না। ত্রিপুরিতে যে এক প্রথমশ্রেণীর রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় হ'বে তা সভাপতি নির্বাচনের উপক্রমণিকাতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"দুঃখের বিষয় এখনো অনেকে স্বীকার করেন না যে, কংগ্রেস এক সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মতে এ সংকট বয়ঃ সন্ধির সংকট। সুতরাং এতে ভীত হবার কারণ নাই। এ সংকটের কারণ কিছুদিন ধ'রেই ধীরে ধীরে পরিপক্কতা লাভ করছিল। সভাপতি নির্বাচনে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মাত্র। ফলে আজ কংগ্রেস দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে। যে কারণের ফলে আজ এই বিভেদ সেই কারণকে চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের যোদ্ধাদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু আজ এই ঐক্য বিধানের এক নতুন ভিত্তি রচনা করতে হ'বে। ঐক্য বজায় রাখতেই হ'বে। কিন্তু তা যদি যে কোন মূল্যে হয় তবে দেখা যাবে যে, হয়তো তা স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে লাভজনক না হ'য়ে পরম ক্ষতিকরই হয়েছে। এই ঐক্য হ'বে সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য, যে সব শক্তি বহুযুগ ধ'রে শোষিত বঞ্চিত এবং বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যেই যাদের মুক্তি ও উন্নতি নিহিত, এবং যে সব শক্তি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তারই ভারতীয় মিত্রদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত, তাদের ঐক্য। মুখের কথায় বিশ্বাস করার প্রয়োজন নাই। কাজের দ্বারই প্রমাণ হোক। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের নীতি বৈপ্লবিক। এর উদ্দেশ্য হ'ল বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সুতরাং বিনা সর্তে কতকগুলি বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণই হ'বে কাজ-কর্মের মধ্যে সত্যকারের স্থায়ী ঐক্য বিধানের বনিয়াদ। *

"এবারের সভাপতি নির্বাচন হয়েছিল দু'টি প্রশ্নের উপর। একটি হ'ল, ভারত শাসন আইনের ফেডারেল অংশ সম্বন্ধে ও অপরটি হ'ল কংগ্রেসের নিয়ম তান্ত্রিকতার প্রতি ঝোঁক। আসলে এটি একটিই সমস্যা। গান্ধীজির যে নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছে সেই নীতি অনুযায়ীই ফেডারেশন অংশটিকে নাকচ করার কর্মসূচী নির্ধারিত হ'বে। অধুনা কংগ্রেসের মধ্যে যে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তা গান্ধীপন্থী রাজনীতিরই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, কারণ এতে সকল বৈপ্লবিক কার্যকলাপই নিষিদ্ধ।

---

* গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির নেতাদের ভীতি প্রদর্শনে সন্ত্রস্ত হ'য়ে কমিউনিষ্ট ও কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট নেতারা জাতীয় ঐক্যের ধুয়া তুললেন। সেই "ঐক্য" প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে এই অংশ লিখিত। —লেখক।

"গান্ধীপন্থী রাজনীতি শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকতাতেই পর্যবসিত হয়। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ১নং ধারাতে যে নীতি লিপিবদ্ধ আছে, বৈধ ও নিরুপদ্রব উপায়ে (legitimate & peaceful means) স্বরাজলাভই কংগ্রেসের ঈপ্সিত, সেই নীতির দ্বারাই কংগ্রেসের রাজনীতি নির্ধারিত হয়। সুতরাং গুরুতর প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও সভাপতি নির্বাচনের সময় যে দু'টি প্রশ্ন উঠেছে সে দু'টি প্রশ্নেরই মীমাংসা যদি করতে চাই তা হ'লেও দাবী করতে হ'বে যে, যে নীতির জন্যে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, সে নীতি পরিত্যক্ত হোক। দলমত নির্বিশেষে সকল চিন্তাশীল কংগ্রেসীই এ বিষয়ে এক মত যে, এই বৎসর সভাপতি নির্বাচনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে কেবল কাজ-কর্মের ধারাই বদলে যাবে না, সেই সঙ্গে নীতিরও পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে। আচার্য কৃপালনী লিখেছেন, 'আমরা মনে করি না' যে, এ বিরোধ ব্যক্তিগত। সুতরাং আমরা মনে করি, ত্রিপুরিতে এ যাবৎ কংগ্রেস যে নীতি ও কর্মকৌশল অনুসরণ করে চলছিল তার পরিবর্তে নূতন নীতি ও কর্মকৌশল গৃহীত হবে। কিন্তু সে নীতি বা কৌশল যে কী হ'বে তা জানি না।' সত্যই কি তাঁরা কিছুই জানেন না? ঐ একই বিবৃতিতে তিনি লিখছেন, 'নীতি ও কর্মসূচীর খুব বেশী রকমের পরিবর্তন না ঘটলে গান্ধীজির ভক্তরা কংগ্রেস ত্যাগ করবেন না। কিন্তু গান্ধীজি মনে করেন, যে বিপ্লবীরা আজ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে তারা কালক্রমে কংগ্রেসের বর্তমান মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাবে। যখন তা ঘটবে তখন গান্ধীজির নিকট যাঁরা রাজনীতির প্রেরণা লাভ করেন, তাঁদের কংগ্রেসের বাইরে এসেই দেশের সেবা করতে হ'বে। তথাকথিত বামপন্থীদের কথাবার্তায় আমার এই মনে হচ্ছে যে এইরূপ পরিবর্তনের ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।'

"আজ যে সব কংগ্রেস-কর্মী তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে সভাপতি নির্বাচন করেছেন তাঁরা যে পুরাতন নীতির প্রতি আস্থাবান ন'ন তা বেশ বোঝা গেছে, এবং তাঁদের ইচ্ছামত যদি নীতির পরিবর্তন করতে হয় তা হ'লে গান্ধীজি ও তাঁর প্রিয় শিষ্যের অনুমান যথার্থ বলেই ধ'রতে হ'বে।

"এ কথা যদি ছেড়েই দিই যে, প্রধান নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ ফেডারেল অংশের ব্যাপারে আপোষ করার জন্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন, তথাপি এ কথা জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে

কংগ্রেস এ ব্যাপারে কতটুকু কি করতে পারে? এর বেশী কিছু করার অবকাশ আছে কি? সুতরাং আমরা যদি নীতি (creed) পরিবর্তনের দাবী না করি তা হ'লে তাঁরা যা করছেন তার পরিবর্তে অন্য কোন রাজনৈতিক কর্মের আশা করতে পারি না। ফেডারেল অংশের পরিকল্পনাকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে অচল করা সম্ভব নয়, কংগ্রেসের আইন বিশেষজ্ঞগণের এই অভিমতের কথা মোটামুটি সবাই জানে। কিন্তু এর সম্যক অর্থ কম লোকেই বোঝে। এর অর্থ হ'ল ফেডারেল পরিকল্পনা বাতিল করার যে কংগ্রেসের প্রস্তাব আছে তা কার্যকরী করবার একমাত্র উপায় বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করা। কিন্তু কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রের ১নং ধারা অনুসারে সে পথ বন্ধ।

"অবশ্যই সত্যাগ্রহের পথ খোলা আছে যা গান্ধীপন্থী রাজনীতির অস্ত্রাগারের একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। কেবল অন্ধ ভক্তরাই বলবে যে, সে অভিজ্ঞতা খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক। এই ব্রহ্মাস্ত্রটি যদি তেমনই অমোঘ হ'ত, তা হ'লে আজ আর নিয়মতন্ত্রের ভূতের ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'তে হত না। এটা ঐতিহাসিক সত্যি ঘটনা এবং যাঁর সত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা আছে তিনিও স্বীকার করবেন যে, সত্যাগ্রহের পরাজয়ের ফলেই কংগ্রেসকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ গ্রহণ করতে হ'য়েছে। অবশ্যই ফল যা হয়েছে তা অনিবার্য ছিল না। দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমে বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরিণতি লাভ করতে পারত। কিন্তু তাতো হওয়ার উপায় ছিল না; কারণ সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারে সে পথ নিষিদ্ধ। সুতরাং গান্ধীবাদের দার্শনিক এবং নৈতিক (moral) নীতি (creed) ও পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত রাজনীতি যে শেষ পর্যন্ত নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথই ধরবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

"এই গান্ধীনীতির (creed) পরিবর্তে গ্রহণ করতে হ'বে, যে কোন উপায়ে, যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা লাভের আপোষহীন সংগ্রামের সংকল্প নতুবা নিয়মতান্ত্রিকতার হাতে কংগ্রেসের অপমৃত্যু নিবারণ করা যাবে না।

"সভাপতি নির্বাচনের সময় কংগ্রেস-সভ্যের যে মত ব্যক্ত হ'য়েছে সেই অনুসারে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতিকে যদি পুনঃ নির্ধারিত করতে হয়, তা হ'লেই কংগ্রেসের মধ্যে সংকট ঘনীভূত হ'য়ে উঠবে, কারণ তা করা যাবে না যতক্ষণ না কংগ্রেসের মূলনীতির পরিবর্তন করা হচ্ছে। যাঁরা কংগ্রেসের এই নিয়ম তান্ত্রিকতার পথে পা বাড়ান পছন্দ করে না, তাদেরই আজ কংগ্রেসকে অন্য

পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব নিতে হবে। যাঁরা ফেডারেল পরিকল্পনা গ্রহণের বিরোধী তাদের এই বিরোধিতার জন্যে অন্য পথের সন্ধান করতে হবে, কারণ নিয়মতান্ত্রিকতার পথে তা হওয়ার উপায় নাই। এই ফেডারেল পরিকল্পনার কোন বিরোধিতাই ফলদায়ক হ'বে না, যদি না এই বিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে—জনগণের ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে পরিণতি লাভ না করে।

"যে সকল রাজনৈতিক কর্মী কোন বিশেষ নীতি (creed) পালনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ নয় বা কোন একটিমাত্র ধারণার পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়েই ব্যস্ত নয়, তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না, যতদিন কংগ্রেসের নীতির আমূল পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন কংগ্রেস এ সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে পারে না। এবং যখনই তা ঘটবে তখনই এ যাবৎ যাঁরা কংগ্রেসকে পরিচালিত করে এসেছেন, তাঁরা একে পরিত্যাগ করে চলে যাবেন। তাঁরা সে কথা পরিষ্কার করেই বলেছেন। তাঁদের নিজ পন্থার প্রতি যথেষ্ট প্রত্যয় আছে, এবং তাঁদের প্রত্যয়ের দৃঢ়তাকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখব। কিন্তু তাই বলে আমরা যেন আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার দৃঢ়তা না হারাই।

"ত্রিপুরি কংগ্রেস কি তার পুরাতন নীতির (creed) আমূল পরিবর্তনে রাজি হবে? এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যে কেবল গান্ধী-নীতি বিরোধী সভাপতি নির্বাচনের ফলেই প্রকট হ'য়ে উঠেছে তাই নয়, আমাদের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্যেও এর ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে। এই কর্তব্য সম্পাদনে ত্রিপুরি রাজি হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। কিন্তু তাই ভেবে বামপন্থীদের বিকল্প কর্মসূচী রচনা ফেলে রাখলে চলবে না এবং সে কর্মসূচীতে কংগ্রেসের পুরাতন নীতি (creed) অনিবার্য ভাবেই পরিত্যক্ত হ'বে। যে বিকল্প কর্মসূচী রচিত হ'বে তাতে জনগণেরই কর্মারম্ভ করার ব্যবস্থা থাকবে. আইন পরিষদের কাজকে লঘু পর্যায়ের কাজরূপে গণ্য করা হ'বে এবং তা কেবল গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করার কাজেই ব্যাপৃত থাকবে। কংগ্রেসী-মন্ত্রীরা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সরকার চালিয়ে নিয়ে যাবার দুর্মতি ত্যাগ করে, যে প্রতিষ্ঠান তাঁদের মন্ত্রীত্বের আসনে বসতে পাঠিয়েছে তার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সুদক্ষ শাসকরূপে পরিগণিত হওয়ার লোভ পরিত্যাগ ক'রে কিভাবে শাসন ব্যবস্থাকে অচল ক'রে দেওয়া

যায়, সে সম্বন্ধেই তাঁদের চিন্তা করা দরকার। যৎসামান্য সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন এবং শাসন ব্যবস্থার খুঁটি-নাটি নিয়ম-কানুন রচনায় মাথা না ঘামিয়ে, যা কেবল জনসাধারণকে ভাঁওতা দেবার কাজেই লাগে, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সকল অঙ্গীকার করা হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি বিষয় রূপায়িত করার চেষ্টা করবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে পদত্যাগ পত্র দাখিল করে সংকট সৃষ্টি করবে। এইভাবে উপর্যুপরি মন্ত্রি-সংকট গণ-শক্তি কর্তৃক ক্ষমতা দখলের অবস্থা সৃষ্টি করে তুলবে। এক কথায়, আইন পরিষদ মারফৎ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাবার মনোভাব দূর করে দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভাব ও ভাবনা গড়ে তুলতে হবে। ১৯৩৫ সালেই বলেছিলাম, পার্লামেণ্টারি মনোভাবই স্থায়িত্ব লাভ করবে। এটাই হ'ল গান্ধী নীতি পরিচালিত কংগ্রেসী রাজনীতির যুক্তিসংগত পরিণতি। এটা ততদিনই থাকবে যতদিন কংগ্রেসে এই গান্ধী নেতৃত্ব কায়েম থাকবে।

"যাঁদের ভোটে সভাপতি জয়ী হয়েছেন। যে জয়কে গান্ধীজী কংগ্রেসের নীতির প্রতি অনাস্থাসূচক কার্য বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হয়তো কংগ্রেসকে সকল ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে এখনো প্রস্তুত হ'ন নি। কিন্তু কংগ্রেস যদি কখনো তার লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় তবে অবশ্যই তাকে একদিন এই পথেই পাড়ি দিতে হবে। বস্তুতঃ এঁদের অধিকাংশই সচেতন বিপ্লবী নয়, এমন কি কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন নয়। এই কঠোর বাস্তবই হ'ল নতুন নেতৃত্ব গঠনের সর্বপ্রধান বাধা। কিন্তু এই নীতি পরিবর্তনের দাবী নিয়ে নতুন নেতৃত্ব আবির্ভাবের সময় হয়েছে। কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সেই নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটুক। নতুবা এই সভাপতি নির্বাচন পর্ব শুধু পর্বতের মূষিক প্রসবের মতই বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে।

"যদিও এ বৎসরের এই নির্বাচনের সুদূর প্রসারী ফলাফল বুঝতে দেরী লাগবে, তথাপি একটি জিনিষ খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে—সেটি হ'ল কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের উপর অনাস্থা। বর্তমান কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ধ্বংস ক'রে স্বৈরাচারী শাসনের প্রবর্তন: করেছেন, তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ অনাস্থা প্রকাশ করেছে। গণতন্ত্র পুনরায় জয়ী হয়েছে। এবং তাতেই আজ কংগ্রেসকে এক প্রথম শ্রেণীর

সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সুতরাং আজ বামপন্থীদের দাবী হ'ল, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের পুন প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্বাচন। এই পথেই কংগ্রেসের বৈপ্লবিকীকরণ দ্রুততর হ'য়ে উঠবে এবং বর্তমানে যে সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে তা সাহসের সঙ্গেই মোকাবিলা করা সম্ভব হ'বে, এবং তখনই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে।" (I. I., 12 2/39)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রায়ের বিকল্প নেতৃত্ব স্থাপনের ঘোষণা পত্র

"ত্রিপুরি কংগ্রেস কি তার পুরাতন নীতির (creed) আমূল পরিবর্তনে রাজি হ'বে ? এই কর্তব্য সম্পাদনে ত্রিপুরি রাজি হ'তেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু তাই ভেবে বামপন্থীদের বিকল্প কর্মসূচী রচনা ফেলে রাখলে চলবে না।"

একথা রায় সভাপতি নির্বাচনের পরেই যে লেখাতে লিখেছিলেন তা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। তিনি ত্রিপুরি কংগ্রেসে বামপন্থীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে একটি ইস্তাহার রচনা ক'রে বাংলা তথা ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী সর্বশ্রী সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, ভূপেন দত্ত, মনোরঞ্জন গুপ্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী, আবদুল্লা সফদার, রাঘবিয়া, টি-পরমানন্দ প্রভৃতি নেতাদের স্বাক্ষরসহ প্রচার করলেন। ইস্তাহারটি নিম্নে দেওয়া হ'ল।

বিকল্প নেতৃত্ব
(Alternative Leadership)

"ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত যদিও বর্তমান সংকট ত্রাণের উপায় সম্বন্ধে কোন ঘোষণা করা হ'বে না, তথাপি গান্ধীজীর সঙ্গে সভাপতির যে কথাবার্তা হয়েছে তা থেকেই অবস্থাটি পরিষ্কার বোঝা গেছে। ওয়ার্ধা থেকে যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ওয়ার্কিং কমিটির যে সব সদস্য শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর পুনঃ নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন তাঁরা ভবিষ্যতে আর কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না; কারণ এই নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়ে কংগ্রেস এমন এক কর্মনীতি (পলিসি) গ্রহণ করছে যা তাঁরা সমর্থন করতে পারেন না।

আমরা জানি না প্রকৃতপক্ষে মত বিরোধ কোথায়? নির্বাচনের সময় ফেডারেল স্কীমের বিরুদ্ধে আরো শক্তিশালী প্রতিরোধের দাবী ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক বা মতবাদ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন তোলা হয় নি। অবশ্য নেতারা যদি এইরূপ সিদ্ধান্তই করেন, এর কারণ অবশ্য তাঁরাই জানেন, তা হ'লে অন্যান্যদের কংগ্রেস-পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেই হ'বে।

"এই সকল নেতাদের ভাব-ভঙ্গী যেমনই হোক, নতুন সভাপতি নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্ম পরিষদ নিয়মানুযায়ী অবশ্যই নতুন করে সংগঠিত করতে হ'বে। বর্তমান সভাপতি নির্বাচনের রাজনৈতিক তাৎপর্য যাই থাকুক, এর ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। ইদানীং কংগ্রেসের উচ্চতর পর্যায়ে যে স্বৈরাচারী আচার-আচরণ দেখা দিয়েছিল, এই নির্বাচন তারই সোচ্চার প্রতিবাদ। সুতরাং গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদের কর্ম পরিচালন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতেই হয়, এবং তা করতে হ'লে পুরাতন নেতৃবর্গের পরিবর্তে নতুন নেতৃবর্গের দ্বারা কর্মপরিষদকেও পুনর্গঠিত করতে হয়; সেই সঙ্গে ঠিক সেই একই কারণে আজ যাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাঁদেরও বিধিমত প্রতিনিধি রাখতে হয়। এটি সংগত ভাবেই আশা করা যায়, যে হেতু এই সকল নেতা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সেই হেতু তাঁরা পুনর্গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি অসহযোগিতা না ক'রে সানন্দে অপর সকলের সংগেই যৌথ ভাবে কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আমাদের বিশ্বাস, সভাপতি যখন নতুন ক'রে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবেন তখন তাঁদের এই কথাই বলবেন। যদি তাঁরা সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন তবে সমগ্র কংগ্রেসের নিকট তাঁদের জবাবদিহি করতে হ'বে।

"সভাপতিকে যদি সম্পূর্ণ নতুন লোক নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হয়, তা হ'লে তাঁদের কাজ হ'বে সভাপতি নির্বাচনের সময় যে মনোভাব ব্যক্ত হ'য়েছে তাকে রূপ দেওয়া। তাঁদের প্রথম কাজ হ'বে, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, যা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সর্বাগ্রে এটি যদি না করা হয়, তবে কংগ্রেসের কার্য পদ্ধতির কোন বড় রকমের পরিবর্তন বা কোন গুরুতর বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ করা যাবে না। সংপ্রতি কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা এমনই বিপুল ভাবে বেড়ে গিয়েছে যে, সংগঠন পরিচালন ব্যাপারে এক মহা সমস্যা দেখা দিয়েছে, এবং এ সমস্যার সমাধান কেবল মাত্র হুকুম জারির

দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। ভুয়ো সদস্য ও নানা দুর্নীতিমূলক কার্য কলাপ এখন আর কংগ্রেসের ব্যতিক্রম নয়, রীতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতা ও ছোটখাট পদাধিকার লোভের দ্বন্দ্বে আজ কংগ্রেস ভিন্ন ভিন্ন উপদলে বিভক্ত। ফলে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। যাঁরা কংগ্রেসের এই সকল আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানের সূত্র উদ্ভাবন করে তৎপরতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রয়োগ করতে পারবে কেবল তাদের মধ্যে থেকেই উদ্ভব হ'বে নতুন বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক নেতৃত্ব। ভুয়ো সভ্যের সাহায্যে দুর্নীতি পরায়ণ ক্ষমতালোভীদের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহ দখলে রাখার ব্যাধিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হ'বে। প্রাথমিক সভ্যদের উপর দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে সক্রিয় ক'রে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে—তা হ'লেই ভুয়ো সভ্য বাছাই হয়ে যাবে।

"কংগ্রেসের প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমিতি গঠিত হ'বে বৈপ্লবিক চেতনা বিশিষ্ট ও রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত সক্রিয় সভ্যদের নিয়ে। কংগ্রেস কমিটি সমূহকে মিউনিসিপ্যাল রাজনীতির আওতার বাইরে রাখতে হবে, কারণ ক্ষমতালোভীরা কংগ্রেসকে তাদের ক্ষমতা দখলের জন্যে ব্যবহার করে। উর্ধতন কমিটি সমূহকে, প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—প্রাথমিক সভ্যগণের কার্যকরী নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখতে হ'বে।

"অবিলম্বে করণীয় এই সাংগঠনিক সংস্কার কার্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের সামনে নতুন নেতৃত্বকে তুলে ধরতে হ'বে বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক সুস্পষ্ট ছবি। মূল রাজনৈতিক দাবীগুলি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমাদের পক্ষে যা অবাস্তব সেই সব বিষয়গুলি আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীকে কেবল ঘোলাটে ও জটিল ক'রে তোলে, আমাদিগকে সংস্কার পন্থী নিয়মতান্ত্রিকতার বিপথে ঠেলে দেয়। তাই এসব অবান্তর বিষয়কে দূরে সরিয়ে দিতে হ'বে। নতুন নেতৃত্বের যে কার্য পদ্ধতি ও কর্মসূচী প্রণীত হবে তার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিও গ্রহণ করার জন্যে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি :

"I. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত এই যে, ভারতের সংবিধান রচনার অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নাই। সুতরাং কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিনা সর্তে প্রত্যাখ্যান করছে, এবং স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে জনগণকে পরিচালিত করবার সংকল্প ঘোষণা করছে, এবং আয়োজন ও প্রস্তুতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণ-পরিষদ (Constituent Assembly)

আহ্বানের দাবী কার্যকরী করে তুলবে। গণ-পরিষদের কাজ হবে, বর্তমান ঔপনিবেসিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করা। সুতরাং গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচনের আহ্বান হবে জনগণের ক্ষমতা দখলের সংকেত ধ্বনি।

"পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবে পরিণত করার জন্যে গণ-পরিষদের যে দাবী, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, তা পূরণ করতে সারা দেশব্যাপী কংগ্রেস কমিটি-সমূহকে নিজ নিজ এলাকার শাসন কার্যের ভার গ্রহণ করবার নির্দেশ দান করবে। এই কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে, দেশের মধ্যে একমাত্র এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলেই গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচন ব্যবস্থা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। কংগ্রেস কমিটি সমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই (All Power to the Congress Committees). সংকেত ধ্বনির দ্বারা ভারত শাসন আইনের ফেডারেল অংশের ধ্বংস ও স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম সুরু হবে। এই রূপে দেশে যে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হবে তারই মধ্যে কংগ্রেস গণ-পরিষদে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে।

"ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, অতঃপর স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতির জন্যই কংগ্রেসের সকল কাজকর্ম পরিচালিত হতে থাকবে।

II. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে, কংগ্রেসের লক্ষ্যে পৌছতে হলে কংগ্রেসে যৌথ দায়িত্ববোধ ও আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্যে কংগ্রেস নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে :

(১) পার্লামেণ্টারি সাব-কমিটি বিলুপ্ত হোক;

(২) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী পরিচালিত ও ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা সাধারণ ভাবে পর্যবেক্ষিত হয়ে অতঃপর কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ ও আইন পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য নির্বাহক পরিষদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত হয়ে কাজ করবেন।

(৩) অতঃপর স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন অনুসারে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহে যথা—জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে, কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা জেলা কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবেন। এবং সাধারণভাবে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক পর্যবেক্ষিত হতে থাকবেন।

(৪) জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির কংগ্রেসী সদস্যগণ স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভ্য হতে পারবেন না।

III. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এই অভিমত, যে উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছিল ঠিক সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ কাজ করছেন না। "সংগঠনমূলক কর্মসূচী" রূপায়ণের মোহ "নূতন ভারত শাসন আইনের বিরোধিতার" নীতিকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করেছে। এই অবস্থায় কংগ্রেস চিন্তিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হউক, তাঁরা যেন তাঁদের বর্তমান নীতি পরিত্যাগ করেন। কারণ তাঁদের কার্য কলাপ জনসাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি করছে এবং কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট করছে।

"অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার ক্ষতি না করে জনসাধারণের সামান্যতম সুখ সুবিধার ব্যবস্থাও করা যায় না। সুতরাং শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে অনির্দিষ্ট কাল ধরে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার কোন অর্থ নাই। অতএব কংগ্রেস ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশ ও ফেডারেল অংশ উভয়কেই যুগপৎ ধ্বংস করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এই প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণকে ও পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণকে এই নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, অবিলম্বে তারা যেন নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন :

১। পর্যাপ্ত পরিমাণে (অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) জমির খাজনা হ্রাস ;

২। পল্লী অঞ্চলে যেখানে আসলের সমপরিমাণ ঋণের টাকা আদায় হয়ে গেছে সেখানে বাকি ঋণ মকুবের ব্যবস্থা ;

৩। কল-কারখানার শ্রমিকদের মজুরির হার সমান রেখে দৈনিক আট ঘণ্টার প্রবর্তন এবং সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ ;

৪। বেকার ভাতা দেবার ব্যবস্থা ;

৬। ভারতের জনগণের স্বাধীনতা খর্ব করবার জন্য যে সব আইন আছে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের আইন কানুন সমূহ নাকচের ব্যবস্থা ;

"কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত যে, মন্ত্রিবর্গ এর মধ্যে যে কোন একটি আইন প্রণয়নের দাবীতে পদত্যাগ করবেন। মন্ত্রিবর্গের পদত্যাগের ফলে যে অবস্থার

উদ্ভব হবে, তার দ্বারা প্রদেশের শাসন কার্যকে অসম্ভব করে তোলা হবে এবং সেই অবস্থাকে জনগণের ক্ষমতা দখলের কাজে লাগান হবে।

IV. এই কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন সাধারণতঃ তিন মাসে একবার করে বসবে, এবং যাতে সকল সদস্যই এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারে সেই জন্যে যাঁরা পাথেয় বহনে অক্ষম তাঁদের খরচ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একত্রে বহন করবে।

V দেশীয় রাজ্য সমূহের প্রজাগণের মধ্যে গণ জাগরণের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে কংগ্রেস কর্তৃক হস্তক্ষেপ না করার নীতি বর্তমানে অচল হয়ে গেছে। সমগ্র ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভই যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সেই কংগ্রেস ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের স্বৈরাচারী শোষণ-শাসনের কবলে থেকে পিষ্ট হয়ে চলবে তা সহ্য করতে পারে না। কংগ্রেসের এই অভিমত যে, এই সামন্ত-তন্ত্র, তা যতই মার্জিত হোক না কেন, তা কংগ্রেসের গণতন্ত্রের আদর্শের পরিপন্থী; সুতরাং কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, ইহার কার্যক্ষেত্র দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশীয় সামন্ততন্ত্রও লুপ্ত হবে।

"এই প্রস্তাবগুলির দ্বারা কংগ্রেসের মূলনীতি অপরিবর্তিতই থাকছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ১নং ধারা বদলানো হচ্ছে না। এই সবগুলি প্রস্তাব একত্রে কংগ্রেসের কর্মসূচী রূপায়ণের একটি যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা রচনা করছে। সুতরাং এই প্রস্তাবে কোন কংগ্রেস পন্থীরই আপত্তি হওয়ার কথা নয়। এই প্রস্তাবগুলি কেবল সমর্থন করাই নয়, এগুলি রূপায়িত করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যেই আছে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের প্রমাণ।

"পরিশেষে আমাদের বিশ্বাস, যদি বর্তমান সংকটের ফলে ওয়ার্কিং কমিটি নতুন লোক নিয়েই গঠন করতে বাধ্য হ'তে হয়, তা হ'লে কংগ্রেসের কর্মসূচীর উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন যে হয়েছিল তা প্রমাণিত হ'য়ে যাবে; এবং এইরূপ পরিবর্তন যদি কংগ্রেসের মধ্যে আনা না যায়, তবে নতুন নেতৃত্বও গড়ে তোলা যাবে না, বৈপ্লবিক চেতনা বিশিষ্ট নেতৃত্বের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীতাও পূর্ণ করা যাবে না। নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী ও অভিজ্ঞ বিপ্লবী

আমরা এই নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার কাজে নিজেদের নিয়োগ করব। এই নতুন নেতৃত্বের নতুন মানুষদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার ইচ্ছা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প নেতৃত্বের কর্মসূচী পেশ করাটাও আমাদের বৈপ্লবিক কর্তব্য বিধায় আমরা এইটি কংগ্রেসের কাছে পেশ করলাম। এই কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্যে দিয়েই কংগ্রেস ভারতের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা রূপে একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক পার্টিতে রূপান্তরিত হ'য়ে যাবে। (I. I., 26/2/39)

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরি কংগ্রেসে বিপ্লবীদের পরাজয়

এদিকে জনসাধারণের মন যাতে সুভাষ বাবুকে নিয়ে মেতে না থাকে, সেই জন্যে রাজকোট দেশীয় রাজ্যের রাজা ঠাকুর সাহেবের চুক্তি লঙ্ঘনের অজুহাতে ত্রিপুরি কংগ্রেসের প্রাক্কালেই গান্ধীজীকে দিয়ে প্রায়োপবেশন সুরু করানো হ'ল। আমরণ উপবাস। ভারতের সমস্ত জনগণের উদ্বেগাকুল দৃষ্টি গান্ধীজীর উপর নিবদ্ধ হ'য়ে রইল। জনগণ সুভাষবাবুকে ভুলে গেল—ত্রিপুরি কংগ্রেস গৌণ হ'য়ে গেল। রায় লিখলেন :

"গান্ধীজীর প্রায়োপবেশনে সারা দেশ আজ ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে। আমরাও অনুরূপ ভাবেই বিক্ষুব্ধ। আমরা ভারত সরকারকে অবিলম্বে ঠাকুর সাহেবকে তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করবার জন্যে বাধ্য করে গান্ধীজীর মহামূল্যবান জীবন রক্ষার জন্যে দাবী জানাচ্ছি। এবং এও বলছি যে, গান্ধীজীর পরম ভক্তগণ অপেক্ষা মহাত্মাজির প্রতি আমাদের ভক্তি কিছু কম নয়। তথাপি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে বা রাজনৈতিক অনাচার সংশোধনের উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রায়োপবেশন করার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের আপত্তি না জানিয়েও পারছি না। এর ফলে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নিদারুণ ক্ষতি হয়। এই প্রায়োপবেশনের পরেই দেশীয় রাজ্য সমূহে যে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল, এবং ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল তা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

"....এই ভাবে আত্মপীড়নের দ্বারা জগৎ থেকে অত্যাচার-উৎপীড়ন শেষ করা যায় না। যীশু খ্রীষ্টের আত্মাহুতিতে জগৎ বিশুদ্ধ হয়নি। গান্ধীজীর আত্মাহুতিতেও ভারত থেকে অনাচার অত্যাচার লুপ্ত হয়ে যাবে না।

"....এর ফলে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কেবল মিষ্টিসিজিমের ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় এবং এই ধোঁয়ার আড়ালে স্বার্থপর লোকেদের স্বার্থ সিদ্ধিই ঘটে। এই শিক্ষার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়তো আমরা ত্রিপুরিতেই দেখতে পাব। গান্ধীজীর প্রয়োপবেশনের পক্ষে এ সময়টি ধার্য করা বড়ই শোচনীয় হয়েছে।.... ত্রিপুরিতে হয়তো কংগ্রেসের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ত। কিন্তু গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন সব কিছুকেই বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। রাজনৈতিক প্রশ্ন আর কারও মনে নাই, ত্রিপুরিতে 'কেউ আর যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হ'বে না, হবে ভাবাবেগের দ্বারা।" (I. I., 8. 3. 39)

যা ভয় করা গিয়েছিল, ত্রিপুরিতে তাই ঘটল। গান্ধীজীর মহিমার মেঘের আড়ালে থেকেই প্যাটেলের দল কাজ গুছিয়ে নিলে। পন্থ প্রস্তাবে গান্ধীজির মতানুসারে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন করার জন্যে সভাপতির উপর নির্দেশ দেওয়া হ'ল। সুভাষ বাবুও গান্ধীজীর আশীষ ও সহযোগিতা ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারলেন না। কেবল রায়পন্থীরা সুভাষ বাবুকে ভোট দিলেন। সোস্যালিষ্ট কমিউনিষ্ট প্রভৃতি বামপন্থীরা পন্থ প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন।

রায় গভীর মনোবেদনার সঙ্গে সহকর্মীদের বললেন :

"আজ বিশ বছর ধরে কংগ্রেসের মধ্যে জনগণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করে আসছিলাম। সুভাষ বাবুর জয়ে তা যে সম্ভব ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বামপন্থী ব'লে যারা বড়াই করে, বিপ্লবের প্রতি কেবল তাদেরই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে কংগ্রেসে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'ল না। এই সব তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নীতির অভাবেই আজ তারা পথ খুঁজে পেল না—প্রতিবিপ্লবীর পথ অনুসরণ করল।"

রায় যে পূর্বে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন : 'বিপ্লবী দলের বৈপ্লবিক নীতি চাই। এদের কারুরই বৈপ্লবিক নীতিও নাই, তা প্রয়োগের কৌশলও জানা নাই। সেইজন্যই এরা যখন বৈপ্লবিক সংকটে পড়বে, তখন পথ খুঁজে পাবে না, প্রতি-বিপ্লবীর পথ ধরবে', সুভাষ বাবুকে ত্যাগ করার ফলে তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেল।

রায় আরও বললেন : "ভারতে বিপ্লবের আশা এই নর্মদাতীরে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। তথাপি আমাদের চলতে হবে সেই সুদূর পরাহত বৈপ্লবিক ভবিষ্যতের পানে। যতদিন না আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে ততদিন ভারতের বিপ্লব আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে, ততদিন ভারতের অগণিত

বুভুক্ষু নরনারীর দুঃসহ জীবনের অবসান হ'বে না। এই সঙ্গে আমাদেরও কংগ্রেসের পালা শেষ হ'ল। এবার কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে দেশের বৈপ্লবিক শক্তিকে সংগঠিত ক'রে তুলতে হবে। কংগ্রেস আজ থেকে ধনীদের ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের পার্টিতে পরিণত হ,ল।"

সুভাষ বাবুকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার অনুমতি গান্ধীজী দিলেন না। গান্ধীপন্থীরা প্রতি আক্রমণ করলে কয়েক মাস পরে সুভাষ বাবুকে বাধ্য হ'য়ে পদত্যাগ করতে হ'ল। তারপর একদিন গান্ধীপন্থীরা সুভাষ বাবুকে কংগ্রেস থেকেই বিতাড়িত করলেন। সুভাষ বাবু যদি ত্রিপুরিতেই এদের বিতাড়িত করতেন, তা হলে আর নিজেকে বিতাড়িত হতে হ'ত না। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেই সেটা হ'তে পারত। পন্থ প্রস্তাব উঠবার পূর্বেই রায় সে কথাই তাঁকে বলেছিলেন।

রায় কয়েকদিনের মধ্যেই নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করলেন :

"ত্রিপুরীতে বামপন্থীদের ছত্রভঙ্গের ফলে র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসসেবিরা একটি সময়োপযোগী কর্মসূচীর উপর তাঁদের সংহতি আরো বেশী শক্তিশালী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির বিস্ময়কর আচরণ সত্ত্বেও কয়েক শত ডেলিগেট কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। এই সব ডেলিগেটদের অধিকাংশই কংগ্রেসের মধ্যে কোন পার্টি ভুক্ত নন। তাঁরা কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যের বৈপ্লবিক চেতনা বিশিষ্ট অংশেরই প্রতিনিধি। কংগ্রেস অধিবেশনের পরে তাদের মধ্যে অনেকেই, যাঁদের প্রায় চল্লিশ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য—কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হ'য়ে ত্রিপুরি কংগ্রেসের পরিস্থিতি, এর ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া এবং এই অবস্থায় বৈপ্লবিক কংগ্রেস কর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই সব বৈঠকের শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, কংগ্রেসের মধ্যে কোন পার্টি গঠন করার চেষ্টা করা যদিও অবাঞ্ছনীয় তথাপি যাঁরা কংগ্রেসের বর্তমান নীতি-পদ্ধতির ও গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিরোধী তাঁরা তাঁদের কাজ কর্ম সংহত করে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চালাবার ব্যবস্থা করবে। সেই উদ্দেশ্যে লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন (League of Radical Congressmen)" নামে একটি সংহতি গড়ে তোলার পক্ষে সকলে অভিমত প্রকাশ করেন, এবং এর জন্যে যে কোন প্রকার পৃথক সংস্থা গড়ে তোলা হবে না, সে অভিমতও প্রকাশ করা

হয়। কিন্তু কাজ কর্মের সংহতি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে একটি সংহতি বিধায়ক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্থির হয় এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করে শীঘ্রই একটি ঘোষণা পত্র প্রচার করা হবে। এই ঘোষণা পত্রে কংগ্রেসের মধ্যে একটি পার্টি বহির্ভূত বামপন্থী সংহতি গড়ে তোলার মূল নীতিগুলি বিবৃত হ'বে এবং র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেনদের করণীয় কাজ কর্মের পরিকল্পনা দেওয়া হবে। যাঁরা এই ঘোষণা পত্রে বিবৃত নীতি ও কর্মসূচী সমর্থন করবেন তারাই এক লীগের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারবেন। এই লীগের উদ্দেশ্য হ'বে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচীর সত্যকার রূপায়ণের পথের সকল বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, কংগ্রেসের মধ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক পার্টি বহির্ভূত বামপন্থী সংহতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা সমগ্র দেশের বিশিষ্ট বিপ্লবী ও র‍্যাডিক্যালদের সমর্থন লাভ করেছে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, ত্রিপুরির পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না।” (I. I., 26/3/39)

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

“লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস-মেন” প্রতিষ্ঠা

ত্রিপুরি কংগ্রেসের কিছুদিন পরেই ‘লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন’-এর ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রকাশিত হল, এবং মতামতের জন্যে আহ্বান জানান হ'ল।

“লীগ অব্ দি র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন-এর ঘোষণাপত্রের খসড়া (Draft Manifesto of the L. R. C. : The Object & Programme of the League)

লীগের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

“ত্রিপুরির ঐতিহাসিক কংগ্রেসের অধিবেশনে যে সব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও ডেলিগেট বৈপ্লবিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন তাদের সেখানে এক বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকে আরও অনেক কংগ্রেস কর্মীও যোগ দেন। উদ্দেশ্য ছিল, কয়েকটি বামপন্থী দলের আত্মসমর্পণের ফলে স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের পুনরুত্থান ঘ'টে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম বিপথগামী না হয় সে জন্যে কংগ্রেসের সকল বৈপ্লবিক শক্তিকে সংহত ক'রে তোলার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা।

শোচনীয় অধঃপতন

“কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বিপুল আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এই সংগ্রামী জনতার মধ্যে যে বিপুল বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত আছে সেই

শক্তিকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়লাভের পক্ষে যথেষ্ট জাগ্রত ও আক্রমণাত্মক করে তোলা হয় নি। আমাদের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে বিপরীত আদর্শের সংমিশ্রণের ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলেই এমনটি ঘটেছে। যে দিন থেকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছে সেই দিন থেকেই কংগ্রেসের পরিকল্পিত বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শ তুচ্ছ সংস্কারমূলক কাজকর্ম করার ঝোঁকে চাপা পড়ে গিয়েছে। বিদেশী শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা ক্রমেই হস্তান্তরিত হ'তে থাকবে এই মিথ্যা মোহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আজ আমাদের সকল রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ কংগ্রেসী রাজনীতি প্রায় বিশ বছর পূর্বের ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থার স্তরেই অধঃপতিত হ'য়েছে। কংগ্রেসের আদর্শ যে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তা অর্জনের যে একমাত্র পথ গণ-বিপ্লব, সেই পথ থেকে এই যে শোচনীয় অধঃপতন তা কিন্তু বীর রসে ভরা বাক্যে রচিত প্রস্তাব, ঘোষণা ও বিবৃতি দিয়ে সযত্নে আবরিত—যাতে এই অধঃপতনের প্রকৃত স্বরূপ অন্ধভক্ত ও তালকানা পর্যবেক্ষকদের চোখে ধরা না পড়ে।

সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ

"কিন্তু কংগ্রেসের পতাকাতলে যে জনগণ সম্মিলিত হয়েছে তাদের বৈপ্লবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হচ্ছে কংগ্রেসী মন্ত্রিদের অক্ষম প্রচেষ্টার প্রতি বিরক্তিতে ও অসন্তোষে। মহাত্মাজীর অলৌকিক শক্তির প্রতি ও তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট নেতাদের কর্মদক্ষতার উপর অগাধ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও অধঃস্তন কংগ্রেস কমিটি সমূহের কর্মকর্তারা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন গণতন্ত্রকে নষ্ট করে সাধারণ কংগ্রেস সভ্যদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ নিবারণ করতে পারছেন না। সাধারণ কংগ্রেস সভ্যদের চেপে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের উদ্দেশ্যেই ভুয়ো সভ্য খাতায়-পত্রে দেখান হচ্ছে; উচ্চতর কমিটির প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় দুর্নীতির ও বে-আইনী উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে, বৈপ্লবিক কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। কারুর সাধ্য নাই যে, এ সব অভিযোগ অস্বীকার করে। অবশ্যই বলা হ'য়ে থাকে যে, এ সব অন্যায় দূর করতেই হ'বে। কিন্তু তার জন্যে যে সব উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা এমনই যে, তাতে কোন কাজই হয় না। এইসব অন্যায়ের প্রতিকারের একমাত্র উপায় কংগ্রেসের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত সকল

পর্যায়েই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ও প্রাথমিক সমিতির সক্রিয়তা। কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যদের রাজনৈতিক শিক্ষাদানই এই রোগের একমাত্র ফলপ্রদ চিকিৎসা। সমগ্র কংগ্রেসে কোথাও আজ এ ব্যবস্থা নাই। বর্তমানের স্বৈরাচারী নেতৃত্বের ভিত্তি হ'ল অন্ধ বিশ্বাস। তার ফলেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র রক্ষার কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

সভাপতি নির্বাচনের তাৎপর্য

"এই বৎসরের সভাপতি নির্বাচনের অপ্রত্যাশিত ফল দুষ্টচক্রকে ভেদ করেছে। সাধারণ কংগ্রেস সভ্যের পুঞ্জিত অসন্তোষ স্বৈরাচারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সেদিন বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল। ডেলিগেটদের অধিকাংশই সেদিন কোন ব্যক্তি বা সোস্যালিজিমের জন্যে ভোট দেয় নি। সে ভোট ছিল কংগ্রেসের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কল্পে এবং তার সবই যে খুব একটা সচেতন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ছিল তাও নয়। তথাপি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যার সুযোগ নিয়ে সচেতন ও দৃঢ়চিত্ত বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তনের চেষ্টা করতে পারতেন। সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এক প্রার্থীর পরিবর্তে অপর একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া ডেলিগেটদের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, স্বৈরাচারী নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করা। কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যখন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে তখন বৈপ্লবিক কংগ্রেসসেবীদের উচিত ছিল অনাস্থাভাজন নেতাগণের মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বকে ভাঙ্গিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার চেষ্টাকে বাধা দেওয়া।

"যাঁরা পূর্বে কংগ্রেসের বৈপ্লবিক অংশকে নেতৃত্ব দানের অধিকার ও দাবী জানিয়েছিল এবং এই বৎসরের সভাপতি নির্বাচনের অপ্রত্যাশিত ফলের সকল কৃতিত্বের দাবীদার ছিলেন, তাঁরা তাঁদের সে কর্তব্য সম্পাদনে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হয়েছেন। তাঁরা স্বৈরাচারী নেতৃত্বের প্রতিআক্রমণের মুখে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েছেন। প্রেসিডেণ্ট নিজেও এবং খানিকটা অসুস্থতার জন্যেও বটে, এই অপরিণত গণতান্ত্রিক বিদ্রোহকে সঠিক পথে পরিচালিত ক'রে উচ্চস্তরের পরিণতির দিকে তুলে ধরতে পারেন নি।

বৈপ্লবিক প্রতিরোধ

"বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও দৃঢ়চিত্ত বিপ্লবীদের একটি ছোট দল গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগামী বাহিনীরূপে ত্রিপুরিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। অবিলম্বেই

সাফল্য লাভ ঘটবে এমন কোন আশার বশবর্তী হ'য়ে তারা সেদিন স্বৈরাচারী নেতৃত্বের প্রতিআক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি, বিদ্রোহের পতাকা উচ্চে তুলে ধরবার জন্যেই সেদিন তারা দাঁড়িয়েছিল। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের কারুরই ছিল না। সুবিধাবাদের ভিত্তিতে আপোষের জন্যে যে দর কষাকষি চলেছিল তা থেকেও তারা দূরে ছিল, এবং তারা কেবল কংগ্রেসের মূলনীতি ও সংগঠনের সমস্যাকেই তুলে ধরেছিল। তাড়াতাড়ি 'বামপন্থা' ত্যাগ করার জন্যে উন্মুখ "বামপন্থী"দের সাহায্য ব্যতিরেকেই তারা ভারতের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের ও তাদেরই সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের শেষ আশার আলোরূপে দাঁড়িয়েছিল। যাদের ভরসায় প্রেসিডেন্ট তাঁর সকল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে পণ রেখেছিলেন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যখন তিনি একান্তই সহায়হীন তখন যারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তিনি যে তাদের সঙ্গে এসে দাঁড়ান নি, সেজন্যেও তারা দুঃখিত হয় নি। যেহেতু তারা দৃঢ়চিত্ত সচেতন বিপ্লবী, সেই হেতু তারা তাদের এই কার্য বেশ ভেবেচিন্তেই করেছে। কোন ব্যক্তিবিশেষকে সমর্থন করা বা কোন দলবিশেষের স্বার্থসিদ্ধি করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, স্বৈরাচারী নেতৃত্বের যে নীতি ও কাজের ফলে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রগতি বিঘ্নিত হচ্ছিল তারই বিরোধিতা করা।

"ত্রিপুরির পরাজয়ের ফলে ভগ্নোদ্যম গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক শক্তিকে সংহত করে তুলতে হ'বে। তাদের উৎসাহিত, সক্রিয় ও সংগঠিত ক'রে তুলতে হ'বে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই "লীগ অব র্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন" নামে একটি সংঘ গড়ার প্রস্তাব হ'য়েছে। এই লীগ কংগ্রেসের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত সকল স্তরেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করে যাবে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের সামাজিক মুক্তির জন্যে যে কঠিন সংগ্রামের প্রয়োজন, তাকে শক্তিশালী করার জন্যে যে নতুন বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রয়োজন তার ভিত্তি স্থাপনের গুরু দায়িত্ব এই লীগ মাথায় তুলে নেবে।

লীগের কর্মসূচী

"কংগ্রেসের যে রাজনৈতিক কর্মসূচী আছে, এই লীগেরও সেই একই কর্মসূচী। সেই কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রচনা করার জন্যে এই লীগ কংগ্রেসের উপর চাপ দেবে। এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শের ও

বিভিন্ন সময়ে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের যে বৈপ্লবিক তাৎপর্য, তা দেশের কাছে তুলে ধরবে। এই লীগ সব সময়েই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ও তার ভারতীয় মিত্রদের সঙ্গে সকলপ্রকার আপোষ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে চলবে।

"যে সব নীতি ও সংস্কার এইরূপ আপোষ মনোভাবের প্রশ্রয় দেয়, তা পরিত্যাগ করবার জন্যে লীগ দাবী জানাবে। অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অধিকার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অতি পবিত্র অধিকার—এই বিশ্বাসে কংগ্রেসের যে নীতি ও কার্য পদ্ধতির ফলে এই বিদ্রোহের অধিকার খর্ব ও বাধাগ্রস্ত হয়, এই লীগ সেই সব নীতির বিরোধিতা করবে। কংগ্রেসের সভ্য বিধায়, লীগের সকল সভ্যই কংগ্রেসের নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলবে। এবং যেহেতু নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার অর্থ গণতান্ত্রিক অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়া নয়, সে হেতু যতক্ষণ সেই সব নিয়ম কানুন বলবৎ থাকবে ততক্ষণ তা মেনে চললেও, যদি সেই সকলের দ্বারা ভারতের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ক্ষতি হয়, তা হ'লে তার পরিবর্তন ও সংশোধনের দাবীতে আন্দোলন চালাবে।

ফৈজপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব

"এই লীগ কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যসূচীকে ফৈজপুর প্রস্তাব অনুসারেই ব্যাখ্যা করবে। সে প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস জনগণের দ্বারা ক্ষমতা দখলের সাহায্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার আদর্শ লাভে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই প্রস্তাবের ফলে ধীরে ধীরে ক্ষমতা হস্তান্তর চেষ্টার কোন অবকাশ নাই, অথচ বর্তমানে সেটাই হয়েছে কংগ্রেসের কার্য পদ্ধতি। এই লীগ, ভারতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া মাত্র যাতে সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু করা হয়, সেইরূপ প্রস্তাব গ্রহণের জন্যে কংগ্রেসের উপর চাপ দেবে। ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে, তার প্রধান অঙ্গ হ'ল, ভূমির মালিকানা স্বত্ব-উপস্বত্ব ভোগী জমিদারগণের হাত থেকে নিয়ে প্রকৃত কৃষকের নিকট হস্তান্তর করা। সমগ্র সমাজের আর্থিক উন্নয়নের অপর প্রধান সর্ত হ'ল, রাষ্ট্রীয় সাহায্য পুষ্ট ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন দ্রুত শিল্পায়ণ, যা অবশ্যই কংগ্রেস গ্রহণ করবে। এই উন্নয়ণ কর্মসূচীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দফা, সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যগুলির বিলোপ সাধন।

উপস্থিত কর্তব্য

"এই লীগ অবিলম্বে নিম্নলিখিত কাজগুলি করবার চেষ্টা করবে :

(১) কংগ্রেসের ভুয়ো সভ্য সংগ্রহের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা অবলম্বন ;

(২) প্রাথমিক সভ্যের সক্রিয়তা সম্পাদন ;

(৩) প্রত্যেক প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিতে একদল বৈপ্লবিক চেতনা সম্পন্ন রাজনৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত, সক্রিয় কর্মী সৃষ্টি ;

(৪) কোন ব্যক্তি বা দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কংগ্রেস কমিটি সমূহ যাতে ব্যবহৃত হতে না পারে সেইরূপ উপায় অবলম্বন ;

(৫) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর প্রাথমিক সভ্যগণের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ;

(৬) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সংসদ কর্তৃক মন্ত্রী ও পরিষদীয় সদস্যদের কাজকর্ম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা।

"এই আশু কর্তব্য সমূহ সম্পাদনের জন্যে এই লীগ প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি সমূহের উপরই সর্বাধিক মনোযোগ প্রদান করবে।

"প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি সমূহকে সক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে এই কমিটিগুলি গঠিত হবে রাজনৈতিক চেতনা বিশিষ্ট সভ্যদের নিয়ে ; এবং কমিটিগুলির উপরে থাকবে নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের সক্রিয় সমর্থন, এবং এই সমর্থন গড়ে উঠবে তাদের আশু দাবী ও প্রয়োজন মেটাবার দৈনন্দিন সংগ্রামে কমিটির নেতৃত্ব দানের মধ্যে দিয়ে।

"যখনই কংগ্রেসের মূল ভিত্তিগুলি জনগণের সংগ্রামের এক-একটি জীবন্ত সংগঠনে রূপান্তরিত হ'য়ে যাবে তখনই গোটা কংগ্রেস ক্ষমতা দখলের শেষ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠবে।

"প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি সমূহকে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিরূপে সংগঠিত করে তুলতে হবে, এবং তা বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকেই গ্রাস করে ফেলবে।

গণ-পরিষদ

"এই লীগ সাধারণ কংগ্রেসসেবীদের বুঝিয়ে বলবে যে, ক্ষমতা দখলের জন্যে যে বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থানের প্রয়োজন, তার জন্যে যদি অবিলম্বে প্রয়োজনীয়

প্রস্তুতি আরম্ভ না হয়, তবে গণ-পরিষদের দাবীর কোন অর্থ হয় না। লীগ একথাও বলবে যে, ফেডারেল স্কীম প্রতিরোধের যে প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছে তা কার্যকরী হ'তে পারে একমাত্র গণ-পরিষদের দাবীকে রূপায়িত ক'রে। গণ-পরিষদ আহ্বানের বৈপ্লবিক তাৎপর্য সাধারণ কংগ্রেসসেবীদের ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিতে হ'বে; এই দাবীর যে কদর্থ করা হচ্ছে তা নির্ভীকতার সঙ্গে প্রকাশ করে দিতে হবে, এবং এই কদর্থ করার মধ্যে যে স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা আছে তাও ধরিয়ে দিতে হ'বে। সাম্রাজ্যবাদের সম্মতিক্রমে ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে যে এই গণ-পরিষদ গ'ড়ে উঠবে না সে কথা ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিতে হবে। ভারতের জনগণের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়েই কেবল মাত্র তা গড়ে উঠতে পারে। জনগণের দ্বারা ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার রূপেই গণ-পরিষদ গড়ে উঠবে; এ হাতিয়ার ক্ষমতা পাওয়ার পরে গড়ে উঠবে না—যদিও কেউ কেউ তা বলে থাকেন। এঁরা ভাবতেও পারেন না যে, ভারতবাসী কোন দিন ক্ষমতা দখল করতে পারবে। সেই জন্যে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনায় ক্ষমতা দখলের হাতিয়ারকে বাদই দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের জন্যে যে হাতিয়ার, তা কেবল বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই গড়ে তোলা যেতে পারে; এবং সেটাই হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের একমাত্র অপরিহার্য পথ।

সংসদীয় কর্মসূচী

"অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার ক্ষতি না করে জন সাধারণের সামান্যতম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও করা যায় না; সুতরাং শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা চালাবার জন্যে অনির্দিষ্ট কাল ধরে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকার কোন অর্থ হয় না। অতএব এই লীগ ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক ও ফেডারেল উভয় অংশই যুগপৎ ধ্বংস করবার জন্যে প্রচার কার্য চালিয়ে যাবে; এবং চেষ্টা করবে যাতে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ ও পরিষদের সদস্যগণ নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রবর্তনের দাবীতে শাসন সংকট সৃষ্টি করে:

(১) পর্যাপ্ত পরিমাণ জমির খাজনা হ্রাস, (অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ);

(২) পল্লী অঞ্চলে যেখানে আসলের সম পরিমাণ ঋণের টাকা আদায় দেওয়া হয়েছে সেখানে বাকি ঋণ মকুবের ব্যবস্থা;

(৩) কল-কারখানায় শ্রমিকদের ও অফিসে কেরানীদের মজুরি ও বেতনের হার সমান রেখে ৮ ঘণ্টা রোজের প্রবর্তন এবং সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ;

(৪) বেকার ভাতা দেবার ব্যবস্থা;

(৫) ভারতের জনগণের স্বাধীনতা খর্ব করবার জন্যে যে সব আইন আছে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের, সেই সকল আইন সমূহ নাকচের ব্যবস্থা।

"যখনই ফেডারেল স্কীম প্রয়োগের চেষ্টা হবে, তখনই যাতে এর যে কোন একটি আইন প্রণয়নের দাবীতে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন তার জন্যে এই লীগ কংগ্রেসকে সম্মত করাতে চেষ্টা করে চলবে। যখন কেবল প্রাদেশিক মন্ত্রিবর্গের পদত্যাগের ফলেই ফেডারেল স্কীমটি নাকচ হ'য়ে যাবে না, তখন এই শাসন সংকটকে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির কাজে লাগাতে হ'বে। এই সংকট সমগ্র দেশে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করবে যখন ক্ষমতা দখলের জন্যে আক্রমণ সুরু করা সম্ভব হ'বে। ইতিমধ্যেই এই লীগের প্রচেষ্টার ফলে প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি সমূহ শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সংগঠন রূপে গড়ে উঠতে থাকবে। তখন এরাই এক বৈপ্লবিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি রূপে কাজ করে চলতে সক্ষম হ'বে।

জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য

"এই লীগ জাতীয় ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা করে চলবে। কিন্তু এই ঐক্য হ'বে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের ঐক্য। সেই হেতু এই লীগ হিন্দু-মোসলেম ঐক্যের জন্যে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করবে। এই ঐক্য বিধান প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হ'বে, মুসলমান, অব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর জনগণকে কংগ্রেসের মধ্যে এনে সমূহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির সম্মেলন-রূপে কংগ্রেসকে গড়ে তোলা। বিভিন্ন স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিকর প্রচারের দ্বারা মোসলেম ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জেগেছে তা দূরীকরণের জন্যে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা গ্রহণ করার জন্যে এই লীগ কংগ্রেসকে অনুরোধ করবে। যতদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য অন্য কোন ব্যবস্থার উদ্ভাবন না হচ্ছে, ততদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জন্যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সরকারী চাকরীতে সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থার দাবী গ্রহণের জন্যে এই লীগ কংগ্রেসকে অনুরোধ, উপরোধ ও যুক্তি প্রদর্শন করে চলবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্যে এইগুলি এবং অন্যান্য

ব্যবস্থা সমূহ গণ-পরিষদ কর্তৃক স্বাধীন ভারতের যে শাসনতন্ত্র রচিত হবে তাতে বিধিবদ্ধ থাকবে।

"এই লীগ প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঘোরতর বিরোধিতা করে চলবে। খারে ব্যাপারের পর* মহারাষ্ট্রে' যেমন প্রাদেশিকতার উদ্ভব হয়েছে, কংগ্রেসের বর্তমান সংকটের ফলে বাংলাতেও তেমনি প্রাদেশিকতার উদ্ভবের সম্ভাবনায় সকল র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসসেবীই প্রমাদ গণছেন। কংগ্রেসের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই লীগের যে সংগ্রাম তা প্রাদেশিকতার সাহায্যে পুষ্টি লাভ করবে না। এই সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয়ে এই লীগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।

"এই লীগের উদ্দেশ্য কংগ্রেসকেই শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা এবং তা সিদ্ধ করতে হ'লে কোন প্রকারেই প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এও সাম্প্রদায়িকতার মতই জাতীয় ঐক্য ও জনগণের ক্ষমতা লাভের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর।

বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি

"আমাদের বিশ্বাস, যে সকল কংগ্রেসসেবীর গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও প্রগতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে তাদের সকলের নিকটই এই লীগের উদ্দেশ্য সমর্থন লাভ করবে। কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচী যা আছে আমরা তাই অনুসরণ করতে চাই। তার একটু বেশীও নয়—কমও নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হচ্ছে না। সেই জন্যেই আজ কংগ্রেসে র‍্যাডিক্যাল ও বিপ্লবী কংগ্রেসসেবীগণের সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে পরিচালিত করার জন্যে একটি সংগঠনের প্রয়োজন হয়েছে। যদি কংগ্রেসকে ভারতের জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয় তা হ'লে আজ এই সব শক্তিকে সংঘবদ্ধ হ'য়ে স্ব-স্বরূপে দাঁড়াতে হ'বে, নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী ঘোষণা করতে

---

* শ্রীখারে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী। প্যাটেলজির হুকুম তামিল করা অপেক্ষা নিজ প্রদেশের স্বার্থরক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকে বিতাড়িত করেন। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়। এর ফলে মারাঠা প্রধান মধ্য-প্রদেশে ও মহারাষ্ট্রে যে কংগ্রেস বিরোধিতা গড়ে ওঠে তা প্রাদেশিকতার রূপ ধারণ করে। সুভাষবাবুর প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির ব্যবহারে বাংলাতেও যে সে সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, সেই আশঙ্কার কথাই বলা হচ্ছে।—লেখক

হবে, কংগ্রেসের নীতি ও কার্যপদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে হ'বে, কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'বে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই সব শক্তি সংগঠিত হয়ে উঠুক। এই সংগঠনের কার্যোপযোগী রূপ আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে ভারতের জনগণের বৈপ্লবিক পার্টিরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা চেষ্টা করে যাব, এবং সেটাই হবে আমাদের এখনকার বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য। তখন কংগ্রেস এক সচেতন বৈপ্লবিক নেতৃত্বের পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে ও গণতান্ত্রিক জাতীয় বিপ্লব সাফল্য মণ্ডিত ক'রে তোলার জন্যে পরিকল্পনা রচনা করবে, যুদ্ধ করবে, এবং সর্বশেষে জয়লাভ করবে।"

(I. I., 16/4/39)

মার্চ মাসে ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। এপ্রিল মাসে এই ঘোষণা পত্রটি প্রকাশিত হ'ল। ৩০শে এপ্রিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলকাতা অধিবেশনে সুভাষবাবু পদত্যাগ করলেন। এই ঘোষণা পত্রের উপরে বিপ্লবী ও র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসসেবীরা প্রতি প্রদেশে প্রদেশে সম্মেলনে মিলিত হ'লেন। রায়এর অধিকাংশেই উপস্থিত হ'য়ে আলোচনা পরিচালনা করলেন। বহু শতাব্দীর অত্যাচারিত ও বঞ্চিত মূক মূঢ় জনগণ কী ভাবে ক্ষমতা দখল করবে তার পবিকল্পনা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

তিনি লীগের ঘোষণা পত্রে লিখেছিলেন, "যে সকল কংগ্রেসসেবীর গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও প্রগতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, এই লীগের উদ্দেশ্য ও কার্য পদ্ধতি তাদের সকলের নিকটই সমর্থন লাভ করবে।" কিন্তু তখন দেশে কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে পুরাতন সংস্কার, অন্ধ বীরপূজা ও গুরুভক্তি ছাড়া সত্যিকারের রাজনৈতিক জ্ঞান এতই কম ছিল যে, 'গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও প্রগতি' বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে সম্যক অনুভূতি বিশেষ কিছুই ছিল না। সেই জন্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈপ্লবিক কার্যসূচী সম্বলিত সমর কৌশলের পরিকল্পনা কংগ্রেসী মহলে নতুন করে কোন সাড়া জাগাতে পারল না। যাঁরা ইতিমধ্যেই র‍্যাডিক্যাল বা রায় পন্থী নামে খ্যাত ছিলেন তাঁদেরই প্রতিনিধিদের নিয়ে পুণাতে ২৭শে-২৮শে জুন নিখিল ভারত লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন-এর উদ্বোধনী সম্মেলনের অধিবেশন বসল। রায় তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন :

"সব ঘটনাই ঐতিহাসিক। সুতরাং এই সম্মেলনকেও ঐতিহাসিক বলার

কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। তথাপি বলতে হচ্ছে যে, এই সম্মেলন ভারতের জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। প্রায় কুড়ি বছর ধরে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছে, সেই সংগ্রামই আজ এক সংকটের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। এই সংকট বয়ঃসন্ধির সংকট। এতদিন ধ'রে এক নতুন শক্তি এই স্বাধীনতা 'সংগ্রামের মধ্যেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। আজ সেই শক্তিই সারা সংগ্রামকে জয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে চায়। লীগ্ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন এই সংকটের মধ্যেই জন্মলাভ করেছে এবং এই লীগই এই সংকট কাটিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধকে জয়ের পথে পরিচালিত করবে। এতদিনের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে যে নতুন শক্তি জন্মলাভ করেছে তারই মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে এতে। এটি হ'ল স্বাধীনতা সংগ্রামের সঞ্চিত সম্পদ—ভবিষ্যতের আশা।....' সুতরাং এই লীগের উদ্ভব অকস্মাৎ ঘটে নি।

"বস্তুতঃ জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের সমগ্র স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে একার্থ বোধক। সেই হেতু এই কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক পার্টির মতন পরিচালিত হয়ে আসে নি। এবং সেই জন্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলতেও কোন সুসংগঠিত নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি।

"....লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন কেবল মাত্র কংগ্রেসের একটি অংশ মাত্র নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করতে জনগণ যে বৈপ্লবিক পার্টি অচিরেই গড়ে তুলবে, এ হ'ল সেই বিপ্লবী জনগণের অগ্রগামী সওয়ার। এই লীগের উদ্দেশ্য, জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পার্টিতে রূপান্তরিত করা।"

এই সম্মেলনে ত্রিপুরির পূর্বে যে বিকল্প নেতৃত্বের (পূর্বে উল্লিখিত) ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয় তার প্রয়োজনীয় অংশও এই লীগের ঘোষণাপত্রে সংযোজিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানে রায়ের প্রচেষ্টা

রায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে একদিকে যেমন প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি সমূহ বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করে চললেন, অন্য দিকে দেখলেন, দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্যে হিন্দু ও মুসলমান জনতার মধ্যে যদি বিভেদ চলতে থাকে, তা হ'লে জনগণের বৈপ্লবিক ঐক্য সম্ভব হ'বে না। অতএব হিন্দু-মুসলমানের স্থায়ী ঐক্যের জন্যে মোসলেম লীগের বৈপ্লবিক শক্তি সমূহকে সংহত করার প্রচেষ্টা সুরু করলেন। এই চেষ্টার ফলে বিখ্যাত বিপ্লবী হজরত মোহানী মোসলেম লীগের মধ্যে যাঁরা র‍্যাডিক্যালপন্থী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেসের র‍্যাডিক্যালদের যাতে এক যোগে কাজ করা সম্ভব হয় সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। মৌলানা সাহেবের প্রাথমিক সাফল্যে শঙ্কিত হ'য়ে মোসলেম লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সংস্কারপন্থী নেতাগণ মৌলানা মোহানীর প্রচেষ্টার বিরোধিতা আরম্ভ করেন। রায় তখন একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে লিখলেন :

"সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী র‍্যাডিক্যাল মতাবলম্বী মুসলমানগণ শুনে নিশ্চয় মর্মাহত হয়েছেন যে, আগামী নিখিল ভারত মোসলেম লীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় মৌলানা হজরত মোহানীর প্রতি নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি জাতীয় কংগ্রেসের এক বামপন্থী অংশের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। কারণ, মৌলানা হজরত মোহানীর বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই অপরাধের আমিও তাঁর একজন সাথী। আমরা পুরানো বন্ধু। মৌলানা হজরত মোহানীর মোসলেম লীগে যোগদান অপেক্ষা

আমাদের বন্ধুত্ব পুরাতন। ইসলামের একজন প্রকৃত অনুগামী বলে, শ্রমশীল জনগণের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব এবং যাঁরা এদের শোষণ করে বড় হয়, তাঁদের প্রতি তাঁর বিরূপতা কোনদিন তিনি গোপন করেন নি। এদেশে আমার সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার প্রচেষ্টায় তিনি অন্যতম প্রথম সমর্থক। তিনি একজন খাঁটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যোদ্ধা। "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা", এই প্রস্তাব তিনিই প্রথম কংগ্রেসে উত্থাপন করেন। তাঁরই চেষ্টায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব মোসলেম লীগ গ্রহণ করে।

"তিনি একজন খাঁটি মুসলমান। তাঁর স্বাধীনতাস্পৃহা তাঁকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধে নিয়ে গেছে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখতে চাইবেন, তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল স্বাধীনতার যোদ্ধাকে মিলাতে চাইবেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর ইংলণ্ড ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে 'লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস-মেন'-এর প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন, এবং সে সময়েই আমাদের যে আলোচনা হয়, তাতে আরও অনেক প্রগতিবাদী মোসলেম লীগের সভ্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি মোসলেম লীগের মধ্যেও যে সব র‍্যাডিক্যাল ও প্রগতিপন্থী আছেন তাঁদেরও অনুরূপভাবে সংহত ক'রে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ সংবাদ সে সময় কাগজেও প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে মৌলানা হজরত মোহানীর চেষ্টা দ্রুত সাফল্য-মণ্ডিত হ'তে থাকে। উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ মোসলেম লীগ পন্থীরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। এই সমর্থনের বলেই মিঃ জাহির উল হাসান লারি আগামী মোসলেম লীগ কাউন্সিলে জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। আমি সকল প্রগতিপন্থী মোসলেম লীগ সভ্যগণকে অনুরোধ করি, তাঁরা যেন মৌলানা হজরত মোহানীর প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।" (I. I., 20-8-39)

এই প্রচেষ্টার ফলে শীঘ্রই 'পাঞ্জাব মোসলেম লীগ র‍্যাডিক্যাল পার্টি' ও 'বোম্বাই মোসলেম লীগ র‍্যাডিক্যাল পার্টি' গড়ে ওঠে। অন্যান্য প্রদেশেও সে প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে জনতার ভাগ্য জনতার দ্বারাই গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

মহাযুদ্ধের সুযোগে বৃটিশের প্রতি অন্ধ আক্রোশ আরও অন্ধ হিংস্রতার সঙ্গে জ্বলে ওঠে। যুক্তিবুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়।

১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাযুদ্ধ ও রায়

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার ড্যানজিগের দাবীতে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। সর্তানুযায়ী, ৩রা সেপ্টেম্বর ফ্রান্স ও ব্রিটেনকেও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। ব্রিটিশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে ভারতকেও ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বিধায় যুদ্ধের অংশীদার হ'তে হয়। তৎক্ষণাৎ ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধও এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের সুরু থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত এই সময়টি সম্ভবতঃ রায়ের জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মহত্তম কাল।

এই যুগের কথা নিতান্ত সংক্ষেপে বলা যায় না। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাবে রায় নিজের ভাব ও ভাবনাকে পরিবর্তিত-পরিমার্জিত করে চলেছিলেন, তাতে তার ক্রমঃবিকাশের সকল ধাপটি না দেখিয়ে, কয়েকটি বাদ দিয়ে যদি দেখান যায়, তা হ'লে তা অযৌক্তিক মনে হ'বে। রায়ের ভাসা ভাসা সমালোচকগণ এই ভুলই করেন ব'লে তাঁরা রায়কে অবোধ্য আখ্যায় আখ্যায়িত করেন—বিরোধীরা তাঁকে সুবিধাবাদী বলেন। সেই জন্যে একটু দীর্ঘ হ'লেও এই ক্রমঃবিকাশের সব ক'টি ধাপই সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করছি।

জুলাই এর-শেষে তাঁর একটি লেখা, ১৯৩৯ সালের ৬ই অগাষ্টের "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া"তে বের হ'ল :

"১৫ই মার্চ হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেয়। তিনদিন পরে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে রুশিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়, হিটলারের রুমানিয়া আক্রমণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে রুমানিয়াকে রক্ষা করার ভরসা দান করতে ব্রিটেনের সঙ্গে সেও প্রস্তুত আছে কি না। সেই দিনই ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের

কার্যকরী পরিকল্পনাসহ সোভিয়েট রুশিয়ার সম্মতি সূচক উত্তর লণ্ডনে এসে পৌছায়। সেই থেকে চারমাস ধ'রে লণ্ডন-মস্কোর মধ্যে প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবের আদান-প্রদান চলে আসতে থাকে। ইতিমধ্যে হিটলার কিন্তু বসে নাই"। এই অন্তহীন আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ার আগেই হয়তো ড্যানজিগ্ জার্মান রাজ্যভুক্ত হয়ে যাবে। এটা সত্য যে, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়ার এই আলাপ-আলোচনাই হিটলারকে সংযত রাখতে সক্ষম হ'বে; অবশ্য যতক্ষণ সে বিশ্বাস করবে যে, এরা সকলে মিলে তার সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কোন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেই। কিন্তু ক্রমেই এটা অতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে যে এই আলোচনাকে ভয় করার মত হিটলারের কোন কারণ নাই। ব্যাপার দেখে এটাই সন্দেহ হয়, ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্য হ'ল হিটলারকে একটু ভয় দেখান, যাতে সে তার দাবীটাকে খানিকটা সংযত রাখে এবং মীমাংসাতে রাজি হয়। কিন্তু মনে হচ্ছে, বর্তমানে ফুয়েরারের সে ভয় কেটে গেছে। কারণ ইংল্যাণ্ড সত্য সত্যই যদি ইচ্ছা করত তা হ'লে ফ্যাসিষ্টদের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টাকে এতদিন সে নিশ্চিন্ত ভাবেই বন্ধ করে দিতে পারত। এ বিষয়ে রুশিয়ার প্রস্তাব খুবই সরল এবং ফলপ্রসূও বটে। ইউরোপের যে কোন রাষ্ট্রের ভূমি বা স্বাধীনতার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রমণ ঘটলে তিন মহাশক্তি একযোগে পাল্টা আক্রমণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই প্রস্তাবটি এতই স্পষ্ট ও সহজ সরল যে, ব্রিটিশ কূটনীতিকরা একে সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। যদিও ফ্যাসিষ্ট দমনের জন্যে এমনি ধারা স্পষ্ট কথায় তারা চমকেই উঠেছিল। দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েট রাজনীতিকরা ব্রিটিশকে এমনই কোণঠাসা করছে যে, তারা এখন এই প্রস্তাবকে না পারে গিলতে, না পারে ফেলতে। আলোচনার অচল অবস্থার জন্যে দায়িত্বটা সোভিয়েটের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা সরে পড়তে চেয়েছিল। সে চেষ্টা সফল হয় নি বলে, শেষ পর্যন্ত চেম্বারলেনকেই হাত লাগাতে হয়েছে। পার্লামেণ্টে জবাব দিহি করতে হ'য়েছে যে, 'ব্রিটেনের সত্যিকারের প্রবল সদিচ্ছাই আছে। যাতে এই আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হয়, তারই জন্যে ত আমরা যুক্ত সামরিক পরিকল্পনা রচনা করার উদ্দেশ্যে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর নেতাদের রুশিয়াতে পাঠিয়েছি। তবেই না আমরা রাজনৈতিক সর্তাবলী সম্বন্ধেও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হ'ব।'

"........এই দীর্ঘসূত্র আলোচনার দ্বারা যুদ্ধ যদি কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাকে তবে সেও ভাল কিন্তু যদি এই ফ্যাসিষ্ট-আক্রমণ-বিরোধী-চুক্তি শেষ পর্যন্ত

সম্পাদিতই হয় তবে ইউরোপের পশ্চিমদিক আক্রান্ত হলে, রুশিয়া যে জার্মানীর পশ্চাদ্দেশে আক্রমণ করে তাকে আটকে দেবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, জার্মানী যদি রুশিয়া আক্রমণ করে তবে ফ্রান্স, এবং ব্রিটিশ তো নিশ্চয়ই, কোন না কোন ওজুহাতে জার্মানীকে আক্রমণ করতে বিরত থাকবে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ইউনিয়ন অব্ সোস্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাবলিককে রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছে, এ দৃশ্য দেখতে আমরা বেঁচে থাকব না"।

এই লেখা লিখবার তিন সপ্তাহ পরেই সোভিয়েট রুশ জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং তার এক সপ্তাহ পরেই যুদ্ধ বাধে। উপরিউক্ত লেখাটি উদ্ধৃত করেছি এই জন্যে যে, এই লেখা থেকেই রায়ের যুদ্ধ নীতির তাৎপর্য বোঝা যাবে। রায়ের ধারণা ছিল, অবশ্য তাঁর যথেষ্ট প্রমাণও ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই ইউরোপকে বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে হিটলারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য দিয়ে গড়ে তুলেছে। সুতরাং হিটলারকে তারা ধ্বংস করতে পারে না। সেই জন্যে যখন পনর দিনের মধ্যে পোলাণ্ড ধ্বংস হয়ে গেল এবং ব্রিটিশ ও ফ্রান্স তাকে কোন সামরিক সাহায্য করতে এগিয়ে এল না, বা পশ্চিম সীমান্তে শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আক্রমণও করল না, তখন রায় আশ্চর্য হ'লেন না। তিনি ভয় করতে লাগলেন, যে কোন মুহূর্তে ব্রিটেন-ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ মিটে যাবে এবং হিটলার একা বা একযোগে রুশিয়াকে আক্রমণ করবে। সেই জন্যে গান্ধীজি যখন বললেন, এই যুদ্ধে তাঁরা বিনা সর্তেই ব্রিটেনকে সাহায্য দিলেও দিতে পারেন, তখন তিনি ভীত হ'য়ে এর প্রতিবাদ জানালেন এই বলে যে, এ সাহায্য শেষ পর্যন্ত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে; কারণ এ যুদ্ধ কাগজে পত্রে যুদ্ধ, বাগাড়ম্বর মাত্র—Phoney War। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের কোথাও হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে না। এ যুদ্ধ হয়তো শীঘ্রই মিটে যাবে এবং সোভিয়েট রুশিয়া আক্রান্ত হ'বে। অতএব এ যুদ্ধে ভারতের সাহায্য দেবার কোন কারণই নাই। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ ও ফ্রান্সের পতন ও ডানকার্কের ঘটনার পর যখন লেবার পার্টিকে নিয়ে ব্রিটেনে জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল, তখন রায়ের মতের পরিবর্তন ঘটল। তিনি এই যুদ্ধকে আর ইউরোপের ঘরোয়া যুদ্ধ না বলে আন্তর্জাতিক ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধ বলে অভিহিত করলেন এবং এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিনাসর্তে সাহায্য দানের সমর্থক হ'য়ে উঠলেন।

তিনি স্পষ্ট দেখলেন এই ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধ বিজয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই এক নতুন শক্তি জগতে জন্মলাভ করবে, যে শক্তি জগৎ থেকে সাম্রাজ্যবাদের নিঃশেষে অবসান ঘটিয়ে সভ্যতাকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে তখন তাঁর দোসর জোটে নি, একাকীই তাঁকে তরী বেয়ে চলতে হয়েছে, সমগ্র ভারতের প্রচণ্ড বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে। *

তারপর রায়ের ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধ জয়ের তথা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে একক প্রচেষ্টার যে এপিক কাহিনী তার অন্ততঃ কিছুটা আভাস না দিলে এ জীবনী লেখার কোন অর্থ হয় না।

* "M. N. Roy was, I think, the first Indian thinker who appreciated clearly the significance of the major break through in the citadel of Imperialism by the forces generated by the Second World War." (Introduction to *M. N Roy's Memoirs* (Allied Publishers. Bombay) by G. D. Parikh—Rector, Bombay University)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশের যুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রায়ের সন্দেহ

কয়েকমাস আলাপ আলোচনা সত্বেও পোলাণ্ডকে রক্ষা করার জন্যে যখন পোলাণ্ড-ফ্রান্স-ব্রিটেন সোভিয়েটকে পোলাণ্ডের মধ্যে দিয়ে লাল ফৌজ পরিচালনা করে জার্মানীকে আক্রমণের অধিকার দিতে রাজি হ'ল না, তখন সোভিয়েট বুঝল, তার সঙ্গে কোন ফ্যাসিষ্ট বিরোধী চুক্তি করতে ব্রিটেনের প্রকৃত অভিপ্রায় নাই। বরং তারা হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করে তাকে রুশ আক্রমণ করতে প্ররোচিত করতে পারে। তখন সোভিয়েটই হিটলারের সঙ্গে চুক্তি ক'রে হিটলারের পূর্বাভিমুখী সম্প্রসারণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রায় এই সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি সম্বন্ধে লেখেন :

"এই চুক্তি ফ্যাসিষ্ট শক্তিদের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট বিরোধী চুক্তি আছে তার বিরুদ্ধে সোভিয়েট কুটনীতির জয়ধ্বজা। নাৎসিরা তাদের প্রতিজ্ঞাকে গিলতে বাধ্য হয়েছে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম চালাবার অঙ্গীকার ভেসে গেছে। সোভিয়েটের শান্তি অভিযানের নীতি ফলপ্রসূ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক দেশ সমূহকে লাল ফৌজের হাতে ঠেলে দেবার সাংঘাতিক পরিণাম বুঝতে পেরে নাৎসী যুদ্ধবাজরা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

"অন্যদিকে রুশিয়া শান্তি রক্ষার জন্যে যুদ্ধ প্রতিরোধ ফ্রন্ট গড়ে তোলা সম্বন্ধে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ইংল্যাণ্ডকে বাধ্য করতে চায়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের সঙ্গে যদি এই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়, তা হ'লে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যেও হিটলারের পূর্ব দিকের আক্রমণ বন্ধ থাকবে। এই মহাশক্তি সমন্বয়ের হাত থেকে নাৎসীরা যদি বাঁচতে চায় তা হ'লে অবশ্যই তার জন্যে

তাদের মূল্য দিতে হ'বে। বর্তমানের এই অবস্থা ব্রিটিশ কূটনীতির দৌর্বল্য ও কপটতার ফলেই ঘটেছে। এমন কি মস্কো আলোচনার সময়েই লণ্ডনের ব্যাঙ্কাররা নাৎসি জার্মানীকে বিপুল পরিমাণ টাকা সাহায্য দেবার গোপন চুক্তি করেছিলেন। রুশিয়ার এই চালটি সকল পক্ষকেই হাতের তাস দেখাতে বাধ্য করল।" (I. I., 24.8.39)

যুদ্ধ তখনো বাধে নি। পরের সপ্তাহের জন্যে লেখা হ'ল :

"যদি হিটলার ড্যানজিগ আর পোলিশ করিডর নেয় তবে তার জন্যে সোভিয়েটকে দায়ী করা চলবে না, দায়ী হবে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। কারণ এই জবর দখল বন্ধ করার যে এক মাত্র পথ ছিল সে পথে যেতে ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স রুশিয়াকে বাধা দিয়েছিল। যদি হিটলার পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করতেই চায় তা হ'লে সে সময় রুশিয়া অবশ্যই তার সীমান্তবর্তী স্থানের খানিকটা দখল করে নেবেই। সেটি তার পক্ষে "লাল সাম্রাজ্যবাদ" হবে না, হবে সম্প্রসারণবাদী নাৎসি আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে রুশিয়ার নিরাপত্তার জন্যে।" (I. I., 3.9.39)

ব্যাপারটি অনুরূপ ভাবেই ঘটল। ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল, এবং সমগ্র পোল্যাণ্ড গ্রাস করার পূর্বেই রেড্ আর্মি পোল্যাণ্ডের খানিকটা দখল করে নিল।

এই সময়ে তিনি ৩রা সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয়র জন্যে লিখলেন :

"এ লেখা ছাপা হবার আগেই হয়তো যুদ্ধ বাধবে।........যুদ্ধ যদি বাধেই তবে ভারত কি করবে ?

"এ সম্বন্ধে কংগ্রেস বহু প্রস্তাব গ্রহণ করলেও, সঠিক ভাবে কোন প্রস্তাবেই বলা হয় নি, ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বাইরে রাখতে বা অপরের ঝগড়ার মধ্যে ব্রিটিশ যাতে তাকে টানতে না পারে, তার জন্যে কংগ্রেস কি করবে। যতক্ষণ ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ থাকবে ততক্ষণ ব্রিটিশের সব যুদ্ধকেই তার নিজের যুদ্ধ বলে মেনে নিতে হবে। সুতরাং এই যখন অবস্থা তখন ভারতকে যুদ্ধের বাইরে রাখা সহজ নয়। তার একমাত্র পথ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। কংগ্রেসের কোন প্রস্তাবেই সে কথা নাই। সুতরাং কংগ্রেসের এই সব প্রস্তাবই কেবল দর কষাকষি করে কিছু সুবিধা আদায়ের কৌশল মাত্র, এবং তাও খুব দুর্বল কৌশল।" (I. I., 3.9/39)

এই উদ্ধৃত অংশটি থেকে বোঝা যাবে যে, রায় প্রথম দিকে যুদ্ধকে কি চোখে দেখছেন এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগ না দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্ষমতা কেড়ে নেবার কথাই কংগ্রেসকে বলেছেন।

এ দিকে কংগ্রেস যতই গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে ঝুঁকছে, রায় ততই ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠছেন।

ফেডারেল অংশ বাদ দিলে কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠতা হয়। ব্রিটিশ যদি তাতে রাজি থাকে তা হলে কংগ্রেস প্রদেশের মতই কেন্দ্রেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজি, এবং তখন যুদ্ধের দায়িত্ব বহন করতেও প্রস্তুত। গান্ধীজী স্পষ্টই বললেন, "তিনি স্বায়ত্ত শাসন চান। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একে হয়তো ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস্ বলবে। তিনি শব্দ নিয়ে মারামারি করবেন না।" (I. I., 3/9 39)

রায় এই সম্ভাবনায় ভীত হ'য়ে সাধ্যমত এর বিরোধিতা করে চললেন। (I. I., 10 9/39)

যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে ভাইসরয় তাঁর পরিষদে ভারত শাসন আইনের ফেডারেল অংশটি যুদ্ধের জন্যে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কংগ্রেসের মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। কেন্দ্রেও কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা এবার আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠল।

গত মহাযুদ্ধে সহযোগিতা করে ব্রিটিশ ভারতকে কিছু দেয় নি, রায় সে কথা নেতাদের স্মরণ করতে বললেন :

"বলা হচ্ছে, এই সময় ভারত যেন দর কষাকষির মনোভাব না দেখায়। খুব উঁচুদরের কথা! কিন্তু এই যুদ্ধ যদি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার জন্যেই হয় তবে আমরা সেই পুরোনো প্রবাদ অনুসারেই বলিনা কেন, Charity should begin at home—।

"ভারতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র স্থাপনের সুবিধার জন্যে যদি কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধ চালাবার দায়িত্ব নিতে হয়, তবে হয়তো শীঘ্রই দেখা যাবে, ভার্সাই সন্ধির মত আর একটি সন্ধি হ'য়ে যুদ্ধ থেমে গেল ; কিংবা ইউনিয়ান অব্ সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাবলিকের বিরুদ্ধে আজকের যুদ্ধমান শক্তিগুলির হোলি এলায়েন্স হ'ল। সেটি আর তখন গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করবে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান গতি-প্রকৃতি যে কংগ্রেসী নেতারা বোঝেন না,

এমন কথা ভাবা চলে না। তাঁরা সব কাজের লোক। আজ যদি তাঁরা হঠাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসি বিরোধী বুলিতে বিশ্বাসী হ'য়ে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেন, তবে তা হ'বে তাঁদের সুবিধাবাদের সমর্থনের জন্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা মাত্র।" (I. I., 17/9 39)

সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে (সুভাষ বাবুর পদত্যাগের পর, পুনরায় ডেলিগেটগণ কর্তৃক সভাপতি নির্বাচিত না হয়ে অতি তৎপরতার সঙ্গে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হ'ন) রায় এক খোলা চিঠি দিলেন:

"কংগ্রেস সভাপতি মহাশয়

সমীপেষু

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি অধিবেশনে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় প্রস্তাব-সমূহ গৃহীত হ'বে। এটা খুবই সন্তোষজনক যে, বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদেরও নিমন্ত্রণ জানান হয়েছে। এইরূপ প্রার্থনীয় ব্যবহারে উৎসাহিত হ'য়ে ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনার জন্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করছি।

"যুদ্ধের দ্বারা আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব বিরোধ মীমাংসা প্রচেষ্টা সভ্যতা সম্মত ব্যবস্থা নয়। এই নীতিতে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে এবং অপরের দ্বন্দ্ব কলহের মধ্যে ভারতের জনগণকে লিপ্ত করার বিরুদ্ধে দৃঢ় সঙ্কল্পে অবিচল থেকে কংগ্রেস ফ্যাসিষ্ট আক্রমণে কবলিত দেশগুলির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছে এবং এই ফ্যাসিবাদের ভয়ংকর কবল থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার জন্যে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে।"

"এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের স্বাধীনতা লাভের আদর্শের পরিপন্থী নয় এবং যদি এর দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তবে তা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতাও নয়।

"এই সংকট মুহূর্তে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণের বিষয়ে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু ও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল যথার্থ কথাই বলেছেন। চুংকিং-এ এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট নেহেরু বলেছিলেন যে, ভারতকে যদি গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করতে হয়, তা হ'লে ভারতকে তার পূর্বেই গণতন্ত্র পেতে হ'বে। সর্দারজি দিল্লী যাবার পথে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, ভারত কেবল মাত্র স্বাধীন জাতি রূপেই এ যুদ্ধে সহযোগিতা করতে পারে।

"প্রশ্ন এই : বিশ্বকে ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে সহযোগিতা করার এই সর্ত কংগ্রেস কী উপায়ে পূর্ণ করবে? কেন্দ্রে সাময়িক ভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা তা হবে না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হ'বে। বিটিশ পার্লামেণ্টের ভারত শাসন আইন রচনা করার স্ব-মনোনীত অধিকারকে অস্বীকার করতে হ'বে। ভারতের স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার অধিকার যে একমাত্র ভারতের জনগণের তা ঘোষণা করতে হ'বে। ভবিষ্যতে পালনীয় সাম্রাজ্যবাদের শূন্যগর্ভ অঙ্গীকারের উপর নির্ভর ক'রে থাকা চলবে না। ফ্যাসিষ্ট আপদের বিরুদ্ধে সহযোগিতার সর্তসমূহ কংগ্রেসকে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করতে হ'বে এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে তা বিনা সর্তে গ্রহণ করতে হ'বে।

"নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতা লাভের ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম ধাপ রচিত হ'বে :

১। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে পূর্ণবয়স্ক সকল নর-নারীর ভোটাধিকার ;

২। আইন পরিষদের উচ্চ কক্ষের বিলোপ সাধন ;

৩। গভর্ণরগণের ও ভাইসরয়ের বিশেষ ও আপৎকালীন ক্ষমতার বিলোপ সাধন ;

৪। ব্রিটিশ বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ক রক্ষাকবচ সমূহের বিলোপ সাধন ;

৫। দেশীয় রাজ্য সমূহের প্রজাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদান ও ফেডারেল আইন পরিষদে পূর্ণবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার প্রদান ;

৬। মুদ্রাযন্ত্রের, মত প্রকাশের ও সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রদান ;

৭। স্থানীয়·স্বায়ত্ত শাসন আইনের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষমতা এমন ভাবে বৃদ্ধির ব্যবস্থা যাতে তারা পুলিশ ও আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী সংগঠন ও পরিচালন করতে সক্ষম হয়।

৮। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বাতিল করে কেন্দ্রে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তুতির জন্যে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচন ব্যবস্থা।

"গণ-পরিষদ কর্তৃক স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার পূর্বেই নতুন নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পরিষদের দ্বারা বর্তমান সংবিধানকে উপরিল্লিখিত ধারা অনুসারে সংশোধনের ব্যবস্থা।

"এই সকল সর্বনিম্ন দাবীগুলি গৃহীত না হ'লে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের ঘোষিত উল্লিখিত আদর্শ লাভ হবে না এবং ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্যকরী সাহায্য দেওয়াও সম্ভব হ'বে না। এই প্রস্তাবগুলি সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক গৃহীত না হ'লে, কংগ্রেস কী উপায় অবলম্বন করবে তা ওয়ার্কিং কমিটিকে স্থির ক'রে সমগ্র কংগ্রেসকে পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করতে হ'বে। কিন্তু এর কমে যে কোন সর্তে সহযোগিতায় স্বীকৃত হ'লে তা হ'বে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ থেকে সুস্পষ্ট পদস্খলন, এবং তখন এটাও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে যে, সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য না করলে এই অবস্থাতেও তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।

আপনার একান্ত—

এম্. এন্ রায়"

(I. I., 17/9/39)

সেই সঙ্গেই ৬ই সেপ্টেম্বর India & War শীর্ষক এক বিবৃতিতে বললেন:

"........আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর চুংকিং বিবৃতিতে যা বলেছিলেন, সেই নীতি অনুসারেই চলতে অনুরোধ করেছি। সে বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যদি গণতন্ত্রের জন্যে লড়তে হয় তবে আমাদেরও গণতন্ত্র চাই। ভাইসরয় তাঁর বেতার ভাষণে আশা প্রকাশ করেছেন, 'মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ভারত নিশ্চয় সহযোগিতা করবে।' তাতে আর সন্দেহ কি! অবশ্য এই সঙ্গে তার নিজের স্বাধীনতাটাও পাওয়া চাই। যে ব্রিটেন এতদিন হিটলারি শাসনকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে এসেছে, সেই ব্রিটেনই আজ বহু বিলম্বে হ'লেও, তারই ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এতে সকল স্বাধীনতা-কামীই তাকে অভিনন্দন জানাবে।

"ব্রিটেন এই সিদ্ধান্ত যদি আরো কিছুদিন আগে গ্রহণ করত তা হ'লে ইউরোপের অনেকগুলি দেশ বেঁচে যেত। তা গ্রহণ না করে ব্রিটেন বরং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্যই করে এসেছে। এই সব কারণে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুধু মুখের

কথার আস্থা ভাজন হ'তে পারে না, যতক্ষণ না যে তার এই বিলম্বিত ফ্যাসি-বিরোধী সিদ্ধান্ত যে খাঁটি তা চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ করছে।

"তা ছাড়া যখন ভারতের উপর আক্রমণের কোন নিকট সম্ভাবনা নাই, তখন ইউরোপের যুদ্ধে ভারতের সক্রিয় ভাবে লিপ্ত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। আজ ভারতের পক্ষে বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি সর্বাপেক্ষা বড় দান হ'বে, নিজের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে দৃঢ় প্রচেষ্টা। সে চেষ্টায় যদি পূর্বের মতই বাধা পড়ে, তবে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি যে ভালবাসার উচ্ছ্বাস, সেটা যে কত বড় মিথ্যা তা প্রমাণ হয়ে যাবে। ভারত বর্তমান সভ্যতার মহাশত্রু ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করার যুদ্ধে সক্রিয় ভাবেই যোগদান করবে। কিন্তু তার আগে তাকে স্বাধীন হ'তে হ'বে।..."

(I. I., 17/9/39)

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিবৃতির আকারে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট তার যুদ্ধের লক্ষ্য, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে তার বর্তমান মনোভাব, এবং যুদ্ধ জয় হ'লে যে "নব-বিধানের" ব্যবস্থা হ'বে তাতে ভারতের কী অবস্থা ঘটবে তা জানাবার জন্যে অনুরোধ জানান হ'ল এবং বলা হ'ল কংগ্রেসের দাবী যদি যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয় তা হ'লে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের কেউ যেন যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা না দেয় তাও জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

রায় এতে একটুও খুসি হ'লেন না। তিনি বললেন: "ব্রিটিশের হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তা না করে কংগ্রেসেরই উচিত ছিল ন্যূনতম দাবী পেশ করা। এই না-করাটাকে ব্রিটিশ কংগ্রেস নেতাদের দুর্বলতার লক্ষণ বলেই মনে করবে এবং ব্রিটিশও সাধ্যমত দর কষাকষি করবে।" (I. I., 24/9/39)

সভাপতিকে লিখিত পত্রে রায় সর্বনিম্ন যে দাবী করেছিলেন, পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তিনি তা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন।

রায় তখন ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় যুদ্ধ বিরোধী। এবং এই যুদ্ধের সুযোগে ক্ষমতা দখলের জন্যে সর্বাপেক্ষা উদগ্রীব। কিন্তু এও তিনি জানেন যে বিপ্লবের জন্যে কোথাও কোন প্রস্তুতি নাই সেই কারণে ধাপে ধাপে এগুতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন-এর যুদ্ধনীতি

এই সময়েই লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করা হয়। এবং এতেই কংগ্রেসের আশু কর্তব্যের যুক্তিসহ বিবরণ থাকে।

এই যুদ্ধনীতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আশঙ্কা আসন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস বারবার তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে যে, যে যুদ্ধের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই সেইরূপ যুদ্ধে তাকে টেনে নামানোর চেষ্টাকে সে বাধা দেবে। কিন্তু সময় যখন এল, তখন সেই বারংবার ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ না করে আমাদের নেতারা এমন এক দুর্জ্ঞেয় ভাব অবলম্বন করেছেন যে, দেশের কংগ্রেসসেবীরা কোন নির্দিষ্ট নির্দেশই পাচ্ছেন না। যখনই যুদ্ধ আসন্ন হ'য়ে আসছিল, কংগ্রেসের মত সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উচিত ছিল, তার বহু ঘোষিত প্রস্তাব অনুসারে কাজ করার জন্যে একটি পরিকল্পনা পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করে রাখা। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তা করা হয় নি। সে জন্যেই আজ আমাদের নেতাদের মধ্যে এই শোচনীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ঘোলাটে চিন্তা যা গালভরা ও দ্ব্যর্থবোধক কথা দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে। ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিক ঘোষণাটি তারই প্রকৃষ্ট নমুনা। আমরা সবসময়েই বলে এসেছি যে, যত বড় প্রস্তাবই হোক না কেন, তাকে কার্যকরী করে তোলার মত একটি পরিকল্পনা যদি তার সঙ্গে না থাকে তবে তার কোন মূল্যই নাই। কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্বের একটি পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সেটাকে যাচাই করে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করার জন্যে কোনদিনই কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে পেশ করা হ'ল না। তা হ'ল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোষ রফার

পরিকল্পনা। গান্ধীবাদী নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে যে সত্য ও অহিংসার অনুশাসন—dogmas—তারই অপরিহার্য পরিণতি হ'ল এই আপোষ রফার পরিকল্পনা। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, কংগ্রেসের বর্তমান নেতারা তাদের মনের কথা গোপনই রাখবেন। অপর পক্ষে পূর্বাহ্নে রচিত একটি পরিকল্পনা ও তা রূপায়িত করে তোলার জন্যে উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তথা কথিত বামপন্থীরাও অনুধাবন করতে পারেন নি। আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবিরাম তাঁরা কেবল বকেই গেলেন, না বুঝলেন সে সুযোগ কোন্ ধার থেকে আসবে এবং না করলেন তার জন্যে কোনও প্রস্তুতি। যখন সত্যই সে সুযোগ এল, তখন ব্রিটিশকে কেবল মুখেই চোখ ধাঁধানো আর মনমাতানো কার্য-কলাপের ভয় দেখাচ্ছেন। আজ কংগ্রেসের বাম-দক্ষিণ দুই পক্ষই একই নৌকোর যাত্রী—স্রোতের মুখে যেখানে গিয়ে ঠেকে।

"কিন্তু আজকের এই সুযোগ হঠাৎ আসে নি। কংগ্রেস যে সময়কালে সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হ'বে, সিদ্ধান্ত-সংকটের আবর্তে পড়ে পথ হারাবে, একথা যারা কংগ্রেসের বড় বড় কথায় ভরা প্রস্তাব সমূহে মুগ্ধ হয় নি, কিংবা যারা কেবল শ্লোগান আউড়েই আত্মপ্রসাদ লাভ করে নি, তারা জানত।

"কংগ্রেসের এমন কোন প্রস্তাব নাই যাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, ব্রিটিশ ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করতে চাইলে সে চেষ্টাতে কংগ্রেস বাধা দেবে। প্রত্যেক প্রস্তাবেই, এমন কি, অগাষ্ট মাসের প্রথমেই ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তাতেও সুবিধামত ব্যাখ্যা করবার মত যথেষ্ট ফাঁক আছে। এবং সকলেরই তা চোখে পড়েছে। এর দ্বারা পূর্বের যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল প্রস্তাবই বস্তুতঃ বাতিল হয়ে গেছে।

"এই প্রস্তাবে কংগ্রেস সর্তাধীনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যুদ্ধকালে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছে। অতএব যুদ্ধ যখন বাধল এবং যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ বিধায় ভারতও আপনা-আপনিই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন কংগ্রেসের একমাত্র কাজ রইল সেই সহযোগিতার সর্তাবলী রচনা করা।

"কংগ্রেস যদি তার যুদ্ধ বিরোধিতার পূর্বতন সিদ্ধান্ত অনুসারেই চলতে চায়, তা হ'লে বর্তমান নেতাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, তা সম্ভব হবে না। নেতারা অসহযোগিতার পথে চলবেন না। সে সব প্রস্তাব যেন এঁদের কাছে বাতিল হয়ে গেছে। তার ওপরে এঁদের আস্থাও নেই। যাঁরা বর্তমান নেতৃত্বের

পরিবর্তে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিরোধী, তাঁদেরও সহযোগিতার কথায় চমকে উঠে আপত্তি জানান বৃথা। তথা কথিত বামপন্থীরা যেন উট পাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে সমস্যাটিকে এড়িয়ে চলতে চান। নাকে দড়ি গলিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে জেনে শুনে স্বেচ্ছায় চলা ঢের বেশী সম্মানজনক।

"কথা হ'ল, কংগ্রেস নেতারা এই যুদ্ধে ব্রিটেনকে সমর্থন করতে স্বীকৃত হয়েছে যদি ভারতকে এক স্বাধীন জাতি রূপে সেই সহযোগিতা করার সুযোগ দেওয়া হয়। যাঁরা এই প্রস্তাব রচনা করেছিলেন, তাদের প্রস্তাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে যে যথেষ্ট অস্বচ্ছ ধারণা ছিল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেও এই প্রস্তাবে যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে বাস্তবে সেই মর্যাদা কখন কী ভাবে পেলে তা রক্ষিত হবে তা বলতে অনুরোধ করা যেতে পারে।

"ধরা যাক্, ব্রিটেন কংগ্রেসের দাবী মেনে নিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে এই স্বীকৃতিটির একটি ঘোষণা মাত্রই দিতে পারে, তার বেশী কিছু সম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কি আমাদের নেতারা সন্তুষ্ট হবেন? সম্ভবতঃ নয়। ধরা যাক, ব্রিটেন কেবল অঙ্গীকার মাত্র না ক'রে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার হস্তান্তর ত দু'এক দিনের কর্ম নয়। অথচ ভারত ইতিমধ্যেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। যখন আমাদের নেতারা বিশ্বের পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা করছেন এবং স্বাধীন ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলছেন, তখন আমাদের মুদ্রাযন্ত্রের ও মতামত প্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তাও গেছে। আমাদের নেতাদের মুখ চেয়ে যুদ্ধে সাহায্য দান বন্ধ থাকবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারত সে সাহায্য দিতে বাধ্য। সুতরাং কংগ্রেসের প্রস্তাবকে কার্যকরী করে তুলতে না পারার গ্লানির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহযোগিতার সর্তসমূহ রচনা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। ওয়ার্কিং কমিটি যে বিবৃতি প্রকাশ করছেন তাতে কোন সর্তের কথাই বলা হয় নি। এতে একটি কথাই বলা হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদ আত্মহত্যা করুক। সেটা একান্তই স্বপ্নালুতা—ইউটোপিয়া।

"যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সামগ্রিক বাধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা বাদই দেওয়া হ'ল—অবশ্য সে কথা বর্তমান নেতারা ভাবেন না; আর গান্ধীজিও ত বলেছেন যে, দেশ সে জন্যে প্রস্তুত নয়, এবং তার জন্যে কংগ্রেস বা অন্য কোন পার্টি কোন দিন কোন আয়োজনও করে নি। এই অবস্থায় কী যে করা হ'বে বা করা যেতে পারে তাও জানা কথা। একটা মধ্যবর্তী ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যথা সম্ভব ভাল

এবং সুবিধাজনক সর্ত যাতে পাওয়া যায় তারই জন্যে মনোযোগ দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে দর কষাকষির চেষ্টাকে নিম্নস্তরের মনোবৃত্তি বলা আদর্শবাদের অজীর্ণতা প্রসূত উদ্গার। রাজনীতির কায়দা—কৌশল ও কূটনীতির মধ্যে এর স্থান নেই। আমরা যা চাই এখনই আমরা তা পাব না—সে জন্যে যে সংগঠন শক্তির প্রয়োজন তা আমাদের নাই। চাইলেই এ জিনিষ পাওয়া যায় না। সুতরাং যথাসম্ভব বেশী সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যে সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে আমরা আমাদের ঈপ্সিত আদর্শ লাভ করার জন্যে পুনরায় লড়তে পারব। আমাদের নেতারাও এই রূপ নীতিরই সমর্থক। তবে নেতারা সরল ভাবে এগিয়ে আসছেন না কেন? সেটাই ত হবে মর্যাদাব্যঞ্জক ও বাস্তবতা সম্মত।

"সত্যিকারের কার্যকরী বাধা সৃষ্টি করতে আমাদের নেতারা যখন চাইবেন না, তখন ভারতের পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধাজনক সর্ত লাভ না করেই তাঁরা হয়তো সরকারের সঙ্গে মীমাংসার চেষ্টা করতে পারেন, এই অনুমান করেই আমরা কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যদের অনুরোধ করছি, তারা যেন এক মধ্যবর্তী ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী আদায়ের জন্যে সচেষ্ট হন। এবং সেই মধ্যবর্তী ব্যবস্থা গত ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের প্রাক্কালে কমরেড্ এম, এন, রায় কর্তৃক সভাপতিকে লিখিত পত্রে উল্লিখিত সর্তাবলীর ভিত্তির উপর রচিত হ'তে পারে। [সর্তগুলি প্রেসিডেণ্টকে লিখিত পত্রে দ্রষ্টব্য]

"আমরা পুনরায় ঘোষণা করছি যে, এই নিম্নতম দাবীগুলি পূর্ণ না হ'লে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের কিছু পাওয়া হবে না এবং ভারতও ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে কোন স্বেচ্ছামূলক এবং ফলদায়ক সাহায্যও দিতে পারবে না।

"এই সঙ্গে এটাও আমরা বলছি যে, আমরা বিনা সর্তে সহযোগিতার কথাও বলতে পারতাম, যদি না বুঝতাম যে, আমাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের কোন বিরোধ নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য যাই হোক, কেবল ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের জন্যে যুদ্ধের আদর্শ ই যে এক মূল্যবান আদর্শ সে কথা অস্বীকার করা গোঁড়া শান্তিবাদী অন্ধতা ছাড়া আর কিছু নয়।

"এই সঙ্গে আমরা একটি সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি; এবং এই বিপদ যদি একান্তই ঘটে তা হ'লে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হ'ব। বর্তমানের যুদ্ধ হঠাৎ বহুদিনের কাম্য সোভিয়েট ইউনিয়ানের বিরুদ্ধে "ধর্মযুদ্ধে—Holy War-এ" পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। ছল হবে, "গণতন্ত্রের

বিরুদ্ধে রুশ-জার্মান ষড়যন্ত্রের" উচ্ছেদ। ইতিমধ্যেই এই আকস্মিক যুদ্ধকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সকল সাম্রাজ্যবাদীদের মিলিত আক্রমণে পরিবর্তিত করার জন্যে প্রচার ও চেষ্টা চলছে। সেই অবস্থায় সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসীগণের যে কি কর্তব্য হবে তা নিঃসন্দেহে সকলেরই জানা আছে। এইরূপ সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধে ভারত কখনো সহযোগিতা করবে না। যে মুহূর্তে বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, সামরিক পরাজয়ের ফলে জার্মানীর ফ্যাসিষ্ট শাসনের পতন ঘটবে, সেই সঙ্গেই এই যুদ্ধও যেন থেমে যায়। তা না হয়ে যদি কোন ছলে এই যুদ্ধ চলতে থাকে, তা হ'লে আমাদের সহযোগিতার নীতির পরিবর্তে দেখা দেবে সক্রিয় বিরোধিতা। তখন সেই বিরোধিতাই আমাদের শেষ জয় লাভের পথে নিয়ে যাবে—ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে।" (I. I., 21/9/39)

লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন-এর এই ঘোষণা পত্রটি থেকেই রায়ের বহু বিতর্কিত যুদ্ধ নীতির মূল সূত্রটি পাওয়া যাচ্ছে। সোভিয়েট ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতাকে তিনি সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় তিনি ব্রিটেনকে খাঁটি ফ্যাসিবাদ বিরোধী রূপে গণ্য করছেন না। দৈবাৎ গ্রেট ব্রিটেন ফ্যাসিবাদ বিরোধীর অংশ অভিনয় করতে বাধ্য হচ্ছে মাত্র। যে কোন মুহূর্তে সেই মুখোস খসে পড়তে পারে এবং স্ব-স্বরূপে প্রকট হ'য়ে জার্মানীর সঙ্গে একযোগে সোভিয়েটকে আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং এই যুদ্ধের দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেন ভারতে বিন্দুমাত্র সুবিধা করতে না পারে, তার জন্যে তিনি প্রচার করছেন, আন্দোলন করছেন, লড়ছেন।

যুদ্ধের গতি পরিণতি যেমন বদলে যেতে লাগল ধীরে ধীরে, বিশেষতঃ ফ্রান্সের পতনের পরে, তেমনই রায়ের যুদ্ধ নীতিও বদলে যেতে লাগল। এবারে সেই কথাটাই বলব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী : সোভিয়েট রুশিয়াই ইউরোপকে ফ্যাসিষ্ট বিপদ থেকে মুক্ত করবে

যুদ্ধ বাধবার প্রায় এক বছর পূর্ব থেকেই ইউরোপে যুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। কংগ্রেসের নেতৃবর্গও সেই সুযোগে ব্রিটিশকে চাপ দিয়ে যথসম্ভব কিছু আদায়ের চেষ্টায় নানা জল্পনা ও নানা প্রস্তাব গ্রহণ করতে থাকেন।

১৯৩৯ সালের অগাষ্ট মাসে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে স্পষ্ট করেই বলা হয়, স্বাধীনতা না পেলে সহযোগিতা করা হবে না। ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধে। তারপর ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যে বিবৃতি দান করা হয় তাতে ঐ একই কথা বলা হয়। তারপর চলে লাট সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজির আলাপ আলোচনা ও দর কষাকষি।

রায় অক্টোবরের প্রথমেও বললেন : "কংগ্রেসের স্বাধীনতা চেয়ে বসে থাকা একেবারে চাঁদ চাওয়ার মতই অবাস্তব কল্পনা! কারণ, যার কাছে চাওয়া হচ্ছে, তাকে তা দিতে হ'লে তার আত্মহত্যাই করতে হয়।

"স্বাধীনতা নিজ বাহুবলে অর্জন করে নেবে, এ ক্ষমতা কংগ্রেসের নাই। কারণ সে ক্ষমতা গড়ে তোলা হয় নি। বৈধ ও অহিংস উপায়ে সত্যাগ্রহ করে আর প্রস্তাব গ্রহণ করে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। এই আদর্শের সঙ্গে নীতিপদ্ধতির সংঘাতের জন্যেই বারবার কংগ্রেসকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যর্থকাম হ'তে হয়েছে; এবং পরমুহূর্তেই তাকে আপোষ-আলোচনায় লিপ্ত হতে হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে মুষ্টি ভিক্ষা, "হয় গ্রহণ কর নতুবা দূর হও" ব্যবহার পেয়ে আসতে হয়েছে। এবারেও ঠিক তাই হবে।

"চক্ষুলজ্জার খাতিরে হয়তো এই "মুষ্টি-ভিক্ষা" গ্রহণ করতে বাধবে, কিন্তু করবারই বা কি থাকবে? আইন অমান্য আন্দোলন যুদ্ধের সময় আরও কম

সময়ের মধ্যেই দমন করে ফেলবে, এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টা পুরোদমে চলবে; কারণ কংগ্রেসের পৃষ্ঠ পোষকরা এতে বেশ দু' পয়সা কামাবার সুযোগ পাবে।

"কংগ্রেসের এই অধঃপতন আজ যে এমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে তার জন্যে বহু দিনের প্রস্তুতি ছিল। এ পতন নিবারণ করা অসাধ্য। এর পর হয়তো এই ধ্বংসের উপর নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার সুযোগ আসবে।" I. I., 8/10/39)

রায়ের এই অনুমানের সিঁড়ি বেয়েই ঘটনাবলী ঘটতে থাকল।

ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু জার্মানী সমগ্র পোল্যাণ্ড গ্রাস করতে পারে নি। অর্ধেকটা রুশিয়ার কুক্ষিগত। তাই দেখে সাম্রাজ্যবাদী দেশ-সমূহ রুশিয়াকে "লাল সাম্রাজ্যবাদী" বলে অভিহিত করতে সুরু করল।

সংবাদ পত্র যে জনসাধারণের মন ইচ্ছামত ভাঙ্গতে আর গড়তে পারে, দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বানাতে পারে সে কথা স্বীকার করে রায় রুশিয়ার স্বপক্ষে লিখলেন: "রুশ-জার্মান চুক্তির পর জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ডের অর্ধেক পরিমাণ অধিকারের সঙ্গেসঙ্গেই রুশিয়ার অপর অংশ অধিকারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে রুশিয়াকে জার্মানীর অংশীদাররূপে যে প্রচার করা হচ্ছে তা একান্তই ভিত্তিহীন।" তিনি ব্রিটিশ ও আমেরিকান সাংবাদিক ও ব্রিটিশ সমর বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত করে দেখালেন যে: "সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি আত্মরক্ষা মূলক চুক্তি। অবস্থা গতিকে তা ছাড়া সোভিয়েটের গত্যন্তর ছিল না। ঐ সকল বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, পোল্যাণ্ড কর্তৃক সোভিয়েট বাহিনীকে তার রাজ্যে প্রবেশ ক'রে জার্মানীকে বাধা দানের অধিকারকে অস্বীকার করাটা এক দিকে যেমন রুশিয়ার পক্ষে অসম্মান-জনক অপর দিকে সামরিক নীতির দিক থেকেও মহাভুল। সেই অপমানের পরই রুশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ বিরোধী বৈঠক থেকে সরে দাঁড়ায়। ব্রিটেনের প্ররোচনায় যখন পোল্যাণ্ড রুশিয়াকে এগিয়ে এসে জার্মানীকে আঘাত হানতে সুযোগ দিল না তখন চেম্বারলেন সরকারের হিটলার বিরোধী ভাব ভঙ্গীকে বিশ্বাস করা রুশিয়ার পক্ষে নিরাপদ হ'ল না। এক মিউনিক প্যাক্ট হিটলারকে চেকোশ্লোভাকিয়া দিয়েছে, আর একটিতে যে পোল্যাণ্ড দেবে না, তার নিশ্চয়তা কী? তার পরেই তো সোভিয়েট। একাই যদি তাকে লড়তে হয় তবে আর শত্রু বাড়াবে কেন? কিছু দিনের জন্যেও যদি শত্রু শিবিরে ভাঙ্গন ধরান যায়,—শত্রুকে দূরে রাখা যায়—তাও মঙ্গল। অতএব সোভিয়েটকে দোষ দেওয়া যায় না। বরং রুশ ভল্লুকের গানের সুরে নেচে নেচে

যদি কমিউনিষ্ট বিরোধী জোটের বড় দাদা ক্রেমলিনে বসেই কমিউনিষ্ট বিরোধী সেই চুক্তির বহ্ন্যুৎসবে যোগ দেয় তবে রুশিয়ার অপরাধ কোথায় ? ইতালী-জাপান আজ বড় দাদার পাশে নাই। জার্মানী আজ একাকী। আজ যে যুদ্ধ বাধল তার জন্যে দায়ী সোভিয়েট নয়—দায়ী পোল্যাণ্ডের ডিক্টেটরটি আর তার মুরুব্বি ব্রিটেন আর ফ্রান্সের বর্তমান গভর্ণমেণ্ট। রুশিয়ার দোষ, তাঁদের কূটনীতির চক্রে প'ড়ে মারা পড়তে অস্বীকার করে নিজেই সে নিজের পথ বেছে নিয়েছে ! সে যদি আজ চুক্তি না করত বা অর্ধেক পোল্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে না থাকত তবে জার্মানীই এগিয়ে আসত সোভিয়েটের দোর গড়ায়। ব্রিটিশ-ফ্রান্স তো পোল্যাণ্ডের রক্ষার জন্যে শুধু বুলি ছাড়া একটি সৈন্যও পাঠাতে পারল না !"

"তা ছাড়া হিটলার সোভিয়েটের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছে বটে কিন্তু তার মূল্য কি ? মাত্র ক'মাস আগেও ত হিটলার পোল্যাণ্ডের সঙ্গে দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল। সে কী তা মেনেছে ? অতএব রুশিয়ার এগিয়ে থাকতে হবে বৈকি ? তা ছাড়া একদিন ত তাকে তার মহাশত্রুর সঙ্গে লড়তেই হবে, অতএব যতটা এগিয়ে থাকা যায় ততটাই মঙ্গল। সুতরাং রুশিয়াকে বর্তমানে যে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের সঙ্গে এক ক'রে দেখানোর চেষ্টা চলেছে তার মতলব ভাল নয়। ইহা যত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয় ততই মঙ্গল।"

এই সঙ্গে রায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন :

"সর্বশেষে আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করার ঝুঁকি নিতে চাই। এই 'বলশেভিক বিপদ'ই এখনো ইউরোপকে এক মহাযুদ্ধের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। যারা সত্যই শান্তি চায়, রুশিয়া আজ যে সুযোগের সৃষ্টি করেছে, তারা যেন সেই সুযোগ গ্রহণ করে। চেম্বারলেন যেন আর একটি সংঘটিত ঘটনাকে স্বীকার করে নেন। যে কুখ্যাত ভার্সাই সন্ধি ইউরোপকে কেবল দুঃখ দিয়েই এল, পোল্যাণ্ড তারই শেষ কুকীর্তি। সেই মহাভুলের শেষ-চিহ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ইউরোপকে পুনরায় এক মহাযুদ্ধের মধ্যে টেনে আনা মহা অপরাধ। ড্যানজিগ ও করিডর এবং সাইলেসিয়া জার্মানীরই অংশ। এগুলো জার্মানীকেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক। অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতি পোল্যাণ্ডের কবল থেকে মুক্ত হোক। তারা যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে তাদের স্ব স্ব জাতীয় অঞ্চলে ফিরে যেতে চায় তবে যাক। অন্যায়ের দ্বারা অর্জিত

ভূখণ্ড ব্যতীত যা তার নিজস্ব, তাই নিয়ে পোল্যাণ্ড পুনর্জীবিত হোক। সেখানে যে গণতন্ত্র এতদিন ছিল না তা প্রতিষ্ঠিত হোক।

"এ সম্বন্ধে অনায়াসে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, যদি পশ্চিমের শক্তিবর্গ এই ইউরোপ বিধ্বংসী যুদ্ধকে এই সর্তে থামাতে চায় তা হ'লে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট দেখবে, যাতে নাৎসীরা তা গ্রহণ করে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে সোভিয়েটের মৈত্রী চুক্তির ভীতিই জার্মানীকে এই সর্তে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করবে।

"নাৎসিরা যদি একান্তই তাতে রাজি না হয়, যদিও সে সম্ভাবনা নিতান্তই কম, তবে একমাত্র ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট মৈত্রীই ইউরোপকে বাঁচাতে পারবে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সে হিম্মত আছে কি? যদি তা না থাকে. তবে বর্তমানে এই শক্তিশালী জার্মানীকে পরাজিত করা সহজ হবে না। এবং তিন-চার বছর ধরে মহা ভয়ংকর যুদ্ধ চলবে। তার পর কে বলতে পারে, কি হবে?"

"রুশিয়াকে এক ঘরে করে রাখবার মূর্খতা সাফল্য মণ্ডিত হয় নি। আজ সোভিয়েট রুশিয়া ইউরোপের প্রবলতম শক্তি। তাড়াতাড়ি এই বাস্তব জ্ঞানের উপলব্ধি হলেই ইউরোপ বেঁচে যাবে।...." (I. I., 1/10/39)

ইতিহাস সাক্ষী যে, রায়ের এই যুক্তি চেম্বারলেন তখন গ্রহণ করেন নি। কিন্তু রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল। "তিন চার বছর ধরে মহা ভয়ংকর যুদ্ধ চলল" এবং শেষ পর্যন্ত "ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট মৈত্রীই ইউরোপকে বাঁচাতে পারবে", এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হ'ল, অবশ্যই আমেরিকা সহ। তখন যদি চেম্বারলেন তা করতেন তা হ'লে হিটলার তখনই যুদ্ধ না থামালেও, অতি অল্পায়াসেই তাকে পরাজিত করা সম্ভব হ'ত। তখনো ফ্রান্সের ও পশ্চিম ইউরোপের পতন ঘটে নি। অতএব দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রণাঙ্গন সৃষ্টি করে বহু কম ক্ষয়-ক্ষতির পরিবর্তে হিটলারের পতন ঘটানো যেতে পারত। ছ'বছর ধরে ইউরোপ আফ্রিকা ও এসিয়ার যে বীভৎস কাণ্ড ঘটল তা ঘটত না। শেষ পর্যন্ত সেই ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট মৈত্রী বন্ধন হ'ল—কিন্তু সময়ে হ'ল না।

আমরা এখানে যেমন চেম্বারলেন সরকারের নিন্দা করি, তেমনি রায়ের দূর-দৃষ্টির অসাধারণত্বের প্রতি বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধাও নিবেদন করি।

কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে আনার চেষ্টা

শুধু যে চেম্বারলেন গোষ্ঠীই সে দিন নিজ শ্রেণী স্বার্থের জন্যে যুদ্ধের গতি-পরিণতি সম্বন্ধে ভুল করেছিলেন তাই নয়, যারা সাম্রাজ্যবাদের বলি, ফ্যাসিবাদের জয়ে যাদের সর্বাধিক সর্বনাশ—সেই শোষিত উৎপীড়িত শ্রেণীর নেতারাও তা সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। এসিয়া ইউরোপের এই একই ইতিহাস। নতুবা যুদ্ধের গতি হয়তো অচিরেই রুদ্ধ করা যেতে পারত।

ভারতের কথাই ধরা যাক। যাঁরা জন-মানসে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা ক্ষমতায় আসীন, তাঁরাও চেম্বারলেনের চোখেই যুদ্ধটাকে দেখলেন—বিশেষতঃ কংগ্রেস নেতারা। রায় তাঁর সাধ্যমত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করে চললেন।

ওয়ার্ধায় ৯ই অক্টোবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকা হয়েছে। যুদ্ধ বাধবার পরে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধরদের এই প্রথম সম্মেলন। ওয়ার্কিং কমিটির কার্যকলাপের পর্যালোচনা হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ দান করা হবে। রায় হঠাৎ ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। জ্বর ছাড়ল বটে, কিন্তু ওয়ার্ধা যাওয়া সম্ভব হ'ল না, তবে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করলেন ও সেই সঙ্গে পাঠালেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের প্রতি এক আবেদন। প্রস্তাবটির অনুবাদ দেওয়া হ'ল :

কংগ্রেস ও যুদ্ধ

"ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্‌সের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যে নাৎসী জার্মানীর পূর্বাভিমুখী আক্রমণ ও সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার গতি চূড়ান্ত

ভাবে রুদ্ধ হয়েছে তার জন্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই সভা সানন্দে সোভিয়েটকে সমর্থন জানাচ্ছে। হিটলারের পররাষ্ট্র নীতির সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য হ'ল, পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্র সমূহকে ধ্বংস করা বা তাঁবেদার সামন্ত রাজ্যে পরিণত করা। সোভিয়েট সরকারের সাম্প্রতিক সামরিক ও কূটনৈতিক কার্যাবলী সেই উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করেছে; ফলে জার্মান নাৎসীবাদের ও আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের গতি নিশ্চিত ভাবেই রুদ্ধ হয়েছে, যদিও পশ্চিমের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহ এর জন্যে এ যাবৎ কোন সাহায্যই দেয় নি। এই A. I. C. C. পশ্চিম ইউরোপে হিটলারশাহী ধ্বংসের ওজুহাতে মানুষের ধনপ্রাণ নষ্ট করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যদি এইরূপ বৃথা ধ্বংসলীলার সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে তবে ক্রমে অর্থ নৈতিক অবরোধের ফলে জার্মানীর সাধারণ মানুষও না খেয়ে মরবে। ভারত কখনো এই ধরণের অর্থহীন প্রতিহিংসা পরায়ণতার অংশীদার হ'তে পারে না।

"সেই হেতু A. I. C. C. এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, অতঃপর এই যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা করা বা না করার প্রশ্ন আর ওঠে না। এবং এই সঙ্গে ব্রিটেনের ও ফ্রান্সের জনসাধারণকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের সরকারকে এই অনর্থক যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্যে চাপ দেন।

"A. I. C. C.-র অভিমত এই যে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, জার্মান নাৎসীদের ও আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের সম্প্রসারণের গতি রুদ্ধ করতে হ'লে এবং অবিলম্বে ইউরোপকে এই বিপদের হাত থেকে মুক্ত করতে হ'লে U. S. S. R.-এর সঙ্গে সহযোগিতা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপায়, এবং আশা করে যে, এই সহযোগিতার সাহায্যে নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্ব শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে।" (I. 1., 8-10-39)

বলাই বাহুল্য, এ প্রস্তাব আলোচনাই হ'ল না, এবং এই অধিবেশন কোন ফলই প্রসব করল না।

ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, দর কষাকষি সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। ভাইসরয় সুবিধামত মোসলেম লীগের দোহাই দিয়ে কংগ্রেসের দাবী প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। মোসলেম লীগও তার দাবী বাড়িয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত মোসলেম লীগ দাবী তুলল, মোসলেম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকার করতে হ'বে। এবং সে জন্যে কেন্দ্রে ও প্রদেশে

যে সব মোসলেম মন্ত্রী গ্রহণ করা হবে তা মোসলেম লীগের মনোনীত প্রার্থী হ'বে।

রায় বললেন মোসলেম লীগের এ দাবী অনেক পূর্বেই স্বীকার করা উচিত ছিল। তা যদি করা হ'ত তা হলে লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে বর্তমানের এই তিক্ততার সৃষ্টি হ'তে পারত না এবং এই মিলিত শক্তির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে মর্মান্তিক আঘাত হানা চলতে পারত। (I. I., 15-10-39)

মোসলেম লীগের উক্ত দাবী মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের নিকট লীগের কংগ্রেস বিরোধী যে সাম্প্রদায়িক আবেদন এযাবৎ ছিল তা শেষ হয়ে যাবে। তখন কংগ্রেসের মধ্যে যেমন শ্রেণী ভিত্তিকও মতবাদ ভিত্তিক দল গড়ে উঠছে, তেমনি মোসলেম লীগের মধ্যেও তা সুরু হবে এবং মোসলেম লীগের মধ্যে র‍্যাডিক্যাল মনোভাবাপন্নরাও সেখানে বিকল্প নেতৃত্বের আওয়াজ তুলতে পারবেন। সে কাজ যে তিনি সুরু করেছিলেন তা আমরা আগেই বলেছি।

শেষ পর্যন্ত মোসলেম লীগের সঙ্গে কোন মীমাংসাই হ'ল না। কংগ্রেসের শত আপত্তি সত্বেও ভারত সরকারের রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা কোনটিই বন্ধ রইল না।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা, অহিংস অসহযোগ বা বৈধ ও নিরুপদ্রব পন্থায় আইন অমান্য আন্দোলনের দৌড়, মোসলেম লীগের সঙ্গে অমীমাংসনীয় দ্বন্দ্ব-কলহ ও তার ফলে কংগ্রেসের আঘাত হানার শক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্রিটিশের এমনই লঘু ধারণা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই অগ্রাহ্য করলে। ভাইসরয় মাত্র বললেন, যুদ্ধ শেষে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা যাবে, সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়, দল, স্বার্থ ও দেশীয় রাজন্যদের আহ্বান করা হবে। তাদের সম্মিলিত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হবে। ইতিমধ্যে একটি পরামর্শ সভা (consultative group) গঠন করা হ'বে।

এই ঘোষণায় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ক্রুদ্ধ হলেন। গান্ধীজি বললেন, "কংগ্রেস রুটি চেয়েছিল—পাথর পেয়েছে।"

রায় বললেন: "আমরা কোন দিনই আশা করি নি, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী মেনে নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আত্মহত্যা করবে। কিন্তু

সুযোগ-সুবিধা হয়তো মিলতো, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির ভিতুক সুলভ দুর্বলতার জন্যে তাও মিলল না।"

"ভাইসরয়ের ঘোষণার জবাব দেবার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসেছে। কিন্তু অতীত প্রস্তাবসমূহে এমন কিছু নাই যার দ্বারা বর্তমানের করণীয় কার্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। গান্ধীজী বলছেন, 'কংগ্রেসকে তার আদর্শ লাভের যোগ্য হতে হ'লে পুনরায় তাকে শক্তি ও বিশুদ্ধি লাভ করার জন্যে নির্বাসনে (wilderness) যেতে হবে।' আমরা কোন দিনই কংগ্রেসের সামনে মাত্র দু'টি পথই যে খোলা আছে তা স্বীকার করি নি; তার একটি হ'ল, মন্ত্রিত্বের মসনদ বা আইন পরিষদের আসন, অপরটি হ'ল কারাগারে নির্বাসন। আমাদের মতে তৃতীয় পথও আছে। তা হ'ল দেশব্যাপী ছোট ছোট দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম সুরু করা। এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিরা বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সব আইন পরিষদ বহির্ভূত আন্দোলন ও সংগ্রামকে জোরদার করার জন্যে সুযোগ সুবিধা করে দেবে।

"মনে হচ্ছে, গান্ধীজির নির্দেশ মত ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রিদের পদত্যাগের নির্দেশ দেবেন, এবং সমগ্র জাতিকে জেলে যেতে বলবেন। কিন্তু তা না করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের চ্যালেঞ্জ সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। যথাসময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বারা সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যুদ্ধের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কংগ্রেস এখন এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানাক। যুদ্ধ যদি চলে তবে তা গ্রেট-ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই চলবে। সে যুদ্ধের প্রতি কংগ্রেসের কোন সমর্থন থাকতে পারে না। কংগ্রেসকে নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্যেই বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হ'বে। সেই জন্যে ওয়ার্কিং কমিটি যেন জনসাধারণের আশু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী সমূহ রচনা ক'রে তা অর্জনের জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করার ব্যবস্থা করেন—সংগ্রাম চলুক বা না চলুক সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে।" (I. I., 22-10-39

অবশ্যই ওয়ার্কিং কমিটি রায়ের নির্দেশিত পথ গ্রহণ করে নি এবং রায়েরই অনুমান অনুযায়ী গান্ধীজীর নির্দেশিত 'নির্বাসনের' পথই গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রিদের পদত্যাগ করার হুকুম জারি করা হয়েছিল। অবশ্য তখনি জেলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। আপোষ-আলোচনার পথ তখনো খুলে রাখবার

জন্যে সকল কংগ্রেস কর্মীদের সকল প্রকার আইন অমান্য আন্দোলন বা ধর্মঘট করতে নিষেধ করা হয়েছিল। (Working Committee Resolutions on the 22nd October 1939)

তারপরে যখন দেখা গেল, ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহযোগিতাকে কোন মূল্যই দিল না তখন প্রথমে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও অনেক পরে ১৯৪২ সালে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করা হয়, এবং কংগ্রেস সমগ্রভাবে গান্ধীজির 'নির্বাসন দণ্ডভোগ' করতে থাকে কারাভ্যন্তরে। অর্থাৎ এই বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে একমাত্র জেলে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করল না। অথচ ব্রিটিশ কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়াই সমগ্র দেশের কাছ থেকে চুটিয়ে সংগ্রাম-প্রচেষ্টায় ষোল আনা সহযোগিতা আদায় করে নিল, এবং কংগ্রেসের শত বাধা তুচ্ছ করে সংগ্রামে জিতেও গেল। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা রায়ের জীবনী লিখছি। অতঃপর তিনি কী করলেন, তা দেখা যাক্।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রায়ের ঐতিহাসিক যুদ্ধনীতি

১৪ই থেকে ১৯শে অক্টোবর দেরাদুনে লীগ অব্‌ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন (L. R. C.)-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির যে অধিবেশন বসেছিল তাতে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে রায়ের সিদ্ধান্ত (War thesis) গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর কার্যকলাপ নির্ধারিত হ'তে থাকে। এই সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

এ যুদ্ধ গত যুদ্ধের মত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়—যদিও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যেই এ যুদ্ধ বেধেছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের রেষারেষি থেকে এ যুদ্ধের উদ্ভব ঘটেনি—এ যুদ্ধ হঠাৎ বেধে গেছে। আজ দশ বছর ধরে জার্মানী ও ব্রিটিশের মধ্যে যা কিছু দ্বন্দ্ব-বিরোধ, তা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টাই হ'য়ে এসেছে। এই দুই শক্তির মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মীমাংসার অযোগ্য কোন সমস্যা বা রেষারেষি নাই। ইউরোপে এই দুই দেশের মধ্যে সম্বন্ধটা হ'ল, ইংল্যাণ্ড ধনী ও জার্মানী সেই ধনের রক্ষক তথা পুলিশ। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে এদের যে রেষারেষি তার তুলনায় সেটা সামান্যই বলতে হ'বে। এই যুগের আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্বটিই হ'ল সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সমগ্র ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রেষারেষি। এই যুদ্ধ ধনতান্ত্রিক শক্তি সমূহের আত্মঘাতী যুদ্ধ। অবুঝ ভাইয়ের এক গুঁয়েমির জন্যেই এ যুদ্ধ বেধেছে।

যে হেতু ফ্যাসিজিম মরোণোন্মুখ ধনতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যে সর্বাপেক্ষা বর্বর উপায়, সেই হেতু এর ধ্বংস সকল বিপ্লবীরই কাম্য—সে ধ্বংস যেই আনুক। সুতরাং বর্তমান যুদ্ধ যখন জার্মান ফ্যাসিজিমকে ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে

দিচ্ছে তখন বিপ্লবীদের শুধু শান্তি কামনার জন্যে যুদ্ধের বিরোধিতা করা চলে না। সোভিয়েট ইউনিয়ানের দৃষ্টান্তই পৃথিবীর সকল বিপ্লবীকে পথ দেখাবে।

[অর্থাৎ এক দিকে যেমন আত্মরক্ষা ও প্রস্তুতি পর্ব চালাবার জন্যে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করা, অন্যদিকে পোল্যাণ্ড, বালটিক রাষ্ট্রসমূহ এবং ফিনল্যাণ্ড যাতে হিটলারের কবলিত হয়ে জার্মানীর সীমানা রুশ সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে না আসে সেই জন্যে নিজেরই এগিয়ে থাকা (Vid.—M. N. Roy —*India and War*)—লেখক]

যুদ্ধের এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে রায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ না করতে অনুরোধ করলেন এবং পূর্বোল্লিখিত পন্থায় দেশব্যাপী খণ্ড ও স্থানীয় আন্দোলন সুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বললেন।

একদিকে ব্রিটিশ সরকার বহাল তবিয়তে ভারত গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করে চললেন, অপর দিকে কংগ্রেস নেতারা কাগজে কলমে, বক্তৃতায় বীরত্ব প্রকাশের চূড়ান্ত করতে লাগলেন। কিন্তু সত্যকারের শক্তি যেখানে সেই প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নিষেধ ও নৈষ্কর্মের নির্দেশ দ্বারা নিঃশেষে পঙ্গু করে দেওয়া হ'ল। কংগ্রেস সভাপতি ভাইসরয়কে লিখলেন,

"ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করতে হ'বে এবং এই মুহূর্তে সেই পরিপ্রেক্ষিতে যথাসম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হ'বে।"

উত্তরে ভাইসরয় এ বিষয়ে যথাপূর্বং উপেক্ষার সঙ্গেই নীরব রইলেন।

(I. I., 12-11-39)

হিন্দু-মোসলেম বিরোধকে ব্রিটিশ এই সময়ে এমনভাবে কাজে লাগায় যে, তা সাম্রাজ্যবাদের ভদ্রতা জ্ঞানকেও ছাড়িয়ে যায়। এই সময় রায় ও যুক্ত প্রদেশের মোসলেম লীগের পরিষদীয় দলের ডেপুটি লীডার জেড্, এ, লারি-এম, এল, এ, হিন্দু মোসলেম সমস্যার সমাধানের এক সূত্র সম্বলিত যুক্ত বিবৃতি প্রচার করলেন। তার সারাংশ নিয়ে দেওয়া হ'ল:

"আজ হিন্দু মোসলেম অনৈক্যের জন্যে সমগ্র ভারত এক মহা দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েছে। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য হ'ল ভারতের স্বাধীনতা লাভ। তথাপি নেতাদের মধ্যে ক্ষুদ্র মনোমালিন্য বা ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ ও ভুল বোঝাবুঝির জন্যে উভয়ের মিলন ঘটছে না। ফলে ব্রিটিশও 'আগে বিভক্ত কর—তারপর প্রভুত্ব কর'-নীতি অতি মাত্রায় সাফল্যের সঙ্গে

প্রয়োগ করে চলেছে। এই মহা সংকট মুহূর্তে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই যে সকল প্রগতিপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল মতাবলম্বী সভ্য আছেন তাঁদের উচিত নেতাদের প্রতি আবেদন জানানো, যেন তাঁরা ব্যক্তিগত কারণসমূহ দূরে সরিয়ে রেখে এই বিবাদের মীমাংসার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে মোসলেম লীগ সত্যই মোসলেম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের উচিত, এই সত্য ঘটনাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া এবং সকল প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাতেই সংখ্যানুপাতে কংগ্রেস-লীগ মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করা। আমাদের বিশ্বাস, এই ব্যবস্থার দ্বারা এই দুই প্রতিষ্ঠানের নেতাদের নৈকট্যের ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানের ও সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী ঐক্যের পথ সুগম হবে। এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-সিদ্ধির পথেও বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'বে। আমরা নেতাদেরও যেমন এ বিষয়ে অবহিত হ'তে অনুরোধ করছি তেমনি উভয় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভ্যদের নিকটও এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

(I. I., 12-11-39)

এ অনুরোধ নেতারা তখন কাণে তোলেন নি। সমগ্র প্রদেশে কংগ্রেস-লীগ মিলিত মন্ত্রিসভার কথায় তখন কংগ্রেসী মহল (তখন মাত্র দু'টি ছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারই কংগ্রেসের করায়ত্তে) তাচ্ছিল্যের হাসিই হেসেছিলেন, যদিও ১৯৪৬-৪৭ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগ মিলিত হয়েই ভাইসরয়ের কাউন্সিল গঠন করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে রায়-লাহিরির কথায় কর্ণপাত করে এটি করলে ভারত বিভাগকে ঠেকান যেতে পারত, বাংলার ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতি অনেক দুর্ভোগের হাত থেকে হয়তো ভারত বাঁচতে পারত। ভারতের কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রগতিপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল মতাবলম্বী লোকদের কোন কথা, কোন প্রচেষ্টা, কোন আদর্শই ভারতের আধুনিক ইতিহাসে সম্মানিত, রক্ষিত বা অনুসৃত হয়নি। ভারতের বর্তমান ইতিহাসে প্রতিক্রিয়াশীল-দেরই জয়-জয়কার ঘটেছে এবং প্রগতিশীলতা ধিকৃত হয়েছে। স্বাধীনতার প্রায় দুই দশক পরেও হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আজও তার ফলভোগ করে চলেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে গান্ধী-রায় বিতর্ক

এদেশে বিজ্ঞান সম্মত রাজনীতির চর্চা এতই বিরল ছিল যে, রায়ের যুক্তি অধিকাংশ সময়েই বোধগম্য হ'ত না। হয়তো বহু বিলম্বে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু পাছে জনসাধারণের কাছে রায়ের নিকট এই ঋণ ধরা পড়ে সেই জন্যে তা আংশিক ভাবে এবং অসময়ে গ্রহণ করা হয়েছে, ফলে তাতে কোনো কাজ হয়নি।

রায় যখন এই যুদ্ধে কংগ্রেসকে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন তা গ্রহণ করা হয় নি। শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়ের নিকট হ'তে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে একদিকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ক'রে, অপর দিকে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হ'ল। রায় লিখলেন:

"শেষ পর্যন্ত সেই নিরপেক্ষতাই অবলম্বন করা হ'ল; তা ভালই; কিন্তু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে আমরা বলিনি। মন্ত্রিত্বে থাকার উদ্দেশ্যই যে সহযোগিতা করা, এমন ধারণা আমাদের কোন দিন ছিল না, থাকলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে বলতুম না। স্বাধীনতা লাভের জন্যে জনগণের যে লড়াই, তারই প্রস্তুতি পর্বে সরকারের তরফ থেকে প্রথমেই যাতে বাধা না আসে তা আগলাবার জন্যেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হবে উদ্যোগ পর্বের শেষে গণ-আন্দোলন আরম্ভের সংকেত রূপে। নতুবা তা অনর্থক, এমনি কি ক্ষতিকরই হ'বে। "Resignation was useless even harmful unless as a prelude to mass resistance." (Gandhi-Roy Letter—26-11-39) এবং গণ-আন্দোলন যখন সুরু করা হচ্ছে না তখন তার প্রস্তুতির জন্যে মন্ত্রিত্ব দখলে রাখা প্রয়োজন অতএব মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ভুলই হ'ল। অবিলম্বে এ ভুল সংশোধন করা হোক। (I. I., 19-11-39)

কিন্তু কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্বের ভাব ও ভাবনায় বা কংগ্রেসের কর্মসূচীর

মধ্যে জনগণের ক্ষমতা দখলের কোন পরিকল্পনা না থাকায়, রায়ের এ যুক্তি কোন দিনই গ্রহণ করা হয়নি ; এবং আপস আলোচনার মাধ্যমেই ক্ষমতা হাত পেতে পাওয়ার জন্যেই কংগ্রেসের বিচিত্র তপস্যা চলতে থাকে !

গান্ধীজী "হরিজন"-এ লিখলেন :

"গ্রেট ব্রিটেনকে বিব্রত করার জন্যে আইন অমান্য করা চলবে না। আমি হাজার বার যে কথা বলে এসেছি, পুনরায় সেই কথাই বলছি। যদি অহিংস মনে দশ লক্ষ লোক স্বরাজ কামনায় চরকা কাটে, তা হ'লে সম্ভবতঃ আইন অমান্যের কোন প্রয়োজনই হবে না। শত্রুকে জয় করার এই হ'ল অমোঘ অস্ত্র।" (I. I., 24-12-39)

গান্ধীজী কংগ্রেসকে নিজ মতাবলম্বীদেরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান, সেই জন্যে তাঁর "হরিজন" পত্রিকায় "দি কংগ্রেস ম্যান" শীর্ষক প্রবন্ধে অন্যান্যদের প্রতি আক্রমণাত্মক এক প্রবন্ধে লিখলেন :

"প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীকে চিন্তায়, বাক্যে এবং কার্যে অহিংস আচরণের কার্যকারিতার উপর জীবন্ত বিশ্বাস রাখতে হ'বে।"

এই প্রবন্ধের উত্তরে রায় গান্ধীজীকে এক খোলা চিঠি দিলেন। (I. I., 26-11-39)

গান্ধীজীও এর উত্তরে লিখলেন :

"কংগ্রেসের দুই প্রকার রূপ। এক রূপ শান্তির সময়, আর এক রূপ সংগ্রামের সময়। শান্তির সময় এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধের সময় এটি একটি অহিংস সামরিক বাহিনী। এই সময় এর মধ্যে কারুরই কোন ভোটাধিকার নাই। তখন এই বাহিনীর ইচ্ছা এর নেতার মুখ দিয়ে প্রকাশিত হবে। তখন প্রত্যেকটি সভ্য নেতার প্রতি, চিন্তায়, বাক্যে এবং কার্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবে। হ্যাঁ—চিন্তায়ও আনুগত্য চাই, কারণ যুদ্ধ যখন অহিংস।

"শ্রীরায় এবং অন্যান্য কংগ্রেস সেবীরা জানেন যে, আমি সাধারণতঃ সহকর্মী হারাতে চাই না। আমি অনেকখানি আপোষ করেও সহকর্মীদের সঙ্গে রাখতে চাই। কিন্তু সে আপসের একটি সীমা আছে যা অতিক্রম করা হয় না, করা যায় না, করা উচিত নয়। যে আপসের ফলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যায় সে আপসের কোন অর্থই হয় না।"

রায় গান্ধীজীর এই ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন :

"কতকগুলি মূলনীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন আমি তুলেছিলাম। কিন্তু তিনি তার ধার দিয়েও গেলেন না। কংগ্রেসের আদর্শ ও এই আদর্শলাভের যুক্তিসংগত কর্মসূচী সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছিলাম সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করলেন না। শুধু যে নীতি কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে কোন দিন গ্রহণ করা হয় নি, সেই অরাজনৈতিক অহিংস নীতির কথাই বলে গেলেন ; এবং আমরাই শুধু যেন তাঁর আদর্শের বিরোধী। কিন্তু তাঁর জানা উচিত, তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচররাই তাঁর এই নীতির সর্বাপেক্ষা বড় বিরোধী। আমাদেরও একটি নীতি ও আদর্শ আছে। সে নীতি হ'ল, মানুষ যেন মানুষকে শোষণ না করে ; আর আদর্শ হ'ল, সকল মানুষের সকল সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলে জীবনকে সুখকর করে তোলার পথের বাধা দূরীকরণের আদর্শ—যাকে এক কথায় সোস্যালিজম বলে। কিন্তু তাদের কোন আদর্শের বালাই নাই। একমাত্র ক্ষমতা দখলই তাদের আদর্শ, এবং সেই ক্ষমতা দখলের সুবিধা হ'বে বলে তারা গান্ধীবাদী—এক কথায়, তারা সুবিধাবাদী।*

"আমরা যখন বলি কংগ্রেসের আদর্শলাভের জন্যে যুক্তিসম্মত কর্মসূচী প্রণয়নের সময় অহিংসার কথা তোলা অবান্তর, তখন তার অর্থ এই নয় যে, আমরা হিংসার বা দুর্নীতির পক্ষপাতী। আমরা যে কংগ্রেসের নীতির আমূল পরিবর্তনের দাবী করি, তার কারণ সে নীতি অহিংস ও মর‍্যাল বলে নয়—এ নীতি বন্ধ্যা ও অকেজো বলে।"

আরও বললেন :

"অত্যন্ত অধৈর্য ও ক্রুদ্ধ হয়েই তিনি আমার চিঠির জবাব দিয়েছেন। প্রকারান্তরে আমাদের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতেই বলেছেন।

"কিন্তু আমরা এত সহজে বেরিয়ে যাব না। কংগ্রেসকে আমরা কোন দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করি না। আমরা মনে করি না যে, কংগ্রেস কোন ব্যক্তির একক চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে এবং সেই হেতু সেই ব্যক্তির ভাব ও ভাবনাকে মেনেই চলতে হবে। কংগ্রেস ভারতের জনগণের স্বাধীনতা

* এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, গান্ধীজী তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করে গেছেন। সেকথা প্যারিলাল আমাদের জানিয়েছেন তাঁর লিখিত, "গান্ধীজীর শেষ দিনগুলি" গ্রন্থে।

লাভের আকাঙ্ক্ষারই মূর্ত রূপ। সুতরাং যতদিন কংগ্রেস তা থাকবে আমরাও ততদিন থাকব। (I. I., 26-12-39)

তবু রায় এবং অন্যান্য বামপন্থী ও র‍্যাডিক্যালদের কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যাবার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল।

প্রথমেই রায় যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করতে বাধ্য হ'লেন। পদত্যাগ পত্রে লিখলেন:

"এই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতিতে বামপন্থী সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও এর কাজ হয়েছে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে নেওয়া। মতভেদ থাকলেও তা বলার উপায় নাই। কারণ, তাতে নাকি নেতাদের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা হ'বে। এই গণতন্ত্রবিরোধী পরিবেশে যে সব সিদ্ধান্ত এই সমিতিতে নেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে যখন আমার মত প্রকাশের বা সেই মতের বিপক্ষে প্রকাশ্যে কিছু বলার অধিকার নাই, তখন এই সমিতির সদস্য থাকার অর্থ এই যে, সকল প্রস্তাবের পক্ষেই যেন আমার নীরব সমর্থন আছে। কিন্তু তা যখন আমার নাই তখন আমার পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।" (I. I., 24-12-39)

দশম পরিচ্ছেদ

কংগ্রেসের নতুন সঙ্কল্প ও রায়

লৌকিক ব্যাপারে বা বাস্তব জীবনের সমস্যা-সমাধানে যুক্তিবাদী লৌকিক পন্থা অবলম্বনে ভারতের সাধারণ মানুষের যেমন অনীহা—তন্ত্রমন্ত্র, পাঁজিপুঁথি, অলৌকিকত্ব, ম্যাজিক প্রভৃতিতে তেমনি আগ্রহ। এ কথা গান্ধীজী ভাল ভাবেই জানতেন। যে জাতীয় কংগ্রেস, কোটি কোটি শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পরিচালক সংস্থা রূপে গড়ে উঠেছে, (সভ্যসংখ্যা যার প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ) সেই কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ কর্মী তখন যুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতা লাভের জন্যে উদগ্র হয়ে কেবল আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। গান্ধীজী বুঝলেন। আদেশ দেওয়া মাত্র সারা ভারত এক দারুণ বিপ্লবের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তাই অহিংস মন্ত্রের ঋষি তখন সেই উত্তাল তরঙ্গকে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত শান্ত করে ঝাঁপিতে ভরে ডালা চাপা দিলেন।

১৯৪০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসের পুরাতন সংকল্পের পরিবর্তে নতুন সংকল্প বাক্য রচনা করলেন। তাতে ব্রিটিশ সম্পর্ক রহিত পূর্ণ স্বরাজ লাভের আদর্শ ই রইল বটে, কিন্তু তা লাভের উপায় হিসাবে যা লেখা হ'ল, তা একান্তই অলৌকিক ও ম্যাজিকের পর্যায়েই পড়ে। আমরা এই নতুন সংকল্পের অনুবাদ দিলাম এই জন্যে যে, রায় এর প্রতিবাদ করেছিলেন।

"সংকল্প বাক্য"

"আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের মুক্তিলাভের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ উপায় হিংসাত্মক নয়। ভারতবর্ষ এ যাবৎ যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস লাভ করেছে এবং স্বরাজের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে তা বৈধ ও নিরুপদ্রব পথে পরিক্রমা করে, এবং সে পথেই দেশ স্বাধীনতা লাভ করবে। আমরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে নতুন করে অঙ্গীকার করছি এবং সর্বান্তকরণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করছি যে, যতদিন না পূর্ণ স্বরাজ লাভ হচ্ছে ততদিন অহিংস সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

"আমরা বিশ্বাস করি, সাধারণ ভাবে অহিংস কার্যাবলী এবং বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ অহিংস সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি নির্ভর ক'রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণের গঠনমূলক কর্মসূচীর সাফল্যের উপর। আমরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহৃদয়তা প্রসারের সকল প্রকার চেষ্টা করে চলব।

"যারা সামাজিক অবহেলার ফলে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত, যারা অনুন্নত ও নিপীড়িত তাদের আমরা উন্নতির পথে চলতে সাহায্য করব। আমরা জানি—যদিও আমরা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চাই তথাপি সরকারের ভেতর বা বাইরের কোন ইংল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে আমাদের কোন কলহ নাই। আমরা জানি—বর্ণ-হিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে বিভেদ দূর করতেই হবে এবং হিন্দুরা তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এই ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্রয় অবশ্যই দেবে না। আমাদের ধর্মবিশ্বাস পৃথক হলেও এইরূপ ভেদবুদ্ধি অহিংস আচার-আচরণের বিরোধী। আমরা যেন পারস্পরিক আচার ব্যবহারে সকলকেই একজাতি, একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে জড়িত মনে করে একই ভারতমাতার সন্তান রূপে দেখি।

"ভারতের সাত লক্ষ পল্লীর পুনরুজ্জীবনের ও জনগণের নিদারুণ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায়স্বরূপ চরখা ও খাদি আমাদের গঠনমূলক কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই জন্য আমরা প্রতিদিন নিয়মিত চরকা কাটব, খাদি ছাড়া পরব না, পল্লীজাত শিল্প যথাসম্ভব ব্যবহার করব এবং অপরকেও অনুরূপ করতে চেষ্টা করব। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কংগ্রেসের নীতি ও অনুজ্ঞা পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকব।"

রায় বললেন, এই নতুন সংকল্প বাক্যে যে গঠনমূলক কর্মসূচীর ব্যাপক ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল তা রাজনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে না—তা সমাজ উন্নয়নমূলক ও ভুল অর্থনীতির কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর সাহায্যে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ লাভ সম্ভব নয়। সেই জন্যে এই কর্মসূচীর সবটাই অবান্তর ও অযৌক্তিক পর্যায়ে পড়ে।

তিনি উপরিউক্ত যুক্তি দিয়ে এই কর্মসূচীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সমগ্র দেশে

প্রচার ও আয়োজন সুরু করলেন। তাঁর এই আন্দোলনে কিছু ফলও ফলেছিল। জনসাধারণ বুঝুক না বুঝুক ওয়ার্কিং কমিটি শেষ পর্যন্ত এই অধিকার দিয়েছিলেন যে, যদি কোন অংশে কারো কোন আপত্তি থাকে তবে সে সেই অংশ আবৃত্তি না করতেও পারে। কিন্তু রায় পন্থীরা ছাড়া এই অধিকার যে বেশী লোক গ্রহণ করে নি সেটি ঐতিহাসিক সত্য। যুক্তিবুদ্ধি প্রণোদিত পন্থায় নিজ ঈপ্সিতকে লাভ করবার সজ্ঞান প্রচেষ্টার অভ্যাস ত' বেশী লোকের নাই, পূজা প্রার্থনা দেবতা ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে অলৌকিকত্বের উপর আস্থা ও লোভই বেশী। সুতরাং অবতার প্রতিম নেতাদের আদেশে চরকা কেটে ম্যাজিক ও মিরাকল্-এর উপরই আস্থা স্থাপন করে স্বরাজ সাধনার আত্মপ্রসাদ লাভ করাটাই ত' স্বাভাবিক।

এদিকে কংগ্রেসের বন্ধ্যা নীতির জন্যে একদিকে যেমন মোসলেম লীগ শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভাও সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকল। ব্রিটিশের ভারি সুবিধা হ'ল, সে সকলকেই এর-ওর বিরুদ্ধে খেলিয়ে রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা বেশ ভালভাবেই চালিয়ে যেতে লাগল।

রুশিয়ার আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা

ইতিমধ্যে সোভিয়েট রুশিয়া হিটলারের মুখ থেকে লিথুনিয়া, ল্যাটাভিয়া প্রভৃতি বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ সম-মর্যাদায় সোভিয়েট ইউনিয়ানের সদস্য শ্রেণী-ভুক্ত করে নিল, এবং নিজ সীমানা জার্মানীর সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দিল। ফিনল্যাণ্ড ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণের উত্তরের উল্লম্ফন ঘাঁটি। বহু বৎসর ধরে, বহু অর্থ ব্যয়ে তাকে সামরিক দিক থেকে দুর্ভেদ্য করে গড়ে তোলা হয়েছিল। সোভিয়েট প্রথমে অর্থ এবং ভূখণ্ডের বিনিময়ে কিছু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেতে চাইল। কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ডিক্টেটর ম্যানার-হাইম তা অস্বীকার করাতে যুদ্ধ বাধল। জনসাধারণের ক্ষতি বাঁচিয়ে সাবধানে সামরিক অভিযান চালাতে মাস কয়েক লাগল। তারপর ম্যানারহাইমকে সিংহাসনচ্যুত করে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং চুক্তিও সম্পাদিত হ'ল।

এই সব কাজের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশে, মায় ভারতেও রুশিয়ার বিরুদ্ধে 'লাল সাম্রাজ্যবাদে'র দুর্নাম রটনা চলল এবং তাকে জার্মানীর অংশীদার রূপেই অভিহিত করা হ'তে থাকল।

রায় প্রতি সপ্তাহেই নানা সন্দেহাতীত নজীর উল্লেখ করে রুশিয়াকে সমর্থন করে চললেন। রুশিয়ার এই সকল কার্যই যে নিছক আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি মাত্র, তা' প্রমাণও করে চললেন।

তিনি আরও বললেন :

"আজ সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রুদ্ধ, কারণ তাদের বহুদিনের বহু যত্নে গড়া পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আগামী বসন্তেই হয়তো যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। সোভিয়েটের উপর আক্রমণ আসন্ন হয়ে উঠবে। তখন কিন্তু এত অর্থব্যয়ে, এতদিন ধরে ফিনল্যাণ্ডে গড়া ঘাঁটিটি আর থাকবে না।" (I I., Dt. 7. 1. 40)

একাদশ পরিচ্ছেদ

কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রামগড় কংগ্রেস

ত্রিপুরির পর রামগড় কংগ্রেস। ওয়ার্কিং কমিটির মনোনীত সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। রায় বুঝলেন কংগ্রেসে থাকার দিন তাঁর শেষ হ'য়ে এসেছে। পরিত্যাগের প্রাক্কালে কতজনকে সঙ্গে নিতে পারবেন তা জানা দরকার। যে বৈজ্ঞানিক রাজনীতি চর্চার প্রবর্তন তিনি কুড়ি বছর পূর্বে করেছেন আজ তার কতটুকু ফল ফলল জানতে না পারলে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা যাবে না। এই সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষে সেটি হ'তে পারে যদি তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাবেন এবং তিনি নাবলেনও।

প্রতিদ্বন্দ্বী আবুল কালাম আজাদ, একে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের মনোনীত প্রার্থী, তার ওপর আবার মুসলমান। সুতরাং রায়কে যারা সমর্থন করবে তারা খাঁটি রায়পন্থী ছাড়া কেউ হবে না। ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্টরা তাঁকে ভোট দেয় নি।

বিশ বছর পূর্বে যে মানুষটি একাকী গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সকলপ্রকার কুসংস্কার, গুরুবাদ, অন্ধ বিশ্বাস, ম্যাজিক, মিরাকল্-এর স্থানে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করে আসছিলেন—সেদিন দেখা গেল, কংগ্রেসের মধ্যে মাত্র ১৮১ জন ডেলিগেট তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এরা কংগ্রেসের মাত্র এক দশমাংশ শক্তি। এক দিক থেকে এই ঘটনাটি যেমন হতাশাব্যঞ্জক তেমনি ভারতে আধুনিকতার গতি-প্রকৃতির নির্দেশকও। ভারতের অতি সামান্য অংশ এটমিক যুগে বাস করলেও অধিকাংশই যে মধ্যযুগ-সুলভ ধ্যান-ধারনায় বিশ্বাসী হয়ে আছে তার হদিস এই ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়।

অবশ্য রায় খুসিই হ'লেন। বললেন, একা ছিলাম, আজ তিন লক্ষাধিক

কংগ্রেস সভ্য ও তাঁদের ১৮১ জন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে এসেছে। সুতরাং হতাশ হবার কারণ নাই।

রামগড় কংগ্রেস যথারীতি স্বাধীনতা-লাভের বিনিময়ে এই যুদ্ধে সহযোগিতার দাবী জানাল। এবং অবিলম্বে তা লাভের জন্তে মন্ত্রিত্ব বর্জন নীতির সমর্থন জানাল ও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার ভারও গান্ধীজীকে দেওয়া হ'ল।

গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবেই কংগ্রেসের ডিক্টেটর হ'লেন। তিনি বললেন, যে স্বাধীনতা-সঙ্কল্পবাক্যে সত্য ও অহিংস নীতি এবং চরখা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদকতা নিবারণ ও হিন্দু-মোসলেম ঐক্যের কর্মচতুষ্টয় আছে, তা যখন যথাযথ পালিত হ'বে তখনই তিনি দেশ প্রস্তুত বলে মনে করবেন এবং সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করার হুকুম দেবেন।

রায়ও যথারীতি বললেন, এই কর্মসূচী দিয়ে স্বাধীনতা লাভ হয় না—চাপ দিয়ে হাত পেতে কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যেতে পারে মাত্র। এতে ধনী ও কায়েমী স্বার্থ খুসী হ'তে পারে বটে কিন্তু অগণিত দারিদ্র্য পীড়িত ভারতের জনগণ খুসী হ'বে না—তাদের জন্তে চাই বিপ্লব।

কিন্তু কে বোঝে এ কথার অর্থ? জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের মূল কারণ যে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, তা দূর করার জন্তে তারা এগিয়ে আসে না। অজ্ঞতা এমনই গভীর যে প্রতিক্রিয়াশীলতার রথ টানাতেই তাদের বেশি আগ্রহ ও আনন্দ।

রামগড় প্রস্তাবে আর একটি গুরুতর বিষয় ছিল। সে সময় কংগ্রেস-মোসলেম লীগ বিরোধকেই ব্রিটিশ সর্বাপেক্ষা কাজে লাগিয়েছিল। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে এতদিন কেবল হিন্দু-মোসলেম ঐক্যের কথাই বলা হচ্ছিল। কিন্তু এবার এ প্রস্তাবে যা বলা হ'ল তাতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনাই রইল না। এতদিন হিন্দু সংখ্যা-গরিষ্ঠের প্রতি সন্দেহের জন্তে মোসলেম লীগের দাবী ছিল পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী, সরকারীপদে সংখ্যানুপাতিক হার প্রভৃতি। মোসলেমলীগ ও কংগ্রেসের আলাপ-আলোচনায় এ যাবৎ এর কোন মীমাংসা হয় নি। এবারে বলা হ'ল, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করবার অধিকার ভারতের পূর্ণবয়স্কের দ্বারা নির্বাচিত গণ-পরিষদের, এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সমস্যার স্থায়ী সমাধান গণ-পরিষদের দ্বারাই সম্ভব। এই গণ-পরিষদের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের

মধ্যে চুক্তির দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থা হ'বে। যদি সর্বসম্মত চুক্তিনামা সম্পাদন সম্ভব না হয় তবে সালিশীর দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থা করা হ'বে।*

এর তাৎপর্য এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার উপরই সংখ্যালঘিষ্ঠের নিরাপত্তা নির্ভর করবে। কিন্তু এ যাবৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে নি। অতএব যে গণ-পরিষদে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই থাকবে সেইরূপ প্রস্তাবের ফলে মোসলেম লীগের সঙ্গে ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনাই রইল না।

রায় যে পন্থায় কংগ্রেস লীগ ঐক্যের প্রচেষ্টা করছিলেন তা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। তিনি পারস্পরিক আস্থা উৎপাদনের জন্যে প্রদেশে প্রদেশে যুক্ত মন্ত্রিত্বের চেষ্টা করছিলেন। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের ফলে সে প্রচেষ্টার অবসান ঘটল, এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানও যে গণ-পরিষদের দ্বারাই হ'বে এ সূত্র মোসলেম-লীগ পূর্বাহ্নে সমর্থন না করাতে কংগ্রেসের প্রতি অবিশ্বাস আরো বেড়ে গেল। ফলে গান্ধীজীর ঈপ্সিত হিন্দু-মোসলেম মৈত্রী আর সম্পন্ন হ'ল না। কংগ্রেসের চতুষ্পদী কর্মসূচীর এক পদ খোঁড়া হয়েই রইল এবং ভারত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) ও ভারত বিভাগের সেই মহা ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল—সাত বছর ব্যাপী বহু গান্ধী-জিন্না বৈঠকও তা ঠেকাতে পারল না।

কংগ্রেস কমিটিগুলি এক-একটি সত্যাগ্রহ কমিটিতে পরিণত হ'ল। যারা সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হলেন না, তাদের কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করতে হ'ল। আর গান্ধীজী হলেন সেই সত্যাগ্রহ কমিটিসমূহের সর্বাধিনায়ক। গান্ধীজী এই ক্ষমতা হাতে নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে দর কষাকষি করতে লাগলেন। ক্ষমতা দখলের জন্যে যে শক্তি কংগ্রেসে দানা বেঁধে উঠছিল, যা বামপন্থী নামে অভিহিত হ'ত, যাদের মিলিত শক্তি কম ছিল না, যারাই সাধ্যাধিক্যে সুভাষবাবুকে নির্বাচিত করেছিল—সেই শক্তি বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

---

* No permanent solution is possible except through a Constituent Assembly, where the rights of all recognised minorities will be fully protected by agreement as far as possible between the elected representatives of various majority and minority groups or bv arbitration if agreement is not reached on any points." (Vide—Ramgarh Congress (1940) resolutions)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মোসলেম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ ও রায়

রামগড় কংগ্রেস প্রস্তাবের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া অবিলম্বেই দেখা দিল। মোসলেম লীগ দু'মাস পরেই লাহোরে পাকিস্তানের দাবী তুলল। রায় 'হায়, হায়' করে উঠলেন। তিনি লিখলেন :

"যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সব প্রচেষ্টাকে এতদিন ব্যর্থ করে এসেছে তা ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠছে। এই সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসের অক্ষমতার জন্যে মোসলেম লীগ ক্রমেই প্রতিক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠেছে এবং তারই পরিণতি ঘটেছে মোসলেম লীগের গত লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণে। এই প্রস্তাব দেশের সকল জাতীয়তাবাদীকেই বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। মনে হচ্ছে যেন ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আর কোনদিনই সম্ভব হ'বে না।

"আমাদের কাছে এই প্রস্তাব এতই অদ্ভুত ও হাস্যকর মনে হচ্ছে যে, এর উপর কোন গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনই অনুভব করছি না। এই পরিকল্পনা যখন একই জাতিকে দুই সম্পূর্ণ পৃথক জাতিতে পরিণত করতে চায়, তখন এ যে একান্ত জাতীয়তা বিরোধী তাতে সন্দেহ নাই। এই দুই পৃথক এলাকায় যে সব হিন্দু বা মুসলমান সংখ্যালঘুরা বাস করবে, তাদের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধানও এ পরিকল্পনা করতে পারবে না।

"আমরা মনে করি, কংগ্রেস নেতাদের অসহযোগী মনোভাবের জন্যেই মোসলেম লীগের নেতারা মরিয়া হ'য়ে এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। গণ-পরিষদই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করবে, কংগ্রেসী নেতাদের এই জেদকে আমরা কোনদিনই বিজ্ঞজনোচিত ও বাস্তব জ্ঞান প্রসূত বলে মনে করি নি। প্রথমতঃ

একে আমরা গণ-পরিষদের তালিকা বহির্ভূত ও গণপরিষদের মর্যাদা হানিকর কার্য বলেই মনে করি। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে গণ-পরিষদ আহুত হয় না—আহুত হয় জনগণের স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করতে।

"দ্বিতীয়তঃ, এ যেন ঘোড়াতে গাড়ি জোতার সামিল। গণ-পরিষদ ডাকার আগেই এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার—গণপরিষদ ডাকবার পর হয় না। এই দুই সম্প্রদায় মিলিত হ'য়ে যদি গণ-পরিষদ ডাকে, তবেই গণ-পরিষদ বসতে পারে, এবং তা সম্ভব হ'বে তখনই যখন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা সম্ভব হ'বে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর গণ-পরিষদ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করার এই ধারণা, হয় সমস্যাকে এড়ানোর চেষ্টা থেকে বা সমাধান না করার ইচ্ছা থেকেই উদ্ভূত। এর ফলে সমস্যাটি অমীমাংসিতই রয়ে গেল। অপর পক্ষে এরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হ'ল মোসলেম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব। (I. I., 12. 5. 40)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ফ্রান্সের পতন ও রায়ের কংগ্রেস পর্বের অবসান

জার্মানী কয়েক মাস নীরব থাকার পর হঠাৎ ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ করে বসল এবং অতি সহজে দখলও করল।

রায়ের মতে, ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েটের সাফল্যে ভীত হ'য়ে সুইডেনের লৌহ ও অন্যান্য কাঁচা মাল যোগানোর পথ নির্বিঘ্ন করতেই জার্মানীর এই আক্রমণ।

এখানে ব্রিটিশ ইচ্ছা করলে জার্মানীর একটা গুরুতর সামরিক পরাজয় ঘটাতে পারত এবং ফলে হয়তো হিটলারের পতনও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তা করল না। অবশ্য তাতে চেম্বারলেন সরকারের গদিচ্যুতি ঘটল, এই পর্যন্ত। তারপরই মে মাসে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম হিটলারের কবলিত হ'ল। রায় এক বিবৃতিতে বললেন :

"এখন ফ্যাসিজিমকে রুখতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের একজন নির্ভরযোগ্য মিত্রের প্রয়োজন। সুতরাং সোভিয়েট বিরোধী প্রচার ও আন্দোলনের এটি সময় নয়। হয়তো শীঘ্রই দেখা যাবে, ফ্যাসিজিমের বিজয় অভিযান রুখতে সোভিয়েট ইউনিয়ানেরই সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।" (I. I., 26. 5 40)

দেরাদুনে ২০শে মে থেকে ৪ঠা জুন পর্যন্ত লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস-মেনের নিদাঘ শিবিরের অধিবেশন বসে। রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত আলোচনা উপলক্ষে রায় যে সকল ভাষণ দেন তা "Scientific Politics" নামে একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। র‍্যাডিক্যালদের বাৎসরিক সম্মেলনও এই সঙ্গে বসে। যে নীতি ও কর্মসূচী এযাবৎ অনুসৃত হচ্ছিল তা সমর্থিত হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবে পূর্ব ঘোষিত নীতি সমর্থিত হয়। তাতে বলা হয় :

"ইউরোপে ফ্যাসিবাদের জয় হ'লে সমগ্র পৃথিবীর সকল বৈপ্লবিক শক্তির অতিশয় ক্ষতি হ'বে এবং সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষেও মহা বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের জয় কামনা না করে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রী ও প্রগতিপন্থীর উচিত এমন কাজ না করা, যা' ফ্যাসিষ্ট শক্তির জয়লাভের পথ সুগম করে।

"বর্তমান পরিস্থিতিতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কাম্য নয়।* কারণ, এখন যদি সন্ধি হয়, তবে তা নাৎসি জার্মানীর নির্দেশ মতই হ'বে, কিংবা নাৎসিবাদী ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের পছন্দ মত হবে। জগৎ আজ এই বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যুদ্ধ যদি চলে তবে দুই পক্ষই ধ্বংস হ'বে এবং বৈপ্লবিক শক্তির জয় হ'বে এই ভয়ে হয়তো নাৎসি নিয়ন্ত্রিত ইউরোপ অচিরেই যুদ্ধ মিটিয়ে নিতে পারে। অতএব সেটি যেন না হ'য়। সেই জন্যে ভারতের স্বাধীনতাকামীদের এমনভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত,যাতে এই যুদ্ধ চলা কালে উপযুক্ত মুহূর্তে একটি মর্মান্তিক আঘাত হেনে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবী শক্তি যাতে নাৎসি জার্মানীর নেতৃত্বে ভারতেও সংগঠিত হ'য়ে উঠতে না পারে।"

(I. I., 16. 6. 40)

ফ্রান্সের পতনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রায় লিখলেন:

"আজ প্রশ্ন হ'ল, গত ৪০০ বছর ধ'রে ইউরোপে যে আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা এই সংকট কাটিয়ে সভ্যতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হ'বে কিংবা ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার বিজয় অভিযানের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

"শেষোক্ত সর্বনাশের আসন্ন আশঙ্কায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়তে হত, যদি না পৃথিবীর একষষ্ঠাংশ থেকে আশার আলো বিকীর্ণ হ'ত।

"সময়োপযোগী সোভিয়েট সাহায্যে শক্তিমান হ'য়ে বৈপ্লবিক শক্তির চেষ্টায় হয় ইউরোপ বাঁচবে, নতুবা আসন্ন ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিজয় অভিযানের বর্বরতার অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে।"

(I. I., 23. 6. 40)

ফ্রান্সের আসন্ন বিপর্যয়ের প্রাক্কালে চার্চিল ফ্রান্সের সকল নাগরিককে

* এখানে স্মরণীয় যে, রায় ২২।১০।৩৯ তারিখের লেখায় যুদ্ধ বন্ধ করতেই চেয়েছিলেন। সে অবস্থা পরিবর্তনের ফলে তিনি এখন আর তা চাইলেন না। কিন্তু তাতে মূল যুদ্ধনীতি অপরিবর্তিতই রইল। মূলনীতি ছিল, ফ্যাসিবাদের পতন ও সোভিয়েটের নিরাপত্তা বিধান; এ ক্ষেত্রেও তাই রইল। উভয় ক্ষেত্রের যুক্তি দ্রষ্টব্য।

গ্রেটব্রিটেনের নাগরিকতা প্রদানের অঙ্গীকার পর্য্যন্ত ক'রে আত্মসমর্পণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েটকে কোন ইঙ্গিতই করেন নি।

সামান্য অনুরোধ করলেই সোভিয়েট তখন জার্মানীকে আক্রমণ করত, রায়ের এই ছিল বিশ্বাস। এখানে উপরিউক্ত লেখাতে সেই কথাটিই ইঙ্গিতে বললেন।

ফরাসী বিপ্লবের ১৫১তম বার্ষিক স্মরণোৎসবের দুই সপ্তাহ পূর্বে প্যারিসের পতন হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভিত্তিক আধুনিক সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা বর্বরতার যুগে ঘুরে গেল।

৭ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসল। রায় কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নিকট লিখলেন :

"বিপদগ্রস্ত ফরাসী জনগণের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে আগামী ১৪ই জুলাই ফরাসী বিপ্লব স্মরণ দিবসে সমগ্র ভারতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোক।"

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের জবাবে রায় বিস্ময়ে হতবাক্ হ'লেন। প্রেসিডেন্ট লিখলেন, বর্তমানে এইরূপ কোন অনুষ্ঠানের যে কোনই প্রয়োজন নাই শুধু তাই নয়, এইরূপ অনুষ্ঠানের পক্ষে সময়টিও অনুকূল নয়।

রায় বললেন : "এর অর্থ হ'ল এই, কংগ্রেস নেতৃবর্গ চান না, এই সময় ভারতীয় জনগণ কর্তৃক ফ্যাসিষ্ট বিরোধী কোন আন্দোলন হয়।" (Vide M N. Roy—*India & War*)

রায় কিন্তু থেমে থাকলেন না। তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সারা ভারতে এই দিনটি যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করলেন, এবং ধ্বনি তুললেন, "ফ্রান্স আবার স্বাধীন হবে—France shall rise again"

২৭ শে জুলাই পুণায় A. I C. C.-র ঐতিহাসিক অধিবেশন বসে। রায় যে প্রস্তাব পেশ করেন তার মধ্যে ছিল :

(১) ১৯টি মূলনীতি সংবলিত স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে গণপরিষদ আহ্বানের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন;

(২) যুদ্ধনীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। এই যুদ্ধনীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে ছিল :

"ফ্যাসিজিমের কবল থেকে বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতা ও আধুনিক সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য আজ যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম চলেছে, ভারতের সংগ্রাম সেই বৃহত্তর সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এই নিখিল ভারত

কংগ্রেস কমিটি বিশ্বাস করে যে, সেই বৃহত্তর সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধারা অচিরেই নিজ আদর্শ লাভ করতে সক্ষম হবে। ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া বা না পাওয়া ব্রিটিশের দয়া ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সে অধিকার ভারতের জনগণের এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ের দ্বারা জনগণকেই তা অর্জন করে নিতে হবে। সুতরাং বিশ্ব-স্বাধীনতার রক্ষা সংগ্রামে ভারতের সহযোগিতা ব্রিটিশের কোন ঘোষণার উপর নির্ভর করে না।"

"ভারতে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার মত শক্তি সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থাই এযাবৎ করা হয়নি। তা যদি করা হত তাহ'লে, অচিরেই অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত এক আঘাতে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারত। কিন্তু অবস্থা যখন তা নয় তখন কর্তব্য হ'ল, যুদ্ধে সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণকে প্রস্তুত করে তোলা এবং অচিরেই সুযোগ আসা মাত্র তার সদ্ব্যবহার করে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া।

"সুতরাং নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি এই অভিমত ব্যক্ত করছে যে, ভারতের জনগণের সাধ্যমত সকল উপায়েই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতা করা উচিৎ। এতে সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করা হ'বে না। কারণ এই সহযোগিতার দ্বারা ইংল্যাণ্ডের প্রকৃত ফ্যাসিবিরোধীদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাবে এবং তত্রস্থ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতা ও প্রভাবকে খর্ব করতে সাহায্য করবে।"। (Ibid)

পুণায় পুরাতন দাবীই সমর্থিত হয়। ৮ই অগাষ্ট পুণা প্রস্তাবের উত্তরে ভাইসরয় ঘোষণা করেন যে, তাঁর কাউন্সিলে যোগদানের জন্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়দের অবিলম্বে আহ্বান জানান হচ্ছে এবং এবার আর পূর্বের মত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রদেশ সম্পর্কে মীমাংসায় আসবার পূর্ব সর্ত আরোপ করা হ'বে না। এর উত্তরে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নীরব রইলেন। কারণ, ফ্রান্সের পতনের পর কংগ্রেস নেতাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ শক্তির দিন ঘনিয়ে এসেছে।

২২শে অগাষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হ'ল। কংগ্রেস আর কোনভাবেই ফ্যাসিষ্টদের বিরোধিতা করতে রাজি নয়। রায় লিখলেন:

"ভাইসরয়ের ঘোষণার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করার দাবী তুলে কংগ্রেস প্রণয়

থেকেই মরীচিকার পিছনে ছুটেছে। এখন স্পষ্ট হয়ে গেল, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের স্বাধীনতাকে কিছুতেই স্বীকার করে নেবে না, যতক্ষণ না সেই স্বাধীনতা বাস্তব ঘটনায় পর্যবসিত হচ্ছে; এবং সেইসঙ্গে এও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাম্রাজ্যবাদ সত্যিকারের কোন ক্ষমতাই স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করতে পারে না। কেননা এর ফলে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

"কংগ্রেস যদি তার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পরিবর্তন না করে তবে তাকে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হ'বে, তার ফলে হয়তো তাকে কোন হঠকারিতায় পেয়ে বসবে কিংবা বাধ্যতামূলক নৈষ্কর্মের মধ্যে সে ডুবে যাবে।

"কংগ্রেস যে পথে চলেছে তাতে যে শেষ পর্যন্ত এমনিধারা সংকটের মধ্যেই তাকে পড়তে হবে, এই আশঙ্কা করেই আমি বিকল্প পন্থার প্রস্তাব প্রথম থেকেই করে আসছিলাম। কিন্তু নেতারা এবং অধিকাংশ সচেতন কংগ্রেস কর্মী আত্মাভিমান ও সস্তা বাহাদুরির মোহে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সম্যক দৃষ্টি দি'য় দেখতে পারেন নি, এবং যা করা যেতে পারত, তা না করে কেবল দিবা স্বপ্ন দেখে ও আকাশ-কুসুম রচনা করেই কাটিয়ে দিলেন।

"প্রথমেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সেপ্টেম্বর ঘোষণাকে বাতিল করে কংগ্রেসের নেতিমূলক সিদ্ধান্তের অবসান ঘটাতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে যে সব ভুল করা হয়েছে অবিলম্বে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। কংগ্রেস নেতারা কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে প্রস্তুত। কয়েকমাস আগে তাঁরা বেশকিছু সুবিধা আদায় করেই সেটা পেতে পারতেন, কিন্তু আরও বেশী আদায়ের চেষ্টায় তাঁরা এক মোক্ষম সুযোগ হারালেন।

"সর্বাপেক্ষা বড় ভুল হয়েছে, প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে। এ ভুল সংশোধনের এখনো সময় আছে। পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে এই সব গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে একদিকে তারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে জনগণকে সাহায্য দিতে পারবে, অন্যদিকে ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধে সহায়তা করতেও পারবে।

"সকল স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রের উপাসকদের আশু কর্তব্য হ'বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে এটা যদি প্রাধান্য লাভ না করে তবে সেটা ভুলই হবে। সারা বিশ্বে যে সামাজিক ব্যবস্থা আজ অচল হয়ে পড়েছে তাকেই জোর করে খাড়া রাখতে এই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছে। এর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়বে। তখন ভারতও স্বাধীন হ'য়ে

যাবে, এবং সেই স্বাধীন ভারত মুক্ত জগতের মাঝে আপন আসন করে নিয়ে উচ্চতর সভ্যতা গড়ার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে সক্ষম হ'বে।

"সেই হেতু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের আমাদের সম্বন্ধে যে মনোভাবই থাকুক সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ভারতকে আজ এই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতা করতে হ'বে। ভারতের মুক্তির জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করছেন আজ তাঁদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে পৃথক করে দেখতে হ'বে, এবং এই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সমস্বার্থেই ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হ'বে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিতে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রিবর্গের মাধ্যমে জনগণের এই সহযোগিতা প্রসারিত হ'তে থাকবে।"

(M. N. Roy—*India & War*)

কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ তাঁদের ভুল সংশোধন করতে পারলেন না। ইউরোপ-বিজয়ী ফ্যাসিষ্টদের হাতে নিগৃহীত হ'য়ে ব্রিটিশ কংগ্রেসের দাবী স্বীকার করে নেবে, এই দুরাশার বশবর্তী হ'য়ে কংগ্রেস নেতারা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির ২২শে অগাষ্টের প্রস্তাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল, তাছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারত না। ১৭ই সেপ্টেম্বর নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সমর্থিত হ'ল। গান্ধীজী দু'বার ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন, এবং বললেন, যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালাবার অনুমতি চাই। ভাইসরয় তা দিলেন না। ১৩ই অক্টোবর সব আলোচনার অবসান ঘটল।

ওয়ার্কিং কমিটিও যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালাবার অধিকারের দাবীতে আইন অমান্য আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

পোল্যাণ্ডের পতনের পর থেকে আট মাস ধরে ইউরোপে কাগজে-কলমে ও কথায়-বার্তায় যে যুদ্ধ চলছিল পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সে যুদ্ধের অবসান হয়ে সত্যিকারের যুদ্ধ বাধল। ডানকার্কের ঘটনার পর ব্রিটিশ জনগণ যেমন প্রজ্বলিত হয়ে জেগে উঠল, অন্যদিকে ভারতে যুদ্ধ সম্পর্কে পরস্পর দুই বিপরীত ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

যুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব ক্রমেই বিমুখ হয়ে উঠে পুরোপুরি বিরোধিতার রূপ নিল।

আর, র‍্যাডিক্যালরা, প্রথম থেকেই তাত্ত্বিক ও ফলিত রাজনীতির দিক থেকে এ যুদ্ধকে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ-রূপে দেখে এলেও আশঙ্কিত

ছিল, যুদ্ধ কাগজে-কলমে বাধলেও ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ হয়তো শীঘ্রই এ যুদ্ধ মিটিয়ে সোভিয়েটকেই আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু যখন দেখা গেল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আত্মসমর্পণ করলেও ব্রিটিশ গণতন্ত্র চড়াও হয়ে দেশীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে এই ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত চালাবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে এবং যার জন্যেই কনসারভেটিভ পার্টি পার্লামেন্টে সংখ্যা-গরিষ্ঠ পার্টি হ'য়েও পরম শত্রু লেবার পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বাধ্য হয়েছে, তখন রায়ের নেতৃত্বে র‍্যাডিক্যালরা কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, জনপ্রিয়তার লোভে লুব্ধ না হয়ে, লোকনিন্দাকে তুচ্ছ করে শুধু বিশ্ব ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস কামনায় সর্বস্ব পণ করল।

(M. N. Roy—*India & War*)

রায় প্রত্যেক সপ্তাহে তাঁর নিজ সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'তে লিখে চললেন, নানা সভা-সমিতিতে ভাষণ, আলোচনা ও পত্রাদির সাহায্যে এই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের স্বরূপ ও ভারতের কর্তব্য সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এবং ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪০, যুদ্ধের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র ভারতে ফ্যাসিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করলেন।

এদিকে নেতৃবর্গ রায়কে কংগ্রেস থেকে না তাড়িয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ১৪ই জুলাই কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ অমান্য করে ফ্যাসীবিরোধী অনুষ্ঠান আয়োজনের অপরাধে যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাঁকে বহিষ্কৃত করলেন।*

রায় উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। তখনকার বিখ্যাত ফ্যাসিষ্টবিরোধী জওহরলালকে দিয়েই নেতারা রায়ের বিতাড়ন প্রস্তাব পেশ

---

* ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই গণশক্তি কর্তৃক অত্যাচার ও অবিচারের প্রতীক রূপী বাস্তিল দুর্গের পতন দিবসটি রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রের অভ্যুদয় দিবস রূপে সমগ্র পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ফ্রান্সে প্রথম গণতন্ত্র পরাজিত হ'য়ে পুনরায় কয়েক বছরের জন্যে রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। পুনরায় এই স্বল্পায়ু রাজতন্ত্রের পরাজয়ে ও গণতন্ত্রের জয়ের সংবাদ পেয়ে রাজা রামমোহন তাঁর ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজ থেকে উত্তমাশা অন্তরীপে ফরাসী জাহাজে গিয়ে এই উপলক্ষ্যে ফরাসীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ফরাসী বিপ্লব দিবস গণতান্ত্রিক মানুষের নিকট যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। অথচ রায় ও রায়-বাদীগণকে এই অপরাধেই কংগ্রেসের নিকট থেকে শাস্তি পেতে হ'ল। এর দ্বারাও বোঝা যায় গণতন্ত্রের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের আস্থা ও দরদ কতখানি।—লেখক।

করালেন। রায় এবং বিখ্যাত কয়েকজন র‍্যাডিক্যালকে এই ফ্যাসিষ্ট বিরোধী কাজের জন্তে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা হ'ল।

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস-কমিটি কর্তৃক রায়কে কংগ্রেস সভ্যপদ থেকে এক বছরের জন্তে খারিজ করার প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি অনুমোদন করলেন না। ওয়ার্কিং কমিটির বুদ্ধি বেশী। তাঁরা দেখলেন এক বছর পরে রায়ের কংগ্রেসে ঢোকার পথ খোলা রইল। কিন্তু রায়কে দিয়েই যদি পদত্যাগ পত্র পেশ করান যায়, তা হ'লে চিরতরেই তাঁকে তাড়ান যায়। তা হ'লে আত্মমর্যাদার জন্তে নিজে থেকে আর তিনি কংগ্রেসে আসবেন না। তাঁরা প্রস্তাব করলেন রায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করলে তা গ্রহণ করা হোক। রায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। এই ব্যাপারটি চুকতে অক্টোবর শেষ হ'য়ে এল। মীরাটে লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন-এর কেন্দ্রীয় সমিতির সভা বসল ২৬শে অক্টোবর। সেখানে অতি গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল : লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন-এর সকল সভ্যই কংগ্রেস ত্যাগ করবেন এবং লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন-এর নাম বদলে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পিপল্স পার্টি নাম গ্রহণ করা হবে। ডিসেম্বরে বোম্বাইতে নতুন পার্টির উদ্বোধন হবে।

এইভাবে রায়ের কংগ্রেস পর্বের অবসান ঘটে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রবর্তক রায় বনাম অবৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রবর্তক গান্ধী

১৯২১ সাল থেকেই রায় ভারতে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রবর্তন করেন। সেই থেকেই তিনি পুস্তক-পুস্তিকা, সংবাদপত্র ও রুশিয়ায় ট্রেনিং প্রাপ্ত বিপ্লবীদের সাহায্যে তার প্রসারের চেষ্টা করতে থাকেন।

ব্রিটিশরাজের অবসান ঘটিয়ে যদি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়, যেখানে সকল সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক মুক্তি পাবে, তা হ'লে সকল মানুষকেই তার জন্যে যোগ্য হয়ে উঠতে হ'বে। সাধারণ মানুষের এই যে যোগ্যতা এটা গড়ে উঠবে ঠিক সেই ভাবেই যেমন পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার লোকেরা গড়ে উঠেছিল রেনেসাঁস ও বৈদগ্ধ্যের যুগে। এছাড়া অন্য পথ নাই।

তিনি দেখলেন, ইউরোপ যেমন সহস্র বৎসরের অধিককাল ব্যাপী মধ্যযুগের বর্বরতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল, ভারতও তেমনি সার্ধ-সহস্রাধিক বৎসর ধরে সেইরূপ তমসাচ্ছন্ন যুগের মধ্যেই কাল কাটাচ্ছে। ইউরোপে যেমন যাজক সম্প্রদায় সাধারণ মানুষকে নিরন্তর একটা পাপাতঙ্কে অভিভূত করে রেখে গুরুনির্ভর, ব্যক্তিত্বহীন ও ভূদাসে পরিণত ক'রে রাজা-রাজন্য-জমিদার জোৎদারদের সঙ্গে একযোগে শোষণ-শাসন চালিয়ে তাদের ভীতিবিহ্বল এক জন্তুতে পরিণত করে রেখেছিল, ভারতেও ঠিক তেমনই ছিল।

ভারতের যখন এই অধঃপতন ঘটেনি তখন সে বিদেশী শত্রু শক হুণদের বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু অন্ধকার যুগে ঠিক ইউরোপের তমসাচ্ছন্ন যুগের মতই বিদেশ থেকে যে শত্রু এসেছে সে সহজেই ভারত জয় করেছে। এ ছাড়া দেশের মধ্যে রাজায়-রাজায় নিরন্তর দ্বন্দ্ব-কলহ সাধারণ মানুষকে স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলতে দেয় নি। জমিদার-মহাজনের আর্থিক শোষণ-শাসন ছাড়াও চলেছে ব্রাহ্মণ ও যাজক সম্প্রদায়ের অত্যাচার; এর ওপরে জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বালবৈধব্য, নানা সামাজিক কু-প্রথা, পাঁজি-পুথি, হাঁচি-টিকটিকির শতসহস্র বিধিনিষেধ সাধারণ মানুষকে নিরন্তর ভীত সন্ত্রস্ত এক ভারবাহী পশুস্তরেই আবদ্ধ করে রেখেছে। গোবর-গাদায় যেমন গুবরে পোকা, মশা, মাছি জন্মায়, প্রাণশূন্য দেহে যেমন কৃমিকীট জন্মায়, ভাগাড়ের ভোজের গন্ধে যেমন শেয়াল, কুকুর, কাক, শকুনের দল ছুটে আসে, ঠিক তেমনি ভারতের নিঃসাড় গণ-সমাজেও দেশী-বিদেশী নানারূপের শোষক-শাসক জন্মিয়েছে, ভোজের গন্ধে ছুটে এসেছে, ভিড় জমিয়েছে।

অতএব শুধু গুবরে পোকা, মশা, মাছি, শেয়াল, কুকুর, কাক, শকুন তাড়ালেই চলবে না, যতক্ষণ না দেহে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে, পচন নিবারিত হচ্ছে, ততক্ষণ একদল শোষক তাড়ান হ'বে, অপর একদল আসবে—শোষণ বন্ধ হ'বে না।

ইউরোপের গণ-সমাজে প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল রেনেসাঁসের যুগে। এর ফলে সংসার-সমাজ সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভঙ্গির এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। তারা সংসার-সমাজকে একান্তই লৌকিক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। তারা বোঝে যে, লৌকিক ও প্রাকৃতিক নিয়মকে কলাকৌশলের সাহায্যে মানুষই প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর ঘটিয়ে ধন-সম্পদ গড়ে তুলেছে এবং মানুষ এই ভাবেই নিজ ভাগ্য গড়ে চলেছে। পরকাল, স্বর্গ, নরকের গল্পের দ্বারা, পাপাতঙ্কে মানুষকে নিরন্তর ভীত, সন্ত্রস্ত করে রাখা যাজক সম্প্রদায়ের শোষণ-শাসন চালাবার ফন্দি মাত্র। ইউরোপে ধর্মশাস্ত্রের ফাঁকিবাজি ধরে দিয়ে নতুন দর্শনের পত্তন করেছিলেন রেনেসাঁসের ও বিদগ্ধ যুগের পণ্ডিতেরা। রায় বললেন, ভারতের জনগণ যদি শোষণ-শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় তবে তার দেহে প্রাণ সঞ্চার ক'রে সমাজ ও ব্যক্তির জীবন থেকে পচন নিবারণ করতে হবে। ভারতেও রেনেসাঁস ঘটাতে হ'বে। সেকথা তিনি তাঁর *India in Transition* পুস্তকে লিখলেন।

অবশ্য ভারতের এই প্রয়োজনের কথা রায়ই প্রথম বুঝলেন না। তাঁর পূর্বেও বুঝেছিলেন—রামমোহন, ডিরোজিও পরিচালিত ইয়ং বেঙ্গল দলের যুবকরা, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষিরা। সুরেন ব্যানার্জি, দাদাভাই নৌরজি, ডব্লু. সি, ব্যানার্জি প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা।

কিন্তু ভারতীয় রেনেসাঁসের স্রোত অব্যাহত রইল না, বাধা পড়ল।

ভারতীয় রেনেসাঁসেরই তৈরি মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক প্রমুখ দেশভক্ত মনীষী, ও মানব প্রেমিকরা সাধারণ মানুষের দুঃখে, জাতীয় অবমাননায় এতই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন যে, অবিলম্বে ভারতের জনগণকে ইউরোপের সাধারণ মানুষের মত শক্তিমান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হ'য়ে ওঠবার জন্যে আহ্বান জানান।

তাঁরা সেই সঙ্গে এও দেখলেন যে, সুদীর্ঘকাল অন্ধ তমসাময় যুগে বাস করার ফলে জনসাধারণের আধুনিক কালের মূল্য বোধ এতই কম যে, নাই বললেই হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বলতে কী বোঝায়, ব্যক্তির অধিকার কী বস্তু, popular sovereignty, rule of law, right to private property প্রভৃতি অধিকার-বোধ এদেশের পক্ষে এতই অবাস্তব যে, এ সম্বন্ধে কারুর কোন ধারণাই নাই। আছে কেবল ধর্মান্ধতা ও অদৃষ্টবাদ। অদৃষ্ট ছাড়া, পূর্বজন্মের সুকৃতি ছাড়া, গুরু-পুরোহিতের আশীর্বাদ ছাড়া, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া, কোন মানুষেরই কিছু হবার যো নাই, মানুষের নিজের কিছুই করণীয় নাই,—আছে কেবল এই ধারণা। এ ছাড়া বিশেষ কিছুই বোঝে না। যেটুকু বোঝে তাও ধর্মের ভাষায়। অর্থনীতি, গার্হস্থ্যনীতি সবই চলে পাঁজিপুঁথি দিয়ে। এইসব দেখে এরা সিদ্ধান্ত করে বসলেন, "ভারত ধর্মের দেশ, ধর্মের মাধ্যম ছাড়া এ দেশে কিছু হবে না।" এই মনে করে মহা ভুলই করলেন। কারণ এঁরা বুঝলেন না, যে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁরা উদগ্রীব, সে কল্যাণ এ পথে আসবে না। ইউরোপেও তা আসে নি—আসতে পারে না। যে কারণের ফলে রোগের উৎপত্তি সেই কারণকে দূর না করে তাকে লালন করলে রোগ সারে না। রেনেসাঁসের আগে ইউরোপও ধর্মের দেশ ছিল। তবু সেখানে রেনেসাঁস এল। অবশ্য রেনেসাঁসের প্রথম যুগে ধর্মের সঙ্গেই মিশে ছিল লৌকিক চিন্তাধারা। সেই মুমূর্ষু ধর্মীয় চিন্তাধারা পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে উঠল রিফরমেশন আন্দোলনে। রিফরমেশনের যুগে গোঁড়ামি আরো প্রকট হয়ে উঠল—রেনেসাঁসকে কয়েকশ বছর পিছিয়ে দিলে। শেষ পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদগ্ধ্যের যুগের মনীষীরা এই প্রতিক্রিয়াকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কারকে, অন্ধবিশ্বাসকে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও অধ্যাত্ম চিন্তাধারাকে সরাসরি সম্মুখ আক্রমণ করেই, যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিন্তা করবার পদ্ধতির প্রচলন করেই তাঁরা জন মানসে প্রাণ সঞ্চার ক'রে সমাজ দেহের পচন নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে প্রাণহীন সমাজ দেহপুষ্ট শৃগাল

শকুনের দল লুপ্ত হয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক শিক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের মনীষী ও দেশ-প্রেমিকরা গ্রহণ না করে ঐতিহাসিক ভুল করলেন। ফলে ইতিহাসের গতি সোজা পথ না ধ'রে বেঁকে গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ দেশ-প্রেমিকরা ধর্মের ভাষায় রাজনীতির কথা ব'লে লোকের মধ্যে সাড়া জাগালেন ঠিকই এবং তাদেরই অনুগামীরা তাঁদেরই অনুসৃত পথে ধর্মের ভাষাতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরই সাহায্যে ব্রিটিশের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতাও পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার ফল যে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল তা দেখতে তাঁরা রইলেন না। আজ থাকলে তাঁরা দেখতেন, তাঁদের বড় আদরের সাধারণ মানুষ দুঃখ দুর্দ্দশায় অধঃপতিত জীবন থেকে আজও মুক্ত হয় নি, বরং এক ব্যাপক দুর্নীতি পরায়ণতার গভীর পঙ্কে তারা নিমজ্জিত হয়ে আছে।

যাঁরা রেনেসাঁসের মানুষ নয়, যাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোড়া ভারতের ভক্ত, তাঁরা বঙ্কিম, বিবেকানন্দর লোকায়ত দিকটি চাপা দিয়ে ধর্মীয় দিকটিই তুলে ধরলেন এবং এভাবে তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে তাঁদের হত্যাই করলেন।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের ধর্মীয় পথই যে একমাত্র পথ সেই বিশ্বাসে সেই যুগের নেতারাও অন্ধবিশ্বাস, ধর্মের দোহাই, গুরুবাক্য, দৈবাদেশ, শাস্ত্রীয় নির্দেশ প্রভৃতির সাহায্যে রাজনীতি চর্চ্চা সুরু করলেন। এই পদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা পারদর্শিতা দেখালেন গান্ধীজী। ১৯২০-২১ সালে সমগ্র ভারতের জনগণ গান্ধীজীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্যে নয়, অবতার দর্শন মানসে, পাপে পূর্ণ জীবনে কিঞ্চিৎ পুণ্য লাভের আশায়। গান্ধীজী তাদের নিয়ে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক কৌশলে তাঁর রাজনৈতিক লীলা-খেলা খেলে চললেন। ব্রিটিশের উপর এক-আধটুকু চাপও দেন—আবার দর কষাকষিও চালান।

পক্ষান্তরে, রায়ের চাঁছা ছোলা কথা, বৈজ্ঞানিক রাজনীতির কথা। কিন্তু তা কেউ বোঝেও না, শোনেও না। তথাপি রায়ের প্রত্যয়ের শেষ নাই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, জনগণের জাগরণ আসবে না, তারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়বে না, যতদিন না তাদের ব্যক্তিত্ব বোধ জাগছে, এবং তা' গান্ধীজীর পথে জাগবে না, বরং আরও ঘুমিয়ে পড়বে, আরও শোষণ শাসনের বঞ্চনার পথ উন্মুক্ত করে দেবে। গান্ধীজী হয়তো জনসাধারণের সাহায্যে ব্রিটিশের হাত থেকে

রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে পারেন কিন্তু তাতে জনসাধারণের মুক্তি তিনি আনতে পারবেন না। সে ক্ষমতা ধনী বণিক ও ক্ষমতা-লোভীদের হাতেই রয়ে যাবে, জনসাধারণ যেভাবে শোষিত হচ্ছে সে ভাবেই শোষিত হ'তে থাকবে। কারণ তাদের লৌকিক প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন বোধ নাই, দেশের আর্থিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর তাদের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে তারা আসছে না। তারা এসেছে অবতার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। একটুখানি পাদোদক ও কণিকামাত্র প্রসাদ পেয়েই তারা 'জয় মহাত্মাজীকি জয়' বলে ঘরে ফিরবে খালি পেটে। উপবাস ত' দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। গান্ধীজী Cannon fodder-এর মত, যুদ্ধের বলি হিসাবে তাদের কাজে লাগাচ্ছেন।

রায়ের মুখে সেই এক কথা। জনগণের মুক্তির একমাত্র উপায় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার অনুশীলন, বৈজ্ঞানিক রাজনীতির চর্চা। ভারতে যতদিন না রেনেসাঁস আসছে ততদিন জনগণের মুক্তি আসবে না। তাঁর আদর্শ যখন প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি, তখন তাঁকে সেইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে গোড়া থেকে কাজ করতে হ'বে—তাঁকে রেনেসাঁস আন্দোলন করতে হবে এবং তার সিদ্ধিতেই তাঁর মহান উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'বে।

তিনি রেনেসাঁস আন্দোলনের কর্তব্য সম্বন্ধে বললেন:

মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান। গুরুবাক্য, দৈবাদেশ, শাস্ত্রীয় নির্দেশ কিংবা অভ্যস্ত ধারণার বদলে প্রমাণিক তথ্যসংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণ, জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান। দর্শনের কেন্দ্র থেকে ঈশ্বরকে ক্রমে হটিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় প্রকৃতি (Nature) এবং মানুষের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং বিচিত্র সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির আত্মবিকাশ রেনেসাঁসের অন্যতম মূল সাধনা। ব্যক্তিজীবনে ভোগের সম্পদ বাড়ানো, সেই সম্পদ সম্ভোগের সুযোগ সকলের জীবনে এনে দেওয়া এবং তার পথে যে সব বাধা আছে তার অপসারণ। অতীতের জঞ্জালের নীচে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাপা না দিয়ে অতীত সংস্কৃতির যেটুকু ব্যক্তির বিকাশে সাহায্য করতে সক্ষম রেনেসাঁস তারই পুনরুদ্ধার ক'রে তা গ্রহণে আগ্রহী। তেমনি সাংস্কৃতিক সম্পদ বাড়াবার প্রয়োজনে রেনেসাঁসী মন নিজের দেশ এবং জাতির গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র জগত থেকেই পুষ্টির উপাদান সংগ্রহে অধ্যবসায়ী।*

* শ্রীশিবনারায়ণ রায়—'মৌমাছিতন্ত্র' দ্রষ্টব্য।

তিনি বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-গান্ধী প্রমুখ নেতাদের পথ সাধ্য-সাধন তত্ত্ব-বিরোধী। যেমন সাধনা তেমনই সিদ্ধি—যেমন বৃক্ষ তেমন তার ফল।

এঁদের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে দুঃখ-দুর্দশা দারিদ্র্য ও অধঃপতন থেকে মুক্ত করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির পথে তুলে ধরা। কিন্তু যে মধ্যযুগীয় অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, অদৃষ্টবাদ, গুরু-পুরোহিতবাদ জনসাধারণের এই অবস্থার কারণ-স্বরূপ সেই কারণকেই পুষে রাখলে অন্যরূপ ফল ফলবে কী করে। যে পথে গান্ধীজী চলেছেন তাতে ব্রিটিশ শোষক-শাসক চলে গেলেও ভারতের মূক-মূঢ় জনগণকে শোষণ করতে পুনরায় শোষক-শাসকের অভাব হবে না।

রায়ের এই বিশ্লেষণ যে কতদূর সত্য তা আজকের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে।

আজ (১৯৬৫) আঠার বছর ভারত স্বাধীন হ'য়ে গান্ধীজীর অনুগামীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট বাড়ছে বই কমছে না। অশন-বসনের দুঃখটাই বড় নয়। এ অভাব হয়তো অচিরেই মিটবে, কিন্তু যেটি সহজে পূরণ হ'বে না তা হচ্ছে সমাজে নৈতিক জীবনের একান্ত অবলুপ্তি। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণতা এই রূপ ব্যাপক হলে জনসাধারণের অশন-বসনের দুঃখও ঘুচবে না।

গান্ধীজী তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সকল সময়েই অন্যায়ের সঙ্গে, বিপরীত শক্তির সঙ্গে রফা করেছেন। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, আত্মশক্তিতে অনাস্থা প্রভৃতি যে জনগণের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার কারণ, যে কারণে ভারতের এই অবনতি ও অমর্যাদা তা জেনেও তিনি জনগণের আস্থা ভাজন হওয়ার জন্যে তাদেরই দোষ-ত্রুটিকে তাদের দুঃখ দুর্দশার মূল কারণগুলিকেই সমর্থন করে এসেছেন, তোষণ করে এসেছেন, মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। তারপর একথাও তাঁর অজানা থাকার কথা নয় যে, দেশীয় ধনী, জমিদার, মহাজনরা চিরকাল জনগণের শত্রু। তাদের এই শোষণ-শাসন সব সময়েই অন্যায় এবং দুর্নীতিপরায়ণতার সামিল। তথাপি তিনি তাদের আর্থিক সাহায্যে, নেতৃত্বের আসনে তাদেরই বসিয়ে জনগণের মুক্তি আনতে চেয়েছেন। এই ধনীরাই অসৎ উপায়ে অর্জিত টাকার জোরে ভুয়া সদস্যের সাহায্যে ১৯২১ সাল থেকেই কংগ্রেস দখল করে রেখেছে। প্রকৃত জনসেবক পাত্তা পায় নি। গান্ধীজী এ সব কথা জানতেন। এই ভুয়া সদস্য ধরবার জন্যে

কংগ্রেস সদস্যদের সাপ্তাহিক সভার বাধ্যতামূলক অধিবেশন ও উপর্যুপরি ছয়টি সভায় অনুপস্থিত হ'লে সদস্যপদ নাকচের যে প্রস্তাব রায় বার বার কংগ্রেসে গ্রহণের জন্যে পেশ করে এসেছেন এবং গান্ধীজীর নির্দেশে তা যে গৃহীত হয়নি, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, গান্ধীজী চাইতেন জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি যেন কংগ্রেসে কোনও দিন না আসে—ধনীরা, ধনীদের এজেন্টরা যেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে কায়েম থাকে। ধনীদের তিনি চিরকালই দরিদ্রের ট্রাষ্টিরূপে দেখে এসেছেন। যেহেতু তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের নাবালক ও নিজ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম বলে মনে করতেন।

এই দুই পদ্ধতিই সাধ্য-সাধন নীতির অভাব জনিত দোষে দুষ্ট। এবং এই জন্যই সেই বিষবৃক্ষের এই বিষম ফল। গান্ধীজী মানবপ্রেমিক, হিতবাদী, ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তাঁর দান যুগান্তকারী, তাঁর উদ্দেশ্যের সততা, উদ্যম, অথবা সংগঠন শক্তি খুবই প্রশংসনীয় এবং ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান। কিন্তু এই যে তাঁর অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিষম ও বিপরীত শক্তিসমূহের সঙ্গে রফা ও হাত মেলানো, যে জন্যে তাঁকে এই পথ ও পদ্ধতি নির্বাচনে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের নীতি লঙ্ঘন করতে হয়েছে এবং যার অনিবার্য ফলস্বরূপ বর্তমান ভারতের ব্যাপক ও গভীর নৈতিক অধঃপতন ও জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা, তা স্ববিরোধী। এ সবের পরিমাণ বেশী, না, গান্ধীজী যে উপকার করেছেন তার পরিমাণ বেশী এ জিনিষ মেপে দেখার কোন যন্ত্র নাই, থাকলে দেখা যেত।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, "গান্ধীজীর অবৈজ্ঞানিক রাজনীতি দিয়েও যখন স্বাধীন হওয়া গেছে তখন তিনি যে বৈজ্ঞানিক রাজনীতি করেন নি সে ইতিহাস নিয়ে হৈ চৈ করা নিরর্থক; আসলে, সেই ভাল যার শেষ ভাল; গান্ধীজী যখন জিতেছেন তখন তার সব ভাল।" এ মত যাঁদের, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই বলা যায় প্রথমতঃ গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা আসেনি, তাঁর প্রচেষ্টায় কংগ্রেস পার্টি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, গান্ধীজীর জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ইতিহাস শেষ হয়ে যায় নি, মানুষের ইতিহাস এখনো চলবে লক্ষ কোটি বৎসর ধরে—যতদিন না সূর্যের আগুন নিভছে। সুতরাং অতীতে যেমন যুক্তিবাদের পথে চলেই মানুষের স্থায়ী প্রগতি সুখ ঐশ্বর্য লাভ হয়েছে, ভবিষ্যতেও যুক্তিবাদের পথে চলেই তা লাভ করতে হবে। ম্যাজিকের দ্বারা কাকতালীয়বৎ কোন কিছু লব্ধ হ'লেও

ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্ত হয় না বা হবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না, অথচ ঘটনা ঘটবার নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে সংসার সমাজ চলে না, এবং বৈজ্ঞানিক রাজনীতি ও সমাজনীতির ফলেই ইপ্সিত ঘটনা ঘটবার নিশ্চয়তা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে যদি ভারত যুক্তিবাদী রাজনীতি ও সমাজনীতি গ্রহণ না করে তবে ভারত পুনরায় অবনতি, লাঞ্ছনা ও দুঃখের পথে পিছিয়ে যাবে। অতএব ভবিষ্যতের জন্যেই আমাদের সাবধান হ'তে হবে।

স্বাধীন ভারতে এই কয় বছরের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা এমনই ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠেছে যে, তাতে এ জাতি বাঁচবে কিনা সন্দেহ। হয়তো বেঁচে থাকবে যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ না হয়; যেমন বেঁচে থাকত অতীত ভারতের অনেক দুর্নীতিপরায়ণ রাজাদের রাজ্য—আর নিমেষে ভেঙ্গে পড়ত বহিঃশত্রুর আক্রমণে।

ভারত আজ বহিশত্রুর আক্রমণের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। নেহেরুকে ধন্যবাদ যে, তিনি নিজেদের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৬৩ সালের জুলাই ও আগষ্ট মাসের সংবাদপত্রে প্রকাশিত গান্ধীজীর অনুগামীদের দুর্নীতি-পরায়ণতার বিবরণ থেকেই বোঝা যায়, এই দেশব্যাপী দুর্নীতি-পরায়ণতার উৎস কোথায়। মাত্র কয়েক দিনের সংবাদ পত্র থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।

১৯৬৩ সালে ১১ই অগাষ্ট তারিখে "যুগান্তর লিখছেন :

"মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী কামরাজ নাদারের অনেক দিনের ধারণা যে, কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে আজকাল একটি মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছে—সেই ব্যাধি হ'ল সহকর্মীদের মধ্যে ঈর্ষা। এই ঈর্ষাই দলের যত সমস্যার সৃষ্টি করছে।

"কিন্তু কেন এই ঈর্ষা? এই প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলেন দিন কয়েক আগে ইন্দোরে এক সভায় শ্রীসঞ্জীবায়ার ভাষণের শ্রোতারা। কামরাজ যা স্পষ্ট করে বলেন নি, কংগ্রেস সভাপতি তা জানিয়ে দিয়েছিলেন অপ্রত্যাশিত স্পষ্ট ভাষায়। কংগ্রেস কর্মীদের অনেকেই, ১৯৪৭ সালে যারা কপর্দকহীন ছিল, আজ স্বাধীনতার ষোল বছরে লক্ষপতি-কোটিপতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই যে বিপুল সম্পত্তি তারা গড়ে তুলেছে, এই আয়ের কোনো সূত্রও সাধারণতঃ দেখা যায় না।"

১৩ই অগাষ্টের আনন্দবাজার পত্রিকা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের "দর্শকের ভূমিকায়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখছেন :

"এই অধিবেশনে দু'টি ঐতিহাসিক উক্তি প্রচুর কৌতুক ও ক্রোধের সৃষ্টি

কমে। দু'টি উক্তিই বিশিষ্ট নেতার মুখ নিঃসৃত। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিল শ্রীকামরাজ নাদার সম্বন্ধে বলেন, তিনি হচ্ছেন মুখ্য মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে কম অসাধু। শুনে শ্রোতৃবৃন্দ হেসে ওঠেন, কিন্তু শ্রীপাতিল হাসেন না। তার অর্থ তিনি সজ্ঞানেই উক্ত উক্তি করেছেন। শ্রীহনুমন্তিয়ার (মহীশূরের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী) উক্তিটি হচ্ছে: কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন, তিনি লক্ষ টাকা খরচ করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, কোটি টাকা খরচ করলে ভারতের প্রধান মন্ত্রীও হ'তে পারেন।"

১৪ই অগাষ্টের যুগান্তর "রাজধানীর চিঠিতে" লিখছেন:

"এ, আই, সি, সি, অধিবেশনে কামরাজের প্রস্তাবের সমর্থন করতে উঠে একজন, যিনি মন খুলে কথা বলেছেন, তিনি পুরানো কংগ্রেস কর্মী শ্রীমহাবীর ত্যাগী।* 'কংগ্রেসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ৪০।৪২ বছরের।' তাঁর বক্তব্য হ'ল কামরাজ প্রস্তাব টনিক হিসাবে হয়তো ভাল, কিন্তু এটি রোগের দাওয়াই নয়। কংগ্রেসের মূল রোগ হ'ল ভুয়া সদস্য। যে যত বেশী ভুয়া সদস্য সংগ্রহ করতে পারে কংগ্রেসে তার প্রতাপ তত বেশী। এ, আই, সি, সি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, কি মণ্ডল কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনে এক-একজন প্রতিনিধি হাজার হাজার টাকা খরচ করে থাকেন। শ্রীত্যাগী বলেন যে, তিনি তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত এবং তাঁর আশঙ্কা, আগামীবার হয়ত এ, আই, সি, সি,-তে নির্বাচিত হ'তে পারবেন না, কারণ (১) তিনি ভুয়া কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ করেন নি এবং (২) তাঁর অর্থবল নেই।"

এই তিনটি উদ্ধৃতি থেকে এটা অতি স্পষ্ট যে, আজকে এই দুর্নীতির মূল কোথায়? ফলেন পরিচিয়তে—ফল দেখেই যদি গাছের বিচার হয়, সিদ্ধি দিয়েই যদি সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়, উদ্দেশ্য দিয়ে যদি উপায়ের সন্ধান মেলে, তাহ'লে এই বিষম ফলের জন্যে যে বিষবৃক্ষের প্রয়োজন তা আগেই রোপিত হয়েছিল বলে ধরতে হবে, এবং তা যে হয়েছিল সে প্রমাণ শ্রীত্যাগীর স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যাবে।†

এই সঙ্গে এ কথাও মনে জাগে, ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত রায়ের

---

* বর্তমানে পুনর্বাসন মন্ত্রী।

†১৯৬৫ সালে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখার্জিও তদানীন্তন প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিকাংশের বিরুদ্ধে এই জাল সদস্য সংগ্রহের অভিযোগ আনেন।

বৈজ্ঞানিক রাজনীতি, তাঁর রেনেসাঁস আনার পুনঃ প্রচেষ্টা যে ফলবতী হ'ল না, তার প্রধান কারণ গান্ধীবাদী রাজনীতি হলেও কমিউনিষ্ট পার্টিও এর জন্যে কম দায়ী নয়। ষ্ট্যালিনের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে তারা বরাবর কাজ ক'রে এসেছে। কোন্ নীতি অনুসারে চললে ভারতের জনগণের কল্যাণ হবে, তারা তা কোন দিন ভেবে দেখেনি। তারা রায়ের নামে নানারূপ মিথ্যা কুৎসা রটনা করে ভারতের শিক্ষিত মানুষ ও রায়ের মধ্যে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে যে রায়ের কথা আর তাদের কাছে পৌঁছায় না। ফলে দেশে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির চর্চা, রেনেসাঁসী চিন্তাধারা আর দেশে বিস্তার লাভ করে না।

ইউরোপে ষ্ট্যালিনের নির্দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে সকল চিন্তাশীল, সাহসী ও সৎব্যক্তিদের বিতাড়িত করা হয়। বিশেষতঃ জার্মানীতে ব্র্যাণ্ডলার প্রমুখ ব্যক্তিগণকে বিতাড়িত ক'রে পার্টির উত্তমাঙ্গকেই বিচ্যুত করা হয়, এবং জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে শত্রুতা করে শ্রমশীল নরনারীর মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করা হয়। ফলে হিটলারের অভ্যুদয় ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অনুরূপ ভাবেই ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্যেও দেশে প্রতিক্রিয়াশীল, জন-স্বার্থবিরোধী, সমাজবিরোধী, ক্ষমতালোভী, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের দেশের নেতৃত্বের আসন থেকে সেদিন দূরে রাখার চেষ্টা বহুগুণে দুর্বল হয়ে যায়। ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, "গর্দান যাবার ভয়ে তিনি ষ্ট্যালিনের অনাচার মুখ বুজে সহ্য করে এসেছিলেন", কিন্তু সেদিন ব্রিটিশ ভারতের কমিউনিষ্টদের গর্দান নিতে ষ্ট্যালিনের হাত পৌঁছত না। তথাপি কিসের মোহে, কার লোভে তারা ষ্ট্যালিনভক্ত হয়েছিলেন? এর একমাত্র উত্তর—ষ্ট্যালিন প্রেরিত চাঁদির লোভে এবং তা যে কত সত্যি তা চীনপন্থী ও রুশপন্থী কমিউনিষ্টদের বিবাদেই জানা যায়।

কমিউনিষ্ট পার্টি ষ্ট্যালিনের স্বার্থে যদি নিজেদের বিকিয়ে না দিত, দেশে যদি বৈজ্ঞানিক রাজনীতি চর্চার ব্যবস্থায়, রেনেসাঁসী চিন্তাধারার প্রবর্তন-প্রচেষ্টায় যদি রায়ের সঙ্গে হাত মেলাত তা হ'লে হয়তো গান্ধীজীর প্রভাব ব্যর্থ হয়ে যেতে পারত। হয়তো তখন বর্তমানের স্বার্থান্ধ দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা আসত না। জনগণ রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সত্যিকারের জনস্বার্থ রক্ষাকারী সৎ প্রতিনিধি পাঠাতে পারত। জনসাধারণের অজ্ঞতার

সুযোগে এইরূপ অনাচার-অত্যাচার চলত না। সেদিন যারা রায়ের কর্মসূচীর বিরোধিতা ক'রে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন, এতকাল পরে জীবনভোর নিষ্ফল রাজনীতির শেষ বেশ সত্যাগ্রহ করে* কংগ্রেসের প্রতি অক্ষম আক্রোশ প্রকাশ করতে হ'ত না। শতকরা ৬০ জনের গড় মাথা পিছু আয় দৈনিক তিন আনার শোকে পার্লামেণ্টের কালো পাথরে মাথা কুটতে হত না।

বড় কাজের বাধাও বড়। সেই বৃহৎ বাধা ঠেলেই রায় কংগ্রেস ত্যাগ করে তাঁর উদ্দেশ্যের পানে দৃঢ় পদক্ষেপে চললেন—পিছনের দিকে না তাকিয়েই। আমরা জানি, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল, একলা চল, একলা চলরে"—গানটি তার বড় প্রিয় ছিল।

* তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি প্রতি বছরেই মাস কয়েক কোন না কোন উপলক্ষে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে আসছেন সেই কথা বলা হচ্ছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জার্মানীর রুশ আক্রমণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে রায়

১৯৪০ সালের ৭ই নভেম্বর রুশ বিপ্লব স্মরণ দিবসের বার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করবার জন্যে রায় জনগণের নিকট আহ্বান জানালেন এবং ধ্বনি তুললেন :

১। ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হোক ;

২। ইংল্যাণ্ড ও ভারতের ফ্যাসিষ্ট এজেণ্টরা নিপাত যাক ;

৩। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে সমর্থন কর ;

৪। দুনিয়ার গণতন্ত্র এক হও ;

৫। এই যুদ্ধকে জন-যুদ্ধে পরিণত কর ;

৬। সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ ;

৭। নিখিল বিশ্ব ফ্যাসিবিরোধী সংঘ গড়ে তোল।

রায় এই উপলক্ষে ভারতের জনগণকে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতে বললেন :

"সোভিয়েট সরকারের যে নীতির ফলে ফ্যাসিষ্টদের পূর্বাভিমুখী আক্রমণ ও সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা নিবারিত হয়েছে সেই নীতিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানান হচ্ছে। সেই সঙ্গে বলকান রাজ্যসমূহের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের আশু সম্ভাবনায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমগ্র এসিয়ার উপর যে বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে তার জন্যেও গভীর উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সক্রিয় হস্তক্ষেপের দ্বারাই এই সর্বনাশ নিবারিত হ'তে পারে, এই বিশ্বাসে সোভিয়েট সরকারকে অবিলম্বে নাৎসি জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্যে অনুরোধ জানান হচ্ছে। এই সঙ্গে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রতি আবেদন জানান হচ্ছে, তারা যেন অনতিবিলম্বে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়ায় আসেন, যার ফলে এংলো-সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি সম্ভব হয়। তখন এই চুক্তির

উপর ভিত্তি করেই সারা দুনিয়ায় এক নিখিল বিশ্ব-ফ্যাসিবিরোধী সংঘ গড়ে উঠবে* এবং সেই সংঘে ভারত ও চীনের জনগণের সানন্দে যোগদানের ফলে এই সংঘ বিপুল শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে উঠবে।" (I. I., 27. 10. 40)

তত্ত্বের দিক থেকে এবং বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, জার্মানীই রুশিয়া আক্রমণ করবে। তিনি অক্টোবরের শেষেই লিখলেন:

"পৃথিবী যখন ইংল্যাণ্ডের উপর নাৎসি আক্রমণের জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত তখন থেকেই আমরা বলে আসছি, 'ইংল্যাণ্ড আক্রমণ' একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র। যুদ্ধের জয়পরাজয় রুশ-জার্মানির মধ্যে পূর্ব-রণাঙ্গনেই হ'বে। জার্মানীর ইংল্যাণ্ড আক্রমণ সফল হ'বে না।"

রয়টারের এক খবর উদ্ধৃত করে তিনি নিজের যুক্তিকে সমর্থন করে বললেন: "নাৎসি মহলের বিশ্বাস, তারা ১৯৪১ সালে রুশ আক্রমণ করবে। রুশ-জার্মান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।" (I. I, 27 10. 40)

কিন্তু সকল দেশের সংবাদপত্রই সাম্রাজ্যবাদী ও ধনীদের কুক্ষিগত। তখনো সমানে সোভিয়েট বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন চলতে থাকল। রায় তারই বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম চালিয়ে চললেন। ৩রা নভেম্বর তিনি লিখলেন:

"সুতরাং বর্তমানের আন্তর্জাতিক বিরোধ, আজ হোক কাল হোক, ফ্যাসিষ্ট শক্তির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধে পরিণতি লাভ করবে।"

(I. I., 3. 11. 40)

প্রতি সপ্তাহেই তাঁর এই অনুমান যে মিথ্যা নয়, তিনি তা তাঁর কাগজে বহু প্রমাণ ও নজির তুলে প্রতিপন্ন করে চললেন।

* এইখানে স্মরণীয় যে, পরবর্তী জুন-জুলাই-এ রায়ের আশানুরূপ এ্যাংলো-সোভিয়েট চুক্তিও হয়েছিল এবং বিশ্ব ফ্যাসিবিরোধী সংঘও গড়ে উঠেছিল। —লেখক।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি

রায়ের সভাপতিত্বে ১৯৪০ সালের ২১শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পিপল্‌স পার্টির প্রথম সম্মেলন বসল।

রায় সভাপতির ভাষণে বললেন: "যে পার্টির আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে তার প্রয়োজন বিশ বছর আগে থেকেই অনুভব করা যাচ্ছিল। গত বিশ বছর ধরে যে গণ আন্দোলন মুক্তি ও প্রগতির আদর্শ লাভের জন্যে দানা বেঁধে উঠছিল, আজকের এই র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পিপল্‌স্ পার্টিতে তা মূর্ত হয়ে উঠল। ভারতের অগণিত জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার সামাজিক বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্বের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আজ এই পার্টির উদ্ভব।"

সম্মেলনে পার্টির নাম র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পিপল্‌স পার্টির পরিবর্তে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি রাখা হ'ল।

গত বিশ বছর ধরে তিনি যে বৈপ্লবিক নীতি ও কৌশল কংগ্রেসকে গ্রহণ করিয়ে ভারতের যুগপৎ তিনটি বিপ্লব—দার্শনিক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করে আসছিলেন, সেই একই বৈপ্লবিক নীতি ও কৌশলের উপর এই পার্টি স্থাপিত হ'ল।

সেই প্রাথমিক পল্লী গণ-পঞ্চায়েৎ গঠন করে সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে গণ-সম্মেলন ও গণ-পরিষদের মধ্যে দিয়ে ১৮টি মূল নীতির ভিত্তিতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র রচনা করা র‍্যাডিক্যাল পার্টির আশু উদ্দেশ্য হ'ল।

যে কথা এই ক'মাস ধরে বলে আসছিলেন এখানেও রায় সেই কথাই বললেন: আজ জগতে মরণোন্মুখ ধনতন্ত্রবাদ উলঙ্গ ফ্যাসিষ্ট মূর্তিতে সারা দুনিয়ার গণতন্ত্র

ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। ফ্যাসিষ্ট শক্তির জয়ে সর্বাপেক্ষা ক্ষতি জনগণের। পক্ষান্তরে যদি ফ্যাসিষ্ট শক্তি পরাজিত হয় তবে মরণোন্মুখ ধনতন্ত্রের বাঁচবার শেষ আশা লুপ্ত হ'য়ে জগতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, সারা দুনিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকবাদ লোপ পেয়ে সমস্ত পরাধীন জাতি মুক্তি পাবে। সুতরাং এই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ প্রচেষ্টা আজ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে। এই যুদ্ধে ফ্যাসি বিরোধী শক্তিরা জিতলে ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্যরূপেই এসে যাবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন জাতিরাও স্বাধীনতা পাবে। অতএব এই ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্যে জনগণকে সর্বস্ব পণ করে লড়তে হ'বে।

আজ জার্মানী রুশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণের চুক্তি করেছে—সেই সঙ্গে ইটালি জাপানের সঙ্গে কমিউনিষ্ট বিরোধী চুক্তিও করেছে। অতএব এটা নিশ্চিত, যে মুহূর্তে পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধের চাপ কমবে, সেই মুহূর্তেই জার্মানী রুশিয়া আক্রমণ করবে। কারণ জার্মানী একই সঙ্গে দুই দিকে যুদ্ধ করতে পারে না। এই আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিষ্ট শক্তির নেতা জার্মানী ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী শক্তির নেতা রুশিয়াকে যদি আক্রমণ না করে তবে তার সকল জয়, সকল যুদ্ধই অর্থহীন হয়ে যাবে।

আর রুশিয়া জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করেছে জার্মানীর সঙ্গেই লড়বার প্রস্তুতির জন্যে প্রয়োজনীয় সময় লাভের উদ্দেশ্যে। (I. I., Jan. Issues 1941—Reports & Proceedings of the Conference)

এই যুক্তির বলেই রায় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে দিয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সমর্থন করালেন। এবং ভারতের ফ্যাসিবিরোধী শক্তিকে একত্রিত করে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে এক ব্যাপক ভিত্তিতে ন্যাশন্যাল ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ান গড়ার প্রস্তাব করলেন।

ভারতীয় কমিউনিষ্টরা তখনও নাৎসি জার্মানীকে রুশিয়ার বন্ধুজ্ঞানে কংগ্রেসের মতই যুদ্ধবিরোধী। অর্থাৎ সে সময় এক রায় এবং তাঁর দল ছাড়া জাতীয়তাবাদী শিবিরে কেউই যুদ্ধের সমর্থক ছিলেন না। এই অবস্থায় কংগ্রেস প্রমুখ জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে, সমস্ত জনমতের বিরুদ্ধে কেবল নিজ যুক্তি-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা তুলে দাঁড়ানো যে কতবড় শক্তির পরিচায়ক তা ভেবে ঐতিহাসিকগণ চিরকালই

বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বেশী নাই। আর শুধু শক্তির কথাই নয়, সমাজ-বিজ্ঞান ও দর্শন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে কতখানি গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, কতখানি দূরদৃষ্টি, কতখানি যুক্তি-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকলে যে এটা সম্ভব হয় তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই যে দুটি গুণের সমন্বয়—চরিত্রের দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা এবং দুর্লভ ধী-শক্তি—এর দৃষ্টান্ত সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে একান্তই দুর্লভ। ধর্মের জন্যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের জন্যে মানুষ দুঃখ বরণ করেছে অনেক, কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত সত্যই অপূর্ব।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন সত্য সত্যই যখন জার্মানী রুশ আক্রমণ করল তখন সকলেই চমকিত হ'ল। রায়ের রাজনীতি জ্ঞানের গভীরতা আর চরিত্রবল দেখে কেউ কেউ বোম্বাই টাইমস-এর সম্পাদকের মত প্রকাশ্যে নিজেদের ভুল স্বীকার ক'রে রায়কে অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু বেশীর ভাগই পাছে তাঁদের পাণ্ডিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যায় এই ভয়ে পূর্বে রায়কে যে ইতর ভাষায় গালমন্দ দিচ্ছিলেন তার জন্যে একটা ক্ষমা পর্যন্ত চাইলেন না।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশিত পথে এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। রায় শ্রমিকদের নিকট এক আবেদনে বললেন :

"এই ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের হাত থেকে জগতের গণতন্ত্রকে, এতদিনের সভ্যতার প্রগতিকে বিশ্ব গণতন্ত্রের নেতা সোভিয়েটকে বাঁচাবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কেবল শ্রমিকদের হাতেই আছে। এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধে শ্রমিকদের নিরপেক্ষ থাকা চলে না। এই যুদ্ধে দেশের বাইরে যারা লড়ছে তাদের রসদ জোগাতে হ'বে এবং দেশের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যারা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছে এবং জার্মানী প্রমুখ দেশের প্রতি সহানুভূতি জাগাবার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধেও লড়তে হ'বে এবং ভারতে জনগণের গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করার জন্যে ধনী জমিদারদের সঙ্গেও লড়তে হবে।" (*M. N. Roy—Presidential Speech*—All India Anti-Fascist Labour Conference—I. I., 30. 11. 41)

রায়ের আহ্বানে অধিকাংশ শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেস ত্যাগ করে কেবল এই যুদ্ধ নীতির উপর ভিত্তি করেই (ট্রেড্ ইউনিয়ানইজিমের জন্যে

নয়) 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেসন অব্ লেবার' নামে এক কেন্দ্রীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এক বৎসর ধরে চলল। দেখা গেল, তাতে "জাতীয় গভর্ণমেণ্টের" দাবী পূরণ হ'ল না। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার কোন ক্ষতিই হ'ল না, বরং সরকার আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল সেই পরিমাণ দুর্বল হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ যেমন নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ছিল, সত্যাগ্রহের দৌলতেও তেমনই হ'ল। দেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলন ডুবে গেল। বেড়ে চলল কেবল সাম্প্রদায়িক দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি। এত বড় দেশে বৈপ্লবিক বাস্তব অবস্থা থাকা সত্ত্বেও বৈপ্লবিক শক্তি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে কুয়াশার মতই মিলিয়ে গেল। জনগণের দিক থেকে সত্যাগ্রহ দেশের ক্ষতিই করল। কিন্তু সে কথা তারা বুঝল না। কংগ্রেস কিন্তু এর সুফল পেয়েছিল ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে, যখন সমগ্র ভারতে সকল হিন্দু আসনই তারা দখল করে নিয়েছিল। রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য জনগণের কাছে ব্রিটিশ বিরোধিতা ও ব্রিটিশ সরকারের হাতে লাঞ্ছনাই যে স্বাদেশিকতার সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট, এ কথা নেতারা জানতেন। অতএব সেই সার্টিফিকেটের জোরেই মূঢ় জনমানসে নেতাগণের মাহাত্ম্য ও বীরত্বের গরিমা অম্লান রইল। আর, রায়ের ঔপনিবেশিক থিসিসের যাথার্থ্যও সমর্থিত হয়ে চলল।

বৎসরাধিককাল চলবার পর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ যখন স্তিমিত হ'য়ে গেল, এবং নেতাগণ জেল মুক্ত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে এই বন্ধ্যা নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন গভর্ণমেণ্ট এক ঘোষণায় বললেন, সরকার আশা করে যে, সত্যাগ্রহী বন্দিরা যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের মত পরিবর্তন করেছে এবং সেই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে তাদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করছে। সত্যাগ্রহীরাও এই ঘোষণায় কোন আপত্তি না জানিয়েই জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই সর্ত পরোক্ষে স্বীকার করেই নিলেন। (I. I., 2. 12. 41)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জাপ আক্রমণ সম্পর্কে রায়

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারাবার আক্রমণ ক'রে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। সেই সঙ্গে আমেরিকাও ব্রিটিশ এবং রুশিয়ার পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রায় ১৪ই ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়তে লিখলেন : "হিটলারবাহিনী বলকান দখল করে নিয়ে যখন রুশিয়ার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনই আমরা লিখেছিলাম, 'মনে হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব ও সে থেকে ভারতের যে-বিপদাশঙ্কা দেখা দেবে সে সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। অক্ষশক্তির ইউরোপীয় দিকটির পূর্বাভিমুখী গতিকে ঠেকিয়ে রাখা গেলেও অক্ষদণ্ডের এশিয়াস্থিত শক্তিটিকে ঠেকান কঠিন। জাপান ইতিমধ্যেই শ্যামে শক্ত হ'য়ে বসেছে এবং ইন্দোচীন দখল শীঘ্রই শেষ হ'বে। শ্যাম থেকে জাপ বাহিনীর মালয়-উপদ্বীপের সরু গলাটা কেটে দিয়ে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে হাজির হ'তে বিশেষ বেগ পেতে হবে না এবং রেঙ্গুন কলিকাতা মাদ্রাজ অবরোধ তখন অতি সহজ হ'য়ে যাবে।' (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া—১৬ই মার্চ ১৯৪১—সম্পাদকীয়—একটি সাবধান বাণী—A warning.)*

"সুখের কথা যে, হিটলারের সোভিয়েট আক্রমণের ফলে পশ্চিম দিক থেকে এসিয়ার অভ্যন্তরে অক্ষশক্তির (Axis Powers) সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা রুদ্ধ

---

* .. "Japan is already firmly established in Siam and has practically annexed Indo-China.

* * * * * *

"All the latest reports indicate that to be the Japanese strategy. From Siam, Japanese forces can easily cut across the narrow neck of the Malaya Peninsula and appear on the Bay of Bengal threatening Rangoon, Calcutta and Madras. (I. I., 16. 3. 1941)

হয়েছে। আমাদের সাপ্তাহিক যুদ্ধ পর্যালোচনায় আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, শীত ঋতুতে অক্ষশক্তি বিভিন্ন দিকে সমরাঙ্গন সৃষ্টি করবে; উদ্দেশ্য, রুশিয়ার হাতে জার্মানীর ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে অন্য প্রান্তে দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া। জাপান যে যুদ্ধে লিপ্ত হবে সে কথাও যেমন আমরা স্পষ্ট ভাবেই একাধিকবার বলেছি, তেমনি হিটলারের নিকট ভিসি সরকারের (পরাজিত ফ্রান্সের সরকার —লেখক) আত্মসমর্পণের ফলে আফ্রিকাতেও ব্যাপক আক্রমণের আশঙ্কার কথা বলেছি। আজ সে সব কথাই সত্য হয়ে উঠেছে। জাপান যে কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করবে সে সম্বন্ধে নানা অনুমান করা হয়েছে। এটাই অনেকে ভাবত যে, জাপান সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করবে। কিন্তু ইন্দোচীন দখলের পর জাপানের অভিযান-পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই নতুন ঘাঁটি থেকে জাপান উত্তর মুখে কিংবা পশ্চিম মুখে অভিযান চালাতে পারে। যে দিকেই করুক তার লক্ষ্য হ'বে ভারত। উত্তর অভিযানে প্রথমেই চীন প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'তে হ'বে—সেহেতু সে পশ্চিম দিকটাই বেছে নেবে।"

৭ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে। রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই লেখাটি লেখেন। তারপর ডাকে গিয়ে বোম্বাইতে ছাপা হয়ে ১৪ই ডিসেম্বরের কাগজে এটি প্রকাশিত হয়। অদূর ভবিষ্যতে জাপ আক্রমণের লক্ষ্য যে ভারতই হবে, রায়ের সে অনুমান সত্য হয়েছিল।

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানকে সমগ্র পৃথিবার সকল প্রগতিশীল ও ফ্যাসি-বিরোধী মানুষই স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী এতে খুসি হ'ন নি। তিনি লিখলেন: "আমি একে স্বাগত জানাতে পারি না। আমেরিকার ঐতিহ্য হ'ল, অপরের দ্বন্দ্ব বিরোধ মেটানো। সেই আমেরিকাই যদি যুদ্ধের একজন অংশীদার হয়, তবে যুদ্ধে লিপ্ত শক্তিদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবার মত আর কেউ রইল না।"

গান্ধীজীর উপরিউক্ত বিবৃতিটি উদ্ধৃত করে রায় লিখলেন:

"গান্ধীজী চান, ফ্যাসিষ্টশক্তি সমূহের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তি হোক। কিন্তু আজ ফ্যাসিবিরোধী শক্তিরা মনে করে, ফ্যাসিষ্ট শক্তির সঙ্গে চুক্তি করা মানে, ভবিষ্যতে আরও বেশী শক্তি সঞ্চয় করে পৃথিবীকে গ্রাস করার পক্ষে তাদের সুবিধা করে দেওয়া। সেই জন্যে মিত্র শক্তির সর্বপ্রধান ঐক্যবদ্ধ

ঘোষণা হ'ল আলোচনার মাধ্যমে কোন প্রকার চুক্তি না করে সমূলে ফ্যাসিবাদের বিনাশ সাধনই এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য। গান্ধীজীর যখন এ উদ্দেশ্য নয় তখন তাঁর স্থান অপর শিবিরে।" (I. I., 28. 12. 41)

পণ্ডিত নেহেরু জেল থেকে বেরিয়ে বললেন: "এ যুদ্ধে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্যই দেওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনেকে মনে করেন যে, বৃহত্তর আদর্শের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করাই উচিত। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না, যদি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয় এবং সরকারী ব্যবস্থার বৃহৎ পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটে।"

রায় এই বিবৃতিটি উদ্ধৃত করে লিখলেন:

"আমরা পণ্ডিতজীর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটলে আমাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু এই পরিবর্তন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এনে দেবে, এ বিষয়ে আমরা একমত নই। তিনি নিজে কেন বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন এনে মানুষের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন না এবং বিদেশী শক্তির হাতে সব ছেড়ে দিচ্ছেন? অথচ তিনিই এই শক্তিকে চিরকালই ফ্যাসিষ্ট শক্তি বলে চিহ্নিত করে এসেছেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত না হ'লে নেহেরু নিজেও পথ পাবেন না, আর সমগ্র দেশকেও পথ দেখাতে পারবেন না।" (I. I., 28. 12. 41)

শ্রীরাজাগোপাল আচারি বললেন: "আমরা যদি স্বাধীন হই তবে যুদ্ধ করার দরকারই হবে না। আমাদের যদি স্বাধীন করে দেওয়া হয়, তবে জাপান বা জার্মানীর ঈর্ষা করার আর কারণ থাকবে না। তখন জাপান যে কেবল আমাদের উপরই ঈর্ষা ত্যাগ করবে তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের উপরও আর তার ঈর্ষার কারণ থাকবে না।"

রায় এই উক্তি উল্লেখ করে বললেন: "সুতরাং আমরা যখন স্বাধীন নই, তখন যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে না। এবং আমাদের যদি স্বাধীন করে দেওয়া হয় তবে 'যুদ্ধ করার দরকারই হয়তো হবেনা'। সুতরাং ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে কোন অবস্থাতেই সহযোগিতা বা অংশ গ্রহণ করা হবে না। শ্রীরাজাগোপাল আচারী মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য খুবই ব্যস্ত বটে কিন্তু সেটা যে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ চালাবার জন্যে নয়, তা বেশ বোঝা গেল। এবং সেটাই যে

তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের পক্ষে উপযুক্ত পথ হবে, সে কথা আমরা বহুবার বলেছি।" (I. I., 22 2 42)

কংগ্রেস নেতাদের ধারণা ছিল, জাপান ভারতের স্বাধীনতার জন্যেই যুদ্ধ করছে, এবং ভারতকে স্বাধীন করে দেবার জন্যে এদিকে আসছে। মার্শাল চিয়াং কাই শেক সস্ত্রীক এলেন। কংগ্রেস নেতাদের বোঝালেন, জাপানের চীন আক্রমণের নৃশংসতা ও বর্বরতার ঘটনাবলী থেকেই ভারতের বোঝা উচিত, জাপান মধ্যযুগীয় বর্বর পররাজ্যলোভী আক্রমণকারী ছাড়া কিছু নয়। ২০ বৎসর পূর্বে জাপানের প্রধান মন্ত্রী টানাকা জাপানের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করে গিয়েছেন। আজ সেই পরিকল্পনা অনুসারে জাপান চলেছে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারেই কেবল চীন প্রভৃতি দেশই নয়, ভারতকেও গ্রাস করতে চায় (চিয়াং-কাই শেকের বিদায় বাণী। (I I., 22. 2 42 & I. I, 1. 3. 42)

যদিও নেহেরু তখন ব্যক্তিগতভাবে বললেন :

"কেউ কেউ ভাবেন, যেহেতু জাপান বা জার্মানী ব্রিটেনকে অক্রমণ করেছে, সেই হেতু ওরা আমাদের সমর্থন পাবার যোগ্য। এই যুদ্ধ বাধবার বহু আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে জাপান-জার্মানীর পররাজ্য আক্রমণ প্রভৃতি বহু কুকর্ম সম্বন্ধে মতামত ঘোষণা করেছে। আজ যেহেতু সেই জাপান বা জার্মানী ব্রিটিশের শত্রু হয়েছে, সেই হেতু কি আমরা আমাদের মতের পরিবর্তন করব? জাপান ও জার্মানী অতি জঘন্য প্রকারের সাম্রাজ্যবাদী। এই সাংঘাতিক ভুলটা যেন কেউ না করে এই ভেবে যে আমরা ব্রিটিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে জাপান-জার্মানীর সাহায্য কামনা করছি। বাইরের সাহায্য যেন কেউ না চায়, কেউ যেন পরনির্ভরশীল না হয়। আমাদের মধ্যে যদি কেউ সে পথে যাবার কথা চিন্তা করেন, তা হলে সেটা কাপুরুষের মতই কাজ হবে। তাতে করে দাসসুলভ মনোভাবেরই পরিচয় দেওয়া হবে। আমরা কেন বিদেশী শাসকের কথা ভাবব?" (I. I., 1. 3. 42)

কিন্তু নেহেরু নেতা নন—নেতা প্যাটেলজি। ভারতের 'পেতাঁরা' (আত্মসমর্পন করার সময়কার ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী) ওৎ পেতে বসে রইলেন সুযোগ বুঝে জাপান-জার্মানীর সঙ্গে রফা করে ক্ষমতায় আসতে।

রায় ৮ই মার্চ '৪২ তারিখের I. I. তে লিখলেন "পেতাঁদের থেকে সাবধান—Beware of Petainism." শীর্ষক সম্পাদকীয়তে : "কংগ্রেস তার যুদ্ধবিরোধী

নীতির সাহায্যে পেতাঁ-প্রদর্শিত পথেই ভারতকে নিয়ে চলেছে। কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধুম্রজালের আড়ালে ফ্যাসিষ্ট পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপের ও ফ্যাসিবাদের বাড় বৃদ্ধির সুবিধা হচ্ছে।"

এই সময় কংগ্রেসে নেহেরু ও রাজাগোপাল আচারির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। নেহেরুর দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত মতের মধ্যে কোন বাস্তব পরিকল্পনা থাকে না, থাকে রাজাগোপাল আচারির মতে। রাজাগোপাল আচারির মত সামান্য দু'একটি বাক্য থেকেই বেশ বোঝা যাবে: "এ যুদ্ধে যেই জিতুক বা হারুক তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। যদি জাপান-জার্মানী জিতে, তবে তাদের সঙ্গে সম্মানজনক সর্তে চুক্তি করা অসম্ভব হবে না।"

রায় লিখলেন: "রাজাজি মনে করেন, জাপানকে তিনি সন্তুষ্ট করতে পারবেন। তাঁর মতে, অক্ষশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা ঢের বেশী বিবেচক, ভারতের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনেক পরিমাণে সহানুভূতিশীল। কোরিয়া, মাঞ্চুকুয়ো, চীনে জাপান পরিচালিত নানকিং গভর্ণমেণ্ট থেকে এবং সম্প্রতি ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড জাপানের হাত থেকে যে ব্যবহার পাচ্ছে ভারত যে তা থেকে কেন ভিন্ন ব্যবহার পাবে তার কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে?" (I. I, 15 3. 42)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ফেডারেসন অব লেবারের সাফল্যমণ্ডিত যুদ্ধ প্রচেষ্টা

শীঘ্রই রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ফেডারেসন অব্ লেবার ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, এবং শক্তি ও মর্যাদায় পর্যায় ক্রমে কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের পরই স্থান লাভ করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নিমন্ত্রণে রায়ের এই দু'টি প্রতিষ্ঠানই বিশ্বসভায় যোগ দানের মর্যাদাও লাভ করে।

অনুরূপ ফ্যাসিবিরোধী তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরে গড়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। (All India Anti-Fascist Student Conference at Delhi—15-11-41.) (I. L., 23. 11. 41)

এইভাবে National Democratic Union, Indian Federation of Labour ও Anti-Fascist Student Union-এর সাহায্যে তাঁর র‍্যাডিক্যাল পার্টি কংগ্রেসের যুদ্ধবিরোধী প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে চলল।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাডিক্যালরা সংখ্যায় মাত্র কয়েক শত ছিল। ১৯৪৪ সালে দেখা গেল যে তা বেড়ে লক্ষের কাছে এসে পৌঁছেছে। এতবড় বৃহৎ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসের দেশে, বিদেশী সরকার, জাতীয় কংগ্রেস, গান্ধীবাদ, হিন্দুমহাসভা, মোসলেম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট প্রভৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রে নিসম্বল অবস্থায় একটি দৈনিক সংবাদপত্র পর্যন্ত যাকে সাহায্য করে নি, কেবল মাত্র আত্মশক্তির বলে, এত কম সময়ের মধ্যে জনবলে, মর্যাদায়, ও গুরুত্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক পার্টির ইতিহাসে র‍্যাডিক্যাল পার্টি বিশ্বে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিল, এবং তা একমাত্র রায়ের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

র‍্যাডিক্যাল পার্টি তার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিপ্লব-বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিল। কলকারখানার মালিকদের সঙ্গে ও ইংরাজ সরকারের সঙ্গে ল'ড়ে শ্রমিকদের সুখ-সুবিধা আদায় করেছে। সে সব কথা লেবার ফেডারেসনের ইতিহাসে লেখা আছে।* যুদ্ধের সময় মহাজন ফড়ে দালাল চোরাবাজারের বিরুদ্ধে লড়ে উৎপাদক ও ক্রেতা সমবায় সমিতি স্থাপন ক'রে খাদ্যবস্ত্র ও ঔষধ সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। পল্লীতে পল্লীতে গণপঞ্চায়েৎ গড়ে গণ-সম্মেলনে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের গঠনতন্ত্র ১৮টি মূল নীতির উপর কীভাবে রচিত হ'বে তা বুঝিয়ে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে—এবং তা যে একেবারে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ স্বাধীন ভারতের সংবিধানেই রয়েছে।

১৯৪১-৪২ সালেই তিনি তাঁর সামরিক জ্ঞানের সাহায্যে বুঝেছিলেন যে, এ যুদ্ধে ফ্যাসিবিরোধী শক্তিরই জয় হবে, যদিও সর্বত্রই তখনো তাদের পশ্চাদাপসরণের পালা শেষ হয়নি, এবং ফলস্বরূপ ভারত স্বাধীনতা পাবে।

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে তিনি বললেন, ফ্যাসিষ্ট শক্তি গোষ্ঠী যদিও এখনো খুবই শক্তিশালী তথাপি লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছি, শেষ পর্যন্ত তাদের হারতে হবে।†

এই সম্মেলনেই স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের পরই তিনি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খসড়া রচনা সুরু করলেন। নাম দিলেন, The People's Plan—a draft. ইণ্ডিয়ান ফেডারেসন অব লেবার ১৯৪৪ সালে তা গ্রহণ করে দেশের কাছে আলোচনার জন্যে পেশ করেছিল। তারপর স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করলেন, নাম দিলেন A draft Constitution of Free India র‍্যাডিক্যাল পার্টি তা দেশের কাছে পেশ করেছিল ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে।

এদিকে যুদ্ধ গড়িয়ে চলল এবং ফ্যাসিবিরোধী শক্তির সর্বাপেক্ষা

---

* V. B. Karnik—The History of The Indian Federation of Labour.

† "From the very beginning I was of the opinion that Hitler could be defeated only by the Soviet Union. I am still of that opinion. .... of course before that the Soviet Union may have to make still greater sacrifice". "...The War will be over soon—in a year or two. We want the defeat of Fascism. The object may be attained soon." (I. I., 17. 1. 43

বিপদের দিনও ঘনিয়ে এল। দুর্লভ ঐতিহাসিক ধৈর্যের সঙ্গে চার্চিল ব্রিটিশকে, মিত্রশক্তির জনগণকে সাহস, বীরত্ব ও বাগ্মিতার সাহায্যে সকলের মধ্যে সাহস ও ধৈর্য সঞ্চারিত করে চললেন।

ব্রিটিশ কংগ্রেসকে বার বার বলতে লাগল কেন্দ্রে এবং প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। রায়ও বার বার বললেন। যুক্তি দিলেন, কেন্দ্রে এবং প্রদেশে ক্ষমতায় এসে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার জন্যে প্রস্তুত করে তোল। শীঘ্রই সুযোগ আসবে। সামান্য একটু আঘাতেই অতি দুর্বল ব্রিটিশের হাত থেকে নামে মাত্র ক্ষমতাটুকু কেড়ে নেওয়া কঠিন হ'বে না। এই মহাযুদ্ধের সংকটকালে ব্রিটিশ ঘর থেকে সৈন্য-সামন্ত এনে পুনরায় ভারত জয় করতে আসবে না—পারবেও না, তা ছাড়া ব্রিটিশ ডেমোক্র্যাসি তা করতে দেবেও না।

রায়ের কথা যে কত স্পষ্ট, কত যুক্তিপূর্ণ তা কংগ্রেসের সকলে বুঝলেও সাহস করল না। কারণ পাছে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে না থেকে বিপ্লবী মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষক-শ্রেণীর হাতে চলে যায়। চিরকাল এই দৃষ্টিভঙ্গিই কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্বের কর্মসূচী নির্ধারণ করে এসেছে। ১৯২০ সাল থেকেই কেবল আন্দোলনের কথাই ছিল—ছিল না ক্ষমতা দখলের কথা। ব্রিটিশের জেলেই যেতে হবে, কিন্তু ব্রিটিশ হাত তুলে যতক্ষণ না ক্ষমতা দিচ্ছে ততক্ষণ হাত বাড়িয়ে তা তুলে নেওয়া চলবে না। হাত তুলে দিলে তবে না কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসবে, কারণ নেতৃত্ব কংগ্রেসের।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

কংগ্রেস কর্তৃক ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান : রায়ের সমালোচনা

১৯৪২ সালের মার্চে ক্রীপ্‌স্ সাহেব ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব নিয়ে এলেন। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা, এমন কি সাপ্রু-জয়াকার প্রমুখ সহযোগিরাও গ্রহণযোগ্য নয় বলে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের যে সমাধান এ প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে অনৈক্য। অবশ্য কংগ্রেসের প্রত্যাখানের কারণ ভবিষ্যৎ অংশটির জন্যে ছিল না, ছিল বর্তমান অংশটির জন্যে। কংগ্রেসের দাবী ছিল, অবিলম্বে ভারতশাসন আইন সংশোধন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সহ সকল ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে হস্তান্তর করা হোক্। ক্রীপ্‌স্ সাহেব তাঁর বিদায় ভাষণে বললেন :

"এই যুদ্ধ বাধবার প্রথম থেকেই এই যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্যে কংগ্রেস দু'টি সর্ত দাবী করে আসছে। প্রথম, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং দ্বিতীয়, এই নতুন স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করবে এক গণ-পরিষদ (Constituent Assembly)। আমার আনীত প্রস্তাবে এই দু'টি দাবীই স্বীকৃত হয়েছিল। তথাপি কংগ্রেসের নিকট এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হ'ল না।

"প্রতিরক্ষা ব্যাপারে কেবল প্রত্যক্ষ যুদ্ধ পরিচালন কার্য ছাড়া একজন ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাতে যুদ্ধের অন্যান্য সকল ব্যাপারের ভার ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও এ প্রস্তাবে ছিল। তথাপি প্রস্তাবটি প্রত্যাখাত হ'ল।

"এই প্রত্যাখানের কারণ, তাঁরা বর্তমান সংবিধানের অবিলম্বে সংশোধন চান, যা এই যুদ্ধের সময় সম্ভব নয়। অন্য কোন পার্টিও এটা দাবী করেনি। দ্বিতীয়তঃ তারা যে জাতীয় সরকার গঠন করবেন তার উপর ভাইসরয়ের বা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কোন হাত থাকবে না।

"এর অর্থ এই যে, যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হ'বে, তা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কোন আইন পরিষদ বা ভোটারদের কাছে দায়ী থাকবে না, এবং এই গভর্ণমেণ্টকে পরিবর্তন করারও কারুরই কোন সাধ্য থাকবে না, এবং এই জাতীয় সরকারের বেশীর ভাগ সদস্য এক মত হ'য়ে ভারতের সংখ্যালঘুদের উপর শাসন পরিচালনা করার নিরংকুশ অধিকার লাভ করবেন। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এ ব্যবস্থা কখনোই মেনে নেবে না।"

এ ছাড়া ক্রীপ্‌স্ কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকেও এক পত্রে লিখলেন :

"কংগ্রেস যে জাতীয় সরকার দাবী করছে তাতে মন্ত্রিসভায় সংখ্যা গুরুরই সম্পূর্ণ ডিকটেটরসিপ প্রতিষ্ঠিত হ'বে মাত্র এবং সংখ্যালঘুদের চিরকালই মন্ত্রিসভার অধিকাংশের স্বৈরাচারের অধীনস্থ হয়েই থাকতে হবে।" (I. I., 19. 4. 42)

ক্রীপ্‌স্ সাহেব তাঁর এই বেতার ভাষণে এই কথাই জানিয়ে গেলেন যে, ব্রিটিশ যখন ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাবই মেনে নিয়েছেন, তখন কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ করতে তাদের কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাব স্বীকার করে নিলে হিন্দু, মোসলেম, তপশীলভুক্ত জাতি, ও শিখদের পরস্পরের মধ্যে এমন গৃহযুদ্ধ বাধবে যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টা যেটুকু চলেছে তাও চলবে না।

তা ছাড়া আর একটা ভয়ও দেখা গেল। যুদ্ধ বাধবার প্রথম থেকেই কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রতি প্রীতিটা খুবই প্রকট হয়ে উঠেছিল, তারপর ভারতের প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দাবীর জন্যে জেদাজেদি দেখে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে জাপান-জার্মানীর সঙ্গে রফা করে ফেলবে এবং মিত্রপক্ষের সমগ্র যুদ্ধ ব্যবস্থাই বানচাল করে দেবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আক্রমণকারীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করবার অধিকারও ক্রীপ্‌সের নিকট দাবী করেছিলেন। (I. I., 12. 4. 42)

রায় এই সময় প্রচুর লিখলেন, ও বিবৃতি দিলেন। তার মধ্যে একটি সম্পাদকীয় থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।

"আমরা যে বলে আসছি, জাতীয়তাবাদ সেকেলে আদর্শ হয়ে গেছে—Nationalism is an antiquated cult—সে কথা আজ জাতীয়তাবাদী নেতাদের ব্যবহারে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল। যুদ্ধ বাধবার পর থেকে এই দু'বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে সিদ্ধান্ত আমরা করে আসছিলাম তা বাস্তব প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয়ে গেল।

"আমরা বলে আসছি যে, জাতীয়তাবাদের যোগ্যতার বিচার হ'বে এর উদ্দেশ্যলাভের ক্ষমতার দ্বারা। কিন্তু দেখা গেল যে, জাতীয়তাবাদীদের আচরণের দ্বারা জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভারতের জাতীয়তাবাদ যোগ্যতার বিচারে হেরে গেল, ফলে দেশের কল্যাণের আশা দূরে থাক্, দেশকে তপ্ত খোলা থেকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং একান্তই যদি সে দুর্দিন আসে তবে যাঁরা তাঁর জন্যে দায়ী হবেন, তাঁরাই তখন জাতীয় সম্মান ও মর্যাদার দোহাই দিয়ে নিজেদের কর্মের সমর্থন খুঁজবেন।"

(I. I., 12. 4 42)

বর্তমান যুগে জাতীয়তাবাদকে সেকেলে আদর্শরূপে ঘোষণা করা রায়ের পক্ষেও খুবই দুঃসাহসিক কার্য বলতে হ'বে। সেই জন্যে এ কথায় সে দিন কেউই কর্ণপাত করে নি। কিন্তু আজ সিকি শতাব্দী ধরে পৃথিবীর ইতিহাস রায়ের স্বপক্ষেই রায় দিয়ে গেল। শুধু ভারত কেন, যুদ্ধোত্তর কালে এসিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতির সকল দেশ যে স্বাধীনতা পেয়ে গেল, তা ত সেই সব দেশের জাতীয়তাবাদ এনে দেয় নি। এনে দিল বিশ্বজনীনতার শুভ বুদ্ধি, যা ফ্যাসিবাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে জেগে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ যে জাতির জনগণের দুঃখ দুর্দশাই বাড়ায়, জাতির প্রকৃত মঙ্গলসাধনে জাতীয়তাবাদ যে একান্তই অক্ষম তা আজ শিক্ষিত মহলের আর কারুরই জানতে বাকি নাই। সেদিন জাতীয়তাবাদ ভারতকে স্বাধীনতালাভের পথে এগিয়ে দেয়নি বরং যে বিশ্বজনীন শুভ বুদ্ধি পাঁচ বছর পরে স্বাধীনতা দিয়েছিল তাকেই সে বাধা দিয়েছিল, অপদস্থ করেছিল, তার ধ্বংস কামনা করেছিল। রায়ের সেদিনকার বাণী সেই "জাতীয়তাবাদ সেকেলে আদর্শ," যেমন সত্য ছিল, আজও সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ অধ্যুষিত ভারতে তেমনি সত্য হয়ে আছে। সেদিনও সে কথা কেউ শোনে নি, আজো কেউ শুনছে না।

জাতীয়তাবাদ যে এযুগে জাতির তথা জনগণের মান-মর্যাদা, সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে না, বিশ্বজনীনতা, বিশ্বের শুভ-বুদ্ধিই যে এ বিশ্বের সকল ব্যক্তির তথা জাতির সুখ-সম্পদ মান-মর্যাদা বাড়াবার একমাত্র পথ সে সম্বন্ধে রায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলি Nationalism is an Antiquated Cult নামক একটি পুস্তকে সংগৃহীত হয়। পুস্তকটি আজও এসিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ-

আমেরিকার পক্ষে সমান মূল্যবান, আজো যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, যার অপর নাম জাতীয়তাবাদ—প্রতিবেশীকে হনন ক'রে জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি ক'রে ব্যক্তির দুঃখ-দারিদ্র্যই বাড়াচ্ছে।

রায় আরও দুটি সম্পাদকীয়তে লিখলেন :

"ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তাবের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম তা প্রমাণিত হয়ে গেল। কেবল কংগ্রেসের জন্যেই কোন মীমাংসা হ'ল না। কংগ্রেস যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ করত, তবে লীগও করত।

"....কংগ্রেস নেতারা তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেই চেয়েছিলেন এবং সে উদ্দেশ্য জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ রক্ষা নয়, অন্য কিছু।

"....তাঁরা নিরংকুশ ক্ষমতা চেয়েছিলেন, যুদ্ধ করার জন্যে নয়, যুদ্ধ বা সন্ধিকে বেছে নেবার জন্যে। কিন্তু আজও যাদের পক্ষাপক্ষ বাছাই হ'ল না, তাদের হাতে দেশের সকল ক্ষমতা তুলে দেওয়া যে নিরাপদ নয়, এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। জাপান-জার্মানীর বিরোধিতা করাই যদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হ'ত, তা হ'লে মধ্যবর্তী কালের জন্যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কোন গুরুতর কারণ ছিল না।

"....ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সম্ভবতঃ সে কথা বুঝেছিলেন। কংগ্রেসের হাতে সকল ক্ষমতা এই যুদ্ধকালে দেওয়ার অর্থ হ'বে, জাপান-জার্মানীর সঙ্গে কংগ্রেসী জাতীয় সরকারের সন্ধি।

"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যদি ধারণা হ'য়ে থাকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা না করলে ভারতে যুদ্ধ প্রচেষ্টা একেবারেই অচল হ'য়ে থাকবে তা হ'লে কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়ার জন্যে যে কোন সর্তেই রাজি হওয়া উচিত ছিল।

"অপর পক্ষে যদি এ কথা তাঁরা বুঝে থাকেন, কংগ্রেসের হাতে সকল ক্ষমতা দেওয়া বিপজ্জনক, তা হ'লে কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করার এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা কেন? কংগ্রেস নেতারা তাঁদের ইচ্ছাকে ত' কোন দিনই গোপন রাখেন নি। কংগ্রেস নেতারা বিশ্বাস করেন, আক্রমণকারীদের সঙ্গে তারা সসম্মানেই সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারবেন।

"....এই অবস্থায় যাদের পক্ষবিপক্ষ বাছাই হয়ে গেছে, যারা এই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ চালাতে চান, সেই সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়েই জাতীয় সরকার স্থাপন করা উচিত। আর তা ছাড়া দেশাত্মবোধ কারুর একচেটিয়া সম্পদ নয়। বর্তমানে ভারতে প্রতিরক্ষার আসল সমস্যা হ'ল, কোন্ উপায়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টায়

জনগণের অন্তরের সাড়া জাগিয়ে সক্রিয় সমর্থন লাভ করা যায়। এ সমস্যার সমাধান কোনও ব্যক্তি বা দল বিশেষের সমর্থন পেলেই হবে না, গভর্ণমেণ্টের নীতিরই পরিবর্তন চাই। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ও সহরে যে কোটি কোটি সাধারণ শ্রমশীল নরনারী বাস করে, তারা এই রাজনৈতিক দলাদলি ও মতবিরোধের কোনও সংবাদই রাখে না। তাদের সক্রিয় সমর্থন পেতে হ'লে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তা ধরতে হ'বে। যুদ্ধ যদি সত্যই জিততে হয়, তবে আসলে এদেরই সক্রিয় সমর্থনের দ্বারা সেটা সম্ভব হ'বে। বর্তমানে গভর্ণমেণ্টের কোনই নীতি নাই, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনও পরিকল্পনাও নাই। যুদ্ধের বর্তমান প্রচার ব্যবস্থায় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার মতও কিছু নাই।

"এই কোটি কোটি জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে সংগঠিত করে তোলা সম্ভব। দেশের জন সংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই গ্রাম অঞ্চলে বাস করে। সহরের অধিবাসীদের মত তারা ভয়ে ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালাবে না। সুতরাং নিজনিজ ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার রক্ষার জন্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা অসম্ভব হবে না। অবশ্য তার আগে এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে তারা বোঝে যে, ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামারের সম্পূর্ণ মালিক তারাই। আইন করে কৃষককে বলতে হ'বে, যে জমি সে চাষ করে সে জমি তারই। সেই জমি রক্ষা করার সব সুযোগ-সুবিধা তাকে দিতে হবে। তখন সমগ্র দেশে সাতলক্ষ প্রতিরক্ষা-কেন্দ্র গড়ে উঠবে—তখন অবিছিন্ন এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে যাবে।

"....প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কল-কারখানার শ্রমিকদের অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ — সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের চাকা অহর্নিশ ঘোরা চাই। কিন্তু আক্রমণ আশঙ্কায় ভীত হ'য়ে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা আজ পালাচ্ছে। তাদের আটকে রাখার সব চেষ্টা এখন পর্যন্ত সফল হয় নি। কলিকাতা ও নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক শ্রমিক আজ পলাতক। যেখানে আক্রমণের আশঙ্কা কম সেখানকার অবস্থাও খুব বেশী ভাল নয়। শ্রমিকদের এই স্থানত্যাগের হিড়িক থামান যাবে না, যদি না শ্রমিকরা বোঝে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কর্মে আঁকড়ে থাকলে তাদের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষিত হ'বে। ততটা করা দূরে থাক, শ্রমিকদের অতি ন্যায্য দাবীও রক্ষা করা হয় না। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ বিদ্যমান এবং সেই জন্যেই সামান্য আশঙ্কাতেই এই ব্যাপক স্থানত্যাগের

হিড়িক। গভর্ণমেণ্টের বন্ধ্যা শ্রমিক নীতির জন্যেই আজ এই দুঃখকর পরিস্থিতির উদ্ভব।

"দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। অথচ বেতন বাড়েনি। অর্থাৎ মানুষের আয় কমেছে। এ পর্যন্ত মাগ্‌গী ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। বেতন বৃদ্ধিরও যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় তা হ'লে যুদ্ধ বোনাস ও ওভার টাইম কাজের জন্যে বাড়তি হারে মজুরির ব্যবস্থা অবলম্বন অবিলম্বে প্রয়োজন।

"এছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ অবিলম্বে প্রয়োজন। দ্রব্যমূল্যরোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। "গভর্ণমেণ্টের এই সকল জনকল্যাণমূলক নীতির অভাবে কোনও কিছুই হচ্ছে না।

"ভারতের এই কোটি কোটি মূক মূঢ় শ্রমশীল কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তকে আজ অবিলম্বে তাদের অন্নবস্ত্রের দাবী পূর্ণ করে জানিয়ে দিতে হবে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ। তখন সমগ্র দেশে এক নতুন আবহাওয়া বইতে থাকবে। বর্তমানের পরাজিতের মনোভাব ঘুচে দেখা দেবে দুঃসাহস, হতাশা দূর হ'য়ে জেগে উঠবে আশা ও আত্মবিশ্বাস। জাগ্রত মানুষই এভাবে লড়তে পারে স্বাধীনতার জন্যে। তখন আর তারা তাদের নেতাদের মুখ চেয়ে থাকবে না। এই নেতারা শুধু বোঝে, হয় ব্রিটিশের হাত থেকে, নয়তো জাপানের হাত থেকে স্বাধীনতাটি মুষ্টি ভিক্ষারূপে পাওয়ার আশায় হাত বাড়িয়ে রাখা।

"এটা জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ নয়। এটা আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধ। প্রত্যেক দেশেই ফ্যাসিষ্ট আছে, ফ্যাসি-বিরোধীও আছে। নতুবা বহুল প্রচারিত এই সব কথার কী অর্থ থাকে—'শুভ-অশুভ শক্তির মধ্যে, সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যে, আক্রমণকারী ও আক্রান্তের মধ্যে জীবন-মরণ সংগ্রাম চলেছে?' আজ প্রতি দেশের মধ্যেই এই দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলেছে।

"সুতরাং এই সব কারণে সমগ্র ভারতকে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে তোলার চেষ্টা অবাস্তব প্রচেষ্টা, সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। অক্ষ-শক্তির মিত্র ও সমর্থক ভারতে আছে। এবং এই মৈত্রী বন্ধন শুধুমাত্র সুবিধাবাদী যোগাযোগ নয়, এ বন্ধন আদর্শগত ও ভাবগত ঐক্যের বন্ধন। কংগ্রেস ও অন্য সকল রাজনৈতিক সংগঠনই এই দুই মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের নিয়েই গঠিত। সেইজন্যে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান।

"এই অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে এক শক্তিশালী ফ্যাসিবিরোধী শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে মীমাংসা সম্ভব হ'ল না, তার জন্যে আফশোষ করে সময় নষ্ট না করে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার কাজে অবিলম্বে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

"এটা সুখের কথা যে, গভর্ণমেণ্ট সঠিক পথেই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। জনসাধারণের মধ্যে National War Front গড়ে তুলতে অগ্রণী হয়েছেন। নামটা সুখের হয়নি। নাম দেওয়া উচিত ছিল, পিপ্‌লস ওয়ার ফ্রণ্ট। এই ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্ট-এর উদ্দেশ্য হ'ল, 'জনসাধারণের মধ্যে মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা; যারা জনসাধারণের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ'; বিশেষভাবে পঞ্চম বাহিনীর সকলপ্রকার কার্যকলাপ যথা, শত্রুর সুবিধাজনক আলাপ-আলোচনা, মতপ্রকাশ, লেখা, গুজব রটানো, পরাজিতের মনোভাব সৃষ্টি প্রভৃতি বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ; ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে জয় যে অবশ্যম্ভাবী জনসাধারণের মধ্যে সেইরূপ প্রত্যয় গড়ে তোলা এবং সাহস, সহিষ্ণুতা ও মনোবল বৃদ্ধি করা; নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সকলপ্রকারে ভারতের মধ্যে ও বাহিরে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাবার জন্যে সমগ্র জাতির মনোবলকে সংহত করে তোলা।" (I. I., 19/4/42 & 26/4/42)

জনগণের মধ্যে জাগরণ আনতে হ'লে গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ ও ফ্যাসি-বিরোধী মনোভাব জাগাতে হ'লে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে সব অধিকার ও সুখ-সুবিধা দেবার কথা রায় বললেন, তিনি তা ১৯২০ সাল থেকেই বলে আসছিলেন। ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্টের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কয়েক মাস পূর্ব থেকেই Volunteers' Defence Corps সংগঠনের জন্যে দেশব্যাপী চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ১০ই-১১ই জানুয়ারী ১৯৪২, তারিখে র‍্যাডিক্যাল পার্টির কলিকাতা সম্মেলনে People's Defence Corps-এর যে উদ্দেশ্য বিবৃত করেন, তার সঙ্গে এপ্রিল মাসে ভাইস্‌রয়ের ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্টের উদ্দেশ্যের মিল হয়ে যায়।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় লেবার ফেডারেসনের অবদান

একদিকে ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস যেমন দেশে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলল, গভর্ণমেণ্টও তেমনি যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। শস্তমূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকরা সাধ্যমত বেশী ফসল উৎপন্ন করার চেষ্টা করতে লাগল।

রায়ের নির্দেশিত পথে ইণ্ডিয়ান ফেডারেসন অব্ লেবারের দাবী অনুযায়ী শিল্পে ও অফিসে মাগ্গী ভাতা ও সস্তায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হ'ল, এবং শ্রমিকদের মধ্যে ফ্যাসি-বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন চালাবার জন্যে ইণ্ডিয়ান ফেডারেসন অব্ লেবার ও ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নিকট থেকে এই কাজের পরিকল্পনা সহ একটি ব্যয় বরাদ্দের হিসাব চাওয়া হ'ল। ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস তখন যুদ্ধ-বিরোধী। তারা এ অনুরোধ রক্ষা করল না। ইণ্ডিয়ান ফেডারেসন অব্ লেবার সারা ভারতে এই কাজ চালাবার জন্যে একটি পরিকল্পনা পেশ করে। গভর্ণমেণ্ট সমগ্র ভারতের জন্যে মাসে মাত্র ১৩০০০৲ টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেন। রায় তখন এই লেবার ফেডারেসনের প্রথম সেক্রেটারি।

এটা ঐতিহাসিক সত্য কথা যে, কংগ্রেস ও ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই লেবার ফেডারেসনের চেষ্টায় শ্রমিকদের মধ্য থেকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোন ক্রটিই ঘটে নি।

যুদ্ধের শেষ দিকে অক্ষশক্তির পরাজয় যখন অনিবার্য হয়ে এসেছে, জার্মানী-জাপানের বন্ধু ও সমর্থকরা যখন মুহ্যমান, তখন তাদের একমাত্র শত্রু রায়কে জনসাধারণের চোখে হীন করার উদ্দেশ্যে এই তেরো হাজার টাকা যে রায় নিজেই ব্রিটিশের নিকট থেকে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সমর্থন করার মূল্য বা ঘুষ হিসাবে

গ্রহণ করতেন তা পত্র-পত্রিকা মারফৎ প্রচার করতে থাকেন। এ টাকা যে ইণ্ডিয়ান ফেডারেসনকে ফ্যাসি-বিরোধী প্রচারের খরচের জন্তে দেওয়া হয়, এর মধ্যে যে কোন গোপনীয়তা কোনদিনই ছিল না, এবং রায়ের সঙ্গে যে এর ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি প্রথম কিছুদিনের জন্তে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন মাত্র, এসব এই সকল সংবাদপত্র ও নেতাদের জানা থাকলেও তা ছাপা হ'ল না। রায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা কুৎসা রটনায় ব্যথিত হয়ে লক্ষৌ বিশ্ববিস্থালয়ের অধ্যাপক B. N Das Gupta (অধুনা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিস্থালয়ের ভাইস-চ্যানসালার) রায়কে এর প্রতিবাদ জানাতে অনুরোধ করেন। তখনকার সেই ঘটনাটি সম্বন্ধে তিনি রায়ের দশম মৃত্যুবার্ষিকী (২৬।১।৬৪) অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে বলেন:

"এই জন্য রায়ের বিরুদ্ধে অতি হীন সব কুৎসা রটনা করা হয়। তখন তাঁকে দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। এতে অবশ্যই তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ন নি। মানুষটি যে কী ধাতু দিয়ে গড়া ছিল, তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। যেমন ধীমান তেমনি সৎ, তেমনি অনমনীয়, তেমনি শক্তিমান। আমি একদিন তাঁকে বলেছিলাম, 'আপনি কেন এই সব কুৎসার প্রতিবাদ করে বলেন না যে, এর একটি পয়সাও আপনি ছোঁন না; এর সবই শ্রমিকদের মধ্যেই খরচ করা হয়।' এর উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি গর্বিত যে, ভারতের পক্ষে যা করা উচিত আমি তা করছি, এর জন্তে কারুর কাছে জবাবদিহি করব না। আমি ভালভাবেই জানি যে, আমার যারা নিন্দুক তারা কতখানি শক্তিশালী আর কী পরিমাণ দলবদ্ধ। তারা আমার জবাবকে থোড়াই গ্রাহ্য করে। তাদের উদ্দেশ্য, যেমন করেই হোক আমাকে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে বিদায় করা। দেশের জন্তে যা ভাল বুঝব তা আমি করবই। আপনি (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বরং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ নিন যে টাকাটা ঠিক মত শ্রমিকদের মধ্যে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা।"

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, সুভাষবাবু যখন কংগ্রেসের সভাপতি তখন তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৯৩৯ সাল থেকেই কংগ্রেসের পরিচালনাধীনে কাজ করে আসছিল। এই প্ল্যানিং কমিশনের খরচ বাবদ মোটা টাকা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টই দিত। এ কথা অবশ্য খুব গোপনেই রাখা হয়েছিল। এটা

প্রকাশ হয়ে পড়েছিল ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা যখন রায় পরিচালিত লেবার ফেডারেসনের বরাদ্দ ১৩০০০৲ টাকা নিয়ে রায়ের নামে দুর্নাম রটনা করতে পরোক্ষে সাহায্য করছিলেন, তখন নিজেদের এই কথাটা একবার ভাবলেন না যে, তারা সরকার বিরোধী হয়েও সেই সরকারের নিকট থেকেই সাহায্য গ্রহণ করেন। রায় ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধনীতিতে সরকারের সহযোগী। সুতরাং নৈতিক অপরাধে কংগ্রেসই অপরাধী, রায় ন'ন।

(I. I., 17/2/46)

যাক্, যা বলছিলাম। কংগ্রেসের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ প্রচেষ্টা ঠিকই চলতে থাকল। রায়ের যুক্তি, রায়ের পন্থা প্রায় সকল নিরপেক্ষ যুক্তিশীল শিক্ষিত লোকেরা স্বীকার করলেও জনসাধারণের শিক্ষা ও যুক্তিশীলতার যথেষ্ট অভাবের ফলে রায়কে সঠিক বোঝা সম্ভব হ'ল না। তবে যারা এই যুদ্ধে সহযোগিতা করছিল, যেমন সৈন্যেরা, নানা ক্ষেত্রের সরকারী কর্মচারীরা, ঠিকেদার আর যোগানদারেরা, তারা নৈতিক সমর্থন পেত রায়ের লেখা থেকে। সরকার রায়ের যুক্তিই নানা পত্র-পত্রিকা ও প্রচারক মারফৎ যুদ্ধে লিপ্ত লোকের কাছে, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করত। কিন্তু রায়ের অনেক যুক্তিবুদ্ধি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করলেও রায়ের প্রধান দাবী পূর্ণ করা হ'ল না। রায় চেয়েছিলেন, ক্রীপ্‌স প্রস্তাব অনুসারে যুদ্ধ-বিরোধী দলের পরিবর্তে ফ্যাসি-বিরোধী উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করতে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। কেন যে করলেন না, তার সঠিক কারণ জানা না গেলেও এটা অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, ভারতীয় ধনী ও ব্রিটিশ সরকারের কারুরই সে ইচ্ছা ছিল না।

প্রথমতঃ যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছোট তরফ ভারতীয় ধনীরা রাতারাতি আরও ধনী হবার জন্যে উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যে যখন রীতিমত সহযোগিতা ক'রে চলছিলেন তখন সরকারের উপর তাদের প্রভাব খানিকটা থাকবে বৈকি। তাঁরা তাঁদের নিজ রাজনৈতিক পার্টি অতি নিরাপদ গান্ধী-কংগ্রেসকে হাতে রেখেই চলতে চান। জাপান-জার্মানী যদি জয়ী হয়, তবে কংগ্রেসের মারফৎ তাদের সঙ্গে আপোষ রফার পথ খোলা থাকবে; ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে, তাদের হাতে লাঞ্ছিত হ'য়ে ও জেলে গিয়ে

জনগণের কাছে কংগ্রেসের বীরত্বের ও দেশ ভক্তির চরম প্রমাণও দেওয়া থাকবে, যা আখেরে কাজে লাগবে।

অন্যদিকে ক্রীপ্‌স প্রস্তাব অনুসারে ফ্যাসি বিরোধী দল ও ব্যক্তি-সমূহকে নিয়ে জাতীয় সরকারের শূন্য আসন পূরণ করলে অবিলম্বে বিপ্লব ঘটে গিয়ে ধনতন্ত্রের অবসানের দিন ঘনিয়ে আসবে, অচিরে জনগণের রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতএব জাতীয় সরকারের আসন শূন্য থাকাই সব দিক দিয়েই সুবিধাজনক। তাই ভারতীয় ধনীদের দাবী ছিল, জাতীয় সরকারের গদি শূন্য থাক।

ব্রিটিশ সরকারও দেখলেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যখন কংগ্রেসের সমর্থক ধনীরা উৎপাদনে ও সরবরাহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছেন তখন তাদের রাজনৈতিক দলের জন্যে গদি শূন্য রাখলে তারা খুশীই থাকবে।

পক্ষান্তর, রায়কে বা রায়ের সমর্থিত ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করলে, রায়ের ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অবিলম্বেই তারা কৃষককে জমির অধিকার দিয়ে পল্লী অঞ্চলে কৃষিবিপ্লব ঘটাবে, এবং সহর অঞ্চলে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের অনুরূপ অধিকার ও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সর্বনাশ ডেকে আনবে। গত দু'বছরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যতই গণতান্ত্রিক হ'য়ে উঠুক, রায়ের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে এই পরিণতি ডেকে আনার ক্ষমতা তখনো তাদের হয় নি। অতএব রায়ের এই দাবী অপূর্ণই রয়ে গেল।

অবশ্য যুদ্ধের গতিও সে সময় মোড় নেয়। যদিও দৃশ্যতঃ তখনো জাপান-জার্মানী জিতছিল, কিন্তু সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে '৪৩ সাল থেকেই অক্ষশক্তির দুর্দিন সুরু হওয়ার সব লক্ষণই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে সুরু করেছিল। কিন্তু তা না হ'য়ে অর্থাৎ জার্মানী যদি ষ্টালিনগ্রাডে ও সাহারায় আটকে না পড়ত, জাপান যদি কোরাল সাগরের যুদ্ধে জয়ী হ'ত, তা হ'লে রায়ের দাবী না মেনে হয়তো ব্রিটিশের গত্যন্তর থাকত না। তা ছাড়া দেখা গেছে, মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ব্রিটিশেরই দূরদৃষ্টি আছে। প্রয়োজন হ'লে নগদ লাভের মোহ ত্যাগ করে ঊর্ধ্বেও তারা উঠতে পারে; চোখের আড়ালের মহত্তর স্বার্থের জন্যে চোখের সামনের স্বার্থ ত্যাগ করার মত বুদ্ধি ও চরিত্রবল তাদেরই আছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কংগ্রেসের 'ভারতছাড়' আন্দোলন : রায়ের কালোবাজার ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ফ্যাসিষ্ট শক্তিচক্রের জয়সূর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে, অর্থাৎ ফ্যাসিবিরোধী-শক্তির যখন বড়ই দুর্দিন, ঠিক সেই মুহূর্তেই কংগ্রেস 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন সুরু করে। তাতে যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিশেষ ক্ষতি হয় নি, বরং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি লাভ হয়েছিল। কংগ্রেস, না জানি কি অঘটন ঘটাবে, এই ভয় তাদের কেটে গিয়েছিল যখন তারা অগাষ্ট আন্দোলনকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন।

অবশ্য কংগ্রেসেরও মহা লাভ হয়েছিল। জেলে গিয়ে, পুলিশ-সৈন্যের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে, মৃত্যু বরণ করে তাঁরা জনসাধারণের কাছে আর একবার শহীদ হয়ে গেলেন। তার ফল তাঁরা পেলেন তিন বছর পরে। সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র ভারতের সমস্ত হিন্দু আসন তাঁরা দখল করলেন।

১৯২০ সাল থেকে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। কিন্তু তাতে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও জ্ঞান বেশী কিছু বাড়ে নি। ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে অসহযোগ ও সে জন্যে জেলে যাওয়া, লাঞ্ছনা, ও কষ্টভোগই হ'ল দেশাত্মবোধের চরম পরিচয়, এইটুকুমাত্র শিক্ষাই তারা পেয়ে এসেছে। ভুল করে হোক, আর না হোক, তাতে দেশের লাভ ক্ষতি যাই হোক, সে বিচারের প্রয়োজন নাই, ইচ্ছাও নাই, ক্ষমতাও নাই। শুধুমাত্র সরকারের সঙ্গে অসহ-যোগিতা ও তাদের হাতে লাঞ্ছনা পেলেই হ'ল! তাতেই পাবে হাততালি আর বাহবা, জনসাধারণের এই অজ্ঞতা কংগ্রেসের নেতাগণ বোঝেন এবং বোঝেন বলেই কংগ্রেস কোন দিন কর্মীদের ও জনসাধারণকে চরখা কাটান ছাড়া রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে তালিম দেয় নি। জনগণের এই অজ্ঞতাই কংগ্রেসের

মূলধন হয়েছিল। সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতায় ও তাদের হাতের লাঞ্ছনায় মূলধনে কংগ্রেসের অপেক্ষা ধনী কে? সে বিচারে রায় খুবই দরিদ্র। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা! আরে রামঃ—দেশদ্রোহিতা আর কাকে বলে! তার উপর তেরো হাজার টাকা!! আর কথা কি!!! নির্বাচনে কংগ্রেস পেল সব ক'টি আসন, আর রায়ের র‍্যাডিক্যাল পার্টি সারা ভারতে একটি আসনও পেল না। অবশ্য হিন্দুমহাসভা, উদারনীতিক ও অন্যান্য গুণীজ্ঞানী স্বতন্ত্র প্রার্থীও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। কারণ টাট্‌কা অসহযোগ ও জেলখাটার মূলধনে এরাও কেউ ধনী ছিলেন না। জনগণের অজ্ঞতা দীর্ঘজীবী হোক! অজ্ঞ মানুষের পক্ষে উপযুক্ত শাসন-ব্যবস্থা আরও সুদীর্ঘকাল ধ'রে চলতে থাকবে!!

ব্রিটিশ ও মিত্রপক্ষ তাঁদের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও রসদ ভারত থেকে কিনতে সুরু করলেন। দেশীয় ধনিক-বণিকরা অতি উচ্চ মূল্যে সরবরাহ করে প্রচুর মুনাফা করতে লাগলেন। হাতে প্রচুর টাকা জমে উঠতে লাগল। সেই টাকা দিয়ে তাঁরা ভারতে ব্রিটিশের কলকারখানার অংশ কিনতে সুরু করলেন। ক্রমে অতি দ্রুত গতিতে ভারতে ব্রিটিশের শিল্পবাণিজ্য ভারতীয় ধনীদের হাতে এসে যেতে লাগল।

সুযোগ বুঝে ধনীরা এই সব বাড়তি টাকা দিয়ে দেশের খাদ্যদ্রব্য মজুত করতে সুরু করলেন। ধনীদের এই দুষ্কার্য কারুরই চোখে পড়ল না। সকল দৃষ্টি তখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেশে খাদ্যের অভাব ছিল মাত্র শতকরা ৫% ভাগ। সুশৃঙ্খলায় সুবন্দোবস্ত করতে পারলে তাতে দুর্ভিক্ষ ঘটতে পারত না। কিন্তু তা হ'ল না। বাংলায় দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক মরে গেল।

এ অবস্থা যে আসতে পারে রায় তা' পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিলেন। কয়েকমাস পূর্ব থেকেই ধনীদের মুনাফাবাজি, কালোবাজারির হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্যে ক্রেতাদের সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচার করছিলেন। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে (১৯৪২ সালের ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর) সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে যথারীতি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হ'ল এবং পার্টিকে এই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে নির্দেশও দিলেন। ধনী ব্যবসায়ীদের বিরোধিতায় ও সমবায়ের প্রতি সরকারের অসহযোগ নীতির ফলে যদিও সমগ্র দেশে ধনী ব্যবসায়ীদের বিকল্প বিনিময় ও বাজার রূপে ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠতে সক্ষম হ'ল না, তথাপি র‍্যাডিক্যাল পার্টি ও

লেবার ফেডারেসনের চেষ্টায় শ্রমিক সাধারণের মধ্যে কষ্ট হ'লেও অনশনজনিত মৃত্যু প্রায় ঘটল না। মরল পল্লী অঞ্চলের লোক, যেখানে র‍্যাডিক্যাল পার্টি ও লেবার ফেডারেসনের বিশেষ কোন সংগঠন ও প্রভাব ছিল না। পল্লী অঞ্চলের লোক সহরে এসে মরল, সহরের বাসিন্দা তারা ছিল না। কংগ্রেস তার যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা সংকট আরো বাড়িয়ে দিল।

যুদ্ধ যত গড়িয়ে চলতে লাগল, রায়ের যুদ্ধ সম্পর্কিত থিসিস ততই সত্য হ'য়ে উঠতে লাগল, এবং তাঁর ডি-কলোনাইজেসন থিসিসের অনুমানও পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের দৃষ্টিতে যুদ্ধোত্তর পৃথিবী

তিনি ১৯৪২ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াতে 'যুদ্ধোত্তর পৃথিবী—The Post-War World' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখলেন :

"যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছে। হিটলারের ফ্যাসিবাদ ধ্বংসই যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধের লক্ষ্য একথা যদিও তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন তথাপি ইতিমধ্যেই সামরিক প্রয়োজনের অজুহাতে বিপরীত লক্ষণও কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। সেই জন্যে যুদ্ধনীতি পুনরায় ভালভাবে ঘোষণা করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।....এই যুদ্ধ সার্থক হবে, যদি এর কারণসমূহের মূলোৎপাটন করা হয়।

"....সুতরাং উদ্দেশ্য হোক যুদ্ধোত্তর পৃথিবী যাতে পূর্ব অপেক্ষা অধিকমাত্রায় শোষণ-শাসন মুক্ত হয়, মানুষ যাতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হ'তে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

"....এ যুদ্ধের জন্যে কেবল হিটলার-মুসোলিনির মত কোন ব্যক্তিই দায়ী নয়। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঐ রকম মানুষদের গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে সেই ব্যবস্থাকেই উপড়ে ফেলতে হ'বে।

"....সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কেবল সামরিক জয়-লাভই নয়, রাজনৈতিকও; এবং রাজনীতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকও আছে। সেই জন্যে এ যুদ্ধ জয়ের অর্থ হবে ফ্যাসিবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলোৎপাটন।

"....সামরিক জয়লাভ অপেক্ষা এ জয় অনেক বেশী কঠিন।

"...আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক দেশসমূহের আর্থিক ও বাণিজ্যিক (economic & financial) ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা সৌধ মাত্র। ব্রিটেনের যে আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল সে শক্তি কি যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের থাকবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপরই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ছবি ফুটে উঠবে।

"....এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হ'লে অনেক তথ্যের প্রয়োজন। তবে একটি মূল্যবান তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতেই ছবিটার আভাস পাওয়া যাবে। সেটি হ'ল যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে জনসাধারণের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে বিভারিজ সাহেবের পরিকল্পনা।

"....আজ ব্রিটেনে এই পরিকল্পনার আলোচনা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আলোচনা।

"কথা উঠতে পারে, কনসারভেটিভ পার্টি হয়তো এ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে না। কিন্তু না করলে আগামী নির্বাচনে তাদের পরাজয় অনিবার্য। যে পার্টি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবে তাদেরই জয় সুনিশ্চিত।

"....এই রিপোর্টের মূল কথা হ'ল জাতীয় সম্পদ জাতির মঙ্গলের জন্যই ব্যয়িত হবে। এই নীতি যদি গ্রহণ করা হয় তবে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যাবে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি হ'ল রপ্তানী যোগ্য বাড়তি মূলধন বিদেশে খাটিয়ে মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা। বিভারিজ রিপোর্টের অভিমত এই যে, ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে বৎসরে ৫০ কোটি ষ্টার্লিং খরচ করতে হবে।

"....এই টাকাটা ধনীর লাভ থেকেই ব্যয়িত হ'বে। ফলে রপ্তানিযোগ্য মূলধন আর বিশেষ থাকবে না।

"....গত মহাযুদ্ধের সময় এই অবস্থা ঘটেছিল। তখনো রপ্তানিযোগ্য মূলধন নিতান্তই কমে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের সে সংকট কেটেছিল ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবে। হয়তো এবারেও সে চেষ্টা হ'তে পারে।

"....বিভারিজ রিপোর্টে যে খরচের কথা আছে তা এবার খরচ করতেই হ'বে। ফলে ব্রিটেন পূর্বাপেক্ষা অনেক সুখী, সন্তুষ্ট ও ঐশ্বর্যশালী জাতিরূপে গড়ে উঠবে; অথচ রপ্তানীযোগ্য মূলধনের অভাবে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি আর থাকবে না। অনুন্নত দেশ সমূহে মূলধন পাঠিয়ে শোষণ করার সাম্রাজ্যবাদী নীতির অবসান ঘটবে।

"....ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভিত্তি হ'ল সস্তা মজুর। কিন্তু রপ্তানীযোগ্য মূলধনের অভাবে সে মজুরকে কাজে লাগান যাবে না। পক্ষান্তরে, যদি দেশের মূলধনের ঘাটতি করে সেই মূলধন উপনিবেশে পাঠান হয় তবে তাও যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের মানুষ সইবে না। কারণ তাতে ব্রিটেনের জীবন ধারণের মান কমবে এবং বিভারিজ রিপোর্টেরও কোন অর্থ থাকবে না।

"অতএব উপনিবেশের জনগণের জীবনের মান উন্নত হ'লে, মজুরির হার বৃদ্ধি হ'লে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের জনগণেরও লাভ। মূলধন তখন ধনীর লাভের উদ্দেশ্যে উপনিবেশ সমূহে প্রেরিত না হ'য়ে দেশের উন্নয়ণের জন্যে থাকবে। যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের উন্নয়ন পরিকল্পনা উভয় দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে।

"....যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বহুল পরিমাণে যুদ্ধোত্তর ভারতের অবস্থাকে নির্ধারিত করবে। ভারতের জনগণ নিতান্তই দরিদ্র ও অজ্ঞ। ভারতের নেতাগণ স্বাধীন ভারতের জনগণের আর্থিক উন্নয়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁরা জাতীয় স্বাধীনতা চান এবং ব্রিটিশ সেটি না দেওয়াতে তাকে দোষী করেন। কিন্তু তাঁরা ক্ষমতা পেয়ে সেই ক্ষমতা দিয়ে কোন কর্ম করবেন সে সম্বন্ধে কোন দিন একটি কথাও বলেন না। সেই জন্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জয়লাভে ভারতে যখন জাতীয় স্বাধীনতা আসবে এবং এই সব নেতারা যখন ক্ষমতায় আসীন হ'বেন তখন হয়তো ভারতের জনগণের বর্তমান দারিদ্র্যও ঘুচবে না; এবং সাম্রাজ্যবাদী মূলধন খাটাবার পক্ষে কোন বাধাও থাকবে না। সেটা বিশ্বের জনগণের পক্ষেও শুভ হ'বে না।

"....ভারতে যদি ধনতন্ত্র থাকে তা হ'লে সেই রন্ধ্র দিয়ে ভারতীয় মূলধনের সঙ্গে বিদেশী মূলধন মিশে জনগণের উপর শোষণ চলতে থাকবে—সেটা হবে নতুন যুগের সাম্রাজ্যবাদের নয়া তালিম। যুদ্ধোত্তর ভারতের সেই রূপ পরিগ্রহের সম্ভাবনা আছে।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রায়ের দৃষ্টিতে যুদ্ধোত্তর ভারত

১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর, "যুদ্ধোত্তর ভারত-Post-War India" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে রায় লিখলেন :

"গত তিন বছরের ভারতের ইতিহাস যেমন দুঃখজনক তেমনই বন্ধ্যা। এ ইতিহাসের সুরু ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে, যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা করার দাবী করল। সে সময় ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ থাকলেও থাকতে পারত। বস্তুতঃ ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সন্দেহের অবকাশ ছিল। ব্রিটিশ হিসাবের ভুলে ও ঘটনাচক্রে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত হিট্লারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে কিনা সন্দেহ ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের পতনের পরে ও চেম্বারলেনের তোষণ নীতির অবসানের ফলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যদিও তাতে কংগ্রেস খুশী হ'তে পারে নি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বেশ স্পষ্টভাবেই বার বার জানিয়েছেন যে, তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হ'ল—হিটলারের ধ্বংস। রুডলফ্ হেসের নাটকীয় অভিসার* যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন বোঝা গেল, ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যা চেম্বারলেনের তোষণনীতির পিছনে ছিল তা শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছে। সে অভিযানে ব্যর্থ হয়ে হিটলার যখন তার সর্বপ্রধান শত্রু সোভিয়েটকে একাই আক্রমণ করল এবং ব্রিটিশ সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল তখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশই রইল না।

* রুডলফ্ হেস ছিল হিটলারের অন্যতম পার্শ্বচর ও সহকারী। তিনি একাকী এক এরোপ্লেনে চড়ে ব্রিটেনে হাজির হ'ন। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের ফ্যাসিপন্থীদের সাহায্যে ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধি করে উভয়েব রুশিয়া আক্রমণ। কিন্তু চার্চিল সরকার হেসকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করেন।—লেখক

"অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ যেমন যুদ্ধের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তেমনি যুদ্ধোত্তর কালের উদ্দেশ্যও ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে সুরু করেছে; যদিও সে উদ্দেশ্য এখনো নানা মতের কুজ্ঝটিকা কাটিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তথাপি এটা অতিশয় পরিষ্কার যে, হিটলার-মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার উপর গড়ে উঠেছিল তা আর থাকবে না এবং হিটলার যেরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চান সেটাও হবে না।

"ভারত কিন্তু এই নব যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারল না। দেখা গেল জাতিপুঞ্জের যুদ্ধের উদ্দেশ্য যে ফ্যাসিবাদের ধ্বংস তা ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের সংগ্রামে তারা হাত গুটিয়েই রইল—কোন সাহায্যই দিল না। আজ সমগ্র বিশ্ব যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা সে সম্বন্ধে নীরব। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তারা তেমনি নীরব। তাঁদের অবিলম্বে ঘোষণা করা উচিত ক্ষমতা পেলে সেই ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা কী করবেন।

"তাঁরা কেবলমাত্র বলেছেন, ভারত জাতীয় সরকার চায়। রাজনৈতিক ভারত গত তিন বছর ধরে এই মনভোলানো কিন্তু একান্তই অসার ধ্বনি শুনে আসছে; অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষেরা ইতিমধ্যে কতই না যুগান্তকারী সব ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল। ভারতীয় নেতারা অপরের যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করাবার জন্যে দাবী করছে অথচ নিজেদের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে তারা একান্ত নারাজ। জাতীয় সরকার ত আর লক্ষ্য হ'তে পারে না। যুদ্ধকালে এই লক্ষ্যের হয়তো কিছু অর্থ থাকলেও থাকতে পারে, এবং তাও এই যুক্তিতে যে, জাতীয় সরকার যুদ্ধ প্রচেষ্টা আরও ভালভাবে চালাতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে পুনর্গঠনের সময় শুধু মাত্র জাতীয় সরকার লক্ষ্য হিসাবে অচল। শান্তির সময়ের লক্ষ্য সুস্পষ্ট আকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতে হ'বে। এ বিষয়ে জাতীয় নেতাগণ একেবারে চুপ।

"ভারতের জাতীয় নেতাগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা চান। এই দাবীর মধ্যে যে যুক্তি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এই ক্ষমতা তো কোন কিছু করার জন্যে চাই। সুতরাং খুব সংগতভাবেই জিজ্ঞাসা করা যায় যে, জাতীয় নেতারা এই ক্ষমতা নিয়ে কী করবেন? যুদ্ধের সময় তাঁদের হাতে সব ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয় নি; এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যেও সেটা হবে

না। তার কারণটাও আজ আর চাপা নাই। ক্ষমতা হাতে পেলে সে ক্ষমতা জাতিপুঞ্জের সাহায্যে লাগবে না, এই ধারণার জন্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় নি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে কারণ দূর হয়ে যাবে। তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জাতীয় সরকারের দাবী মেনে নিতে পারে। কিন্তু জাতীয় নেতাগণ ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মিলে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করলে চলবে না। ভারতের জনগণের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে জড়িত। তাদের মতামত গ্রহণের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। তাদের গভীর সন্দেহ আছে যে, জাতীয় নেতারা ভারতের বুভুক্ষু জনগণের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। যদি এক সন্দেহের কারণে জাতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে না দেওয়া হ'য়ে থাকে তবে আর এক সন্দেহের জন্যেও ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া জনগণের সন্দেহও পূর্বেকার সন্দেহের মতই অমূলক নয়। নেতাদের আচার-ব্যবহার ও কার্যকলাপের ফলেই এই দুই ক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্ভব হয়েছে।

"যুদ্ধোত্তর ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে নেতাদের নীরবতার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, জাতীয় সরকার ভারতের উচ্চশ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হ'বে। বস্তুতঃ ভারতে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট স্বতন্ত্র নেতারা সবাই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মঙ্গলের জন্যে নানারূপ রক্ষণ শুল্ক ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে যত ব্যস্ত, সে তুলনায় জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে তত নয়। অতএব যে জাতীয় সরকার নেতারা পেতে চাইছেন সে রূপ জাতীয় সরকার ইতিমধ্যেই ভাইসরয় গঠন করেছেন স্বতন্ত্র নেতাদের নিয়ে। এরা শিল্পপতি ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রতি খুবই সদয়।

"অর্থাৎ এর দ্বারা এটাই বলতে চাইছি যে, জাতীয় নেতাদের হাতে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, তখন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন হ'বে না—ফলে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন ধারণের মানও বাড়বে না। এই হ'ল যুদ্ধোত্তর ভারতের চিত্র।

"এই অবস্থার জন্যে ব্রিটিশের কোন মাথাব্যথা নাই। কারণ যাঁরা কর্তা, তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাব, হয়তো ইচ্ছারও অভাব।

"আর জাতীয় নেতারা যখন ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে কোনও প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করছেন না, তখন স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যায় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলে তারা স্থিতাবস্থাই রক্ষা করে চলবেন।

"কিন্তু এরা ছাড়াও আরও ভারতবাসী আছে। তারা কিন্তু 'ভাগ্যে যা আছে তা কে খণ্ডাবে', বলে হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদেরও অংশ কিছু কম নয়। যে জাতীয় নেতারা আজ ব্রিটিশের পরিবর্তে ভারত শাসন করার অধিকার দাবী করছেন, তাদের অনেকের চেয়ে এদের ত্যাগ ও দুঃখভোগ অনেক বেশী। এদের কাছে স্বাধীনতা বলতে কেবল বিদেশী মনিবের বদলে দেশী মনিবের পরিবর্তন মাত্র নয়। তারা ক্ষমতা লিপ্সার জন্যে রাজনীতি করতে আসে নি। অবশ্য রাজনীতির অর্থই হ'ল, ক্ষমতা লাভ। সে হিসাবে তারাও ক্ষমতা চায়। কিন্তু তাদের ক্ষমতা চাওয়া একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে এবং সে উদ্দেশ্য তারা সর্বদাই ঘোষণা করে বেড়ায়। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান ও সামাজিক মুক্তি আনাই সে উদ্দেশ্য। এই ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধ জয়ের ফলে সে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবে সে বিষয়ে সতত সতর্ক সচেতনতার জন্যেই তারা এ যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল। জনগণের যে মুক্তির উদ্দেশ্যে তারা সংগ্রাম করে চলেছে তা ফ্যাসিষ্ট অধিকৃত জগতে পাওয়া যায় না। সেই জন্যেই তারা অতি সহজেই বুঝেছিল যে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে ভারতের জনগণের স্বাধীনতা লাভ সুগম হ'য়ে উঠবে। সেই জন্যেই যুদ্ধের লক্ষ্য স্থির হ'য়ে যাওয়া মাত্র তারা ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের পক্ষে ভারতের জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে সর্বান্তকরণে মনোনিবেশ করে। সে কাজে যে তারা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তার প্রকৃত মূল্যায়ণের সময় হয়তো এখন নয়। কিন্তু এটি ঠিক যে, এই যুদ্ধের সবাপেক্ষা সংকট মুহূর্তে ভারতে একমাত্র তারাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মিত্র ছিল। অতিরঞ্জিত না করেই এটা জোরের সঙ্গে বলা যায়, তাদের চেষ্টা না থাকলে এ দেশকে ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়তে হ'ত। তারাই র‍্যাডিক্যাল

---

*কমিউনিষ্টরা যুদ্ধের ২৭ মাস পরে এ যুদ্ধকে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ বলে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাই প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসে তারা প্রথম এই প্রস্তাব তুলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে তার পুরাতন যুদ্ধবিরোধী "লাইন" পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করে। প্রথমে তারা এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে, পরে জার্মানীর রুশিয়া আক্রমণের পর 'দুই যুদ্ধের' নীতি (রুশ-ফ্রন্টের যুদ্ধ ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ, আর অন্যান্য ফ্রন্টের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ) গ্রহণ করে এবং ১৯৪১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ বিরোধিতাই করে আসে। (V. *B. Karnik—The Rip Van Winkle Wakes up—The "Communists" Change their Lines. I. I.*, *21. 12. 41.*)

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গড়ে তুলেছিল। সুতরাং র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিই ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিনিধি।

"র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই দাবী কেবল ভারতকে ফ্যাসিষ্ট অক্ষশক্তির শিবিরে জোর ক'রে টানার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দুঃসাহিক সংগ্রামের জন্যেই করা হচ্ছে না, এ দাবী করা হচ্ছে এই জন্যে যে, কেবল র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিই ভারত এবং জগতের সামনে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির রূপটি তুলে ধরেছে।

"যে সব বড় বড় পার্টি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র দখল করে রেখেছে তারা এ যাবৎ ক্ষমতার জন্যেই পরস্পর কাড়াকড়ি কলহ কোন্দল করে চলেছে। তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা বর্তমান সংবিধানের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করেন, এবং সময় সময় নতুন সংবিধানও রচনা করেন। কিন্তু সকলের দৃষ্টি কেবল ঐ এমন একটি শাসনযন্ত্র গড়ে তোলার প্রতি নিবদ্ধ যা ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর হাতের অস্ত্রস্বরূপ হ'বে; আর আছে পদের জন্যে বিরক্তিকর অতি অশোভন কাড়াকাড়ি।"

"একটি দেশের সংবিধান হ'ল, দেশবাসীর সামাজিক সম্বন্ধ ও অর্থনৈতিক জীবন যে মূল বিধানসমূহের দ্বারা পরিচালিত হ'বে তারই বিবৃতি। সংবিধান অনুসারে যে সরকার গঠিত হ'বে তার কাজ হবে, সেই বিধান সমূহের রূপায়ণ। সকল সংবিধান রচনার এই মূল প্রশ্নটাই ভারতের বড় বড় সংবিধান রচয়িতারা এড়িয়ে এসেছেন। এর মধ্যে অনেকটা অজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা থাকতে পারে, কিন্তু মূলতঃ এটা ইচ্ছাকৃত। ভারতের ভাবী শাসকবর্গ প্রাচীন তথা প্রচলিত প্রথা ও সামাজিক সম্পর্কের গায়ে হাত দিতে চান না, অথচ এই মান্ধাতা আমলের সামাজিক বন্ধনমুক্তির জন্যেই জনগণ সংগ্রাম করে চলেছে!"

"ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে যেরূপ সংবিধান প্রয়োজন, একমাত্র র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিই সেরূপ সংবিধানের মূলনীতি রচনা করেছে। সমগ্র জনগণ যাতে এই সংবিধান রচনার কাজে সক্রিয় ও সচেতন সহযোগিতা করতে পারে, সে পদ্ধতির পরিকল্পনাও এই পার্টি ঘোষণা করেছে। ভারতে সরকার গঠনের সংবিধান রচনা করবে ভারতের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদ। এই প্রস্তাব সর্বপ্রথম র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অগ্রদূতদের কাছ থেকেই এসেছিল। কংগ্রেস এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল প্রথম প্রস্তাবকের নিকট ঋণ-স্বীকার না করেই, বলা বাহুল্য এটিকে বিকৃত করবার

উদ্দেশ্যেই। কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত গণ-পরিষদের প্রস্তাব কংগ্রেসের অন্যান্য প্রস্তাবের মতই নিষ্ফল প্রস্তাবে পরিণত হ'ল। গণ-পরিষদের প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারত, যদি ভারতের বিশেষ প্রকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিষদ গড়ে ওঠার পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি সহ নিখুঁতভাবে উল্লেখ করা হ'ত। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এইরূপ খুঁটিনাটি সহ সম্পূর্ণ পদ্ধতিরই প্রস্তাব দেশের কাছে তুলে ধরেছে। কিন্তু কি জাতীয় নেতাগণ, কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কেউই তাতে কর্ণপাত করেন নি। যদিও ভারতের সংবিধান রচনার অধিকার যে ভারতের জনগণের সে কথা বলার তাদের কামাই নাই। উভয়পক্ষের এই ঔদাসীন্যের কারণ উভয়েরই গণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতির প্রতি অতীব অনীহা, যথা জনগণের সার্বভৌম অধিকার, সুযোগ ও সুবিধা হতে জনগণকে বঞ্চিত রাখা।

"যদি জনগণের মতামত অনুসারে দেশের সংবিধান রচনা করতে হয়, তা হ'লে মতামত দেবার পূর্বে সংবিধানের মূলনীতিগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্যে জনগণকে সুযোগ-সুবিধা. দিতে হয়। গণতন্ত্রে আস্থার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায় তখনই যখন কোনো সংবিধানের মূলনীতিগুলির উপর মতামত দেবার জন্যে জনসাধারণের নিকট তা পেশ করা হয়। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সত্যিকারের বিশ্বাসী পার্টির মনের কথা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করতে ভীত হওয়া উচিত নয়। সেই জন্যে কাউন্সিল চেম্বারের মধ্যে গোল-টেবিলের ধারে বসে স্বাধীন ভারতের সংবিধান সম্বন্ধে আলোচনা না করে জনসাধারণের সামনেই সে আলোচনা করা উচিত। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানের মূলনীতি রচনা করেছে। এবং মূলনীতির দোষত্রুটি খুঁজে বের করার জন্যে এই পার্টি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই মাথাব্যথা আছে বলে যারা জাহির করেন তাদের কাছে এটি পেশ করেছে। গণতন্ত্রের নীতির প্রতি মর্যাদা রেখে এর কোন অংশের প্রতিই আপত্তি জানাবার উপায় নাই। কারণ সর্বজনগ্রাহ্য গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করেই ওই নীতিগুলি রচিত।

"র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নিজের হাতে ক্ষমতা চায় না। জনগণের হাতেই সে ক্ষমতা দিতে চায়। জনগণ কি করে প্রত্যক্ষভাবে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবে সে কথাও পার্টি জানিয়েছে। যদি এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয় তা হ'লে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং ভারত তখন এমন এক উন্নতি ও প্রগতির পথে যাত্রা করবে যার ফলে সে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের উন্নয়ণ পরিকল্পনায় এক সুযোগ্য সহযোগী হ'য়ে উঠতে পারবে।"

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ

বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের সন্ধিক্ষণে ভারত

যুদ্ধের শেষ দিকে রায়ের কার্যাবলীর পূর্বাভাষ পূর্বের দুটি পরিচ্ছেদ থেকেই পাওয়া যাবে।

যুদ্ধ অন্তে ব্রিটিশ গণতন্ত্র যে মুখর ও সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং তার ফলে ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করবে সে বিশ্বাস তখন রায়ের আরও দৃঢ় হয়েছে। সেই জন্যে স্বাধীন ভারতে যাতে জাতীয় সরকার ক্ষমতায় এসে ধনিক-বণিকের রাজত্ব কায়েম না করে, জনগণের হাতেই যাতে ক্ষমতা আসে সে জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মূলনীতি সাধারণ্যে প্রচার করে জনগণকে সচেতন হ'য়ে ক্ষমতা দখল করতে আহ্বান করছেন।

দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত রায়ের কথা, গণতন্ত্রের মূলনীতি ও গণ-পরিষদে জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপায় পদ্ধতি কারুরই কানে ঢুকল না। গণতন্ত্রের যে মূল কথা—মানুষই নিজ প্রচেষ্টায় এই বাস্তব জগতের নিয়ম-কানুন আয়ত্তে এনে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে সক্ষম, তা মেনে সংবিধানে সবসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা না করে জনগণ যুগ-যুগান্তরের অভ্যস্ত গুরুবাদ ও অদৃষ্টবাদকেই মেনে নিল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যে নির্বাচন হ'ল তাতে হিন্দু-মুসলমান জাতীয় সরকারের শূন্যগর্ভ দাবীর ভিত্তিতেই নেতাদের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিল।

তারপর আজ প্রায় বিশ বছর কেটে গেছে। ফল ফলেছে এই যে, মাঠে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে, লোকসভায়, বিধান পরিষদে, বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টে, সংবাদ পত্রে, সভা-সমিতিতে কেবল গাল-মন্দ আর হায় হায় ধ্বনিই শোনা যায়;

রাজনীতির অধ্যাপকরাও বিধান পরিষদের দোরে মাথা কোটেন, উপোস করে পড়ে থাকেন, ঠিক যেমন দেবতা মন্দিরে পল্লী নারীরা মাথা কোটে, উপোস দেয়, ধরণা দেয়। দেখলাম না, কোথাও ভোটাররা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ডেকে এনে তাদের দাবী প্রতিপালন করার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছে, নিজেদের সমস্যা-সমাধানের পরিকল্পনা রচনা করে তা পরিষদে পেশ করার জন্যে চাপ দিচ্ছে, প্রতিপালন না করলে পদত্যাগ করার জন্যে হুমকি দিচ্ছে।

কিন্তু সেকথা এখন থাক। যেকথা বলছিলাম। তখন ১৯৪২ সাল শেষ হ'য়ে ১৯৪৩ সাল চলছে।

রায়ের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তা বললে ঠিক হবে না। রায়ের লেখা, তাঁর ভাষণ, তাঁর সমালোচনা গভীর মনোযোগের সঙ্গেই সকল শ্রেণীর রাজনীতিকরা পড়তেন। তার মধ্যে লাট সাহেবের দরবার থেকে পল্লী নেতারাও থাকতেন। ফলে কংগ্রেস প্রভৃতি পার্টিতে যাঁরা সত্যই গণতন্ত্রী ছিল তারা ১৯২০ সাল থেকেই যেমন প্রভাবিত হ'ত এখনো তেমনি প্রভাবিত হ'তে লাগল। তারা কংগ্রেসকে গণতন্ত্রের পথে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে চলল। পার্টি বহির্ভূত নেতারাও কিছু না কিছু প্রভাবিত হ'ত। ধনিক স্বার্থ রক্ষাকারী অ-গণতান্ত্রিক মনের কথাগুলো সাধারণের মধ্যে তীক্ষ্ণ যুক্তি-সহকারে প্রকাশিত হ'য়ে যাওয়াতে সতর্ক হয়ে উঠতে লাগল।

১৯৪৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী রায় তার 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'তে লিখলেন:

"এই দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা হ'ল একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অতি দ্রুত জাতীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া এতখানি এগিয়ে গেছে যে তা সাধারণের ধারণার বাইরে। আজ গভর্ণমেণ্টের সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিই বৃহৎ শিল্পপতিরা নিয়ন্ত্রণ করেন; এবং এই দেশের অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ মূলধনের ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসছে। সামরিক শক্তির উপর ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটাই কেবল আসে নি। কিন্তু সৈন্য-বাহিনীকেও খেতে পরতে হয়। আধুনিক সামরিক শক্তি দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং দেশের অর্থনীতি যাদের করায়ত্ত সামরিক শক্তির উপর প্রভাবও তাদের কম নয়।"

রায় যুদ্ধের প্রারম্ভেই এই কথা কংগ্রেসকে বলেছিলেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা আপনা-আপনিই এসে যাবে, এবং

ফ্যাসিবাদের পতনে জনগণের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান হবে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশ্বের জনগণের সচেতন সহযোগিতার ফলে ধনীদের প্রভাব কমবে, পরিশেষে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'বে।

কিন্তু সে কথা কংগ্রেস শোনে নি। রায়ের সব অনুমানই সত্য হ'তে চলল, কেবল জনগণের সচেতনতার অভাবে ধনিক শ্রেণীরই ষোল আনা লাভ হ'তে লাগল। জনগণ এগিয়ে না আসাতে প্রতিবিপ্লবীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'তে লাগল। তথাপি তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নাই। অক্লান্ত উদ্যমে জনগণের হাতে ক্ষমতা আনবার চেষ্টা চলল। তিনি ১৯৪৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী লিখলেন :

"এই দেশে জাতীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠছে এক অভাবনীয় শক্তির আনুকূল্যে। অপসৃয়মান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শূন্যস্থান পূরণ করছে এই নতুন গড়ে ওঠা রাষ্ট্র। এই যে একই সঙ্গে দুই রাষ্ট্রের অবস্থিতি, এর দ্বারা এক বৈপ্লবিক যুগের আবির্ভাব সূচনা করছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হ'বে প্রত্যেক বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই যুগপৎ বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের। সব কিছুই যখন দ্রুত পরিবর্তনের অবস্থায় এসে যায় তখন পরিবর্তনটা বিপ্লবের পথে মোড় নেবার যেমন সম্ভাবনা থাকে, তেমনি থাকে প্রতিবিপ্লবের দিকে ঝুঁকবার।" (I. I., 31/1/43)

অর্থাৎ রায় জনগণকে বলছেন, এই অবস্থায় সামান্য চেষ্টাতেই জনগণের হাতে ক্ষমতা এসে যাবে কিন্তু সেই সামান্য চেষ্টাটুকু করা চাই। ১৪ই ফেব্রুয়ারির কাগজে তিনি লিখলেন :

"জনগণ বহুদিন ধরে ভারতে স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে একে জনগণের মুক্তি সংগ্রাম বলা চলে না।

"ইতিহাসের এটা একটা সাধারণ ঘটনা যে, যখন কোন শ্রেণী তার নিজ শক্তিবলে দাবী আদায় করতে পারছে না, তখন সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে দাবী আদায় করার চেষ্টা করছে। অন্যান্য শ্রেণীকে, বিশেষতঃ জনগণকে সংঘবদ্ধ করে তোলার জন্যে, (যাদের সংহত শক্তির ক্ষমতায় জয় অনিবার্য) এই শ্রেণী এমন সব স্লোগান ও দাবী তুলে ধরে যাতে জনগণের মন ভোলে। কিন্তু এই সব স্লোগান ও দাবী এমন কৌশলের সঙ্গে রচনা করা হয় যাতে জনগণের সমর্থন লাভ করা যাবে অথচ ফাঁক ও ফাঁকি থাকায় কোন সঠিক দাবী পূরণের বাধ্যবাধকতাও থাকে না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ঠিক অনুরূপ অবস্থা হয়েছে।

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট থেকে ভারতের উচ্চশ্রেণীর নিজ স্বার্থ আদায়ের জন্যে জনগণের সমর্থন প্রয়োজন হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই জাতীয় স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল; এবং তার ফলেই জনগণকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির সংগ্রামে টেনে আনা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু জনগণের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যাতে বিদেশীয় ও দেশীয় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামে রূপান্তরিত হ'য়ে না যায় সেই জন্যে তাঁরা স্বাধীনতার আদর্শকে যথাসম্ভব অস্পষ্ট ও শূন্যগর্ভ করে রাখতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে।"

এইখানে রায়ের ১৯২০ সালে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের নিকট ঔপনিবেশিক সমস্যা সমন্ধীয় থিসিসের কথা স্মরণীয়। তাঁর অনুমান যে সত্য তা ২৩ বছর পরের ঘটনাবলীর দ্বারা সমর্থিত হয়ে চলল। তিনি এই প্রবন্ধেই লিখলেন:

"ব্রিটিশ শাসনের অবসান একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু জাতীয় ধনতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন আরও জরুরী। একমাত্র জনগণের সরকারই কৃষককে জমি দিতে পারে, শ্রমিকদেরর ক্রমবর্ধিত হারে জীবনধারণের মান বাড়াতে পারে এবং সর্বসাধারণের জন্যে প্রগতি ও প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করতে পারে।

"জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে তা দেশের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ণের জন্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের ও শাসন-কার্য পরিচালন ব্যাপারের পরিবর্তন সাধন করবে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সাম্য পরস্পর সহযোগিতা করে চলবে, যাতে জনগণ চার বা পাঁচ বছর অন্তর ব্যালট বাক্সে একবার মাত্র নাম-কা-ওয়াস্তে ভোটপত্র ফেলেই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সব অধিকার শেষ করে দেবে না, দেশ শাসনের দৈনন্দিন কাজকর্মকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সাধারণ মানুষই হ'বে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার প্রকৃত মালিক, এবং তা মাত্র কাগজ-পত্রেই লেখা থাকবে না—বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়েই সে অধিকার রূপায়িত হয়ে উঠবে। সাধারণ মানুষ খাওয়া-পরার সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দিনের খানিকটা সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করে উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়া পত্তন করতে সক্ষম হ'বে।*

*এখানে রায় তার নিউ হিউম্যানিজিমের রাষ্ট্ররূপটির কথাই বলছেন। জেল থেকে বের হবার পর থেকে তিনি এই আদর্শই যে প্রচার করে চলেছেন এবং তা ১৯৩৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল তাঁর কাগজে প্রকাশ করেছিলেন তা আমরা পূর্বে বলেছি—লেখক।

"জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হ'য়ে জাতীয় নেতাদের কাম্য স্বাধীনতা যদি আসে তবে সেই স্বাধীনতা নিপীড়িত মানুষ যাতে এই সকল রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়চর্চায় আনুকূল্য পায় সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটাই হবে জনগণের স্বাধীনতার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ।

"র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি স্বাধীন ভারতের সংবিধানের যে মূলনীতি প্রণয়ন করেছে তাতে জনগণের এই স্বার্থ সম্পূর্ণরূপেই রক্ষিত হয়েছে।"

ব্রিটেন কর্তৃক কংগ্রেস-লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন পর্যন্ত তিনি "জাতীয় সরকারের" পরিবর্তে "জনগণের সরকারের" হাতে যাতে সেই ক্ষমতা আসে সেই চেষ্টা করে গেছেন; এবং তাতে বিফলই হয়েছেন।* সংক্ষেপে সেই ইতিহাসটুকু বলে এই কাণ্ডের ইতি টানব।

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রায় কেবল জনগণকে নিজেদের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি বললেন :

"এখন প্রয়োজন কেবলমাত্র ভারতীয় গণতন্ত্রের এগিয়ে আসা। "Now it remains for the Indian Democracy to assert itself."

(I, I., 7/3/43)

ক্রীপ্‌স দৌত্যের সময় দিল্লী থেকে যে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'র দৈনিক সংস্করণ বেরুচ্ছিল তার নাম ১লা সেপ্টেম্বর থেকে "Vanguard" রাখা হ'ল। স্মরণ করা যেতে পারে ইউরোপ থেকে প্রকাশিত রায়ের সেই বিখ্যাত কাগজের নামও ছিল "Vanguard"।

এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়া কলকাতা থেকেও বাংলা সাপ্তাহিক "জনতা" ও People's Voice নামেও একটি ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত।

* Vide—M. N. Roy—*National Government or People's Government.*

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পিপল্‌স্ প্ল্যান

১৯৪৩ সালের জুলাই থেকে অগাষ্ট মাসে রায় 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'তে পরিকল্পিত অর্থনীতি, Planned Economy শীর্ষক চারিটি প্রবন্ধে যুদ্ধোত্তর ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ণ পরিকল্পনার মূলনীতির একটি সংক্ষিপ্ত আভাষ দিলেন। তাতে লিখলেন:

"শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই যদি উৎপাদন করা হয় তবেই ভারতে দ্রুত শিল্পায়ণ সম্ভব, নতুবা নয়। অন্য কথায়, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মে চললে, অর্থাৎ বাজারে বিক্রী করে লাভ করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করতে চাইলে দ্রুত শিল্পায়ণ সম্ভব নয়।"

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা তাও তিনি তখন লেখেন:

"ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধান বড়ই কঠিন কাজ। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, প্রতি বছর পাঞ্চাশ লক্ষেরও বেশী নতুন মানুষ জন্মাচ্ছে তখন এই সমস্যা আরো সুকঠিন মনে হয়।—The problem of numbers is indeed a stupendous task but the problem becomes still more baffling when we remember the five million or so of extra mouths to feed that appear on the scene every year."

অবশ্য এই সমস্যার সমাধান তাঁর পরিকল্পনায় ছিল।

এই নীতির উপরই পরে ইণ্ডিয়ান ফেডারেসন অব লেবার নিযুক্ত The Post War Reconstruction Committee-র দ্বারা রচিত পিপল্‌স্ প্ল্যান (People's Plan) ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে দেশের নিকট আলোচনার্থ প্রকাশ করা হ'ল।

রায়ের যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার উদ্যমে সচকিত হ'য়ে অতি তৎপরতার সঙ্গেই ভারতের শিল্পপতিরা এক পরিকল্পনা পেশ করলেন। পরিকল্পনাটি স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, টাটা, বিড়লা প্রমুখ সাতজন শিল্পপতি এবং অর্থনীতিবিদ জন মাথাই-এর নামে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হ'ল। ভালই হ'ল। রায় এতদিন তাঁর যুক্তিসঙ্গত অনুমানের উপর নির্ভর করে ধনীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা এই পরিকল্পনার দ্বারা সমর্থিত হ'ল।

এই পরিকল্পনায় ধনীরা স্বীকার করলেন যে, সর্বাগ্রে কলকারখানা গড়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। পাঁচ বছর প্রস্তুতি পর্বের পর ১৫ বছরে তাঁরা ৫ গুণ শিল্প বৃদ্ধি করবেন অর্থাৎ শতকরা ৫০০% ভাগ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হবে মাত্র শতকরা ১৩০% ভাগ। এর জন্য জাতীয় সরকার "নোট ছেপে" ধনীদের হাতে মূলধন জোগাবেন। এই জাতীয় সরকার "ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করবেন" এবং জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে উৎপাদন না হয়ে, "যাতে সরকারী উদ্দেশ্যে উৎপাদন চলে সেদিকেই লক্ষ্য রাখবেন।"

নোট ছেপেই এই পরিকল্পনার অধিকাংশ মূলধন আসবে এবং তার ফলে সর্বাগ্রে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘ'টে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের জীবনধারণের মান যে কমে যাবে সেটা জানা কথা। সেই জন্যে এই পরিকল্পনায় ২০ বছরে যখন মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে তখন টাকার হিসাবে তা বাড়লেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে তাতে যে মানুষের প্রকৃত জীবনধারণের মান কমেই যাবে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। পরিকল্পনাটি একেবারে পরিকল্পিত ধনতন্ত্র (Planned Capitalism) অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

মার্চ মাসে রায়ের পরিকল্পনা প্রকাশিত হ'ল। এই দুই পরিকল্পনাকে পাশাপাশি রেখে তিনি সারা ভারতে এক প্রবল আন্দোলন সুরু করলেন।

রায়ের এই সাধারণ মানুষের জন্যে রচিত প্ল্যানের প্রধান লক্ষ্য হ'ল, সর্বাগ্রে কৃষির উন্নতিবিধান। এর কারণ স্বরূপ প্ল্যানে বলা হ'ল: "এটি প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, ভারতের জনগণের দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র উপায় হ'ল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা। এই মতটি একান্তই ভাসা ভাসা এবং এতে মাত্র অর্ধ সত্যই প্রকাশিত হয়। আর, সকল অর্ধ সত্যের মতই এটিও বিপজ্জনক। ....ভারতে বৃহৎ শিল্পায়ণের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হ'ল অধিকাংশ লোকের অতি সামান্য ক্রয় ক্ষমতা।

জনগণের ক্রয় ক্ষমতা যদি বাড়াতে হয় তবে সর্বাগ্রে কৃষির উপরেই গুরুত্ব দিতে হ'বে, কারণ দেশের অধিকাংশই কৃষিজীবী।" (M. N. Roy—*People's Plan*—para 8.)

সেই জন্যেই রায়ের এই পরিকল্পনায় দশ বছরে চার গুণের বেশী কৃষি উন্নয়ণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কৃষকের হাতে জমি দিয়ে কৃষকের ঋণ-মকুব ক'রে এবং সম্পূর্ণ সরকারী খরচে কৃষি উন্নয়ণের ব্যবস্থা ক'রে এই উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্ভাবনাপূর্ণ করে তোলা হয়েছিল।

দেশের সমগ্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যই করা হয়েছিল মানুষের অভাব মোচনের জন্যে, বাজারে বিক্রী করে ধনীর লাভের উদ্দেশ্যে নয়। অনুমান করা হয়েছিল, এই কৃষিশিল্পের উন্নয়ণ যখন লাভের উদ্দেশ্যে হবে না, তখন ব্যক্তিগত মূলধনও এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে বিশেষ পাওয়া যাবে না। সরকারকেই এর মূলধন সরবরাহ করতে হ'বে। সেই সঙ্গে সরকারের উপর জনগণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকলে এই পরিকল্পনাও গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা হয়ে উঠবে। এইরূপ গণতন্ত্রের মূলনীতির খসড়া র‍্যাডিক্যাল পার্টি কর্তৃক অনেক দিন পূর্বেই প্রচারিত হয়েছিল। (Vide—M. N. Roy—*Planning* & *Planning*; & Articles on *Planning* in Independent India.—Feb-March 1944 Issues)

স্বাধীন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যদিও ধনীদের পরিকল্পনার ধাঁচেই হয়েছিল এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় পরিকল্পনাও সেই ধাঁচেই চলেছে তথাপি ফ্যাসিবাদের উলঙ্গরূপ যে তাতে ছিল না, তার কারণ হয়তো রায়ের এই উভয় পরিকল্পনার তুলনামূলক সমালোচনা ও ব্যাপক আন্দোলনের জন্যে।

৫ই মে থেকে ৭ই মে ঝরিয়ায় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিশেষ সম্মেলনে এই পিপলস্ প্ল্যান গ্রহণ করা হ'ল এবং সারা ভারতে তা প্রচার ও আন্দোলনের ব্যবস্থা করা হ'ল।

১৯৪৪ সালের জুন—পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ নৌ-অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়ে হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সমরাঙ্গন সৃষ্টি করেছে। জুলাই মাসের মধ্যেই রুশিয়া থেকে হিটলারের বাহিনী প্রায় বিতাড়িত। ইটালিতে অবতরণ করে এ্যাংলো-আমেরিকান বাহিনী অব্যাহত গতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছে। ইটালির পতন আসন্ন। আসাম বর্মা সীমান্তে জাপানীরা হেরে গেছে—ক্রত

পিছু হ'টে চলেছে। কোহিমা-ইম্ফাল রোড পুনরায় ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে ফিরে এসেছে। উত্তর বর্মায় চীন-আমেরিকান বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত। পোর্ট ব্লেয়ার বম্বার্ড করে দক্ষিণ বর্মায় ব্রিটিশের নৌ অভিযান আসন্ন। জাপানের প্রধান নৌবাহিনী পূর্ব ফিলিপাইনের নৌ-যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ শেষ হ'য়ে এল। রায়ের আশা সাফল্যমণ্ডিত হতে যাচ্ছে। ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হবে, সেই সঙ্গে বিশ্বের সকল উপনিবেশ ও পরাধীন জাতি মুক্তি পাবে। কিন্তু জনগণের হাতে ক্ষমতা আসবে কি? এখন শুধু ঐ এক ভাবনা!

যুদ্ধ শেষ হ'তে চলেছে। রায় বুঝলেন, শীঘ্রই ব্রিটেনে নির্বাচনের ব্যবস্থা হ'বে এবং লেবার পার্টি জিতবে। তখন ভারতে নির্বাচনের ব্যবস্থা ক'রে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টা হবে। তিনি এও বুঝলেন যে, অন্য সকল পার্টিই সেই শতকরা ১৩ জন মানুষের ভোটের উপরই নির্বাচন চাইবেন। তিনি তখুনি দাবী তুললেন, সকল পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকার। এই মর্মে ৫ই জুলাই র‍্যাডিক্যাল পার্টি এক বিবৃতি প্রকাশ করে সারা দেশে এই দাবী নিয়ে আন্দোলন সুরু করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রায়ের এ দাবীটুকুও ব্রিটিশ সরকার পূর্ণ করল না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের শেষে কলিকাতায় র‍্যাডিক্যাল পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন বসল। প্রধান কার্যসূচী হ'ল, রায় রচিত স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া গ্রহণ।

ভারতে সমগ্র রাজনৈতিক পার্টির ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ পর্যন্ত জনসধারণ কেবল ফাঁকা স্বরাজের বুলিই শুনে এসেছে। এইরূপ পটভূমি ও পরিবেশে স্বাধীন ভারতের সম্পূর্ণ সংবিধান ও তার গ্রহণ পদ্ধতি সম্বন্ধে পার্টি সম্মেলনে আলোচনার ঘটনাটি সত্যই অভিনব।

এই সংবিধানের মূল সূত্রগুলি গত দু'বছর ধরে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ও শিক্ষিত মহলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। রায় এই খসড়ার ভূমিকাতে লিখলেন :

"সংবিধানের এই খসড়াটিতে মূল ও প্রধান প্রশ্নগুলি সম্বন্ধেই লিখিত হয়েছে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলি পরে পূরণ করলেও চলবে। সংবিধানের মোটামুটি খসড়া হিসাবে এটি একটি সামগ্রিক দলিল।

"মূল প্রশ্ন হ'ল, (১) ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক পদ্ধতি; (২) রাষ্ট্রের গঠন; এবং (৩) ক্ষমতা হস্তান্তরকারী শক্তি।

"প্রধান বিতর্কমূলক সমস্যা হ'ল, মোসলেম লীগের দাবী। অনুন্নত শ্রেণী প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের দাবীও বিতর্কমূলক। এই খসড়াটিতে সেই সকল মূল সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়েছে।

"ধরে নেওয়া হয়েছে যে, একপক্ষ ক্ষমতা দাবী করছে, আর এক পক্ষ তা দিচ্ছে। ভারতীয়দের হাতে এই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হচ্ছে স্বাধীন ভারতের

সংবিধান রচনা করার জন্যে। এই মূল স্বীকৃতি থেকে দু'টি প্রশ্নের উদ্ভব হয় : (১) কোন্ ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে? এবং (২) কোন্ পদ্ধতিতে হস্তান্তর কার্য সম্পন্ন হবে? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের উত্তরের দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

"এই খসড়ার প্রধান প্রত্যয় হ'ল, ভারতের সমগ্র জনগণের হাতে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তবেই একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হ'তে পারে।

"এযাবৎ উভয় পক্ষ থেকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়ে এসেছে, সর্বজনগ্রাহ্য এই গণতান্ত্রিক প্রত্যয়ের দ্বারা সে সবই বাতিল হয়ে যায়।

"প্রায় সকল পক্ষ থেকেই বলা হয়ে এসেছে যে, জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী গণ-পরিষদ কর্তৃক ভারতের রচিত সংবিধান রচিত হ'বে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও এই পরিষদ গড়ে ওঠার পদ্ধতির প্রশ্ন সমাধান করতে হয়। এই গণ-পরিষদ আহ্বান করবে কে? কোন্ উপায়ে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা এর ওপর ন্যস্ত হ'বে?

"জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে গণ-পরিষদ গড়ে তুলল, কিংবা গণ-পরিষদ গড়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, এক্ষেত্রে সে সব প্রশ্ন ওঠে না। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার বিতর্কে যে সকল পক্ষ অংশ গ্রহণ করছেন তাদের কেউই এই বিদ্রোহের পথে গণ-পরিষদ গড়ে তোলার পক্ষপাতী নয়। অবস্থা যখন এই, তখন ভারতের সংবিধান রচনার জন্যে গণ-পরিষদে সম্মিলিত হবার আগে একটি বৈধ শক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন, যে শক্তি এই গণ-পরিষদ আহ্বান করার উপযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ বিদ্রোহী জনগণ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন যখন অবাস্তব তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকেই ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্যে উদ্যোগী হ'তে হ'বে।

"এই সকল দিক পর্যালোচনা করে দু'টি সিদ্ধান্তে আসা গেছে। প্রথমতঃ ভারতের জনগণকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটি আইন রচনা করতে হ'বে; এবং দ্বিতীয়তঃ মধ্যবর্তী কালের জন্যে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্যেও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন রচনা করতে হ'বে।

"সুতরাং পদ্ধতিটির মধ্যে আর জটিলতা নাই। প্রথমতঃ ভারতের জনগণের হাতে বিধিমতে ও আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতে একটি বিধিবদ্ধ সরকার গঠন, যার সাহায্যে জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালন করতে সক্ষম হ'বে। বস্তুতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তরের ভিত্তিতে

এক সংবিধানের পরিবর্তে অন্য এক সংবিধান প্রবর্তন পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলার জন্যে একটি অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা একান্তই অপরিহার্য।

"অস্থায়ী সরকারের গঠন সম্বন্ধে কোন বিতর্ক উঠবে না। যারা এই বিশেষ প্রকারের সংবিধান রচনার অঙ্গীকারে আবদ্ধ তাদের নিয়েই এই অস্থায়ী সরকার গঠিত হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনটি একটি দানপত্রের অনুরূপ হবে। এই দানপত্রে যিনি স্বাক্ষর করবেন তাঁর যেন অছি নিযুক্ত করার আইন সঙ্গত ক্ষমতা থাকে। উক্ত অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে। এ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের বাহন হবে মাত্র।

"ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি একমত হতে পারলেন না। সুতরাং অনির্দিষ্ট কাল ধরে এইরূপ অস্থির এলোমেলো পরিস্থিতি দূর করতে হ'লে পার্লামেন্টকেই অগ্রণী হ'তে হ'বে। এই খসড়াটিতে যে পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হ'ল, যে সব পার্টি ও নেতারা এ যাবৎ ভারতের জনসাধারণের ভাগ্য নির্ধারণ করতে একমত হ'তে পারলেন না, তাদের হাতে সে ভার আর না রেখে জনসাধারণের হাতেই তুলে দেওয়া। এই খসড়া এমন কতকগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক মূলনীতির উপর রচিত যে, এটি সকল মুক্তিকামী ও প্রগতিবাদী ব্যক্তিগণের নিকট থেকেই সমর্থন লাভ করবে। এই নীতিগুলি সুস্পষ্ট আকারে গত দু'বছর ধরে দেশের কাছে আলোচনার জন্যে পেশ করা হয়েছিল, এবং বহুজনের দ্বারা সমর্থিতও হ'য়ে এসেছে। এটা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আশা করা যেতে পারে যে, সুযোগ পেলে এটিও অনুরূপ ভাবেই অধিকাংশ লোকের সমর্থন লাভ করবে। সুতরাং খসড়াটিতে যে পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে তার জন্যে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের উপর এই সংবিধানটি চাপিয়ে দিচ্ছে। বরং এটা ভাবাই উচিত হবে, ব্রিটিশ গণতন্ত্র ভারতের জনগণের প্রতি তাদের সহযোগিতা ও সদিচ্ছাপূর্ণ হস্ত প্রসারিত করছে।

"গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ'ল, সংবিধানটি কী ভাবে দেওয়া হচ্ছে তা নয়, সংবিধানের মধ্যে বস্তু কী আছে সেইটি। যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংবিধানটি আলোচনা করা হয় তা হ'লে নিশ্চয় করে বলতে পারি, এই সংবিধান ভারতে সর্বাধিক পরিমাণ মতৈক্য লাভ করবে, এবং যে পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে, তা যে কেবল কার্যটি দ্রুত নিষ্পন্নের সুবিধার জন্যেই করা হয়েছে, এই বিবেচনাতেও এটি সমর্থিত হবে।

"এই খসড়াটি যদিও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত আইনেরই একটি অংশ মাত্র হ'বে, তথাপি এই আইনের বলেই ভারতের জনগণের একে গ্রহণ করার বা বর্জন করার অধিকার থাকবে। সেই জন্যে এই খসড়ায় প্রস্তাবিত পদ্ধতির দ্বারা ভারতের জনগণের সার্বভৌমত্ব কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। অবশ্য এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কৃত আইনের মধ্যে এই সাংবিধানিক অংশটি একান্তভাবেই সুপারিশ মাত্র। এই খসড়াটিতে ধরে নেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বিশ্বাস করে যে, এই সংবিধানের দ্বারা ভারতে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হ'বে এবং ভারতের জনগণকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে এগিয়ে দিতে সক্ষম হ'বে।

"এই খসড়াটিতে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের রূপ দেওয়া হয়েছে। এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যে ত্রুটির জন্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি, এতে সে ত্রুটি দূর করা হয়েছে।

"মোসলেম লীগের দাবী সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণ করা হয়েছে। মোসলেম লীগের বর্তমান দাবী, (ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই ভারতের কিয়দংশের বিভাজন) ক্ষমতা হস্তান্তর পদ্ধতিতে আটকায়। এই খসড়া সে সমস্যারও সমাধান করেছে। ভারতকে এক অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করেই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপরে অস্থায়ী সরকার কর্তৃক (এই সরকার কোন নির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়ী নয়) প্রদেশ সমূহ পুনর্গঠিত হওয়ার পর যে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ না দিতেও পারে।

"একদিকে যেমন অনিচ্ছুক প্রদেশসমূহকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যাতে এইরূপ বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাব প্রশ্রয় না পায় সেই জন্যেও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এককেন্দ্রিকতার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

"১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মধ্যে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা ছিল, দেশীয় রজেন্দ্রবর্গের কায়েমী স্বার্থের জন্যে তা গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। অন্য যে কোন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাই ঐ একই বাধার সম্মুখীন হ'বে। কিন্তু সমস্যাটির সমাধানের অন্য পথ আছে। সমস্যাটি বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায়: কোন কোন উপরাষ্ট্র যদি স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে থাকে তা হ'লে তাদের নিয়ে কি একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব? স্পষ্টতঃই এর জবাব নেতিবাচকই হ'বে। যদি ভারতের জনগণের হাতে

সার্বভৌমিক ক্ষমতা হস্তান্তরই করা হয় তা হ'লে সে অধিকার থেকে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীগণকে বঞ্চিত করা ন্যায়সঙ্গতও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। এই সকল অধিবাসীর প্রতি যদি ন্যায়সঙ্গত সুবিচার করা হয় তা হ'লে রাজন্যবর্গের দাবী টেকে না। দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে ব্রিটিশ-রাজের সন্ধি পত্রের যুক্তি খুব টেকসই নয়। এই সব সন্ধিকে যদি পবিত্র জ্ঞানে অলঙ্ঘণীয় ভাবা হয় তা হ'লে ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিবর্তে রাজন্যবর্গের পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্র না হ'লেও তাদের স্বৈরাচারকে সমর্থন দিয়েই চলতে হয়। এই প্রতিক্রিয়াশীল-অঙ্গীকার অস্বীকার করা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে আইন সঙ্গতও বটে আর নৈতিক কর্তব্যও বটে। এই সন্ধিপত্রগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছিল। সে পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল সন্ধিপত্র বাতিল হ'য়ে গেছে। এটি যদি দায়িত্বের প্রশ্ন হয় তা হ'লে দেশীয় রাজ্যের প্রজাবর্গের দায়িত্ব ব্রিটিশরাজ অস্বীকার করতে পারেন না। কয়েক শত রাজন্যের নিকট দায়িত্ব কয়েক কোটি মানুষের নিকট দায়িত্ব অপেক্ষা বড় হ'তে পারে না।

"এই ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক বিচারের দিক থেকে এবং গণতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা দূর করার জন্যে এই সংবিধান দেশীয় রাজ্যগুলির অবলুপ্তির ব্যবস্থা করে ভাষা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সংগে তাদের সংযুক্তির ব্যবস্থা করেছে। যে পদ্ধতির দ্বারা রাজন্যবর্গের অধিকার লুপ্ত হ'বে এবং অস্থায়ী সরকার রাজ্যগুলিকে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করবে সে পদ্ধতিটি Bill of Succession-এ (উত্তরাধিকার আইন) বা এই সংবিধানের মধ্যে উল্লিখিত হয় নি। এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক এই সংবিধান সম্বলিত বিল অব্ সাকসেসনটি গৃহীত হবার পূর্বেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেবেন, যার ফলে তাঁদের ভারতের কোন অংশের উপরই কোন শাসনাধিকার থাকবে না। সম্মানের সঙ্গে বাস করবার মত তাঁদের মাসোহারার ব্যবস্থা করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রাজন্যবর্গের সঙ্গে সহজেই এ ব্যবস্থা করতে পারেন। রাজন্যবর্গের অধিকার বিলোপের জন্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁদের সঙ্গে যে সর্ত করবেন তা একটি চুক্তির দ্বারা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উপর বর্তাতে পারে কিংবা সংবিধানের মধ্যেই তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

"এই খসড়াতে সংহত গণতন্ত্রকেই (রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতাসহ গ্রাম-সভা) সকল সাংবিধানিক ক্ষমতার উৎস রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংহত গণতন্ত্রই (Organised Democracy), জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের যন্ত্রস্বরূপ হ'বে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, বিচ্ছিন্ন অসংহত ভোটদাতা গণতন্ত্রকে কার্যকরী করে তুলতে পারে না। এই সংবিধান অনুসারে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে তা হবে গ্রামভিত্তিক এবং এই গ্রাম সংগঠনগুলি হয়ে উঠবে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার এক-একটি বিদ্যাপীঠ। ভারতের মত অশিক্ষিত দেশে পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের আপত্তি এই ব্যবস্থার দ্বারা খণ্ডিত হচ্ছে। এইরূপ সংহত গণতন্ত্রের দ্বারা ভারতের মত বিশাল দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দুরূহতাও দূরীভূত হবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন বিভাগের সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালন বিভাগের সহযোগিতা সম্ভব হ'বে। রাষ্ট্রের এই দুই কার্যের পৃথক সত্তার ফলে সমাজ-জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব শূন্যগর্ভ বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

"এই খসড়াটি মূলতঃ সাধারণতান্ত্রিক (প্রকৃত গণতন্ত্র মাত্রই সাধারণ তান্ত্রিক—রিপাবলিকান); অথচ রাষ্ট্রপতিকে প্রেসিডেণ্ট নামে অভিহিত না করে গভর্ণর জেনারেল নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অনেকে হয়তো বিস্মিত হ'তে পারেন। এই আপত্তি খণ্ডন করার জন্যে বলা যেতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নাম যদি প্রেসিডেণ্ট হয়, তা হ'লে প্রাদেশিক সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকেও প্রেসিডেণ্ট বলতে হয়; কারণ প্রদেশগুলির শাসনতন্ত্র গণতান্ত্রিক বিধায় সেগুলিও সাধারণতান্ত্রিক। এই অবস্থায় ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধতে পারে। প্রদেশগুলিও যদি নিজ নিজ এলাকায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের অধিকার পায় তা হ'লে সাংবিধানিক নীতি অনুসারে প্রদেশগুলি হ'বে স্বাধীনসত্তাবিশিষ্ট রাষ্ট্র। তা হ'লে যুক্তরাষ্ট্র আর থাকবে না। আমেরিকার সংবিধানে এই সংকটত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছে প্রাদেশিক রাষ্ট্রপতিদের গভর্ণর আখ্যায় আখ্যাত করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে গভর্ণর জেনারেল নামে অভিহিত করতে ক্ষতি কি? আমেরিকার সংবিধানে এই অযৌক্তিক ব্যবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রদেশপতিদের প্রেসিডেণ্টের নিম্নপদস্থ আসন দেওয়া হয়েছে। এই অসামঞ্জস্য দূরীকরণের জন্যেই এই খসড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানকে গভর্ণর-জেনারেল রূপে

অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রেসিডেণ্টই হ'বেন, কারণ পদটি নির্বাচনমূলক। প্রাদেশিক গভর্ণরের পদকেও নির্বাচনমূলক পদরূপে গণ্য করে প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

"এই খসড়ার কোন কোন অংশ সম্ভবতঃ নতুন মনে হ'বে। পুরাতন যুগের সাংবিধানিক তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট হয়তো সেগুলি রীতিমত অসঙ্গত বলেই মনে হবে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর জগতে যুদ্ধপূর্ব ব্যবস্থা যে টিকিয়ে রাখা যাবে না তা ক্রমেই অধিক সংখ্যক মানুষের ধারণায় আসছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এই উভয় দিক থেকেই পৃথিবীকে পুনর্গঠিত করে তুলতে হ'বে। এই পুনর্গঠন যদি সত্যিকারের হয় তা হ'লে রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতার একটি সম্বন্ধ রাখা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধের ভিত্তির উপরেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান কার্যকরী হ'য়ে উঠতে পারে।

"এই মহাযুদ্ধের কটাহ থেকে এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'বে। ভারত হ'বে সেই নতুন পৃথিবীরই এক অংশ। এই খসড়াটি সেই নব-ভারতের ছবি তুলে ধরেছে।

"যদি ভারতের সকল রাজনৈতিক পার্টি এই সংবিধানকে সমর্থন করে তবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের গত্যন্তর থাকবে না। এ যাবৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে অঙ্গীকার বার বার করে এসেছেন সে অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে তাঁকে এই সংবিধান গ্রহণ করতে হ'বে। তা ছাড়া অন্যান্য, রাজনৈতিক পার্টি যদি ভারতের জনগণের মুক্তিকামী হ'ন, তা হ'লে তাদের এই সংবিধান গ্রহণ না করার কোন হেতু নাই। তাঁরা যদি এটি গ্রহণ না করেন তবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হয়তো এই মতান্তরের অজুহাতে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র স্থাপনের কাজকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিদ রেখে দিতে পারে।

"সেক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি একদিকে যেমন এই সংবিধানটিকে পার্লামেণ্টে গ্রহণ করে ভারতের জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্রিটিশ ডেমোক্র্যাসিকে আবেদন জানাবে, তেমনি অন্যদিকে এই সংবিধানের সমর্থনে জনমত গড়ে তুলবে। এই জনমতের দ্বারা বাধ্য হ'য়ে তখন হয়তো ভারতীয় পার্টিও নেতাদের 'খাব না, খেতেও দেবনা' নীতিকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অগ্রণী হবেন। অন্যথায় ভারতীয় জনগণ তখন নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা জাহির করে এই সংবিধান গ্রহণ করতে গণ-পরিষদ আহ্বান করবে—তখন এ পথ ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ এম, এন, রায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ওয়াভেল প্রস্তাবের পরিণতি

১৯৪৩ সালের অক্টোবরে লর্ড লিনলিথগোর পরিবর্তে ভাইসরয় রূপে ভারতে আসেন লর্ড ওয়াভেল। ১৯৪৫ সালের ৮ই মে হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে ফ্যাসিবিরোধী শক্তির জয় সম্পূর্ণ হয়। এবার ব্রিটেনে দশ বছর পর সাধারণ নির্বাচন হবে। গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের জনগণের সমর্থনের জন্যে চার্চিল পুনরায় ক্ষমতা হস্তান্তরের এক প্রস্তাব পাঠালেন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের মারফৎ। ক্রীপ্‌স প্রস্তাব অপেক্ষা এ প্রস্তাব নিকৃষ্ট এই জন্যে যে, তাতে জাতীয় সরকারের দাবী মেনে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারেই ভাইসরয়ের কাউন্সিলই থাকবে, কেবল ভারতীয় করণ হবে মাত্র।

ওয়াভেল ১৪ই জুন সেই প্রস্তাব ঘোষণা করে ২৫শে জুন সিমলায় এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। আমন্ত্রণ জানালেন কংগ্রেসকে, মোসলেম লীগকে, শিখদের, সিডিউল ভুক্ত সম্প্রদায়কে এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের ইউরোপীয় দলকে। সকলেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সকল সদস্য জেলে ছিলেন, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হ'ল।

এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল, ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতৃবর্গের দ্বারা পুনর্গঠিত করে ভারতকে স্বাধীনতা-লাভের জন্যে প্রস্তুত করে তোলা। একজিকিউটিভ কাউন্সিলে এক ভাইসরয় ও কম্যাণ্ডার ইন চীপ ছাড়া আর সকলে ভারতীয়ই হবেন। প্রতিরক্ষাবিভাগ ছাড়া আর সকল বিভাগের দায়িত্বভারই ভারতীয় সদস্যদের হাতে থাকবে।

কাউন্সিল গঠিত হ'বে সমসংখ্যক বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সদস্য এবং সিডিউল শ্রেণীভুক্ত লোক নিয়ে। নতুন কাউন্সিলের কাজ হবে :

(১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ;

(২) বর্তমান মতবিরোধের মীমাংসা হ'য়ে যতদিন না স্থায়ী নতুন সংবিধান রচনা ও চালু হচ্ছে ততদিন ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত সরকারের পরিচালনা ;

(৩) মতবিরোধ মীমাংসার জন্যে উপায় নির্ধারণ।

শেষ পর্যন্ত সিমলা প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য হ'ল না। ওয়াভেল প্রস্তাবের অসাফল্যের কারণ এবার আর কংগ্রেস নয়—মোসলেম লীগ। কংগ্রেস এবার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ রাজী। ব্রিটিশ যুদ্ধে জিতছে, জার্মানী গেছে, জাপান যেতে বসেছে, তবুও রাজী ; সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে তার "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে" সাহায্য করতে এবার আর বাধছে না। এবার আর ওয়াভেল প্রস্তাব ক্রীপস্ সাহেবের প্রস্তাবের মত "পোষ্ট ডেটেড্ চেক"—(গান্ধী) নয়—"A post-dated cheque on a crashed Bank"—Gandhi (*Indian Constitutional Devilopment*—by J. P. Suda pp. 375)—এবার যেন নগদ! এবার আর ভাইসরয়ের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ সেনাপতির হাতে থাকলেও কংগ্রেসের আর আপত্তি নাই। দেশের লোক ভুলে গেল, ক্রীপস্ প্রস্তাবে এর চেয়ে কিছু কম ছিল না। রায় তা গ্রহণ করতে বলেছিলেন বলে ধিকৃত হয়েছিলেন ; লোকে ভুলে গেল কংগ্রেসের 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবের কথা। রায় লিখলেন :

"সিমলা আলোচনার ফলাফল যাই হোক এবার আর কংগ্রেসের অসহযোগিতার জন্যে ভেঙ্গে যাবে না। কংগ্রেসের একগুঁয়েমির জন্যে শাসন ব্যবস্থায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে আছে তা ওয়াভেল পরিকল্পনার দ্বারা সমাধান হ'তেও পারে, নাও পারে, কিন্তু ওয়াভেল পরিকল্পনা একটি বিষয়ে যে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ওয়াভেল সাহেব গর্বোদ্ধত বিদ্রোহীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্রাট-প্রতিনিধির (Pro-Consul) নেতৃত্বাধীনে থেকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে ও ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছেন।

"অহো, কি অধঃপতন! পরাজিত বিদ্রোহীদের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ! আর ক্ষয়িষ্ণু কিন্তু গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট-প্রতিনিধি ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীদের ডেকে এনে আবার সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেবার জন্য উদার চিত্তে ক্ষমতার গদিতে বসিয়ে দিচ্ছে! উড়নচণ্ডি ছেলেকে আদর করে ঘরে ফিরিয়ে আনা

হচ্ছে। এই লজ্জাকর অনুষ্ঠান পর্ব সম্পন্ন হবে ভারতীয় গণতন্ত্রের কোরবানিতে। তবে দুঃখ এই শাবকটি মোটেই মোটাসোটা নয়—নিতান্তই উপবাসক্লিষ্ট ক্ষীণ-কলেবর।" (I. I., 15/7/45)

জিন্না দাবী তুললেন, সব মুসলমান আসনগুলিই লীগ মনোনীত করবে। কংগ্রেস এ দাবী মেনে নিল না। ফলে ওয়াভেল পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হল না। রায় লিখলেন:

"ইণ্ডো-ব্রিটিশ ধনীদের সমস্বার্থে রচিত ওয়াভেল পরিকল্পনা জিন্নার জন্যে ব্যর্থ হ'ল বলে প্রচারিত হচ্ছে। ওয়াভেল পরিকল্পনায় ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত ভাইসরয়ের কাউন্সিল ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে যে এক বৃহৎ পদক্ষেপ বলে প্রচার করা হ'ল তাতে কিন্তু ভারতের শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে কোন প্রতিনিধির আসন ছিল না। এই জন্যে শ্রমিক-কৃষক সংস্থা সমূহের নিকট থেকে সারা ভারতব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু সে সবে ওয়াভেল সাহেব কর্ণপাত করেন নি। অথচ জিন্নার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার হুমকিতে শুধু কর্ণপাত নয়—প্রস্তাবই বাতিল করতে হল!

"ভারতের জনগণের প্রতি এমনিধারা ষড়যন্ত্র চলতেই থাকবে জাতীয় নেতাদের জনকল্যাণমূলক বড় বড় বুলির ধোঁয়ার আড়ালে। এ ষড়যন্ত্র বন্ধ হ'তে পারে জনগণের শক্তিশালী অভ্যুত্থানের দ্বারা (mighty action)।

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ যুদ্ধ সুরু হোক সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের দাবী তুলে। সকল প্রকার বাধা ও প্রভাবমুক্ত এই নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। লর্ড ওয়াভেল বা তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন অধিকারই নাই ৪০ কোটি নরনারীর ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবার। এ যাবৎ তাঁরা সাধারণ মানুষের ভালমন্দের প্রতি এমনই তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন যে, তার দ্বারা তাঁদের সে অধিকার বাতিল হয়ে গিয়েছে।

"নির্বাচনের বিষয় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি পরিষ্কার করে দিয়েছে। যাঁরা প্রকৃত স্বাধীনতা চান তাঁরা উক্ত পার্টির প্রচারিত স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া ও জনগণের অর্থ নৈতিক উন্নয়ণ পরিকল্পনার দ্বারা পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করবে।

"দেশে অনেক সভা-সমিতি-সম্মেলন হয়েছে। শেষ কথা বলার অধিকার জনগণের। তাঁরা তাঁদের কথা বলুক এবং সেই ইচ্ছাকে কার্যকরী করে তুলুক।" (I. I., 22/7/45)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সাধারণ নির্বাচন ও রায়ের পরাজয়

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে ১৯৪৫ সালের ৮ই মে জার্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়। জাপান তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ৫ই অগাষ্ট জাপানের হিরোসিমা নগরে ও ৯ই অগাষ্ট নাগাসাকি বন্দরে এটম বোমা পড়বার পর জাপান ১৫ই অগাষ্ট আত্ম-সমর্পণ করে।

৫ই অগাষ্ট ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন হল। নিবাচনে ব্রিটিশ গণতন্ত্র লেবার পার্টিকে নির্বাচিত করল। রায়ের আর একটি অনুমান সত্য হ'ল।

১লা ও ২রা অগাষ্ট ওয়াভেল প্রাদেশিক গভর্ণরদের সভায় সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কিন্তু রায়ের পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নয়—সেই পুরাতন শতকরা ১৩ জন ভোটাধিকারীর ভিত্তিতে। রায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

নির্বাচনে কংগ্রেস হিন্দু আসনগুলি পেলো, লীগ পেলো মুসলমান আসনগুলি। হিন্দু মহাসভা, লিবারেল, কমিউনিষ্ট ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা হারল। আর হারল র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। পাঞ্জাবে কংগ্রেস ⅔ অংশ শিখ আসন লাভ করেছিল।

কংগ্রেসের এই বিরাট জয়, আর র‍্যাডিক্যাল পার্টির শোচনীয় পরাজয়ের কারণ আমরা আগেই একবার উল্লেখ করেছি। ভারতের সুদীর্ঘকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মানুষের যেটুকু রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ হয়েছে তার দৌড় বেশীদূর ছিল না। দুটি মাত্র মাপকাঠি দিয়ে তারা দেশ হিতৈষণার বিচার করতে শিখেছিল। একটি হ'ল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ ও ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা আর একটি জেলে যাওয়া। এই দু'টি

মাপকাঠিতে কংগ্রেস তখন দেশ হিতৈষণার চরমে! আর রায় ও তাঁর র্যাডিক্যাল পার্টি, এমন কি হিন্দুমহাসভা, লিবারেল, কমিউনিষ্ট সকলেই সেদিন এই বিচারে খুবই নিম্নস্তরের। জনগণের রাজনীতিজ্ঞানের দৌড় যে কতটা তা কংগ্রেস নেতাদের খুব ভালভাবেই জানা ছিল। সেই জন্যে জনসাধারণের চোখে কংগ্রেস যাতে দেশ-হিতৈষণার সর্বোচ্চ স্থানে সর্বদাই অবস্থান করে সে দিকে তাঁরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। সেই কারণেই কংগ্রেসের ইতিহাসে যত না আছে জয় তার চেয়ে ঢের বেশী আছে পরাজয়, তথাপি কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার অন্ত নাই এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল মাঝে মাঝে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ঢক্কা নিনাদ ও দলে দলে কারাবরণ, আর বড় বড় সংবাদপত্র মারফৎ সেই সব কাহিনী স্মরণ রাখার দৈনন্দিন ব্যবস্থা।

বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করার মত শিক্ষা, সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক উন্নতি, সার্বভৌম ক্ষমতা, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা প্রভৃতি উক্ত দুই মাপকাঠিতে নাই। সুতরাং রায় ও তাঁর র্যাডিক্যাল পার্টি জনকল্যাণমূলক স্বাধীন ভারতের সংবিধান ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও নির্বাচনে হেরে গেলেন!

তা ছাড়া টাকার প্রশ্নও ছিল। কংগ্রেসের পিছনে দিল্লী মসনদের লালসাক্ষিপ্ত যুদ্ধোত্তর ভারতের উদীয়মান ধনী-বণিক সম্প্রদায়, আর র্যাডিক্যাল পার্টির—সত্য সত্যই যাকে বলে নিঃস্ব অবস্থা। ভারতের মত বৃহৎ দেশে সেদিনের পাঁচ-লক্ষ, দশ-লক্ষের এক একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কপর্দকহীন ব্যক্তি বা পার্টির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই অবস্থায় রায়ের পরাজয় অবশ্যম্ভাবীই ছিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব

ব্রিটেনের এটলি গভর্ণমেণ্ট এবার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লেন। তিনি তাঁর ক্যাবিনেটের তিনজন প্রভাবশালী সদস্য, লর্ড পেথিক লরেন্স—ভারত সচিব, ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্—শিল্পবাণিজ্য সচিব, এবং এ. ভি. আলেকজাণ্ডার—নৌ সচিবকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্যে পাঠালেন।

এই উপলক্ষ্যে রায় লিখলেন :

"ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিনা সর্তে স্বীকার করে নিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিন জন মন্ত্রী ভারতে এসেছেন দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা করতে। দৃশ্যতঃ এই মিশন ব্রিটিশ গণতন্ত্রের দূতরূপেই এসেছেন। কারণ ব্রিটেনে আজ লেবার পার্টি সরকার গঠন করেছে। কিন্তু ব্রিটিশ গণতন্ত্রের এই দূতমণ্ডলী ভারতের জনগণের নিকট আসে নি—এসেছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীদের নিকটে, যারা সমগ্র বিশ্ব যখন বিজয়ী ফ্যাসিবাদের পায়ের তলায় দলিত হওয়ার আতঙ্কে কম্পমান তখন অতি নিষ্ঠুর হৃদয়হীনের মত নির্লিপ্ত ছিল। তারা এসেছে দেশের মাত্র শতকরা তের জন কায়েমী স্বার্থবানদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করতে। বস্তুতঃ ক্ষমতা আরও কম সংখ্যক লোকের হাতেই হস্তান্তর করা হ'বে। যারা ধনী, জমিদার, শিল্পপতি, ব্যবসাদার, যারা দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, বড় বড় রাজনৈতিক পার্টিগুলির নীতি নির্ধারিত করে, দেশের শতকরা সেই দু'জনের হাতেই এ ক্ষমতা হস্তান্তর করা হ'চ্ছে।" (I. I., 31/3/46)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পাকিস্তানের দাবী ও রায়

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের আগমনের সময়ে দিল্লীতে মোসলেম লীগের আইন সভায় নব নির্বাচিত সদস্যদের সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ভারত বিভাগের ভিত্তিতে স্বাধীন পাকিস্তানের দাবী স্বীকার না করা পর্যন্ত লীগ কোন প্রকার মীমাংসাতেই রাজি নয়। এই সম্মেলনে বলা হয়েছিল যে, যেহেতু হিন্দুধর্মে জাতিভেদ আছে, অস্পৃশ্যতা আছে, এবং মুসলমান ধর্মে তা নাই, সেই হেতু পাকিস্তান সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত সাধারণ মানুষের আপন দেশরূপে গৃহীত হবে। রায় এই দাবীর উত্তরে লিখলেন ঃ

"হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ নিয়ে এই সম্মেলনে যে সমালোচনা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপত্তি করবার মত যুক্তি দেখি না, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদকে সমর্থন করারও কোন যুক্তি নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাস্য এই যে, বস্তুতঃ কোন্ উপায়ে পাকিস্তান সাম্য ও গণতন্ত্রের দেশ হয়ে উঠবে? এই সব মহৎ আদর্শ যে ইসলাম ধর্মের মধ্যে আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রধান প্রধান ধর্মের মধ্যে ইসলামেরই সবচেয়ে কম বয়স। স্বভাবতঃই এর মধ্যে সর্বাধুনিক আদর্শ থাকবে। এটাও সত্য যে, মোসলেম লীগের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা মনে করেন পাকিস্তান কেবল যে গণতান্ত্রিক হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিকও হবে। কিন্তু তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত, পৃথিবীতে বহু মুসলমান রাষ্ট্র আছে তাঁরা মোটেই গণতান্ত্রিক নয়। পারস্যের কথাই ধরা যাক। জারের শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর সেখানে গণতন্ত্র স্থাপিত হয় নি, জনসাধারণও মুক্তি লাভ করে নি, এবং দেশের সমূহ কৃষি জমি (কৃষিই সে দেশের বলতে গেলে একমাত্র জীবিকা) নগরবাসী জমিদারদের সম্পত্তি;

আর তারাই হ'ল পারস্যের স্বৈরতন্ত্রের শাসকশ্রেণী। জারতন্ত্র শাসিত রুশিয়ার কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠলেও তার দ্বারা সাধারণ মানুষের শাসন কায়েম হ'ল না। সুতরাং ইসলাম ধর্মে এই সব আদর্শ আছে বলেই যে পাকিস্তান সাম্য ও গণতন্ত্রের দেশ হয়ে উঠবে এ কথা যেন কেউ ধ'রে না নেন।

"স্মরণাতীত কাল থেকে ধর্ম প্রবর্তকগণ সকলেই সকল মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্রের আদর্শ প্রচার করে গেছেন। তথাপি সে মহান আদর্শ বাস্তব মানুষের জীবনে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে নি। এর কারণ এই আদর্শের প্রতি ধর্ম-প্রচারকদের প্রত্যয়ের অভাব নয় বা মনুষ্য চরিত্রের চিরন্তন দুর্বলতাও নয়। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত মানবিকতা ও সাম্যের আদর্শ জীবনে রূপায়িত করে তোলার জন্যে যে আর্থিক প্রাচুর্যের প্রয়োজন হয় তা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না! অনুন্নত অর্থনীতিতে, অপ্রচুর উৎপাদন ব্যবস্থায় সামান্যতম সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলতে হ'লেও ধন বণ্টনে অসাম্য অপরিহার্য ছিল, এই অবস্থায় ধনবণ্টনের সাম্য অর্থে দারিদ্র্যের সমবণ্টন, অশিক্ষা অসংস্কৃতির সমবণ্টন। সাম্প্রতিক কালে যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের ফলে উৎপাদন এতই বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, তার ফলে সমগ্র সমাজকে অর্থনৈতিক সাম্যের উপর গড়ে তোলা সম্ভব হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু যারা মানবতাবাদ ও সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী, যে আদর্শ এই সর্বপ্রথম কল্পনার স্তর থেকে বাস্তব জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে, অবশ্যই তাদের এই আদর্শ রূপায়িত করে তোলার উপায় পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে হবে।

"কিন্তু আজ যখন এই আদর্শ জীবনে রূপায়িত করার মত আর্থিক প্রাচুর্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনো সমাজে এক নিদারুণ ধন-বৈষম্য বর্তমান, এবং এক মুষ্টিমেয় শ্রেণী বহুসংখ্যক মানুষকে শোষণ করে ধনোপার্জন করে চলেছে। জমিদারী প্রথা থাকবে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চলবে, থাকবে সব রকম কায়েমী স্বার্থ, আর সেই সঙ্গে বিশ্ব-মৈত্রীর প্রচার, হয় মূর্খতা, নয় ধূর্ততা। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দুইই সাম্য ও গণতন্ত্রের দেশ হ'ত পারে যদি সম্পত্তি আইনের আমূল পরিবর্তন করা হয়। যদি গান্ধীর আধ্যাত্মিকতার প্রচার ও নেহেরুর ফাঁকা সমাজতন্ত্র হিন্দু ভারতে সাম্য ও স্বাধীনতা আনতে না পেরে থাকে তবে মোসলেম নেতাগণের মোসলেম ধর্ম প্রচার করেও পাকিস্তানে তা

আসবে না, যদি না তাঁরা সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে এক বাস্তব পরিকল্পনা রচনা করেন। মোসলেম লীগ যে এতদিন পর্যন্ত কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা স্পষ্টভাষায় কোন অর্থনৈতিক উন্নতির কর্মসূচী রচনা করেন নি, বা আলোচ্য সম্মেলনে সে বিষয়ে আলোচনা করেন নি, তার অর্থ ত এইই। সেই জন্যেই এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, ভারতের বাইরে মোসলেম রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষা পাকিস্তানের ভাগ্য অন্যরূপ হ'বে।

"এই সকল মন্তব্যের উদ্দেশ্য মোসলেমদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবীর বিরোধিতা করা নয়। তা করা আমাদের মতে বোকামির চূড়ান্ত। কারণ যে কোন কারণেই এ দাবীর বিরোধিতা করা হোক না কেন—বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এ দাবীর জোর বাড়বে বই কমবে না।

"যে সকল অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাধিক্য আছে সে সব অঞ্চলকে নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্রগঠনের দাবী অস্বীকার করবে কে? আর সেইরূপ অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের থাকতে বাধ্য করেই বা কী প্রগতিমূলক উদ্দেশ্যটা সাধিত হ'বে, যে অখণ্ড ভারতে এক প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্র রাজত্ব করছে এবং দ্রুত জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে? কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী আর মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবী এক পর্যায়ের। এই দাবী পূর্ণ হ'লে এক বা একাধিক প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভাবনার বিপদের ঝুঁকি যে নাই তা বলা যায় না। এই বিপদের ঝুঁকি কাটাতে হ'লে এই দাবীর বিরোধিতা করলে হবে না। এদের জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করাতে হ'বে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হ'লে এদের শোনাতে হ'বে যে, হিন্দু ও মুসলমানের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হ'বে মধ্যযুগীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উচ্ছেদ সাধন ক'রে বর্তমান সমাজকে পুনর্গঠিত করে তোলা। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের আড়ালে থেকে দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে পরাভূত করতে হ'বে।

"সাম্প্রদায়িকতা দূর করার এই একমাত্র পথ। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই আজ বর্তমান সমাজের পুনর্গঠন চায়, কারণ একমাত্র এর দ্বারাই তাদের উন্নতি সম্ভব। এই আদর্শলাভের উদ্দেশ্য নিয়েই এই উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য গড়ে উঠবে। মোসলেমদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতেও

সে ঐক্য ভাঙ্গবে না। কারণ ব্যক্তি মানবের কল্যাণের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে সে রাষ্ট্র অপর এক মানবতাবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে থাকতে পারবে; জাতীয়তাবাদী মনোভাবের অভাবে এদের মধ্যে কোন বিরোধেরই সম্ভাবনা থাকবে না।

"বর্ত্তমানে কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের মধ্যে একটি মীমাংসার ভিত্তিতে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি এই চেষ্টা সফল হয় তা হ'লে সমগ্র অবিভক্ত ভারতে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের মতই ধনী-শাসিত রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। পক্ষান্তরে যদি এই মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয় তা হ'লেও দেশে অশান্তি ও অরাজকতায় ভরে যাবে। এই সংকট মুহূর্তে ভারতের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হ'লে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সকল প্রগতিপন্থী শক্তির ঐক্যের প্রয়োজন। এই ঐক্যের উদ্দেশ্য হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন দ্বারা ভারতকে আধুনিক উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভারতকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে এই রকম জনগণের সংহতির দ্বারাই সম্ভব। অন্যদিকে যদি কংগ্রের-লীগের মীমাংসা সম্ভব না হয় এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধেই তা হ'লে এই জনগণের সংহতি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে প্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার, উন্নতির বিরুদ্ধে অবনতির, সভ্যতার বিরুদ্ধে বর্বরতার লড়াইয়ে রূপান্তরিত করবে।" (I. I., 14/4/46)

এটা আজ সর্বজনবিদিত যে, এই ক্যাবিনেট মিশন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধলেও কংগ্রেস কর্তৃক পাকিস্তানের দাবী মেনে নেওয়াতে তা থেমেও গিয়েছিল। কিন্তু এই মিশন প্রস্তাবিত যে পদ্ধতি অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানের হাতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল সে পদ্ধতি রায় তাঁর সংবিধানের খসড়াতে ১৯৪৪ সালেই লিখেছিলেন; একথা যাঁরা খসড়াখানি পড়েন নি তারা হয়তো জানেন না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও রায়

ইউরোপে বিজয়ী রুশ সৈন্য পূর্ব ইউরোপ ও জার্মানীর অর্ধেক দখল করে রইল আর মিত্রপক্ষ তার অপরার্ধ। রুশিয়া অধিকৃত দেশসমূহে সেই সেই দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট খাড়া করতে সুরু করল। প্রথম প্রথম সেই সব দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির বিশেষ কোন প্রভাব না থাকাতে অন্যান্য ফ্যাসিষ্ট বিরোধী গণতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কমিউনিষ্টরা গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থানকারী রেড আর্মি ও রুশ রুবলের সাহায্যে ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়িয়ে অপর সকল পার্টি ও সহযোগীদের জেলে পুরতে লাগল, মেরে ফেলতে লাগল।

ব্রিটেনে ব্রিটিশ জনগণ রক্ষণশীলদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে শ্রমিক পার্টির হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে। ব্রিটেনের সঙ্গে রুশিয়ার বিশ বছরের অনাক্রমণ ও সহযোগিতার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও লেবার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রুশিয়ার অহেতুক মন কষাকষি সুরু হ'ল। বোঝা গেল এ শুধু ঝগড়ার জন্যেই ঝগড়া।

রায় বুঝলেন, রুশিয়া সম্বন্ধে তাঁর সকল আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। এতদিন তিনি ষ্ট্যালিনের সকল নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার সহ্য করে আসছিলেন এই যুক্তিতে যে, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদীদের আক্রমণের হাত থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ষ্ট্যালিনের। সুতরাং তাঁর শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তাঁকে নিরঙ্কুশ সুযোগ দেওয়া উচিত।

কিন্তু যুদ্ধ অন্তে দেখা গেল, ইউরোপে রেড আর্মি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামরিক শক্তিরূপে গড়ে উঠেছে এবং ইউরোপের অর্ধেক নিজ আয়ত্বাধীনে রেখেছে। আর, ফ্রান্স তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক বনিয়াদ ধ্বংস হয়ে গেছে। যুদ্ধের অতিরিক্ত চাপের ফলে ব্রিটিশ যন্ত্রশিল্পের যে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে আর্থিক অনটনের দিনে বহু সময় লাগবে। অতএব ইউরোপ থেকে রুশিয়াকে আক্রমণ করার মত আর কেউ নাই।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্য ছাড়া আমেরিকা রুশিয়া আক্রমণ করতে আসবে না। সেই মতলব থাকলে সে এটম বোমা দিয়ে জাপান ও রুশিয়া একই সঙ্গে আক্রমণ করত। অন্ততঃ এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের লিপ্সার জোর সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যের কাছে মাথা হেঁট করেছে।

তথাপি যখন রুশিয়া ব্রিটিশ লেবার পার্টির সাহায্যে সমগ্র ইউরোপে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি স্থাপন করতে এগিয়ে না এসে নিজ অধিকৃত দেশসমূহে কমিউনিষ্ট পার্টির সাহায্যে নিজের ডিক্‌টেটরসিপ স্থাপন করে জারতন্ত্রের মত সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নীতির পরিপুষ্টি সাধন করতে সুরু করল, তখন রায় ষ্ট্যালিন নীতিকে আর সমর্থন করতে পারলেন না। রায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'লেন। কেন এমন হ'ল?

প্রথমেই মনের আকাশে যেটি ফুটে উঠল সেটি এই যে, পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশের আপামর জনসাধারণ সর্বস্ব পণ ক'রে না লড়লে ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হ'ত না। মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ যদি সত্য হ'বে তা হ'লে গণতন্ত্রের মত একটি সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যে মূল্যবান সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্যে সকল মানুষ জীবন পণ করে লড়বে কেন?

দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েট রুশিয়া ত' বিশ্ব বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে লড়ল না। জাতীয়তাবাদের আদর্শকেই পুনরুজ্জীবিত করল। পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ত' অনেক দিন পূর্বেই শেষ হয়ে সেখানে নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। তবু ত' মানুষের মনোভাব সেই সেকেলেই রয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। এখানেই বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ভাব ও ভাবনাকে বদলাতে পারল না কেন?

তারপর রায় চোখের 'পর দেখতে পেলেন ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে সোভিয়েটের আচরণ। যেহেতু লেবার পার্টি ডিক্‌টেটরশিপে বিশ্বাস করে না—গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—সেই হেতুই কি এই বিরোধ নয়? তবে কি কমিউনিজিমে সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যের কোন স্থান নাই?

বহুদিন ধরে যে প্রশ্ন তাঁর মনের গভীরে দেখা দিয়েছিল আজ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে বসলেন। মার্কসবাদ এই একশত বৎসরের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার পরেও কি অপরিবর্তিত থাকবে? মার্কসের মধ্যে যে পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব আছে তার মীমাংসা না হ'লে এই রকম বিকৃত সৃষ্টিই হ'তে থাকবে, ডক্টর ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের দৈত্যের মত সৃষ্টিই স্রষ্টাকে মারবে। এ প্রশ্নের দার্শনিক দিকটির জবাব তিনি জেলে থাকার সময়েই দিয়েছিলেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দিকটির জবাব টুকরো টুকরো করে র‍্যাডিক্যালিজিমের নামে দিলেও সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করেন নি। তা প্রকাশ করবার সময় বুঝি হ'ল। অনাগত ভবিষ্যৎ-কালের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপ এক পরিপূর্ণ দর্শনের আকারে তাঁর মনের আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তিনি অবিলম্বে তাঁর চিন্তাধারা সহকর্মীদের নিকট প্রকাশ করার জন্যে প্রস্তুত হ'লেন। ১৯৪৬ সালের ৮ই মে থেকে ১৮ই মে পর্যন্ত এক সম্মেলনে তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মীদের সমগ্র ভারত থেকে দেরাদুনে ডেকে পাঠালেন।

দৈনন্দিন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে আজীবন অতিবাহিত করে—কখনো উত্তুঙ্গ ঊর্মিমালার শিখরে, কখনো আবর্তের নিম্নে, বিশেষতঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিগত ছ'টি বছর, যা শেষ পর্যন্ত এনেছিল এক নিদারুণ আশাভঙ্গ—মানসিকতার কী বিপুল বলে তা কাটিয়ে ঊর্ধে উঠে এলেন এবং এক অতি গভীর ও অতি ব্যাপক দার্শনিক প্রশান্তির মধ্যে আত্মসমাহিত হলেন যে সে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

জন্ম দার্শনিক রায়ের কাছে বিশ্ব সমাজ ছিল যেন তাঁর গবেষণাগার। এতদিন হাতে-কলমে নানা পরীক্ষা ও তার ফলাফল নিরীক্ষণ করেছিলেন। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিন শেষ হ'ল,—এবার সিদ্ধান্ত নির্ধারণ। এই নিদাঘ শিবির সেই উদ্দেশ্যেই আহুত হ'ল।

গত চল্লিশ বছর ধরে তাঁর এই যে রাজনৈতিক আবর্ত সংকুল জীবন, তাতে তিনি কেবল অভিজ্ঞতা লাভই করলেন, নিজে প্রভাবিত হলেন না। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা তাঁকে স্পর্শ করল না। তিনি নির্লিপ্তই রইলেন। তার কারণ প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে দার্শনিক নির্লিপ্ততা ছিল, বৈজ্ঞানিক অনপেক্ষতা ছিল, সাধকের নির্মমতা ছিল। মানবেন্দ্রনাথ নিষ্কাম কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবমানবতাবাদের উদ্ভাবনা

দেরাদুনে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটদের যে সম্মেলন বসে, তাতে রায় যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব-রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও অপরিসীম দুর্গতি হ'ল তা প্রথম মহাযুদ্ধের মতই ব্যর্থ হয়ে গেল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সকলে আশা করেছিল, পৃথিবী থেকে চিরকালের মত যুদ্ধ উঠে যাবে ; জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব-বিরোধ আর যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসা করার প্রয়োজন হ'বে না, জাতি সংঘই (লীগ্ অব্ নেশনস্) সে কাজ করবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও আশা করা গিয়েছিল যে, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎসতা স্মরণ করে বিশ্বের সকল দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রকে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে জাতিতে-জাতিতে সংঘাতের, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের, মানুষে মানুষে বিরোধের স্থূল কারণগুলি আর না থাকে। আমেরিকা থেকে ধনতন্ত্র অবিলম্বে বিদূরিত না হ'লেও ইউরোপ থেকে তা দূর করা সম্ভব হবে। ব্রিটেনে যখন লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসেছে, তখন সোভিয়েট রুশিয়া ব্রিটিশের সঙ্গে একযোগে ইউরোপের সকল দেশে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি) গড়ে তুলবে।

যুদ্ধের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে আশা নির্মূল ত' হলই, সুরু হ'ল ব্রিটিশের সঙ্গে সোভিয়েটের দারুণ মন কষাকষি। এদিকে সোভিয়েট অধিকৃত ইউরোপে ষ্ট্যালিন খাড়া করলেন রেড্ আর্মির সাহায্যে সেই অতি ভয়ঙ্কারজনক ডিকটেটরসিপ।

পশ্চিম ইউরোপ সোভিয়েট রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রাণভয়ে আমেরিকার শরণাপন্ন হ'ল। ১৯৪৬ সালেই পুনরায় নতুন ক'রে

পূর্ব ও পশ্চিমী গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা'র দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেল। একদিকে সোভিয়েট রুশিয়া, অন্যদিকে আমেরিকা। অর্থাৎ বিশ্বের সাধারণ মানুষের মুক্তির স্বপ্ন পূর্বের মতই স্বপ্ন র'য়ে গেল।

এই বিশ্ব-সংকটের কারণ কী? এই সংকট থেকে মুক্তিরই বা উপায় কী?

দশ দিন ধরে আলোচনা চলল। প্রতিদিন আলোচনার মধ্যে যে সব নতুন প্রশ্ন ওঠে রায় তার জবাব দেন, সন্দেহ ভঞ্জন করেন, জটিলতা দূর করেন এবং পরের দিন আলোচনাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেন। রায়ের সে সব ভাষণ New Orientation নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথমেই তিনি বিংশ শতাব্দীর এই বিশ্ব সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করে বললেন, ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই ত হ'ল মানুষকে নিয়ে। উদার-নৈতিক, গণতান্ত্রিক, মার্কসবাদী, ফ্যাসিবাদী প্রভৃতি মতবাদ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে, ব্যক্তি মানুষের দুঃখ ঘুচেনি বরং বিংশ শতাব্দীতে এসে তা আরও বেড়ে গেল। যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গেই এই সব মতবাদ নিয়ে পরীক্ষ-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল, তবু কিছু সুফল ফলল না। এই সকল মতবাদের অন্তর্নিহিত ত্রুটিই এর কারণ।

তিনি একে একে সকল মতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করলেন। তারপর সেই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ক'রে সমগ্র মানব-সভ্যতার মূল্যবান ভাব ও ভাবনাকে সংশ্লেষণ ক'রে এক নতুন মতবাদ গড়ে তুললেন। নাম দিলেন নব-মানবতাবাদ (New Humanism)।

মে মাসের এই সম্মেলনের পর রায়ের বাইশটি সূত্রে রচিত এই দর্শনের উপর সমগ্র ভারতের র্যাডিক্যাল পার্টির সকল ইউনিটে ডিসেম্বর পর্যন্ত আলোচনা ও বিতর্ক চলল। তারপর ডিসেম্বরের শেষে বোম্বাই-এ পার্টির সম্মেলনে র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসির দর্শন ও এই দর্শনের প্রয়োগ পদ্ধতিরূপে এই মতবাদ গ্রহণ করা হ'ল।

রায় এই দর্শনের কিছু ব্যাখ্যা করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট নিউ হিউম্যানিজিম নামে একটি মেনিফেষ্টো প্রচার করলেন। ঠিক একশ' বছর আগে মার্কস কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো প্রচার করেছিলেন। এই একশ বছরে তাঁর মতবাদের ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটেছে।

যে সব ত্রুটি ও অসংগতির জন্যে এই ভয়াবহ পরিণতি, রায় তার বিচার-বিশ্লেষণ করলেন, এবং তাঁর সূত্রের সাহায্যে যে সেই সব সংশোধিত হয়ে বর্তমান সংকট দূর হতে পারে তা এই মেনিফেষ্টোতে দেখালেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নব-মানবতাবাদের মূলসূত্র

নব-মানবতাবাদ বাইশটি সূত্রে নিবদ্ধ। সভ্যতার ইতিহাসে ব্যক্তি মানুষ সভ্যতার রথ কেবল টেনেই চলল, কোনও দিন এর সম্পূর্ণ ফলভোগ করতে পারল না। দর্শনের যে অপরিণতির জন্যে, অর্থনীতির যে অভাবের জন্যে, রাষ্ট্রনীতির যে ত্রুটির জন্যে সেটি সম্ভব হয় নি, সে অপরিণতি যতক্ষণ না পরিণত হচ্ছে, অভাব পূরণ হচ্ছে, ত্রুটি সংশোধিত হচ্ছে ততক্ষণ ব্যক্তি মানুষ মুক্তি পাবে না; এবং তার ফলে ব্যক্তি মানুষের উন্নতির, বিকাশের, উন্নততর সভ্যতার পথও অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে; আর সমগ্র মানবজাতি উপর্যুপরি সংকটের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে কেবল অধঃপতন ও ধ্বংসের পথেই পিছিয়ে যাবে।

তিনি দর্শনের, অর্থনীতির, রাষ্ট্রনীতির সে প্রয়োজন মেটালেন। মানবতাবাদ মানব সভ্যতার মতই অতি পুরাতন ভাবনা। সে ভাবনায় এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, এবং ছিল বলেই ব্যক্তি মানুষের চিনির বলদের বলদত্ব ঘোচেনি। সেই সব ভুল-ত্রুটি দূর করে রায় ব্যক্তি মানুষকে প্রকৃত সার্বভৌমত্বের আসনে বসিয়ে মানবতাবাদকে এক নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই জন্যে এর নাম দিলেন নব-মানবতাবাদ। নিচে বাইশটি সূত্রের ভাবানুবাদ দেওয়া হ'ল:

এক

"ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ সাধনই সমাজের আদর্শ। পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভিত্তিক সামাজিক সম্বন্ধের দ্বারাই ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তিসমূহের বিকাশ ও উন্নতি ঘটে সভ্য,

কিন্তু সমাজের উন্নতি-অবনতির বিচার করতে হ'লে তা সমগ্র সমাজকে ধ'রে করলে চলবে না, তা করতে হ'বে প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতি বা অবনতি কতখানি ঘটল তা' দিয়ে। সমাজ ব্যষ্টি মানুষের সমষ্টিমাত্র। ব্যষ্টি যখন সমষ্টিতে মেশে তখন ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব ঘুচে গিয়ে একটি নতুন সমষ্টি সত্তার জন্ম ঘটে না, ব্যষ্টি ব্যষ্টিই থেকে যায়। ব্যক্তি মানুষ যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে সেটুকুর সমষ্টি ছাড়া অন্য সকল সামাজিক উন্নতি, জাতীয় স্বাধীনতা, দেশের মঙ্গল প্রভৃতি কেবল কল্পনা মাত্র; ব্যক্তি মানুষের সে সব কোন কাজেই আসে না। সমাজের উন্নতি, কল্যাণ, অগ্রগতি যদি সত্যিকারের হয় তা হ'লেই তা' ব্যক্তির সম্ভোগে লাগে; যদি না লাগে তবে তা কাল্পনিক ভাবনা-মাত্রই থেকে যায়। মানব সমষ্টির যে কোন রূপের উপর—যেমন জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী প্রভৃতিতে—প্রাণ ও নার্ভতন্ত্র বিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়ানুভূতিক্ষম এক চিন্ময় সত্তা আরোপ করা ভুল। কারণ এতে যে-ব্যক্তিকে নিয়ে এই সমষ্টি সেই ব্যক্তিকেই বলি দেওয়া হয়। সুখ-দুঃখ অনুভব করার জন্যে ব্যক্তির পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং মন আছে। কিন্তু জাতি-শ্রেণী-গোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ বোধের জন্যে সেরূপ পাচটি ইন্দ্রিয় ও মন নাই। সুতরাং জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী প্রভৃতি সমষ্টি সত্তার সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকতে পারে না। সমষ্টির মঙ্গল, সমাজের উন্নতি, দেশের কল্যাণ, জাতির গৌরব বলতে সকল ব্যক্তির মঙ্গল, উন্নতি, কল্যাণ ও গৌরবই বোঝায়।"

এই প্রথম সূত্রে জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজিম, ফ্যাসিজিম প্রভৃতি সমষ্টিসত্তাবাদ খণ্ডন ক'রে ব্যক্তি মানুষকে সার্বভৌমত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

দুই

দ্বিতীয় সূত্রে আছে নব-মানবতাবাদের গতি-বিজ্ঞানের বিষয় (Historiology)।

সমাজের আদর্শ যদি ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ সাধন হয় এবং সমাজের উন্নতি বলতে যদি সমাজের ব্যক্তিসমূহের উন্নতিই বোঝায় তা হলে প্রশ্ন ওঠে, মানুষের এই উন্নতি প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা কী?

এ সম্বন্ধে নানা মত আছে। বিষয়টি সভ্যতার বা ইতিহাসের গতি বিজ্ঞানের (Historiology) মধ্যে পড়ে। মানুষের ইতিহাস রচনা করে কে? মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয় কোন শক্তির প্রেরণায়?

এ বিষয়ে নানা মতের মধ্যে তিনটিই প্রধান:

ধর্মীয় মতে, ঈশ্বর বা গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত করে ও ইতিহাস রচনা করে।

যাঁরা অন্ধ জড়বাদী, তাঁদের মতে, প্রকৃতির সকল বস্তুর মতই মানুষও পরিচালিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে;

মার্কসের মতে, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে সভ্যতা ও মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, ইতিহাস রচিত হয়।

দেখা যাচ্ছে, এই সকল মতে মানুষ খেলার পুতুল, দাবা পাশার ঘুঁটি, স্রোতের তৃণ মাত্র। অন্ধ জড়বাদী ও মার্কসের মতে মানুষ পারিপার্শ্বিক ও আর্থিক ব্যবস্থার নিকট স্রোতের তৃণের মত অসহায় বা ক্রীতদাস মাত্র।

মানুষের সার্বভৌমত্ব কোন মতবাদেই স্বীকৃত হয়নি। একমাত্র রায়ই সর্বপ্রথম মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেন। তিনি বললেন:

> "মানবের অগ্রগতির মূল প্রেরণা হ'ল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যানুসন্ধিৎসা (Quest for freedom and search for truth)। এই প্রেরণাতেই মানুষ নিত্য নতুনভাবে তার ভাগ্য গ'ড়ে তোলে, ইতিহাস রচনা করে। জীব-জগতে শুধু টিকে থাকার জন্যে যা ছিল জীবন সংগ্রামের মূল প্রেরণা, সেই আদি জৈব প্রেরণাই মানুষের ক্ষেত্রে ক্রমবিকশিত হ'য়ে বুদ্ধি ও আবেগের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে মানুষের মত বাঁচার জন্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষারূপে দেখা দিল। মানুষের ক্ষেত্রে এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সকল বাধা মুক্ত হয়ে অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তির অনুশীলন ও পরিস্ফুটনের দ্বারা বিকশিত ব্যক্তিত্বের যে সাধনা, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায় সন্ধানের অপর নামই সত্যানুসন্ধিৎসা। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে, বস্তু জগৎ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সকল প্রকার পারিপার্শ্বিকের অত্যাচারে বশীভূত না হ'য়ে, প্রকৃতিকে পরাভূত ক'রে, পারিপার্শ্বিককে জয় ক'রে নিজের কাজে লাগাতে, অপর ব্যক্তি ও সমাজকে নিজ বিকাশের

> সহযোগী ক'রে তুলতে, নিজের মনকে, নিজের পরিবার পরিজনকেও সহায়ক করে তুলতে হ'লে সঠিক সত্য পথেই চলতে হ'বে, ভুল পথে চললে ঈপ্সিত ফল লাভ হ'বে না। সুতরাং এই সত্যানুসন্ধিৎসা মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যেই। সেই জন্যেই সত্যানুসন্ধিৎসা মুক্তির আকাঙ্ক্ষারই অনুসিদ্ধান্ত। সত্য হচ্ছে, মুক্তির পথে চলবার জন্যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই বিষয়বস্তু।"

এই সূত্রের মধ্যে আছে, "জীবজগতেশুধু টিকে থাকার জন্যে যা ছিল জীবন সংগ্রামের মূল প্রেরণা সেই আদি জৈব প্রেরণাই মানুষের ক্ষেত্রে ক্রমবিকশিত হয়ে বুদ্ধি ও আবেগের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে মানুষের মত বাঁচার জন্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষারূপে দেখা দিল।" এই সার্বিকটি উল্লেখ করে পল্লবগ্রাহী পাঠক ও casual observer-রা বলেন, একথা ঠিক নয়; কারণ সকল মানুষের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাই। পৃথিবীর বিপ্লবের বা মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায়, সমগ্র সমাজের এক মুষ্টিমেয় অংশই অগ্রণী হয়ে বিপ্লব ঘটায় বা অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে। সমাজের বাকী অংশ উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, দর্শক মাত্রই থাকে। আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথা দূরীকরণ প্রচেষ্টায় অনেক ক্রীতদাসই আপত্তি জানিয়েছিল। সুতরাং রায়ের এই সার্বিকটি ভুল।

উত্তরে বলা যায়: মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেমন মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি, তেমনি ভয়-সন্দেহ, দুর্ভাবনা, যুক্তিপরায়ণাতাও প্রত্যেক মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মনুষ্যেতর জীবজগতের প্রয়োজন মিটে যায় কেবল মাত্র আহার-নিদ্রা-মৈথুনের উপকরণ পাওয়া মাত্র। কিন্তু মানুষের মন বস্তুটির প্রয়োজন সহজে মেটে না। এই মনের অন্তর্নিহিত শক্তি অপরিসীম এবং প্রত্যেক মানুষের সতত প্রচেষ্টা এই সকল শক্তি ও বৃত্তি সমূহের চর্চা বিকাশ-সাধন ও তৃপ্তি লাভের জন্যে। কিন্তু মনে সহজাত ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনা থাকার ফলে অন্ধকারকে, চোখের আড়ালকে, অনাগতকে, নতুনকে তার বড় ভয়। সেই জন্যে প্রত্যক্ষ বন্ধন থেকে অপ্রত্যক্ষ মুক্তির যাত্রা পথে এই ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনা এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। একেই Erich Fromme, 'escape from freedom' বলেছেন।

মানুষের ভয় দূর করে মানুষের আর এক সহজাত প্রবৃত্তি—যুক্তিপরায়ণতা। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মূলে আছে এই যুক্তিপরায়ণতা। আর এই

জ্ঞান-বিজ্ঞানই মানুষের চলার পথ আলোকিত করে তোলে—ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনা কাটিয়ে দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় মানুষের মন যতই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে থাকে, মনের ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনাও ততই কমতে থাকে; আর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে চলে মানুষের অপর এক সহজাত প্রবৃত্তি, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সকল মানুষের মন যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তখন সকলের মধ্যেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও প্রস্ফুট হ'য়ে উঠবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে একশ' বছর আগে নিগ্রোদের মধ্যে মুক্তি সম্বন্ধে যে ভয় ছিল, আজ আর তা নাই। মানুষের যুক্তিবুদ্ধির স্থান যে সকলের উপরে সে কথা রায়ের সূত্রাবলীর অন্যত্র দেওয়া আছে। বিচার করতে হবে বাইশটি সূত্রের সমগ্রকে নিয়েই। বিচ্ছিন্ন বাক্যকে নিয়ে বিচার করলে এইরূপ বিভ্রান্তি ঘটবে। সুতরাং এই যুক্তি দিয়ে বিচার করলে রায়ের এই সার্বিকটিকে ভুল বলা চলে না।

তিন

তৃতীয় সূত্রে মুক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

> "ব্যক্তি ও সমাজের সকল প্রকার যুক্তিসম্মত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হ'ল অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় মুক্তি অর্জন। এই মুক্তির অর্থ হ'ল, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তি বিকশিত ক'রে তোলার পথে যে বাধা আছে তার ক্রমাবলুপ্তি। ব্যক্তির এই বিকশিত ব্যক্তিত্ব কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনকে আশ্রয় করেই ফুটে উঠবে। ব্যক্তিকে সমাজচক্রের ব্যক্তিত্বহীন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখলে চলবে না—তাতে ব্যক্তির বিকাশ ঘটবে না। যে কোন যৌথ ও সামাজিক সংগঠনের ভালমন্দ, উন্নতি-অবনতির মানদণ্ড ব্যক্তিমানুষ। সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সাফল্য-অসাফল্যের বিচারে দেখতে হ'বে, ব্যষ্টি এর কতটুকু পেল বা পেল না এবং তার উপরেই নির্ভর করবে এই বিচারের রায়।"

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে রায়ের আবাল্যের যে আদর্শ সেই সর্বাঙ্গীন মুক্তির আদর্শ—সেই বিকশিত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার অনুশীলন ও সাধনার পথের সকল বাধা অপসারণই যে মুক্তি, সেই আদর্শই এখানে অপরিবর্তিত আছে। এর সমর্থনে দেরাদুনের নব মানবতাবাদের উদ্বোধনী সম্মেলনে রায়ের সেই

বিশেষ উক্তিটির পুনরুল্লেখ করছি। দেখা যাবে যে এই মানবতাবাদ তাঁর শৈশবে বা কল্পনা মাত্র ছিল তাই অবশেষে বৈজ্ঞানিক দর্শনের রূপ নিল। বলা চলে, হিউম্যানিজম ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করল।

"আমার বয়স যখন চৌদ্দ—স্কুলে পড়ি, তখন থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবনের সুরু। তখন থেকেই আমি মুক্তির সন্ধানে ঘুরছি। হয়তো জীবনটা বৃথাই কেটে যেত, কিছুই মিলত না, তথাপি সেদিন আমার আকুতির অন্ত ছিল না। একান্তভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাবার নতুন প্রেরণাই আমাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল। সে দিনের বিপ্লবীরা এইরূপ সর্বাঙ্গীন মুক্তির কামনাই করত। আমরা তখন মার্কস পড়িনি। সর্বহারার—প্রোলেটেরিয়েট-এর অস্তিত্বই তখন আমরা জানতাম না। তথাপি, সারা জীবন জেলে কাটাতে বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে অনেকের বাধে নি। তখন তাদের উৎসাহিত করতে সেদিন কোন প্রোলেটেরিয়েট ছিল না, শ্রেণী-বিরোধ সম্বন্ধে চেতনাও তখন তাদের মনে কেউ জাগিয়ে তোলে নি, কমিউনিজিমের কথা তারা স্বপ্নেও সেদিন শোনে নি। তবু তারা সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য ও গ্লানিতে অভিভূত হ'য়ে মানবিক প্রেরণাতেই বিদ্রোহী হয়েছিল। ঠিক কোন্ পথে সে সব দুঃখ দারিদ্র্য দূর হ'বে, তারা তা তখন জানত না; তবু তারা তাদের প্রাণ পর্যন্ত পণ রেখেই যে কোন উপায়ে তা দূর করতে চেয়েছিল। আমার রাজনৈতিক জীবন এই প্রেরণা (spirit) থেকেই সুরু। এখনও মার্কসের তিন খণ্ড ক্যাপিটাল বা মার্কসবাদীদের তিনশ গ্রন্থ থেকে আমি প্রেরণা পাই না—আমার প্রেরণা আসে আবাল্যের সেই মুক্তিলাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই।"

চার

চতুর্থ সূত্র দ্বিতীয় সূত্রেরই অংশ। ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের তত্ত্বসন্ধানে সেখানে বলা হয়েছে, "মানুষের অগ্রগতির মূল প্রেরণা হ'ল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই প্রেরণাতেই মানুষ ইতিহাস রচনা করে চলেছে।" কিন্তু মানুষ যে ইতিহাস রচনা করছে, তার সে ক্ষমতার উৎস কোথায়? চতুর্থ সূত্রে তারই সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

মানুষের মনের দুটি দিক। এক, যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, দুই, ইচ্ছা বা ভাবাবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতা। শারীরবৃত্তের দিক থেকে

ভাবাবেগ প্রকাশের কেন্দ্রের উপর যুক্তিবুদ্ধির কেন্দ্রের যেমন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে, তেমনি যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে এই ভাবাবেগ প্রকাশের ক্ষমতাই মানুষকে অশুভ কাজ, অসামাজিক কাজ, ক্ষতিকর কাজ করাতে পারে।

এযাবৎ ইচ্ছা বা ভাবাবেগ প্রকাশের এবং যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতাকে পৃথক করে দেখা হ'য়েছে। অশুভ ইচ্ছা ও বিবেক যেন দুই পৃথক শক্তি। অশুভ ইচ্ছার উদ্ভব, যোনিদ্বারে যার জন্ম সেই জন্মগত পাপী মানুষের মন থেকে, আর শুভ ইচ্ছা ও বিবেকের আবির্ভাব ঘটে অলৌকিক শুভ শক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহে।

মানুষের সৌভাগ্য রচনা, কল্যাণকর ইতিহাস গড়ে তোলা শুভ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্য ছাড়া হয় না। অতএব মানুষের ভাগ্য গড়ে তোলা, সভ্যতা ও ইতিহাস রচনার ক্ষমতা জন্মগত অশুভ মনের অধিকারী মানুষের থাকতে পারে না। এ কাজ সেই অলৌকিক মঙ্গলময় ঈশ্বরের।

কিন্তু আধুনিক শারীরবৃত্তের জ্ঞান বিস্তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে, ভাবাবেগের কেন্দ্র হ'ল থেলেমাস (লঘু মস্তিষ্ক)। তার উপরে অবস্থিত সেরিব্রাল হেমিসফিয়ার—মানুষের গুরু মস্তিষ্ক। ইহা অন্য কোন জীবের নাই। ইহাই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের কেন্দ্র। সংজ্ঞাবহ নার্ভ দিয়ে উদ্দীপনা প্রথমে আসে এই থেলেমাসে। থেলমাস তা গুরু মস্তিষ্কে পাঠায়। এই গুরু মস্তিষ্কের ক্ষমতা আছে খানিকটা ভেবে চিন্তে, জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে বিচার-বিবেচনার পর প্রতিক্রিয়া জানাবার। তার ফলে প্রতিক্রিয়া শুভ হয়। একেই আমরা বিবেকের ক্রিয়া বলি। কিন্তু সব সময় মস্তিষ্ক তা করে না। এটা কুঁড়েমির জন্যেই হোক বা ঝিমিয়ে থাকার জন্যেই হোক বা দীর্ঘ অভ্যাসের ফলেই (conditioning) হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, নিজ বিবেচনা শক্তি প্রয়োগ না ক'রেই প্রতিক্রিয়া জানায়; ষড়রিপুর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া-গুলি এই ভাবেই হয়।

শুভ-অশুভ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষেরই মস্তিষ্ক প্রসূত—কোন অলৌকিক দেবতা বা দানবের দ্বারা আদিষ্ট নয়। আধুনিক শারীরবৃত্ত বিদ্যা অনুসারে মানুষের অশুভ বুদ্ধিও যেমন আছে, শুভ বুদ্ধিও তেমন আছে। মানুষের যুক্তিবুদ্ধির, চিন্তাশক্তি ও বিবেকের যে কেন্দ্র সেই কেন্দ্রই মানুষের নার্ভতন্ত্রের শীর্ষস্থানে অবস্থিত এবং সমগ্র নার্ভতন্ত্রের উপরেই তার সর্বাধিনায়কত্ব।

অতএব মানুষ স্বভাবতই যুক্তিপরায়ণ। এই যুক্তিপরায়ণতাই মানুষকে বিবেকপরায়ণ করে, নীতিপরায়ণ করে এবং নীতি-পরায়ণ মানুষই মানুষের সৌভাগ্য গড়ে, শুভ ইতিহাস রচনা করে, নব নব সভ্যতার পত্তন করে।

এই সব কথাই বীজাকারে চতুর্থ সূত্রে আছে :

> "এই নিয়ম নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে উদ্ভূত ব'লে মানুষও প্রধানতঃ যুক্তিবাদী। মানুষের এই যুক্তিশীলতা তার সহজাত দৈহিক বৃত্তি, এজন্যই এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তি বা আবেগের বিপরীত-ধর্মী নয়। মানুষের যুক্তিবুদ্ধি ও ভাবাবেগ যে একই মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত হয় তা প্রমাণ করা যায়। নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে উদ্ভূত যে মানুষ তার মনও যে পরিপার্শ্বিকের দান হ'বে এ কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। কিন্তু প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উদ্ভূত হ'লেও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকে যে, সে তখন পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত ও নির্দেশিত না হয়ে পারিপার্শ্বিককেই প্রভাবিত ও নির্দেশিত করতে পারে। সেই জন্যে ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তির স্থান সকলের উপরে। সভ্যতার ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাসে মানুষের ইচ্ছাশক্তির যতখানি স্থান ততটা আর কোন শক্তিরই নেই। তা না হ'লে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত ও চালিত বিপ্লবের স্থান সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে থাকত না। এই যে যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা সামাজিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিত ও নির্দেশিত করা একে যেন ধর্মীয় নির্দেশ্যবাদ বা অদৃষ্টবাদের সঙ্গে এক করে ফেলা না হয়; কারণ এ দুইয়ের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।"

ধর্মীয় নির্দেশ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদের বক্তব্য হ'ল, ঈশ্বর বা গ্রহনক্ষত্র এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের ভাগ্য, সবকিছুই পূর্বাহ্নে ঠিক করে রেখেছেন, সেই উদ্দেশ্যের প্রতিই সমগ্র সৃষ্টি ধাবমান; ক্ষুদ্র মানুষের খোদার উপর খোদকারী করার অধিকারও নাই, সামর্থ্যও নাই।

পক্ষান্তরে এই সূত্রে বলা হ'ল মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি পরিচালিত ইচ্ছা ও আবেগই মানুষকে মুক্তির পথে চালিয়ে নিয়ে যায়, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের

জন্যে প্রয়োজনীয় সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র গড়ে তোলে। অবশ্যই প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার দ্বারা সে সৃষ্টি সীমিত।

এই চতুর্থ সূত্রটিই নবমানবতাবাদের সর্বপ্রধান সূত্র, সমগ্র কাঠামোর মুধনী কাঠ, খিলানের key stone.

পাঁচ

পঞ্চম সূত্র দ্বিতীয় ও চতুর্থ সূত্রেরই অংশবিশেষ। এতেও ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের তত্ত্বই আলোচিত হয়েছে। বিশেষ ক'রে এই পঞ্চম সূত্রে মার্কসের ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের সার্বভৌমত্ব খণ্ডন করে তার আংশিক সত্যকে স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থাৎ আর্থিক বিধি ব্যবস্থা মানুষের ইচ্ছাকে মুখ্যতঃ প্রভাবিত করে না—গৌণতঃ করতে পারে।

> "মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ বস্তুবাদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত। এই মতবাদে যখন বলা হয়, আর্থিক বিধি ব্যবস্থা মনকে নির্দেশিত করে তখন আর্থিক ব্যবস্থা ও মন দুই ভিন্ন বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়। এইভাবে মার্কসীয় মতবাদে বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বস্তুবাদে মনকেও সমগ্র পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই ধরে নেওয়া হয় বলে বস্তুবাদ এক অদ্বৈতবাদী দর্শন। ইতিহাস বিনা চেষ্টায় রচিত হয় না, তাকে গড়ে তোলা হয়। এই গড়ে তোলার পিছনে নানা কারণ থাকে। মানুষের ইচ্ছা এই কারণ সমূহের অন্যতম এবং আর্থিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকেই যে এই ইচ্ছার উদ্ভব তা সব সময় সত্য নয়।"

ছয়

ষষ্ঠ সূত্রটিও ইতিহাসের গতিবিজ্ঞান সূত্র সমূহেরই অংশ বিশেষ।

> "চিন্তা, ভাব ও ভাবনা একটি শারীরিক প্রক্রিয়া। ইহা পরিবেশ চেতনা সঞ্জাত—একবার গঠিত হয়ে গেলে স্বাধীনভাবে নিজস্ব নিয়মেই চলে। ভাব ও ভাবনার গতি ও সমাজের বিবর্তনের ধারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করতে করতে সমান্তরাল পথে চলতে

থাকে। বিভিন্ন মতবাদ যে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সভ্যতার সামগ্রিক বিবর্তনে এমন কোন নজির নাই।

[এখানে "মতবাদ" ও মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে পৃথক করে দেখা হচ্ছে। চিন্তার দ্বারা মানুষের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। কিন্তু "মতবাদ" হ'ল অপর কোন ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তিসমূহের দ্বারা পূর্বাহ্নে চিন্তিত ভাব ও ভাবনার ফলস্বরূপ। সেই জন্যে ঐতিহাসিক ঘটনা যখন ঘটে তখন পুরাতন "মতবাদের" সঙ্গে তখনকার নতুন মানুষের ভাব ও ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটে এবং সেই পুরাতন "মতবাদ" বহুলাংশে সংশোধিত ও পরিশীলিত হয়ে যায়।]

"শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিকমূল্য কেবলমাত্র প্রচলিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি নয়—উহা সমাজের ভাব ও ভাবনার নিজস্ব নিয়মে সমাজেরই অপরিহার্য প্রয়োজনেই গড়ে ওঠে।"

সাত

প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে,—"ব্যক্তিই সমাজের আদর্শ।"

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, "মানুষই মুক্তির প্রেরণায় সভ্যতা গড়ে চলেছে, ইতিহাস রচনা ক'রে চলেছে।"

তৃতীয় সূত্রে এই মুক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্বিতীয় সূত্রের মতই ইতিহাসের গতিবিজ্ঞান বিষয়ক।

সপ্তম সূত্র এর পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর। মানুষই যদি মানুষের ভাগ্য গড়ে, সভ্যতার সৃষ্টি করে, ইতিহাস রচনা করে তা হ'লে সেই ভাগ্যের, সেই সভ্যতার সেই ইতিহাসের 'বৈজ্ঞানিক স্বরূপ' কী, ত্রুটিবিচ্যুতিহীন প্যাটার্ণ কী? যার ফলে মানুষ তার বিকশিত ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রে জীবনকে সার্থক, উপভোগ্য, পরম রমনীয় করে তুলতে পারবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে প্রথমেই প্রচলিত মতবাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যার স্থান সেই কমিউনিজিম ও সোস্যালিজিমের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটন ক'রে আদর্শ সমাজের প্রকৃত স্বরূপ কী হওয়া উচিত তারই মূল নীতি বিবৃত করা হয়েছে।

"সকল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাধনার জন্যে সর্ববাধা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হ'লে কেবল মাত্র সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার

পুনর্বিন্যাস করে বিপ্লব সংগঠন করলে চলবে না, উদ্দেশ্য হ'বে ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে সকলপ্রকার বাধা অপসারণের ব্যবস্থা করা। উৎপীড়িত বঞ্চিত মানুষের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ক'রে উৎপাদনের উপায় সমূহকে ব্যক্তিগত মালিকানার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করে দিলেই যে ব্যক্তি মানুষের ঈপ্সিত মুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নাই।"

আট

সপ্তম সূত্রেরই অনুস্যূতি এই অষ্টম সূত্র। এতে কমিউনিজিমের সমষ্টিবাদ ও তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে একনায়কত্ব স্থাপনের যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

"তর্কের খাতিরে যদি বিশ্বাস করা হয় যে কমিউনিজিম বা সোস্যালিজিমের সূত্র অনুসারে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুললে ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি আসবে, তা হলেও সে প্রত্যয় যাচাই করে নিতে হ'বে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে; অর্থাৎ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে যা ঘটেছে, সেই বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিল ক'রে। যে রাষ্ট্রে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রক্ত মাংসে গড়া পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তি-মানুষের সুখ-দুঃখ-অনুভূতিকে অস্বীকার ক'রে জাতি বা শ্রেণীর স্বার্থে ব্যক্তিকে একটি কাল্পনিক সমষ্টি সত্তার কাছে বলি দেওয়া হয় সেখানে আর যাই হোক ব্যক্তি মানুষের মুক্তি মেলে না। স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে স্বাধীন করে দেওয়া যেমন অর্থহীন কথা, তেমনি ব্যক্তিকে সমাজের বা শ্রেণীর বা দেশের কল্যাণের নামে বলি দিয়ে ব্যক্তির মুক্তির ব্যবস্থাও অনুরূপ অর্থহীন কথা। যে সমাজ দর্শনে বা সমাজ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত, ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির আদর্শকে অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়া হয় সে দর্শন ও পরিকল্পনাকে সত্যিকারের প্রগতিমূলক ও বৈপ্লবিক বলা চলে না।"

নয়

দরিদ্র জনসাধারণের কাছে কমিউনিষ্টদের যে সাম্যবাদী অর্থনীতির মন ভোলানো আবেদন, অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনীতি—প্ল্যানড্ ইকনমি, যা

কেবল লাভের উদ্দেশ্যে নয় শুধু মানুষের অভাব দূর করবার মুখ্য উদ্দেশ্যে গড়ে তোলার অঙ্গীকার, তা যে কতদূর অলীক এবং জনসাধারণকে আর্থিক অভাব থেকে মুক্তি দেবার ভাঁওতা দিয়ে রাষ্ট্রে ডিকটেটরসিপ স্থাপন করে দোর্দণ্ড প্রতাপে স্বৈরাচার চালাবার কৌশল ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র, তা এই সূত্রে বলা হয়েছে :

> "রাষ্ট্র যখন সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তখন কমিউনিজিমের রাজত্বকালে রাষ্ট্র শুকনো পাতার মত ঝরে গিয়ে লুপ্ত হবে এ শুধু যে কথার কথা ও কল্পনাবিলাস মাত্র তা কমিউনিজিমের অর্ধ শতাব্দী কাল-ব্যাপী রাজত্বের ইতিহাস থেকেই বোঝা গেছে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে সরকারী আয়ত্তাধীনে এনে পূর্ব পরিকল্পিত ছক অনুসারে উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয় ব্যবস্থা পরিচালিত করতে হ'লে সরকারের ক্ষমতা ও দক্ষতা অতিমাত্রায় বাড়াতে হয়। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও কর্মপরিচালন বিভাগের উপরে গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব থাকলেই তবে জন-সাধারণের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে যার ফলে প্ল্যান্‌ড অর্থনীতির দ্বারা জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস হয়ে চরম দাসত্বের স্তরে অবনমিত হয় না। বাজারে লাভের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু মানুষের প্রয়োজনে যে উৎপাদন পরিকল্পনা তা একমাত্র গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নিরাপত্তার ভিত্তিতেই সম্ভব হ'তে পারে।"

দশ

দশম ও একাদশ সূত্রেও কমিউনিজিমের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচনা চলেছে। পূর্বে মার্কসের ইতিহাসের গতি-বিজ্ঞান, যার নাম অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ, তার অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করা হয়েছে; মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম ও প্রোলেটেরিয়েট শ্রেণীর একাধিপত্যের সূত্রকেও বর্জন করা হয়েছে সমষ্টিসত্ত্বাবাদের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে। নিম্নলিখিত দুই সূত্রে মার্কসের "বাড়তি মূল্য" সূত্রের ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে; এবং যে কটি সূত্রে মার্কসবাদের সমালোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে মার্কসের দ্বান্দ্বিকের সূত্রেরও অযৌক্তিতা প্রমাণ করা হয়েছে; অর্থাৎ মার্কসের চারিটি সূত্রকেই খণ্ডন করা

হয়েছে। রায়ের New Huminism—A Manifesto, ও Reason, Romanticism & Revolution গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

"কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের মালিকানা সরকারের হাতে গেলে এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন হলেই যে শ্রমিক শোষণ বন্ধ হ'য়ে যাবে কিংবা ধন-বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে তেমন কোন নিশ্চয়তা নাই।* অর্থনীতিতে গণতন্ত্র না থাকলেও রাজনৈতিক গণতন্ত্র সম্ভব কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্র না থাকলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সম্ভব নয়।

এগারো

"একনায়কত্ব একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে আর হট্‌তে চায় না। ডিকটেটরি শাসনের অধীনে যখন সমাজের সকল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হ'তে থাকে তখন অনেক বেশী কাজ করার সুবিধার দোহাই দিয়ে, দক্ষতা ও দলবদ্ধতা বৃদ্ধির অজুহাতে এবং দ্রুত উন্নতিলাভের প্রলোভন দেখিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চস্তরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার করা হয় তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে উদ্দেশ্য লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় শুধু সেই একনায়কত্বের জন্যেই সে উদ্দেশ্য আর সফল হয় না।"

বারো

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সূত্রে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসি ও তার দর্শন লিবারেলিজমকে সমালোচনা ও খণ্ডন করা হয়েছে।

"প্রতিনিধি মারফৎ শাসনতন্ত্র যার নাম পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসি তারও ত্রুটি-বিচ্যুতি অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ধরা পড়েছে। এই ত্রুটি আছে প্রতিনিধির হাতে জনসাধারণের সার্বভৌম রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করে দেবার ব্যবস্থার মধ্যে। গণতন্ত্রকে যদি কার্যকরী ও সফল করে

---

* রুশিয়ায় ধনবণ্টনে সাম্য আসে নি। ধনতন্ত্রের মতই রুশিয়ার কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রও শ্রমিকের বাড়তি মূল্য Surplus Value অপহরণ ক'রে শ্রমিককে ঠিকই শোষণ করে এবং বেশী পরিমাণেই করে, তার জন্যেই রুশিয়ায় দ্রুত মূলধন সঞ্চয় ও শিল্পায়ণ সম্ভব হয়েছে।

তুলতে হয় তা হ'লে সার্বভৌম ক্ষমতাকে সকল সময়ের জন্তেই জনসাধারণের হাতে রাখতে হবে। কিছুদিন অন্তর অন্তর সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের পরিবর্তে জনগণ যাতে দৈনন্দিন শাসন কার্যেও তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করতে হ'বে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংহত নাগরিকরা কোন রকমেই সক্রিয় হয়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতে পারে না ; সেই জন্তে প্রায় সকল সময়েই তারা নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাহীন হয়েই থাকে। নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের উপর স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন উপায়ই তাদের হাতে থাকে না।"

তেরো

"লিবারেলিজম (উদারনৈতিক মতবাদ) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের হাতে প'ড়ে অর্থহীন ও মিথ্যা ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। অবাধ বাণিজ্য নীতি (laissez faire) সৃষ্টি করে নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি ; ফলে সবল ও দক্ষ মানুষের হাতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অদক্ষ মানুষের পরাজয় ও শোষণকেই আইন সংগত ক'রে তোলে মাত্র। ব্যক্তি যখন কেবল আহার-নিদ্রা-মৈথুনসর্বস্ব জীব মাত্রে পরিণত হল (economic man) এবং সেই জীব ধর্মের পরিমাপ করা হল টাকা পয়সার মাপকাঠি দিয়ে তখন উদারনীতি ব্যক্তির মুক্তিলাভের যে দার্শনিক মতবাদ ও অঙ্গীকার দিয়েছিল তা মিথ্যা হয়ে গেল। এই যে মনুষ্য ধর্ম বিবর্জিত নিছক জীবধর্মী ইকনমিক ম্যান, সে টাকা পয়সার জন্তে হয় নিজে দাস হবে, নয়ত অন্যকে দাস ক'রে শোষণ করবে। মানুষ সম্বন্ধে এই অতি স্থূল ইতর ধারণার পরিবর্তে তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হবে। প্রকৃত মানুষ হ'ল যুক্তিশীল, বুদ্ধিমান ও নীতিপরায়ণ জীব। এই নীতিপরায়ণতা মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিশীলতা থেকেই এসেছে *। পরিবেশের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে

* অপরের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারের নামই নীতিপরায়ণতা। অপর মানুষের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে হলে, তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার না করলে প্রতিদানে অনুরূপ সদ্ব্যবহার পাওয়া যাবে না—এই যুক্তিবুদ্ধি থেকেই সকল মানুষ নীতিপরায়ণ হওয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছে।

মানুষ ভাল-মন্দ, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে প্রতিক্রিয়া জানায়; এই বিবেচনা কার্যই মানুষের বিবেক। এই বিবেক নির্দেশিত আচরণকেই নীতিপরায়ণতা বলা হয়। চৈতন্যের সম্যক প্রক্রিয়াকেই বিবেক বলে। অর্থাৎ মানুষের গুরুমস্তিষ্কের সৎ-অসৎ, অগ্র-পশ্চাৎ ভাবনার নামই বিবেক। সুতরাং বিবেক বুদ্ধি হ'ল যুক্তি সম্মত ভাবনা।"

পল্লবগ্রাহী পাঠক দ্বিতীয় সূত্রের মতই এই সূত্রটির মধ্যেও ত্রুটি আবিষ্কার করেন। "....who is moral because he is rational—মানুষের নীতি-পরায়ণতা তার যুক্তি পরায়ণতা থেকেই উদ্ভূত"—এই বাক্যাংশটি সম্বন্ধে তাঁদের আপত্তি। তাঁরা বলেন, যুক্তিপরায়ণতা থেকেই যদি নীতিপরায়ণতা আসে তবে সব মানুষই ত' যুক্তিপরায়ণ, কিন্তু সবাই নীতিপরায়ণ হয় না কেন?

এর উত্তরে বলতে হয়: এই সূত্রের সম্যক অর্থ ও তাৎপর্য একটু ব্যাপক। শব্দার্থ দিয়ে সেটা বোঝা যাবে না। নৃ-বিজ্ঞান (Anthropology) পাঠ করলেই জানা যাবে, মানুষের নীতিপরায়ণতার উৎস মানুষের যুক্তিপরায়ণতা। ক্রীতদাস হওয়া বা ক্রীতদাসদের প্রভু হওয়া মনুষ্য সমাজের শাশ্বত স্বাভাবিক নিয়ম নয়। এটা অস্বাভাবিক ও সাময়িক অবস্থা মাত্র। এটা অসামাজিকতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা। যুক্তিবুদ্ধি লব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ আবিষ্কার করেছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারই (মর্যালিটি) হ'ল সমাজের বন্ধন, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সহযোগিতা করার সিমেন্ট। সমাজ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনের প্রবর্তন করেছে। অতএব নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, সামাজিক মানুষ আর নীতিপরায়ণ মানুষ সমার্থক। এই শাশ্বত সার্বিকটি (universal) ভুলে মানুষ যখন অসামাজিক হয় তখনই সমাজ ভাঙ্গে। উদার-নৈতিকদের ধনতন্ত্রের যুগে এই সার্বিকটি মানুষ ভুলেছে বলেই সুখ শান্তির সকল উপাচার আজ থাকা সত্ত্বেও মানুষের দুঃখ-দুর্দশার, ভয়-ভাবনার অবধি নাই।

এই সূত্রের এই বাক্যাংশটি যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায়, তা হ'লে সমগ্র সূত্রটির তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হবে না।

চৌদ্দ

প্রথম সূত্র থেকে ষষ্ঠ সূত্রের মধ্যে এই দর্শনের মূলতত্ত্বকে স্থাপন করা হয়েছে।

এই দর্শনের প্রয়োগের ফলে যে সমাজ গড়ে উঠবে তার সম্ভাব্য প্রকল্প দেওয়া হয়েছে পরবর্তী সূত্রসমূহে।

প্রথমে বর্তমানে যে দু' প্রকার সমাজ ব্যবস্থা চলছে, সেই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র ও প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং কমিউনিষ্টদের পার্টি একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্র ও সোস্তালিষ্ট অর্থনীতিসমূহ যুক্তি ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাহায্যে খণ্ডন করা হয়েছে।

তারপর চতুর্দশ সূত্র থেকে ব্যক্তি মানুষের বিকশিত হয়ে উঠবার পথের সকল বাধা ক্রমবর্ধিত পরিমাণে দূরীভূত করবার জন্যে যে ধরণের রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উপযোগী হবে তারই সম্ভাব্য প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি বোঝা যায়, এটি আদর্শের উপযোগী হচ্ছে না তবে যে সব কারণের জন্যে তা হচ্ছে না সেই কারণগুলি পুনরায় দূরীভূত করে আরও ত্রুটিমুক্ত রাষ্ট্র ও অর্থনীতির নতুন প্রকল্পের সন্ধান করতে হবে। এই হবে মানুষের Quest for freedom and search for truth (Thesis 2)-এর চিরন্তন পথ পরিক্রমণ।

এখানে পিরামিড আকারের যে রাষ্ট্ররূপের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে তা যে একান্তভাবেই পরীক্ষা এবং পরিবর্তন সাপেক্ষ তা যেন স্মরণে রাখা হয়; নতুবা অকারণে নব-মানবতাবাদকে dogmatic (গোঁড়া) আখ্যায় ভূষিত হতে হয়। এর ফলে এই দর্শনের প্রধান অঙ্গীকারকেই ভুল করে অস্বীকার করা হবে।

> "রাষ্ট্রে ও সমাজে একনায়কত্ব কায়েম করে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসির ত্রুটি দূর করা যায় না। এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব বর্তমানের ক্ষমতাহীন বিচ্ছিন্ন মানুষকে সংহত ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সংঘবদ্ধ ক'রে! গ্রামে গ্রামে সকল মানুষকে গ্রামসভার মধ্যে সংঘবদ্ধ করে তুলতে হ'বে। এই গ্রামসভা যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করবে সেই পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রামসভার সকল মানুষের কাছে সকল সময়ের জন্যই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকবে ও নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে। সেই দেশব্যাপী পঞ্চায়েৎ সমূহের মাথার উপর থাকবে পার্লামেণ্ট বা লোকসভা। রাষ্ট্র হবে সমগ্র সমাজের সঙ্গে একাত্মক। তার ফলে মানুষ রাষ্ট্রকে সকল সময়েই প্রত্যক্ষ করায়ত্তের মধ্যে রাখতে সক্ষম হ'বে।"

পনর

"যে বৈপ্লবিক দর্শন ব্যক্তি মানুষের মুক্তি পথের সন্ধান দেবে সেই দর্শনের সর্বপ্রধান কর্তব্য হ'বে এই ঐতিহাসিক সত্যটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান যে, মানুষই এই সংসার, সমাজ, সম্পদ গ'ড়ে তোলে, এবং তা সম্ভব হয় তার চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা আছে ব'লে, এবং সেই চিন্তা ভাবনা কেবল ব্যক্তিগতভাবেই সম্ভব। মানুষের মস্তিষ্ক উৎপাদনের এক যন্ত্রবিশেষ এবং তা থেকে উৎপন্ন হয় সবচেয়ে বৈপ্লবিক পণ্য সামগ্রী অর্থাৎ বৈপ্লবিক ভাব ও ভাবনা। বিপ্লব মাত্রেরই মূলে আছে পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন গ'ড়ে তোলার ভাব ও ভাবনা। নিজেদের সৃষ্টি ক্ষমতায় সচেতন, নতুন সংসার-সমাজ গড়ে তোলার অদম্য সঙ্কল্পে সুদৃঢ়, চিন্তাক্ষেত্রে নব নব দুঃসাহসিক অভিযানে অনুপ্রাণিত এবং মুক্ত মানুষের সমবায়ে মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার আদর্শে উদ্দীপিত মানুষের সংখ্যা যতই বাড়বে ততই গড়ে উঠবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ এবং তখনই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'য়ে উঠবে।"

ষোল

এই সূত্রে এইরূপ ঈপ্সিত আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার পদ্ধতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে বলা হয়েছে—methodology। এই পদ্ধতি মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব ও তার অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে এবং সেই সকল বৃত্তি ও শক্তি অনুশীলন করে বিকশিত করে তুললে ব্যক্তি মানুষের জীবন যে কী সীমাহীনভাবে উপভোগ্য ও আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে তার উপলব্ধির ব্যবস্থাও উক্ত পদ্ধতির কাজ। কিন্তু এই শিক্ষা কেবল বই পড়িয়ে বা বক্তৃতা শুনিয়ে হবে না; সে শিক্ষা গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে দিতে হবে এবং এই শিক্ষা তাদের দেবে রেনেসাঁসে উদ্বুদ্ধ নতুন মানুষেরা।

"বিপ্লবের পদ্ধতি ও কর্মসূচী রচনা করতে হবে বাঞ্ছিত সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্মুখে রেখে। ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশের জন্যে মুক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার

সঙ্গে বসবাসের উপযোগিতা বিষয়ে শিক্ষা দেবার একনিষ্ঠ ব্যাপক প্রচেষ্টা থেকেই সমাজে আসবে নব-জাগরণ তথা রেনেসাঁস। মানুষকে গ্রামসভার মধ্যে সংহত ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। এই গ্রাম-সভার দ্বারা নির্বাচিত ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিই হবে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। এই ঈপ্সিত সমাজ বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন ক্রমবর্ধিত হারে বহুসংখ্যক নবজাগ্রত রেনেসাঁসী মানুষের; এবং এই সব মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটাতে হ'বে ক্রমপ্রসারী দেশব্যাপী গ্রামসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের সঙ্গে। আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের কর্মসূচী রচনা করতে হবে এমনভাবে যাতে এই বৈপ্লবিক কর্মসূচীর সুসংগত ও যুক্তিসম্মত পরিণতি ঘটে সকল মানুষের মুক্তিতে, সুসংগত সামাজিক সম্পর্ক রচনায়। এই বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে সকল প্রকার ধনতান্ত্রিক শোষণ ও কায়েমী স্বার্থের প্রভাব ও শাসন থেকে সমাজ জীবন হ'বে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

সতর

"আমূল গণতন্ত্রে সমাজের অর্থনীতিকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা হবে যার ফলে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে। ক্রমবর্ধিত পরিমাণে সকল মানুষের অশন-আসন-বসন-ভূষণের প্রয়োজন মেটানোর উপরেই নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তি-সমূহের পূর্ণ বিকাশ। এইরূপ ক্রমবর্ধমান আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। সর্ব সাধারণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যই হ'ল মুক্তির লক্ষ্যে পৌছবার প্রধানতম সর্ত।"

আঠার

"নতুন সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি হ'বে প্রয়োজন মেটানোর জন্যে উৎপাদন—লাভের জন্যে নয়, এবং বণ্টন হবে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে। রাজনৈতিক সংগঠনে প্রতিনিধি মারফৎ শাসন-ব্যবস্থার কোন স্থানই থাকবে না; কারণ প্রতিনিধি মারফৎ শাসন-ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা চলে যায় প্রতিনিধিদের হাতে—জনসাধারণের

হাতে কিছুই থাকে না। জনসাধারণ চির নাবালকই রয়ে যায়। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দ্বারা নির্বাচিত ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মারফৎ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণই হবে এই নতুন সমাজের রাজনৈতিক ভিত্তি। এই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠবে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের উপর। এই শিক্ষাদানের নীতি হবে বৈজ্ঞানিক ও সৃষ্টিমূলক কাজে যথা সম্ভব কম বাধা নিষেধ আরোপ ও যতবেশী সম্ভব উৎসাহ দান। এই নতুন সমাজ যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গঠিত হবে এবং তার অপচয় নিবারণের জন্যে একটি পরিকল্পনাও থাকবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য থাকবে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা। এই নতুন সমাজ হ'বে সব দিক থেকেই গণ-তান্ত্রিক। রাজনীতিতে হ'বে আমূল গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না, সবার অধিকার হবে সমান; সাংস্কৃতিক জীবনও গড়ে উঠবে সকলপ্রকার অনুশাসন মুক্ত হয়ে দায়িত্বশীল সৃজনাত্মক অনুপ্রেরণায়। এবং যেহেতু এই গণতন্ত্রে সকল মানুষেরই জীবন উপভোগ্য ও সুখকর হয়ে উঠবে সেই হেতু বিপৎকালে এই গণতন্ত্রকে একান্ত নিজস্ব জ্ঞানে সকলে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, এর জন্য প্রাণ পণ করবে।*

উনিশ

"মুক্ত মানুষের সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অনাসক্ত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই আমূল গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হ'বে। এই অনাসক্ত মুক্তবুদ্ধি মানুষ ভবিষ্যতে জনসাধারণের শাসক হ'য়ে দাঁড়াবে না—তারা হ'বে জনসাধারণের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথ-প্রদর্শক, (ফ্রেণ্ডস, ফিলজফার, গাইড্)। সর্বাঙ্গীন মুক্তির লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে চলতে গেলেই এদের রাজনৈতিক কাজ-কর্ম খেয়ালখুশী মত

---

*ইউরোপের পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র যখন ফ্যাসিজিম বা কমিউনিজিম দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তখন তা রক্ষা করতে সে সব দেশের জনগণ এগিয়ে আসে নি; কিন্তু এই আমুল গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকায় জনসাধারণ আপৎকালে একে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।

হবে না, হবে যুক্তি সম্মত, অর্থাৎ নীতি সম্মত। জনসাধারণের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার পরিধি যত বেড়ে চলতে থাকবে এদের প্রচেষ্টা ও কর্মক্ষমতাও সেই অনুপাতে বেড়ে চলবে। অবশেষে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের সমর্থনে ও সুচিন্তিত ক্রিয়া-কলাপে গড়ে উঠবে আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি কেন্দ্রীভূত হয়, তা হ'লে জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, লুপ্ত হয়; সেই জন্যে আমূল গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে যথাসম্ভব জন-সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা করে চলবে।"

কুড়ি

এই সূত্রটিও আমূল গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার পদ্ধতি (methodology) সম্বন্ধে। পূর্বে বলা হয়েছে, শিক্ষাদানই হ'ল এই পদ্ধতি। এই বিশেষ প্রকার শিক্ষাদান পদ্ধতির কৌশলটি বিবৃত করা হয়েছে এই সূত্রে।

"ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব না করেও উন্নত ও সকল মানুষের কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে তখনই যখন জন-সাধারণের মধ্যে সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হবে। এই প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিদ্যাপীঠ হবে গ্রামসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি। আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র ও কার্য পরিচালন ব্যবস্থাই পরার্থপর অনাসক্ত মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরোভাগে এনে দেবে। এইরূপ পরার্থপর অনাসক্ত মানুষের দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্র যখন পরিচালিত হ'তে থাকবে তখন রাষ্ট্র আর শ্রেণীবিশেষ দ্বারা অপর শ্রেণীকে দমন করবার অস্ত্র হ'য়ে উঠবে না।* অনাসক্ত মানুষরা যখন ক্ষমতার আসনে আসবে কেবল তখনই মানুষের চলার পথের সকল বাধা বন্ধন চূর্ণ করে এরা মুক্ত মানুষের জন্যে মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করবে।"

---

*এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মার্কস রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন এই বলে যে, রাষ্ট্র হ'ল এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন করে রাখবার হাতিয়ার বিশেষ, এই সূত্রের দ্বারা রায় সেই মত খণ্ডন করে বলছেন, রাষ্ট্রের সর্বজনীন জনহিতকর রূপও হ'তে পারে এবং এখানে সেই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্ররূপেরই মূলসূত্র ও পরিকল্পনা দিচ্ছেন।

একুশ

"এই নবমানবতাবাদ সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে যাতে আধুনিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত করা সম্ভব হয় তার পরিকল্পনা দিয়েছে; ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সামঞ্জস্য বিধান করেছে; নৈতিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক মূল্য আরোপ ক'রে এবং এই সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে মুক্তির সংজ্ঞাকে একটি সার্থক আদর্শ হিসাবে গ'ড়ে তুলেছে; এই মতবাদ সভ্যতার গতি বিজ্ঞানের পুরাতন ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন ক'রে এক নিখুঁত গতিবিজ্ঞান রচনা করছে। এই গতিবিজ্ঞানে মার্কসের দ্বান্দ্বিক অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের আংশিক সত্যটুকু স্বীকৃত হয়েছে এবং সভ্যতা রচনায় মানুষের ভাব ও ভাবনার যথাযোগ্য মূল্যও দেওয়া হয়েছে; এবং এই সামাজিক গতি বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারেই এই যুগের বিপ্লবের জন্যে এক নতুন পদ্ধতি ও কর্মসূচী রচনা করেছে।"

বাইশ

"এই নব-মানবতাবাদ বা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মতবাদের মূল প্রত্যয় হ'ল প্রোটাগোরাসের ভাষায়—ব্যক্তি মানুষই সব কিছুরই মানদণ্ড—Man is the measure of everything"—কিংবা মার্কসের ভাষায়, "ব্যক্তি মানুষই মানব জাতির মূল—Man is the root of mankind" এবং এই দর্শন দিয়েছে এক মুক্তমনা নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায়ে বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ।"

নব-মানবতাবাদের এই বাইশটি সূত্র থেকে যেটি স্পষ্ট হ'য়ে উঠল সেটি হ'ল, এই দশন বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের দর্শন। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তোলার সাধনায় যে সব বাধা দেখা দেবে তা ক্রমবর্ধিত হারে দূরীকরণের ব্যবস্থা হবে এই দর্শনের রূপায়নের সাহায্যে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে আছে মোটামুটি তিন বাধা। সকল মানুষকেই এই তিন বাধা অতিক্রম করেই এ পথে চলতে হয়।

প্রথম বাধা হচ্ছে, এই প্রকৃতির বাধা। মানুষকে পদে পদে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হয়। মানুষের নানা প্রয়োজন মেটাতে, আশা

আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে প্রকৃতি সহজে দেয় না, তা আদায় করে নিতে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে।

দ্বিতীয় বাধা হ'ল, অপর মানুষ, প্রতিবেশী, সংসার সমাজের অসংখ্য নরনারী ও সমগ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা সমূহ। সমাজেরই বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আছে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রাচারের সংস্থাসমূহ। ব্যক্তির অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বীয় বিকাশের পক্ষে সহায়ক শিক্ষা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হ'লে চাই রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব।

তৃতীয় বাধা হ'ল, বক্তির অন্তরের বাধা। ব্যক্তির মনে অহর্নিশ যে পরস্পর-বিরোধী ভাল মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা জাগছে তা যদি সুশৃঙ্খলিত না হয়, সুসংস্কৃত না হয়, একাগ্র করার মত শক্তির অভাব হয়, তবে ব্যক্তির উন্নতি ও ক্রমবিকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রথম ও তৃতীয় বাধা অপসারণ করতে মানুষের যত সময় শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক কম প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় বাধা অপসারণের জন্যে। বিশেষতঃ রাজনীতির জন্যে।

অর্থাৎ নব-মানবতাবাদ ব্যক্তিজীবনে রূপায়িত করে তোলার জন্যে যে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন, তা যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক। মানুষ যদি শিক্ষিত হয়, সচেতন হয়, বিদগ্ধ হয় তা হলে কি গ্রাম পঞ্চায়েতে, কি লোকসভা বা সংসদে সঠিক প্রতিনিধি বেছে নিতে ভুল হবার বা বিশেষ হৈ চৈ-এ সময় ক্ষেপণ করার কথা নয়, এবং নির্বাচক-মণ্ডলী যদি মূর্খ না হয়ে বিদগ্ধ হয় তা হ'লেও সেই নির্বাচক-মণ্ডলীর নির্দেশেই পরিচালিত হতে প্রতিনিধিবর্গ ব্যগ্রই হবেন।

সুতরাং নব-মানবতাবাদ অনুসারে এক কথায় বলা যায় যে, নিজেকে শিক্ষিত, সংস্কৃত, অনুশীলিত বিদগ্ধ, বিকশিত ক'রে তোলার সাধনাই মানুষকে তার 'নাচ দুয়ারেই' মুক্তি এনে দেবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন ভারত জনগণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল না—করল ধনীর পরিকল্পনা

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী সরকার রায়ের পিপল্‌স প্ল্যান গ্রহণ না ক'রে ধনীদের রচিত বোম্বাই প্ল্যান গ্রহণ করলেন। সেই অনুসারেই সর্বাগ্রে শিল্প-উন্নয়নের উপর জোর দিলেন, কৃষি উন্নয়ন অবহেলিত হ'ল। ভারত খাদ্যের জন্যে সোনা দিয়ে আমদানী করা শস্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল। খাদ্যশস্য আমদানী করতে করতে, বৃহৎ শিল্পের যন্ত্রপাতি কিনতে আর বিদেশে ব্যয়বহুল দূতাবাসের খরচ জোগাতেই তিন হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং ব্যালেন্স প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। সুরু হ'ল ভিক্ষাপাত্র হস্তে বিভিন্ন দেশের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা আর ঋণের জন্যে আকুল আবেদন।

রায় বলেছিলেন, শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে বড় বড় বাঁধ বেঁধে জল সেচন পরিকল্পনা না ক'রে বড় ব্যাসের নলকূপ ও পুরাতন দীঘি খাল প্রভৃতির সংস্কার করেই কৃষিসেচ ব্যবস্থা করতে। তিনি বলেছিলেন, দামোদর পরিকল্পনার মত বাঁধ থেকে জল পেতে কৃষকের বহু বৎসর লেগে যাবে। কিন্তু যে দেশে বৃষ্টিপাত যথেষ্ট সে দেশে দূর দূরান্তর থেকে খাল কেটে জল আনার ব্যবস্থা না ক'রে কূপ, নলকূপ, দীঘি ও স্থানীয় খালের সাহায্যে এক বছরেই ফল পাওয়া যাবে, অথচ তা করতে বেশী কিছু বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হ'বে না। প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদনক্ষম একটি টিউব তৈরীর কারখানা ও একটি ডিজেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা স্থাপন করলেই আপাততঃ চলে যাবে।

শিল্পোন্নয়নের মূল সূত্র হ'ল দেশের অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধি। কৃষির উন্নতি হ'লে কেবল খাদ্যেই যে ভারত স্বাবলম্বী হ'বে তাই নয়, কৃষকের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়বে। ভারতের ৪০ কোটি লোকের শতকরা ৭৫% জনের ক্রয়ক্ষমতা

কিছু মাত্র বাড়লেও শিল্পের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং শিল্পও দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে। জোর ক'রে শিল্পায়ণ করতে গেলে তা ঋণ করেই করতে হবে। আর, তাড়াতাড়ি করতে গেলেই অপচয় হ'বে বেশী, উৎপাদনক্ষমও হ'য়ে উঠবে না। সময়ে ঋণের সুদ-আসল শোধ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে, বাধ্য হ'য়ে ট্যাক্সের বোঝা বাড়বে, ফলে দেশের দুঃখ কষ্ট না কমে বেড়েই যাবে।

তিনি আরও বলেছিলেন, দেশ রক্ষা খাতে যথাসম্ভব কম ব্যয় করতে হবে, কারণ ভারতকে কেউই শীঘ্র আক্রমণ করবে না। যদি করে তা হ'লে জাতি-সংঘ আছে—ভারতের হ'য়ে লড়বে। এতে দু'টি কাজ হবে। এক, জগতে নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখান হবে; আর বৃথা সমরায়োজনের অর্থ ও সম্পদ মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে মূলধনে পরিবর্তিত করা চলবে। তা ছাড়া সন্তুষ্ট দেশবাসীই ত' হ'ল সর্বাপেক্ষা বড় দেশরক্ষা বাহিনী। রায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের কথাও বলেছিলেন।*

*বহু বিলম্বের পর চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি ও পরিবার পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সব বিষবৃক্ষ রোপণ হয়ে গেছে তার বিষ ক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পেলে তবে ত?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতের ভবিষ্যৎ দিগদর্শন

১৯৪৭ সালের ২৯শে-৩০শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে র‍্যাডিক্যাল পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অধিবেশনে রায়ের সভাপতিত্বে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান। সেই জন্যে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

(১) তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা

"যুদ্ধোত্তর পৃথিবী পুনরায় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এক দিকের নেতা আমেরিকা আর এক দিকের রুশিয়া।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি বাধে তবে সারা পৃথিবীই ধ্বংস হবে, সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আধুনিক সভ্যতার সব কিছু অবদান। যে কোন উপায়ে এই মহা-সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখতে হ'বে।

যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয় করলে জগতের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হ'বে; মানুষের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ ঘুচবে না।

অতএব ভারতের উচিত, এমন কোন কাজ না করা যাতে এই বিশ্ব যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়; প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোন পক্ষভুক্ত না হওয়া; এবং সামরিক শক্তিরূপে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা না করা।"

(২) দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারত ভুক্তি

"বর্তমানে কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভারত ভুক্তির ব্যাপারে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মীমাংসার সূত্র যেন নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে বিবেচিত হয়:

"সরকার যেন ভূমি জয়ের লিপ্সা ত্যাগ করেন এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই কাজ করেন।

"ভৌগোলিক সান্নিধ্যের জন্যে এবং জনসাধারণের বর্তমান মনোভাবের ভিত্তিতে হায়দ্রাবাদ এবং জুনাগড় ভারত ভুক্ত হোক, এবং কাশ্মীরের কতক অংশ পাকিস্তানে যাক। গণ-ভোটের ফল এই রকমই হ'বে। কিন্তু গণ-ভোট অনুষ্ঠিত হ'লে পারস্পরিক তিক্ততা আরও বাড়বে—সাম্প্রদায়িক লড়াই পুনরায় ছড়িয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে এই উপায়ে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ফলে উভয়েই লাভবান হয়ে চলবে!" (I. I., Feb 1, 1948)

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'তে সে সময় যা লেখা হচ্ছিল, তার মর্মার্থ নিম্নরূপ:

আজ উভয় রাষ্ট্রই যে জম্মু ও কাশ্মীর নিজ নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করার জন্যে উদগ্রীব হয়েছে এর উদ্দেশ্য কী? ভূখণ্ড লাভের জন্যে? কাঁচা মাল পাবার সুবিধা হবে বলে? দেশ জয়? এ সবই ত ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদীদের আদর্শ ছিল। তবে কি নতুন স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল? তা যদি না হয় তা হ'লে ধরা যেতে পারে যে, উভয় রাষ্ট্রেরই উদ্দেশ্য কাশ্মীরী জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। কিন্তু পরস্পর যুদ্ধ করে কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে? ভারতের এখনই প্রতিদিন চার লক্ষ টাকার বেশী খরচ হচ্ছে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের মোহ প্রসূত ভূখণ্ডের লোভ ছেড়ে যাতে সমগ্র ভারত ও পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং যুদ্ধায়োজনে অর্থ ব্যয় না করে ব্যক্তি মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় সে দিকেই উভয় রাষ্ট্রের মন দেওয়া উচিত। স্মরণ রাখা উচিত, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে—এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্যেই মহাত্মাজি জীবন দান করেছেন। অতএব গান্ধীজীর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেন আমরা কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে যত্নবান হই! (vide—I I.,—Jan. to Feb. '48)

(৩) ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার গতি-পরিণতি

"র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অনুমান অনুসারেই ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা রূপ নিচ্ছে। এই রূপায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এক নায়ক-

তন্ত্রের উদ্ভব। স্বাধীনতা লাভের পর জনসাধারণের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মান বাড়াবার কাজে ব্যাপৃত না থেকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক পার্টিগুলি জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িকতা-বাদী ও আরো সব সমষ্টিবাদী আবেদন প্রচার করে চলেছে।

"জনসাধারণ যে এই সব সমষ্টিবাদী সার্বিক মতবাদে এত সহজে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে তার কারণ তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির একান্ত দৈন্য। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, গুরুবাদ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার অভাব, ধর্মীয় ভাব ও ভাবনার প্রভাব এবং গুরু নেতা বা কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বিচারে আনুগত্য স্বীকারের যুগযুগান্তরের সংস্কার ও অভ্যাস রাষ্ট্রে একনায়কত্ব স্থাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র। জনসাধারণের এইরূপ মানসিক অবস্থায় ধর্মীয় ও জাতীয় ঐক্যের আবেদনে সহজেই সাড়া জাগে এবং একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ অতিশয় জনপ্রিয় আন্দোলন হ'য়ে জেগে ওঠে। ধনী ও কায়েমী স্বার্থবানদের সহায়তায় এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়। একে ত তাদের কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও রাজত্ব করার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক, তার উপর তাদের ধনসম্পদ স্বার্থ প্রভৃতি কায়েম রাখার জন্যেও এই মতবাদ সহায়ক হয়ে ওঠে।

"ভারতীয় ফ্যাসিবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে অন্যান্য দেশের ফ্যাসিবাদের লক্ষণের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেহেতু এদেশে স্বাধীন চিন্তার কোন বালাই নাই এবং কোন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নাই, সেইজন্য ফ্যাসিবাদের বিরোধিতাও নাই—থাকলেও তা অতি ক্ষীণ। কম বেশী নীরবে, কোন বাধা বিপত্তি অতিক্রম না করেই অহিংসার পথেই ফ্যাসিবাদ এদেশে জেগে উঠতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় ফ্যাসিবাদের শক্তি এবং সংহতিও তেমন প্রবল আকার ধারণ করবে না, কারণ ভারত এখনো প্রধানতঃ সামন্তযুগেই আছে। ফ্যাসিবাদের আক্রমণাত্মক শক্তি গড়ে তুলতে হ'লে দেশব্যাপী যে জঙ্গী মনোভাব সৃষ্টির প্রয়োজন সে মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্যে কৃষকের ছেলেরা ও দেশের যুবকরা এগিয়ে আসে না। উপরন্তু প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব (সামন্ততান্ত্রিক দেশের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক) সার্বিক জাতীয়তা-বাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলার পক্ষে মোটেই সহায়ক হয় না। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার দারিদ্র্য,

আর্থিক নিরাপত্তার অভাব, বেকারী প্রভৃতি সমস্যার সমাধান কেবল সামরিক অর্থনীতি গড়ে তুললেই হবে না। সেই জন্য যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করে রেখেছে, সেই অবস্থাই ভারতীয় ফ্যাসিবাদের আক্রমণাত্মক শক্তিকে বাড়তে দিচ্ছে না। তথাপি ভারতের ফ্যাসিবাদ যে দাঁড়াতে পারছে, তার কারণ এর নিজের শক্তির জন্যে নয়—এর কারণ গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতা।" (I. I., Feb. 1, 1948)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শহীদের বাণী

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮। গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের দিনে রায় কলিকাতায় ছিলেন। সেই সময় তিনি নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ার' এক বিশেষ সংখ্যা মাত্র এই লেখাটি নিয়েই দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। তারপর দিল্লী থেকে কাগজটির দপ্তর বোম্বাইতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ২২শে ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় পুনরায় প্রকাশিত হয়।

"শোকাচ্ছন্ন ভারতের নেতারা শহীদ মহাত্মার পবিত্র স্মৃতির প্রতি তাঁদের একান্ত দৃঢ় আনুগত্য ঘোষণা করেছেন, এবং তাঁর বাণী অনুসরণ করার অঙ্গীকারও করেছেন। যদি এই অঙ্গীকার পালন করা হয়, তা হ'লে মহাত্মাজি তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনায় যা পারেন নি, আততায়ীর হাতে নিহত হয়ে তাই পারলেন। মহাত্মাজির মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অনুভূতির দ্বারা মথিত হ'য়ে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এই যে স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার উৎসারিত হয়েছে এর অকপটতা ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণই নাই। এই সঙ্গে এটাও ঠিক যদি জাতীয়বাদী ভারত মহাত্মার বাণী আগে অনুধাবন করত এবং দ্বিধাহীন চিত্তে তা অনুসরণ করত তা হ'লে আজ আততায়ীর হস্তে তাঁর নিহত হওয়ার শোক ভারতকে পেতে হ'ত না। সুতরাং এই নিদারুণ আঘাতের প্রথম বেদনার অসাড়ত্বটা কেটে যাবার পর তাঁর জীবন দান যাতে ব্যর্থ না হয়, সেই জন্য আজ দেশকে মহাত্মাজির বাণীর সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে হবে।

"মহাত্মাজির জীবদ্দশাতেই তাঁকে জাতির জনক রূপে অভিহিভ করা হ'তো। তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে জাতীয়তাবাদী ভারত তাঁকে এই নামেই চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তিনি জাতীয়তাবাদের কুলপুরোহিত—

পেট্রন-সেণ্ট ছিলেন, এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মনস্কামনা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তথাপি তিনি যে জাতীয়তাবাদের ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেই ধর্মের হাতেই বলি হলেন। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার এই তাৎপর্যই আজ সমগ্র সভ্য জগতকে বিস্ময় বিমূঢ় করে ফেলেছে। কিন্তু সন্দেহ হয়, খুব কম লোকেই হয়তো এই তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। জাতীয়তাবাদের অখণ্ড হিন্দুস্থানের ভৌগোলিক সত্তার বেদীমূলে জাতীয়তাবাদের পেট্রন-সেণ্ট বলি হলেন, এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ, যাঁরা আজ মহাত্মাজির প্রতি তাঁদের অমর আনুগত্য পুনর্ঘোষণা করছেন, তাঁরা সেই একই ভৌগোলিক সত্তার নিকট পূজো দিচ্ছেন। অবিশ্বাস্য হ'লেও, যখন এই গোঁড়া জাতীয়তাবাদ তার নিজ যুক্তি অনুসারে তার নিজেরই কুলপুরোহিতের রক্ত দাবী করে বসল, তখন সেই কুল পুরোহিত মহাত্মাজির বাণীকে শুধু দেশের জন্যে দুঃখবরণ ও ত্যাগ করার আহ্বানের মধ্যেই শেষ হ'ল বলে ধরলে চলবে না, তার চেয়ে তা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলেই ধরতে হবে। মহাত্মার বাণীর আবেদন প্রধানতঃ নৈতিক মানবতাবাদী ও বিশ্বজনীন, যদিও মহাত্মাজি নিজেই জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতা দিয়ে তাঁর বাণীর মহান দিকটাকে আচ্ছন্ন করার সুযোগ দিয়ে এসেছিলেন। তাঁর এই জীবন দানের তাৎপর্য এই যে, তাঁর বাণীর মহৎ দিকটির সঙ্গে তাঁরই প্রচারিত জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ গোড়ামির মিল হ'তে পারে না। দুঃখের বিষয়, মহাত্মার ভাব ও ভাবনার এবং লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধিতা ছিল, তা তিনি সম্প্রতি বুঝতে পেরেছিলেন। এই সময়টি যেমন তিনি ভ্রম-মুক্ত ব্যথা-কাতর চিত্তে কাটিয়েছেন, তেমনি বীরের মত চেষ্টা ক'রে তাঁর পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে ফেলতে চেয়েছেন তাঁরই নিজস্ব পুরাতন ধ্যান-ধারণার চোরাবালির উপর নির্ভর করে।

"রাজনীতির মধ্যে নীতিপরায়ণতার প্রবর্তন করাই ছিল অহিংসা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা গেছে মহাত্মাজির মধ্যে নীতিবাদের চেয়ে রাজনীতিই অগ্রাধিকার পেয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো তিনি কোন দিনই তাঁর নীতি বা বিশ্বাস থেকে সরে যান নি, কিন্তু তিনি তাঁর অনুগামীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং ব্যক্তিগত পদস্খলন তাঁর নীতিবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করেছেন বা রফা করেছেন; যদিও তাঁকে এসব বাধ্য হ'য়েই করতে হয়েছে। তাঁর নৈতিক অনুশাসন এমনই বাঁধাধরা ছিল যে, অপরের পক্ষে তা

প্রতিপালন করা অনেক সময় অন্ধ অনুকরণের মতই হ'তো। মহাত্মা যে নৈতিক অনুশাসন প্রচার করে গেছেন মোটামুটি তাতে আপত্তিকর কিছুই নাই। তাঁর নৈতিক জীবন অতীতের ধর্মগুরুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং আধুনিক যুক্তিবাদী আবহাওয়ায় তাঁর নৈতিক অনুশাসনকে খানিকটা গোঁড়ামি বলেই মনে হ'তে পারে। তাই বলে বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে বা অকেজো ব'লে একে পরিত্যাগ না ক'রে বরং যুক্তিসম্মত ভাবে এর সংস্কার সাধন ক'রে একে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নৈতিক অনুশাসনের বিকল্প একমাত্র ইউটিলিটেরিয়ানিজিম বা হিতবাদ নয়। নৈতিকতার অন্য লোকায়ত সমর্থন আছে।

"উদ্দেশ্য দিয়ে উপায়ের বিচার চলে না। এই সাধ্য-সাধন তত্ত্বেরই ব্যবহারিক প্রকাশ অহিংসা নীতির মধ্যে। মহাত্মার বাণীর এই-ই হ'ল মর্মকথা, এবং এ নীতি ক্ষমতাপ্রয়াসী রাজনীতির সঙ্গে খাপ খায় না। মহাত্মাজী রাজনীতিকে বিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেটা সম্ভব হ'তে পারে, যদি রাজনীতি থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দূর করা যায়। তা করতে হ'লে জাতীয়তাবাদী ভারতকে সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হবার জন্যে প্রমত্ত হওয়া চলবে না; কারণ এর অনিবার্য পরিণতি, যুদ্ধ। এই প্রমত্ততার মধ্যে মহাত্মার অহিংসা ও শান্তির বাণীর প্রতি অচলা নিষ্ঠা জানানো পাষণ্ডতা বলেই মনে করি।

"হিন্দু গোঁড়ামি মিশ্রিত জাতীয়তাবাদ মোসলেম সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে। সেইজন্যেই মহাত্মাজী যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের আদর্শ দেশের সামনে রেখেছিলেন তা সফল হ'ল না। এই অসাফল্যে নিশ্চয়ই তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। এবং শেষ জীবনে তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্যেই জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনি যা পারলেন না, তার চেয়ে যারা অনেক খাট, যাদের আদর্শ অতখানি বড় নয়, তারা তা পারবে কেন? জাতীয়তাবাদ তাঁর আপন রক্তাক্ত পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলেছে। মহাত্মাজীর সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত বিশ্বজনীনতা ও মানবিক মূল্যে মূল্যবান বাণীর প্রয়োজন আজ ভারতের পক্ষে যতটা বেশী, তেমনটি আর কোনদিন ছিল না। তাঁর ভাব ও ভাবনার সঙ্গে তাঁর লক্ষ্যের বিরোধ থাকার ফলে জাতীয়তা-বাদের মধ্যে যে ত্রুটি ছিল তা জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছবার আগে পর্যন্ত তাঁর চোখে পড়ে নি। তাঁর এই জীবনদানের ফলে তাঁর অনুগামীদের কি চোখ

খুলবে? তাঁরা কি এখন বুঝবেন, কী করে তাঁর পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করা যায়? তা সম্ভব হ'বে তাঁর বাণী অনুসারে কাজ ক'রে—যে কাজ করতে তিনিও সাহস করেন নি, সেই দুঃসাহসিক কাজ ক'রে।

"নব ভারতের জাতীয়তাবাদের পেট্রন-সেণ্টরূপে ইতিহাসের পাতায় তিনি খ্যাত হবেন না; কারণ জাতীয়তাবাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর নৈতিক ও মানসিক আদর্শের বিরুদ্ধ কর্ম করেই চলতে বাধ্য হবে। তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এই জন্যে যে, তিনি মানব-প্রেমের আদর্শে একটি সভ্যতা গড়ে তোলার কল্পনা করেছিলেন; যদিও তা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির অবৈজ্ঞানিক কুহেলিকায়

প্রধানতঃ তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ; অথচ তিনি তাঁর অনুগামী-দের নিকট যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তা রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজন ধর্মীয় ভাব ও ভাবনার মন্ত্রপূত গণ্ডি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা। সেইজন্যে সকল নীতি, শান্তি ও সর্বজনীন সৌভ্রাত্রের আদর্শ প্রচারক অন্যান্য মহাপুরুষগণের মতই মহাত্মাজীও তাঁর উদ্দেশ্যলাভে ব্যর্থ হতে বাধ্য। মধ্যযুগীয় ধর্মোন্মত্ততা ও অন্ধ গোঁড়ামির আবহাওয়ার মধ্যে সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্য সম্ভব নয়। জাতীয়বাদ একটি সমষ্টিবাদী সার্বিকধর্মী মতবাদ; সেইজন্য এতে ব্যক্তিসত্তার ও স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ নাই। ব্যক্তিসত্তা ও স্বাতন্ত্র্যই যদি গেল তবে কী নিয়ে মানবতাবাদ গড়ে উঠবে? অতএব জাতীয়তাবাদের মধ্যে মানবতাবাদের আদর্শ লাভ সম্ভব নয়। যেখানে আশা আর আদর্শ হ'ল জাতিকে বড় ঐশ্বর্যবান ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা, সেখানে শান্তিপূর্ণ বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্রের লক্ষ্য ম্লান হয়ে যেতে বাধ্য। জাতীয়তাবাদের সংগে মানবতাবাদের যে বিরোধ তার যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা যদি করা না হয় এবং মহাত্মাজীর শিক্ষা ও বাণীর মর্মকথা যে মানবতা, তাকে যদি জাতীয়তাবাদী ও ক্ষমতা লিপ্সু রাজনীতির উর্ধে তুলে ধরা না হয়, তবে মহাত্মাজীর বাণী ও আদর্শের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার অর্থহীন; এবং মহাত্মাজীর এই জীবনাহুতি—তাঁর এই শহীদের কণ্টক মুকুট পরিধান ব্যর্থ।"

উত্তরপাড়া শিক্ষা শিবির (র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট) ১৯৪৮

উপবিষ্ট : মানবেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এলেন রায়, ভি. এম. তারকুণ্ডে, স্বদেশরঞ্জন (লেখক), শান্তি দাস (লেখক-পত্নী)

দণ্ডায়মান : জগন্নাথ বসু, বরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ কুমার সিংহ, শিব নারায়ণ রায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রূপান্তর

রায় দেখলেন, তাঁর নব-মানবতাবাদ এতই অভিনব যে, লোকে ঠিক ধরতে পারছে না। যাদের বোঝার কথা সেই অতি উচ্চশিক্ষিত মহলও বুঝে উঠতে পারছে না। তিনি তাত্ত্বিক দিকটির আলোচনার জন্যে Marxian Way নামে এক ত্রৈমাসিক কাগজ বের করলেন। পরে এই কাগজের নাম বদলে Humanist Way রাখা হয়েছিল।

সারা বছর ধরে সমগ্র ভারত ঘুরে ঘুরে আঞ্চলিক সভায় উপস্থিত থেকে নব-মানবতাবাদের দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতির স্বরূপ এবং এর প্রয়োগ পদ্ধতির আলোচনা পরিচালনা করেন, ব্যাখ্যা করেন, ভ্রান্তি অপনোদন করেন, সংশয় ভঞ্জন করেন।

সমগ্র ভারতের মানবতন্ত্রীদের নিয়ে অতি উচ্চস্তরের আলোচনার জন্যে দেরাদুনে ১৯৪৮ সালের মে মাসে দশ দিনব্যাপী আলোচনা চক্র বসল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এ পর্যন্ত যত প্রকার দর্শনের, রাজনীতির, অর্থনীতির, শিক্ষা-সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে তার সঙ্গে নব-মানবতাবাদের তুলনামূলক বিতর্ক ও সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে এর ভুলত্রুটিরও অনুসন্ধান হল।

তারপর কয়েকমাস ধরে সমগ্র ভারতের আঞ্চলিক আলোচনা চক্রে দেরাদুনের আলোচনার ফলাফল নিয়ে পুনর্বিবেচনা চলল।

এই নতুন দর্শনের দু'বছরের মধ্যেই একটি জিনিষ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট দর্শনে ও রাষ্ট্র পরিকল্পনায় যখন ব্যক্তি-মানুষের সার্বভৌম অধিকার প্রতিনিধির হাতে হস্তান্তর ক'রে দেবার নীতি ও ব্যবস্থা নাই, এবং ব্যক্তি মানুষই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার বলে গ্রামসভাতে বসে গ্রাম পঞ্চায়েৎকে

তথা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করবে তখন রাজনৈতিক পার্টি বলতে আর কিছু থাকবে না। কারণ রাজনৈতিক পার্টির বাঁচবার একমাত্র মূলধন হ'ল জনগণের দ্বারা হস্তান্তরিত সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereign Right)। তা যখন আর থাকবে না তখন তেলের অভাবে যেমন দীপ নিভে যায়, মূলধনের অভাবে যেমন কারবার উঠে যায়, তেমনি পার্টি-কারবারও এই মূলধনের অভাবে উঠে যাবে। কিন্তু যে দর্শনের উদ্দেশ্য হ'ল এই প্রকার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সেই দর্শন যদি কোন রাজনৈতিক পার্টির দ্বারা প্রচারিত হয়, তা হ'লে এক দিকে যেমন সেটি অযৌক্তিক হয়, অন্যদিকে তেমনি আবার ভুল বোঝা-বুঝির সম্ভাবনাও থাকে। সেইজন্যে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তুলে দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরে কলিকাতায় নিখিল ভারত র‍্যাডিক্যাল পার্টির সম্মেলনে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অবলুপ্তি ঘোষণা করে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজিম প্রচারের জন্যে "র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মুভমেণ্ট" নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা হ'ল। এই "মুভমেণ্টের" কোন সংগঠন থাকল না, সভাপদ রইল না, কার্যকরী সমিতি বা সেক্রেটারীদের কোন কাজ রইল না। এই "মুভমেণ্ট" পরিচালনার জন্যে মাত্র এক কো-অর্ডিনেটিং কমিটি রাখা হ'ল।

র‍্যাডিক্যাল পার্টি তুলে দেবার যে কারণ উপরে দেওয়া হ'ল তাতে কিন্তু সবটুকু বলা হ'ল না। আরও কারণ ছিল :

নব-মানবতাবাদের দর্শন এতই অভিনব যে তা উপলব্ধি করা র‍্যাডিক্যাল পার্টির সভ্যদের পক্ষে খুবই দুরূহ হয়ে উঠল।

র‍্যাডিক্যাল পার্টি গড়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দল বিপ্লবীদের নিয়ে। তারা প্রায় সকলেই মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিল। সরকারী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাদের তফাৎ ছিল এই যে, তারা ষ্ট্যালিনের নীতির বিরোধী হয়ে রায়ের পক্ষ সমর্থন করত। এছাড়া তারা মার্কসের ডায়লেকটিক্‌স্, ইতিহাসের অর্থনৈতিক গতিবিজ্ঞান, বাড়তি মূল্য ও বিপ্লবের নীতি, শ্রেণী বিরোধ ও সর্বহারার একাধিপত্যের নীতিতেই আস্থাবান ছিল।

রায় তাঁর দর্শনে লিবারেলদের ও মার্কসবাদীদের মানুষকে ইকনমিক্ ম্যান পর্যায়ে অধঃপাতিত করার জন্যে নিন্দা করেছেন, দোষী সাব্যস্ত করেছেন। র‍্যাডিক্যাল পার্টির সভ্যরাও মার্কসবাদী ছিল, তারাও অনুরূপ দৃষ্টি দিয়েই

মানুষকে দেখে আসত। তারাও লিবারেলদের মত বিশ্বাস করত, সার্বজনীন ভোটাধিকার মানে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া নয়, কেবল প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার; তারাও বিশ্বাস করত যে, এই সব প্রতিনিধি গঠিত স্বাধীন ভারতের সরকার ভাল ভাল গোটা কয়েক আইন জারি করলেই মানুষের সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কমিউনিষ্টদের মত তারা এও বিশ্বাস করত যে, রাষ্ট্রে একাধিপত্য স্থাপন করে সমাজে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারলেই মানুষের সকল দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটে আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার পথে আর কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু এতে যে ব্যক্তির সার্বভৌম অধিকার মোটে স্বীকৃতই হ'ল না, এতে যে ব্যক্তি-মানুষ সমষ্টিসত্তার কাছে বিকিয়ে যাবে, চরম দাসত্বের পর্যায়ে অধঃপাতিত হয়ে অতি কঠিন জীবনযাপন করতে হবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল রায়ের নব-মানবতাবাদ দর্শন উদ্ভাবনার পূর্বে?

মানুষের স্বাধীনতা ইকনমিক্ ম্যানের স্বাধীনতা নয়—শ্লেভ্ বা শ্লেভ্ ড্রাইভার হয়ে পয়সা রোজগার করার স্বাধীনতা নয়। মানুষের স্বাধীনতা তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যে ইচ্ছামত জীবনযাপনের স্বাধীনতা। এ দুয়ের মধ্যে যে আসমান্ জমিন্ ফারাক্, তা আগে কে বুঝতে পেরেছিল।

র‍্যাডিক্যাল পার্টির উচ্চ পর্যায়ের কর্মীরা সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরাতন পরীক্ষিত বিপ্লবী কর্মী। তাদের শিক্ষা ও সংস্কার জাতীয়তাবাদী বিপ্লব বা মার্কসবাদী বিপ্লবের নীতি-পদ্ধতির দ্বারাই প্রভাবিত।

সুতরাং নব-মানবতাবাদ তাদের পুরাতন শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানল। এই আঘাতের প্রচণ্ডতার ফলে তারা সকলেই অসাড় হ'য়ে গেল—নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। বরং যে সব র‍্যাডিক্যাল তরুণ তখনো ছাত্র-জীবন শেষ করেনি তাদের অনেকের পক্ষে এই নতুন দর্শন অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হ'ল। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি দেখা গেল, র‍্যাডিক্যাল পার্টি, (এক বছর আগে যার সভ্য ও সমর্থকদের সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল) প্রায় নিশ্চল হয়ে গেছে।

রায় সবই বুঝলেন। বুঝলেন, পুরাতন শিক্ষা-সংস্কার ও মানসিক অভ্যাসের কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে এই নতুন দর্শনের জন্যে যে ভাব ও ভাবনা অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের মনে জাগিয়ে তুলতে হ'বে তা সময় সাপেক্ষ; এবং ভাব-জগতে সেইরূপ পরিবর্তন সাধনের কাজে পার্টিতে কে যে উপযুক্ত কে যে নয়, তা কালক্রমে কাজের মধ্য দিয়ে জানা যাবে। অতএব যে পার্টিকে ক্ষমতা দখল করার অস্ত্ররূপে

গড়ে তোলা হয়েছিল বর্তমানে সে অস্ত্রের আর প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন যখন প্রধানতঃ শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক তখন রাজনৈতিক পার্টি দিয়ে সে কাজ হয় না।

ব্যক্তি মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে রায়ের এই যে উদ্ভাবনা—এ তাঁর সমগ্র জীবনের এষণার ফল। এই দর্শনের কথা র‍্যাডিক্যাল পার্টির সভ্যদের কাছে (যারা ছিল ফলিত রাজনীতির ছাত্র) একান্তই দুর্বোধ্য ঠেকেছিল।

তিনি তাঁর দর্শনের ত্রয়োদশ সূত্রে ব্যক্তি মানুষ সম্বন্ধে লিবারেলদের ধারণাকে নিন্দা করেছেন। লিবারেলরা ব্যক্তি মানুষকে তবু ইকনমিক ম্যান রূপেও দেখত কিন্তু মার্কস ব্যক্তিকেই অস্বীকার করলেন—বললেন ব্যক্তিত্বের ধারণা বুর্জোয়াদের কল্পনা মাত্র।

ব্যক্তি সম্বন্ধে রায়ের এই ধারণা সভ্যতার ইতিহাসে কারুরই কোনদিন ছিল না; সুতরাং র‍্যাডিক্যাল পার্টির সভ্যদেরও ছিল না। অতএব নব-মানবতাবাদ তাদের দুর্বোধ্য লাগবে বৈকি!

রায় বললেন, যে কোন বৈপ্লবিক মতবাদের মূল ভিত্তি হ'ল ব্যক্তির সার্বভৌমিকতা। কিন্তু ব্যক্তির উপর সার্বভৌমত্বের মূল্য আরোপ করা সম্ভব হয় তখনই অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষ সকল অধিকার ও দায়িত্ব বহন করার মত উপযুক্ত হতে পারে তখনই যখন মানুষকে এক নীতিপরায়ণ সত্তা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। মানুষ সম্পর্কে এই ধারণা ধর্ম জগতে অতি পুরাতন। ক্রীশ্চান জগতে ধরা হয়, যেহেতু মানুষের আত্মা আছে, এবং যেহেতু আত্মা ঈশ্বরেরই অংশ, সেইহেতু মানুষও এক নীতিপরায়ণ সত্তা। ইউরোপে লিবারেলরা গোড়ার দিকে ব্যক্তি মানুষের উপর যে সার্বভৌমত্বের মূল্য আরোপ করেছিল, তার ভিত্তি ছিল ক্রীশ্চান জগতের এই বিশ্বাস। প্রথম প্রথম এতেও কাজ হয়েছিল। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ভূ-দাসত্ব প্রথা থেকে ইউরোপের জনগণ লিবারেলদের এই মতবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই মুক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের এই নীতিপরায়ণতার মধ্যে স্বকীয়তা না থাকায় এবং মানবাত্মা ঈশ্বরের বা মহান আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র হওয়ায় মানুষের এই ধার করা সার্বভৌমত্ব কোনদিনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে নি। তার ফলে মুক্তির পথে মানুষকে বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতেও পারে নি। এই ধর্মীয় নীতি-পরায়ণতার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মানুষ মানুষ হিসাবে কখনও নীতিপরায়ণ

হ'তে পারে না। অতএব মানুষকে যখন সমাজ গ'ড়ে বাস করতে হবেই, এবং নীতিপরায়ণতা না থাকলে সমাজে বাস করা যায় না, তখন এই নীতিপরায়ণতার জন্যেই মানুষকে ঈশ্বরের ও ধর্মের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হ'বে। ধর্মের ও অলৌকিক শক্তির নিকট মানুষের এই যে ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি, এই যে দাসত্ব, এই যে নির্ভরতা, এর ফলে মানুষ কোনদিনই সার্বভৌমত্বের অধিকারী হ'য়ে মনের মত সমাজ গড়ে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। আদিকাল থেকে যেমন মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে, বামুন-পুরুতের ভয়ে, মুনি-ঋষির অভিশাপের ভয়ে, সর্দারের ভয়ে, মাঝে মাঝে যুদ্ধের ভয়ে, রাজা-জমিদারের ভয়ে, ভূতের ভয়ে, পাপের ভয়ে, শনি রাহু অশ্লেষা মঘা গ্রহ-নক্ষত্রের ভয়ে, নরকের ভয়ে সর্বদাই অভিভূত হ'য়ে এক অতি নিরেট নিরবকাশ দাসত্বের জীবন যাপন করত—ঠিক তেমন জীবনই যাপন করে চলবে; হয়তো প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের দৌলতে অশন-বসনের কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হবে মাত্র। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার উদ্ভবই হয়েছিল মানুষকে এই মানসিক দাসত্ব থেকে সর্বাগ্রে মুক্তি দিতে। লিবারেল মতবাদের জন্মও হয়েছিল এই প্রচেষ্টা থেকেই। এই প্রচেষ্টা চরমে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈদগ্ধ্যের যুগে।

কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের অতিরিক্ত অনাচার-অত্যাচার লিবারেলদের ভীত ও আতঙ্কিত করে তুললো। পুনরায় ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘুরে গেল। সুরু হ'ল পুনরায় সেই অপ্রাকৃত অলৌকিক শক্তির কাছে মনে মনে আত্ম নিবেদন, পূজা-প্রার্থনা, ধর্মের অনুশাসনে জীবনকে শাসিত ক'রে পাপাতঙ্কে সন্ত্রস্ত মানুষকে নরকের ভয় দেখিয়ে নীতিপরায়ণ করার সাধু প্রচেষ্টা!

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এ চেষ্টার প্রতিবাদ হয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিবাদের ফলে বৈদগ্ধ্যের যুগ ফিরে এল না। যাঁরা এই ধর্মীয় নীতিপরায়ণতার প্রতিবাদ করলেন, তাঁরা এর পরিবর্তে দিলেন হিতবাদী নীতি-পরায়ণতা অর্থাৎ যে ক্রিয়াকর্মে ও আচরণে মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশী হিতসাধন হবে তাকেই নীতিপরায়ণ ক্রিয়াকর্ম বলে ধরা হবে। কিন্তু এই হিতের বিচার হবে কোন বাস্তব মাপকাঠি দিয়ে? তাঁরা উত্তর দিলেন, সে বিচার হবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে—যে যার মনে মনে।

ধর্মীয় নৈতিকতার বিচারও হয় মনে মনে। তারও কোন বাস্তব মাপকাঠি নাই, যা দিয়ে তার গুণাগুণ পরিমাপ করা যাবে। ঠিক তেমনই এই

হিতবাদের নৈতিকতা নির্ধারণেরও কোন বাস্তব মাপকাঠি রইল না। ফলে যে যার ইচ্ছামত নৈতিকতার—মর‍্যালিটির সংজ্ঞা নিরূপণ করে চললেন; মানুষের কিসে ভাল হবে কিসে হবে না, তাও এইরূপ মনগড়া সংজ্ঞা দিয়েই নির্ধারিত হ'য়ে চলল। নীতিপরায়ণতার কোন সর্বজনগ্রাহ্য সামাজিক মাপকাঠি আর রইল না। ধর্মীয় ও হিতবাদী এই দুই প্রকারের নৈতিকতার ফল হ'ল শেষ পর্যন্ত সমাজ ও জীবন থেকে সর্বজনগ্রাহ্য মর‍্যালিটির অন্তর্ধান। নৈতিক জগতে এক ব্যাপক শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলতা বিরাজ করতে লাগল।

এই নৈতিক সংকটের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তি মানুষের দুর্দশাও বেড়ে চলল। পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি তথা প্রতিনিধি মারফৎ শাসন-তন্ত্রে ও laissez faire নীতি শাসিত নিরংকুশ প্রতিযোগিতা-মূলক অর্থনীতিতে দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের জন্যে অক্ষম আক্রোশে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া সাধারণ মানুষের আর করার মত কিছু রইল না। আর করবেই বা কী? লিবারেলদের সকল পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সার্বভৌম অধিকারের দৌড় ত' ঐ প্রতিনিধিদের হাতে সেটি হস্তান্তরিত করে দেওয়া পর্যন্ত। এবং যারাই প্রতিনিধি তারাই ত ভক্ষক। অতএব সমস্যার সমাধান যখন ব্যক্তি মানুষের ক্ষমতার বাইরে তখন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস আর কী করে থাকবে?

সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস যে থাকার কথা নয়, তা বেশ বোঝা যায় যখন দেখি, দু' দলের মধ্যে এক দল বলছেন, নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত দায়িত্ব-জ্ঞান, অর্থাৎ নীতি-পরায়ণ হবার মত শক্তি মানুষের মধ্যে নাই, তা আছে ঈশ্বরের হাতে; অতএব অবস্থা যদি অসহনীয় হয় তবে তার প্রতিকারের জন্যে ঈশ্বরের নিকট পূজা-প্রার্থনা ছাড়া আর করার কিছু নাই।

আর একদল নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন, greatest good to the greatest number—অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ হিত করতে হবে। তার উপায় হ'ল: দল-পার্টি গড়ে তোল, শ্রেণী-সচেতন হও, সব ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক দল এবং দলপতির শরণ লও—সর্ব সন্তাপ থেকে মুক্তি পাবে—চিন্তা কি!

এই দুইয়ে মিলে দাঁড়াল, ব্যক্তি মানুষের নিজের করণীয় আর কিছু রইল না। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তি সমূহের অনুশীলন করে, তার

বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটিয়ে, নিজের সমস্যা নিজে দূর করার মত আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার প্রশ্নই আর থাকল না। রইল কেবল পূজা-প্রার্থনা,—ঈশ্বরের কাছে কিংবা পার্টি বা নেতার কাছে।

এইভাবে রাজনীতি ও সমাজনীতি থেকে ব্যক্তি মানুষের বিলোপ ঘটল। সেদিন পর্যন্ত সকল মানুষের ভাব ও ভাবনায়, এমন কি র‍্যাডিক্যাল পার্টিতেও ঠিক এই জিনিষই বিরাজ করছিল। রায় এরই মাঝে নিয়ে এলেন তাঁর নতুন ভাবনা। একেবারে নতুন—একেবারে বিপরীত।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে নয়, পার্টির পরিচালনায় নয়, ব্যক্তি যে মানুষ হিসাবেই নীতি পরায়ণ অর্থাৎ দায়িত্বশীল, আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারে এবং নিজের সৃষ্টির দায়িত্ব বহন করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই অপর মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে, প্রতিবেশীর সহযোগিতায় নিজ ভাগ্য - সমাজ—সভ্যতা, এক কথায়, ইতিহাস গড়ে তুলে নিজের সুখ সম্ভোগ বিকাশের পথের বাধা অপসারণ করতে পারে, সে কথা আর কার জানা ছিল?

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখার সকল কথা ঠিকমত গাঁথলে দেখা যাবে সকলেই এ কথা জানতে পারত বা জানতে পারে। তথাপি বলতে হবে ব্যক্তি মানুষ সম্বন্ধে রায়ের এই ধারণা একান্তই অভিনব।

রায়ের মানুষ শুধু জীবধর্মী ইকনমিক ম্যান নয়। সে মনুষ্য ধর্মী। রায়ের ঈপ্সিত সমাজ, রাষ্ট্র এই সব মানুষকে নিয়েই গঠিত হবে। সত্যই এ এক নতুন পরিকল্পনা। চিন্তার ক্ষেত্রে এটা ফুটিয়ে তুলে বহুর মধ্যে একে উপলব্ধির পর্যায়ে নিয়ে আসা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে সে কাজ সম্পন্ন করা মোটেই সম্ভব ছিল না। আজ ১৯৬৫ সাল। জানিনা, রায়ের ব্যক্তি মানুষের সংজ্ঞা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি কত জনের হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ বেশী নয়। অথচ সে সংখ্যাবৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে না হলে রায়ের ঈপ্সিত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে না। এই সংখ্যা বৃদ্ধি আজ না হলেও কাল যে হবে না, তা বলা চলে না। কারণ, দেখা যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখার যে সব খণ্ড সত্য গেঁথে গেঁথে রায় তাঁর দর্শনের মালাখানি রচনা করেছিলেন, সেই সব খণ্ড সত্যের সংবাদ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ছাত্ররা রাখেন। কিন্তু সেই সব খণ্ড সত্য একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা যে রায়ের নব-মানবতাবাদ, সে সংবাদ অতি অল্প মানুষই রাখে। সুতরাং

সুকৌশলে ও দক্ষতার সংগে চেষ্টা করলে এই দর্শনের সংবাদটি এই সব শিক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয় না ; এবং এই অনড় জগদ্দল পাথর একবার নড়লে নিজের গতিবেগে নিজেই চলতে থাকবে। রায় প্রায়ই বলতেন, আইডিয়ার ডানা আছে, আপনিই উড়ে বেড়ায়।

যে কথা বলছিলাম। র‍্যাডিক্যাল পার্টির অবলুপ্তির অন্যতম কারণ হ'ল, সেদিন পার্টিতে রায়ের নতুন দর্শনের সম্যক উপলব্ধি করার মত মানুষের অভাব। নতুবা ১৯৪৬ সালে পার্টির বোম্বাই সম্মেলনে যখন নব-মানবতাবাদকে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসির দর্শনরূপে গ্রহণ করা হ'ল, তখন এই দর্শন প্রচারে এবং তা প্রয়োগের ব্যাপারে র‍্যাডিক্যাল পার্টিকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা যে নীতি বিরোধী ব্যবস্থা হচ্ছিল তেমন কথা কেউ বলে নি। এই ঘটনা থেকেই লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছে।

র‍্যাডিক্যাল পার্টির সভ্যরা সকলেই অতি সৎ, বিবেকবান—দুঃসাহসী আইডিয়ার জন্যে জীবনদানেও প্রস্তুত, বৈপ্লবিক রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, লেখাপড়া জানা, বুদ্ধিমান মানুষ। নতুবা সেদিন রায়ের মত সর্বাপেক্ষা নিন্দিত ও অপ্রিয় মানুষের সঙ্গে শুধু আইডিয়ার জন্যে হাত মেলাতে পারতেন না, সকল নিন্দা হেলায় তুচ্ছ করে প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে নামতেন না। যদিও সেদিন পার্টি উঠে গেল এবং রাজনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ হ'ল তথাপি এঁরা কোন রাজনৈতিক পার্টিতে যোগ দিলেন না। অথচ এঁদের স্বাগত জানাতে সেদিন পার্টির অভাব ছিল না। রায়ের দর্শন সেদিন সম্যকভাবে উপলব্ধি না করেও এঁরা কেবল রায়ের ব্যক্তিত্বের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীলতার জন্যে নিজেদের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দিলেন। অধিকাংশই তরুণ বয়সে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন বলে, সংসারী লোকেরা যাকে বলে, career তা এদের নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। ফলে 'সংসারী হওয়া' আর অনেকের পক্ষেই সম্ভব হ'ল না, অনেককে অতি হতভাগ্য জীবনই যাপন করতে হল। তথাপি তাঁরা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট রূপেই নিজেদের পরিচয় রাখলেন। এ কেবল সেই অসাধারণ মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন।

১৯৪৮ সাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ইতিহাসের অন্তরালে অন্তর্হিত হ'ল। বিদায় অভিনন্দন জানাতে তখন বড় একটা কেউ ছিল না। যে জাতীয়তাবাদের জয়গানে এতদিন ভারতের আকাশ-

বাতাস মুখরিত ছিল, সেই জাতীয়তাবাদের দিল্লীর সিংহাসন লাভের মধ্যে দিয়ে যখন জয়লাভ হ'ল তখন যে পার্টি ঘোষণা করেছিল, Nationalism is an antiquated cult—Individual is the archetype of society—জাতীয়তাবাদ এযুগে অচল—ব্যক্তিই হোক সমাজের আদর্শ, সে পার্টি যে জাতীয়তাবাদ বিরোধিতার অপরাধে অপরাধী হবে, ধিকৃত হ'বে, অসম্মানিত হবে, সে ত জানা কথা! তার বিদায় সভায় সাধারণ মানুষের শঙ্খধ্বনি না করা, বীণা-বেণু বাজিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন না করাই ত' স্বাভাবিক!

তবে ইতিহাস এই পার্টিকে ভুলবে না। সেদিন যে দানবীয় শক্তি সমগ্র সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের যতকিছু মহৎ সৃষ্টি ও সাধনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, সব কিছুকে নির্মম নিষ্ঠুরতার সংগে ধ্বংস ক'রে যতকিছু বর্বর ও বন্যকে তুলে ধরবার অপচেষ্টা করেছিল—যার নমুনা পৃথিবী পেয়েছে বেলসেন, ডাচাউ, অসউইজ-এ লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর নির্বিচার উৎসাদনে—তা রুখবার জন্যে সমগ্র বিশ্বে যে অভাবনীয় ও অভিনব দুঃসাহস, বীরত্ব ও দৃঢ়তার সমন্বয় ঘটেছিল, যার ফলে ইতিহাসের প্রথম মহৎ মহাযুদ্ধে সভ্যতার জয়, মানবতার জয়, প্রগতির জয় সম্ভব হয়েছিল, সেই বিশ্ব মানবের মুক্তি মহাযজ্ঞে এই র‍্যাডিক্যাল পার্টিও অন্যতম হোতা রূপে সেদিন সামিল ছিল।

সভ্যতার ইতিহাসে আদর্শলাভের জন্যে 'প্রাণ তুচ্ছ, সবাই দান করিতে পারে', এই বাক্য যেমন সত্য, তেমনি 'যাক্ প্রাণ, থাক মান'ও তেমনি সত্য। সমগ্র ভারতে সেদিন জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার কল-কোলাহলের কুজ্ঝটিকা ও ঘূর্ণাবর্ত ভেদ করে সেই মুক্তি মহাযজ্ঞে যোগদান সহজ ছিল না। অতি গুরুভার দুর্নাম ও ধিক্কারের বোঝা মাথায় নিয়ে শিরদাড়া উঁচু করে আদর্শলাভের জন্যে নির্ভীক ও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলা দুর্লভ বীরত্ব বই কি! সেদিন সেই মুক্তি মহাযজ্ঞের হোতাদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা র‍্যাডিক্যালরা অর্জন করেছিল।

ইতিহাস এ কথা স্মরণ করবে।

ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরদের যে কেউ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও মহৎ সৃষ্টির প্রতি আগ্রহশীল হবে, তাকেই প্রথম মহৎ মহাযুদ্ধের ইতিহাস থেকে জানতে হবে সেদিন কী দুর্জয়-দুঃসাহস, মহান-বীরত্ব, নিদারুণ-দুঃখবরণ, কঠিন-আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার এই সব মহার্ঘ ধনরত্ন রক্ষা করতে হয়েছে। তখন স্বতঃই তার মনে উদয় হবে, সে যদি সেদিন থাকত, তবে সেও এই বিশ্বমানবের মুক্তি-

মহাযজ্ঞের সমিধ বহন করে ধন্য হ'ত, আত্মাহুতি দিয়ে অমরত্ব লাভ করত। কিন্তু সমগ্র ভারতে সেদিনকার ইতিহাসের মধ্যে একটি বই দু'টি পতাকা দেখতে পাবে না, যে পতাকাতলে সমবেত হয়ে সে সেই মুক্তি মহাযজ্ঞে যোগ দিত। সেই পতাকাটি ছিল র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির যুক্তিবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতীক প্রজ্বলিত মশাল চিহ্নিত লাল পতাকা।

র‍্যাডিক্যাল পার্টি বিলুপ্ত হয়নি—তার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। ভারতের সুখ-শান্তি প্রগতি ও জীবন সম্ভোগ প্রচেষ্টার মধ্যে র‍্যাডিক্যালরা একাত্ম হয়ে আছে এবং থাকবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিম-বিবেকানন্দের উত্তর সাধক রায়

রায়ের আবাল্যের সাধনা যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের, এবং সে সাধনার সুরু যে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা থেকেই, সেকথা হয়তো অনেকে স্বীকার করবেন না। তাঁরা বলবেন, "ভারতের মানস উজ্জীবনের ইতিহাসে দু'টি প্রবল ভাবধারার সংঘাত চোখে পড়ে। এর মধ্যে বঙ্কিম, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, তিলক এবং অরবিন্দ একটি ভাবধারার প্রধান প্রবক্তা। বিপরীত ধারার মুখ্য প্রতিভূ ছিলেন ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, লোকহিতবাদী ফুলে, আগরকার প্রভৃতি। মানবেন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তার সংগে দ্বিতীয় ধারার সাযুজ্য কি অনেক বেশী স্পষ্ট নয়?

"মানবেন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ এবং পথ পরিবর্তন চোখে পড়ে, ধর্ম এবং ঐতিহ্য আশ্রয়ী জাতিপ্রেম থেকে মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদ থেকে বৈজ্ঞানিক ও বিশ্বনাগরিক মানবতন্ত্রে পৌঁছানোর পথে মানবেন্দ্রনাথকে যে সব আভ্যন্তরীণ বাধা এবং মানস সংকট অতিক্রম করতে হয়েছে তারই বা ব্যাখ্যা কি?"

এই প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য, রেনেসাঁসের মূল উদ্দেশ্য হ'ল, ইহজীবন-বিমুখ, অন্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক-দর্শন-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবর্তে ইহজীবনমুখী, যুক্তি নির্ভর, বস্তুতান্ত্রিক ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। অর্থাৎ জীবন-বিমুখ জীবনাদর্শের পরিবর্তে জীবনমুখী জীবনাদর্শের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া। ইহজীবনকেই যে সুখে স্বচ্ছন্দে ভরে তুলে পরম রমণীয় করে তোলা যায়, এমন আদর্শে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। রেনেসাঁস সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলছেন:

* "এই সংসার আর তখন পরলোকে যাবার কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথের কষ্টকর পান্থশালা রইল না, জীবন আকণ্ঠ সম্ভোগ করার উপবন হয়ে উঠল—এল জীবনে স্বীকৃতি, সৌন্দর্য, মরণের মুখে তুড়ি মেরে নিত্য নতুন দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে জীবনকে উপভোগ করার মত অফুরন্ত প্রাণশক্তি। শত শত বৎসরের ইন্দ্রিয় নিগ্রহের অভ্যাস অকস্মাৎ ভেসে গেল রাশি রাশি শিল্পে কাব্যে আনন্দ-সৃষ্টি-সুখের উল্লাসের বন্যায়।"

এইরূপ বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে রায় ১৯৪৯ সালের মে মাসের দেরাদুন নিদাঘ শিবিরের এক বক্তৃতায় বলেন :

"দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের ভাব ও ভাবনার সমগ্র ধারায় একটি রক্তিম রেখা একটানা চলে গিয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এই রক্তিম রেখাটি বলতে সেই প্রচেষ্টাকেই বলা হয়েছে, যে প্রচেষ্টায় মানুষ অপ্রাকৃত শক্তির পবিত্র বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে, তারপর প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে এবং (মানুষ নিজেও প্রকৃতিরই অংশবিশেষ) সেই সঙ্গে নিজেকেও জানতে চেয়েছে, ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে, মন বুদ্ধির অগোচর সমস্ত অপ্রাকৃত তত্ত্বের পরিবর্তে নিজের মন-বুদ্ধির গোচর প্রাকৃতিক তত্ত্বের সাহায্যে। এই প্রচেষ্টার ইতিবৃত্তই হ'ল দর্শনের মূলকথা এবং বিভিন্ন যুগে এরই বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। এ যাবৎ আমরা দর্শনকে বস্তুবাদ—Materialism আখ্যায় আখ্যাত করে এসেছি। তাই বলে আমাদের বস্তুবাদ উনবিংশ শতাব্দীর বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল—'এক তাল কঠিন বাস্তবতা'—সে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমাদের বস্তুবাদ হ'ল এই যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ম্ভূত ; অর্থাৎ এই সৃষ্টি নিজে নিজেই বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, বাইরের কোন শক্তি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চলার ব্যাপারে, এর ক্রমঃবিকাশে কোনকালেই কোন হস্তক্ষেপ করে নি : কারণ এই প্রকৃতির বাইরে আর কিছু নাই, প্রকৃতি অনাদি অনন্ত সবব্যাপী।" (I. I., 28/11/8)

এই ভাষণেই রেনেসাঁস আন্দোলন সম্বন্ধে বলেন :

"ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুপ্রেরণার দু'টি উৎস ছিল : প্রথম : প্রাচীন

* "For them the world appeared no longer as a vale of tears, a place of painful pilgrimage to another world but as affording opportunities for pagan delights, for fame and beauty and adventure. The long centuries of asceticism were forgotten in a riot of art, poetry and pleasure"
(Bertrand Russel, *History of Western Philosophy*)

জ্ঞান-বিদ্যা, দর্শন ও সভ্যতা। দ্বিতীয়ঃ আরবীয় পণ্ডিতদের দ্বারা পরিপুষ্ট গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান।

"আমাদেরও ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই ঘটবে। আমাদেরও দু'টি উৎস থেকেই অনুপ্রেরণা আসবে। প্রথমতঃ অনুপ্রেরণা পেতে হবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক বিজ্ঞান থেকে, যাকে বলা হয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি।" (I. I., 28/11/48)

ইউরোপের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং তারই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, উলঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণ-বৈষম্য, দেশীয় লোকদের উৎসাদন, উগ্র-জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, নির্মম নিষ্ঠুরতা, আর সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান সবই ইহলৌকিক—অতি স্থূল ইহলৌকিক। সুতরাং রেনেসাঁসের ইতিহাস বিচারে জাতীয়তাবাদ বনাম বিশ্বজনীনতা বিচার্য নয়। কারণ জাতীয়তাবাদ বনাম বিশ্বজনীনতা লোকায়ত সমাজ বিজ্ঞানের বিচার্য বিষয়। সমাজের ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার বিচারের প্রশ্ন যখন আসবে তখন এর বিচার হ'বে। বর্তমানে বিচার্য হ'ল, মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদী জীবন-বিমুখ জীবনবাদ বনাম ইহলৌকিক জীবনমুখী জীবনবাদের।

সুতরাং গত দেড়শ' বছরে ভারতে যে ভাব বিপ্লব চলেছে তার গতি-প্রগতির দিক নির্ণয় করতে হ'লে এই মাপকাঠি দিয়েই করতে হ'বে। এই নতুন যুগের ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে যখনই ইহজীবনমুখীনতা নিন্দিত হ'য়ে পুনরায় জীবন-বিমুখ হ'য়ে উঠবে তখনই বলতে হবে যে পুনরায় Revivalism সুরু হ'য়ে গেল, সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা সেই মধ্যযুগের ঘরে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে পরকাল, স্বর্গ-নরকের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে রেনেসাঁসের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা লাগে—মন মানিয়ে নিতে পারে না। প্রথম প্রথম ইহজীবনমুখীনতাও সম্পূর্ণ নির্ভেজাল বেশে আসে না। সমাজ-বিজ্ঞানে বস্তু-বিজ্ঞানের মত উপাদানসমূহ খাঁটি আকারে মেলে না। সমাজে অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা যে উপাদানের গুরুত্ব বেশী থাকে, সেই উপাদানের গুণানুসারেই সভ্যতার গতি-প্রগতি চিহ্নিত হয়ে এসেছে। ইউরোপের পাচশ' বছরের ইতিহাসেও তাই হয়েছে। আর আমাদের সেই পাঁচশ' বছরের ঘটনা দেড়শ' বছরের মধ্যে ঘটায় খানিকটা যে টেলিস্কোপিক হবে তা অনুমান করা যায়। সেইজন্যেই এই দেড়শ বছরের ইতিহাসে প্রায় সকল পথিকৃতের মধ্যেই

একটা দ্বন্দ্ব, একটা ক্রমঃবিকাশ, একটা আলো-আঁধার, ইহলোকে-পরলোকে টানাটানি, জীবন-মুখীনতার সংগে জীবন-বিমুখতার মাথামাথি দেখা যায়। ইহলৌকিক ও পারলৌকিকের ধারা যুক্ত বেণীর মতই পরস্পরকে জড়িয়ে জড়িয়েই প্রবাহিত হয়েছে।

কেশব সেন, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা একদিকে যেমন লৌকিক জীবনবাদী অপর দিকে আবার তেমনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করছেন নাম-সংকীর্তন ক'রে। তিলক কাটা গঙ্গাস্নানে—পুণ্য-লাভে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার মানুষই ত প্রায় সব। নামকরা সাহিত্যিকদের কলমের ছুটো জিভ দিয়ে বেরুচ্ছে যুক্ত বেণীর মতই দু' ধারা—জীবনবিমুখ আর জীবনমুখী সাহিত্য।

এর কারণ এক দিকে যেমন পশ্চিমের অনুসরণ নয়, অনুকরণ,—তেমনি অভ্যাস বশতঃ অতীত ভারতের অনুকরণ। অনুকরণের যে দোষ অবশ্যই সে দোষে আজ ভারত দুষ্ট। রেনেসাসের দার্শনিক তত্ত্বটির অজ্ঞতার ফলে মানসিক পরিণতি ঘটে নি। রেনেসাঁসী মনের প্রধান লক্ষণ যে সৃজনী প্রতিভার স্ফুরণ সেটা কোথাও জাগে নি। তিলককাটা মালাজপা বৈজ্ঞানিক যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুকরণ স্পৃহায় কেবল মুখস্থ না করে সত্যিকারের বিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞানী হ'তেন তা হ'লে অতি সহজেই তিলককাটা ও নাম জপের অসারতা বুঝতে পারতেন। আজ সমগ্র ভারতের শিক্ষিত মহলের সৃজনী প্রতিভার নিদারুণ দৈন্ততার কারণ পাশ্চাত্যের অনুকরণ—অনুসরণ নয়। কিন্তু অনুকরণকারীরাও নিদারুণ স্থূল জড়বাদী। সুখই তাদের কাম্য। তারা কেউই জীবন বিমুখ নয়। তাঁরা সকলেই জীবনমুখী, বেদনা-বিমুখ, সুখ-সন্ধানী জীব। ইহজীবনে সুখের সন্ধান ত' চলছেই, পরকাল যদি থাকেই তবে সেখানকার সুখ থেকেই বা বঞ্চিত হই কেন? এই জন্তেই তিলককাটা, গঙ্গাস্নান আর নামজপ। সুতরাং তারাও যে স্থূল জড়বাদী সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বন্ধ্যা কেবল সম্যক দৃষ্টির অভাবে।

সত্যই যাঁরা রিভাইভেলিষ্ট—অধ্যাত্মজগতের, স্বর্গ নরকের সত্যতায় যাঁদের অখণ্ড বিশ্বাস, তাঁরা তাঁদের সুবিধামত এই সব পথিকৃৎদের ব্যাখ্যা ক'রে কাজে লাগায়, শিষ্য-প্রশিষ্য বাড়ায়।

ডিরোজিও প্রমুখ রেনেসাঁসীদের ধারাটা ইউরোপের তদানীন্তন বিবাদের মতবাদের উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছিল; ইউরোপে যার পরিণতি

মার্কসবাদের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে। লিবারেলদের ইকনমিক ম্যান পরে মার্কসের অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে মিশে নিজ সত্তাটুকুও হারিয়ে ফেলে ছিল।

রায় যতদিন মার্কসবাদী ছিলেন, ততদিন তিনি এই ধারাটিকেই তাঁর সগোত্র-রূপে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর India in Transition প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে তিনি বঙ্কিম, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, তিলক, অরবিন্দকে রিভাইভেলিষ্ট আখ্যায় আখ্যাত করেছিলেন। আজও মার্কসবাদীরা রায়ের এই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই এ যুগের ইতিহাসকে দেখে আসছে।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটল রায়ের নব মানবতন্ত্রী দর্শন রচনার পরে। রায় লিবারেল দর্শনকে খণ্ডন করলেন—সেই সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনকেও।

লিবারেলদের ও মার্কসীয় মেটিরিয়ালিজমকে তিনি জড়বাদ—hard lumps of reality-র দর্শন বললেন। জড়জগৎ থেকে উদ্ভূত হ'লেও মানুষের সেরিব্র্যাল হেমিস্ফিয়ার অর্থাৎ মানুষের মনটি এমনই এক অভিনব স্জনী শক্তিতে শক্তিমান হয়েছে যে, সে জড় জগতের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় না। সেই জন্যে সে পারিপার্শ্বিকের দাস নয়, সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলে না, সে পারিপার্শ্বিককে বদলায়। পারিপার্শ্বিক মানুষের ভাগ্য গড়ে না, সে পারিপার্শ্বিককে নিজ প্রয়োজনে পরিবর্তিত ক'রে নিজের ভাগ্য গড়ে তোলার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

রায় বস্তু (matter) বা অর্থনীতিকে সরিয়ে মানুষের মনকে শীর্ষস্থানে বসালেন।

এইসব কারণে রায় তাঁর দর্শনকে মেটিরিয়্যালিজম থেকে পৃথক করলেন, নাম দিলেন Realism—Physical Realism.

লিবারেলদের ব্যক্তি মানুষের নৈতিক ভিত্তি ছিল খৃষ্টীয় Soul তত্ত্ব।

মার্কসবাদে ব্যক্তিই নাই, অতএব নীতির বালাই নাই—তারা amoral.

রায়ই প্রথম নৈতিকতাকে যুক্তি-নির্ভর ক'রে ব্যক্তি মানুষকে নৈতিকতায় স্বয়ম্ভু করলেন।

ভাল ভাল আইন ও প্রতিষ্ঠান রচনার উপরে মানুষের কল্যাণ নির্ভর করে না—করে ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তি সমূহের সুষম অনুশীলন, তৃপ্তি ও বিকাশের উপরে। এ কথা লিবারেলরা, হিতবাদীরা, মার্কসবাদীরা কেউই বলে নি। এ তত্ত্ব রায়ের একান্তই নিজস্ব।

মানবতন্ত্রী রায়ের গোত্র যে লিবারেলিজম নয়, হিতবাদ নয়, মার্কসবাদও নয়—সমগ্র মানব ঐতিহ্য, একথা তিনি অসংখ্যবার বলে গিয়েছেন।

মার্কসবাদের রঙিন চশমা রায়ের চোখ থেকে খসে পড়বার পর তিনি যে চোখে ইতিহাসকে দেখে আসছিলেন তার পরিবর্তন হয়েছিল—সকল ঘটনার মধ্যে মানবতাবাদ কতটুকু রইল বা গেল তা দিয়েই সব বিচার করতেন। ইতিহাসের অনেক ঘটনার মতই ভারতীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসকে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে সুরু করেছিলেন। সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি বঙ্কিম-বিবেকানন্দকেও নতুন করে দেখেছিলেন। বঙ্কিম-বিবেকানন্দকে অন্যান্য সত্যিকারের রিভাইভ্যালিষ্টদের সংগে মিশিয়ে ফেললে চলবে না। এঁরা দু'জন অনন্য। অধ্যাত্মবাদ অপেক্ষা মানবতাবাদ এঁদের মধ্যে সমধিক।

বঙ্কিমের ধর্মের ব্যাখ্যা চার্বাকীয়, এপিকিউরীয়—জীবন বিমুখ অধ্যাত্মবাদী বা খ্রীষ্টীয় নয়।

বঙ্কিমের মতে, ধর্ম-আচরণের ফলে ইহলোকে সুখ। যে ধর্ম আচরণের ফলে ইহলোকে সুখ নাই, তা ধর্ম নয়। (ধর্মতত্ত্ব)

এ বিচার চার্বাকীয় ও এপিকিউরীয়। চার্বাক বলেছেন, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ—"

এপিকিউরীয় পন্থীরা বিশ্বাস করতেন, জীবনের উদ্দেশ্য সুখভোগ।

"এপিকিউরিয়াসের জীবনবাদের মূল প্রত্যয়গুলি পাওয়া যায় তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যায়: দর্শন হ'ল সেই বস্তু যার সাহায্যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে সুখী করে।"

"এপিকিউরিয়াসের সুখভোগ, 'খাও, পিয়, মজা লোট' নয়—জ্ঞানলাভ। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্ব-প্রকৃতির চলার অন্তর্নিহিত কারণ সমূহের অজ্ঞতার জন্যে মানুষ নিজেকে নিতান্তই দুর্বল ও অসহায় ভাবে এবং সেইজন্যে সে সততই উদ্বিগ্ন ভীত ও চকিত থাকে। যদি মানুষ এই চির চঞ্চল বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্যের মূল তত্ত্বটি জেনে অজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি পায় তবে এই জ্ঞান তাকে উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তি দেবে—এবং তার চেয়ে বড় আনন্দ মানুষের আর কিছুতে নাই। সেইজন্যেই বলা হয়, আনন্দ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। এপিকিউরিয়াসের শিক্ষা হ'ল, প্রত্যেকটি আনন্দই ভাল আর প্রত্যেকটি ব্যথাই মন্দ। প্রত্যেক আনন্দ যে ভাল তার কারণ আনন্দের উৎস জ্ঞান, আর ব্যথা যে মন্দ তার কারণ ব্যথার উৎস অজ্ঞতা"—(M. N. Roy—*Materialism* pp. 67/68)

অধ্যাত্মবাদী হিন্দু বা খ্রীষ্টীয় বিচারে ঠিক উলটো কথাটাই বলা হয়। ধর্মের উদ্দেশ্য সুখ নয়, ধর্ম আচরণই সুখ। এই আচরণ যদি কষ্টকর হয় তা মনের ভ্রান্তিমাত্র।

"Virtue is the thing in itself; it should be practised for its own sake. The practice of this or that virtue may actually cause pain, yet it should be practised, because the happiness is not in the result of the practice but in the practice itself." (Ibid pp. 68)

এখানে রায় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী ও মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ফিলিপ স্প্র্যাটের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"...In the hands of the orthodox Communists, in fact, Marxism had become a philosophy of regimentation......Roy alone reformulated the Marxian philosophy in such a way that it appears as a philosophy of freedom......The great difficulties of materialist theories are to account for the emergence of mind or spirit, and to validate ethics. Marxism slides over the first by means of the dialectic, and ignores the second. Roy does not use the dialectic. His argument is mainly empirical resting on the fact of evolution ; but at the crucial points it becomes Platonic. Nature is law-governed, he says : therefore the human mind which is a product of nature is rational. Also being rational, man is moral ; and each individual participating in the rational essence of humanity, can achieve his greatest good by self-realisation, the free development of his essential nature : from this follows the idea of liberty.

"Thus Roy solves both problems by using Platonic doctrines. The first is that of universals. That nature is law-governed means that universals are part of the constitution of nature. Universals are of the character of thought : they are rational entities ; and human rationality is duly ascribed to the fact that man is part of nature and so shares this rational character.

"The second Platonic doctrine is that the world of universals culminates in the good....... The argument from rational to moral follows only if we assume the Platonic doctrine that

the world of universals does contain a moral factor. (vide—Philip Spratt in *M. N. Roy—Philosopher-Revolutionary*: a symposium ; Renaissance Publishers (P) Ltd.—1959)

উক্ত উদ্ধৃতির ভাবার্থ নিম্নরূপ :

"বস্তুতঃ মার্কসবাদ গোঁড়া কমিউনিষ্টদের হাতে পড়ে এক দাসত্বের মতবাদে পরিণত হল।.........একমাত্র রায়ই মার্কসীয় দর্শনকে এমনভাবে সংশোধন করলেন যে, সেটি একটি যুক্তি-দর্শনের রূপ গ্রহণ করল।

"বস্তুবাদের সূত্রের সাহায্যে মন বা চৈতন্যের উদ্ভব ও নীতি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়। মার্কসবাদ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রথম প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে গেছে, আর দ্বিতীয়টিকে উপেক্ষা করেছে। রায় দ্বান্দ্বিক-পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। তাঁর যুক্তি প্রধানতঃ অভিজ্ঞতা লব্ধ, তা বিবর্তনবাদের ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তিনি এ প্রশ্ন দুটির মীমাংসা করেছেন জড়-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সাহায্যে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তিনি প্লেটোপন্থী হয়েছেন।

"রায় বলেন : প্রকৃতি নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু মানুষ এই প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত সেহেতু মানুষের মন যুক্তিপরায়ণ, এবং যেহেতু মন যুক্তিপরায়ণ সেইহেতু নীতিপরায়ণও বটে। ব্যক্তি যুক্তিনিষ্ঠ থেকে সঠিক পথে চলতে চলতে সকল বৃত্তির সুসংগত বিকাশ ও পরিতৃপ্তির ফলে পরম শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ লাভ করে। সেটাই হ'ল চরম মঙ্গল। এর থেকেই রায়ের মুক্তি তত্ত্বের উদ্ভব।

"প্লেটোর পন্থানুসারেই রায় এই দুই সমস্যার মীমাংসা করেছেন। প্রথম সমস্যার মীমাংসা যে সার্বিকের দ্বারা করেছেন, তা হ'ল,—এই প্রকৃতি একই সার্বিক কার্য-কারণ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।*

"প্লেটোর দ্বিতীয় সার্বিক হ'ল পরম মঙ্গলের আদর্শ। যুক্তি-পরায়ণতা

* সেই সার্বিক অনুসারে অর্থাৎ কার্য-কারণ নিয়ম অনুযায়ী জড় থেকে জীব ও মানুষের মনও যখন উদ্ভূত তখন কার্য-কারণ নিয়মেই চিন্তা করাটাও মনের স্বভাব ও ধর্ম এবং সেটাকেই বলা হয় যুক্তিপরায়ণতা। চিন্তার সময় কারণটা হয় অনুমান ও কার্যটা হয় সিদ্ধান্ত। অনুমানে যখন ভুল থাকে তখন সিদ্ধান্তেও ভুল হয়—তখনই মানুষ ভুল করে—দোষ করে, অসামাজিক হয়। পাগলও এই কার্য-কারণ নিয়মেই চিন্তা করে, তফাৎ হয় কেবল তার অনুমানে ; সেগুলো হয় সবই মনগড়া, তাই তার সবই হয় ভুল। —লেখক

থেকেই নীতি পরায়ণতার উদ্ভব,—রায়ের এই যুক্তির যাথার্থ্য সম্ভব হ'তে পারে যদি প্লেটোর এই সার্বিকটি গ্রহণ করা হয়।"

প্লেটোর এই সার্বিক অনুসারেই রায় তাঁর দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন :

"মানবের অগ্রগতির মূল প্রেরণা হ'ল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যানুসন্ধিৎসা। এই প্রেরণাতেই মানুষ নিত্য নতুন ভাবে তার ভাগ্য গড়ে তোলে, ইতিহাস রচনা করে। জীবজগতে শুধু টিকে থাকার জন্যে যা ছিল জীবন সংগ্রামের মূল প্রেরণা সেই আদি জৈব প্রেরণাই মানুষে ক্রমবিকশিত হয়ে বুদ্ধি ও আবেগের উচ্চস্তরে এসে হয়েছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।"

প্লেটোর পরম মঙ্গলের সার্বিকই রায়ের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতে রূপ নিয়েছে।

স্প্র্যাট রায়ের মধ্যে প্লেটোর প্রভাব দেখেছেন। খোঁজ করলে দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও প্লেটোর প্রভাব সমধিক। কেবল প্লেটোর সার্বিকই নয়, তাঁর নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, বৃত্তিসমূহের অনুশীলন তত্ত্ব, নেতা বা অভিভাবক তত্ত্ব বঙ্কিমকে প্রভাবিত করেছে। তিনিও প্লেটোর প্রথম সার্বিক অনুসারে বলেছেন :

"মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার 'বৃত্তি' নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।"

দ্বিতীয় সার্বিক 'পরম মঙ্গল' অনুসারে লিখেছেন :

"সেই অনুশীলনের সীমা পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ।"

লক্ষনীয় যে, ইহজীবনের লৌকিক সুখের আদর্শ যে তাঁর ঈশ্বর ভক্তির সংগে সমার্থক হয়েছে তা তাঁর এই বাক্যটির দ্বারা প্রমাণিত হয় :

"ভক্তি শাসিত অবস্থায় সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের "সুখ" ও "ধর্ম" এবং রায়ের "মুক্তি" প্লেটোর "পরম মঙ্গল" সার্বিকের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্লেটোর "দার্শনিক রাজা" আদর্শে নিষ্কাম কর্মযোগের তত্ত্ব আছে। তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের "ঈশ্বর" প্লেটোর মতই। প্লেটোর "ঈশ্বর" সম্বন্ধে স্প্র্যাট লিখছেন :

"Plato believed in God, but his God was not that of the orthodox of any religion and in any event it is not an integral

part of his system. His grounds for believing in God were empirical. (Ibid)

প্লেটোর ঈশ্বর যেমন অভিজ্ঞতার দ্বারা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরও তেমনি—আদর্শ মানব।

"এখন বল দেখি মা, তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে?"

"যখন আমার কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।"

"কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মে এ ধন পৌঁছিবে কি প্রকারে?"

"শিখিয়াছি, তিনি সর্বভূতস্থিত, অতএব সর্বভূতে এ ধন বিতরণ করিব।"

* * * * *

"তখন নিশি প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল; বলিল, "এত' জানিতাম না।" নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।"

যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুশীলন ধর্মের পরিণতি ঈশ্বর ভক্তিতে", এই কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমকে revivalist আখ্যা দেন তাঁরা চূড়ান্ত জবাব পাবেন প্রফুল্লর শেষ পরিণতি স্মরণ করলেই। প্রফুল্লের শেষ জীবনের ছবি এঁকে বঙ্কিমচন্দ্র "ঈশ্বরভক্তির" ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি প্রফুল্লকে দেবীগড়ে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের পূজারিণী করে তাঁর ইতি টানেন নি। তিনি তাঁকে স্বামী-গৃহে প্রেরণ করে গিন্নীপনা করিয়েছেন; স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, সপত্নী, নিজ ও সপত্নীদের পুত্রকন্যার সেবা যত্ন করিয়েছেন এবং যথাকালে, পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত প্রফুল্লকে স্বর্গারোহণ করিয়ে 'ঈশ্বর-ভক্তির' স্বরূপ দেখিয়েছেন। এ ছবি জীবনবিমুখতার নয়—চূড়ান্ত জীবনমুখীনতার।

বিবেকানন্দের ঈশ্বরও ধরা ছোঁয়ার মধ্যে :

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দের সব চেয়ে বড় প্রার্থনা, মোক্ষ নয়—মনুষ্যত্ব।

"হে গৌরিনাথ, হে জগদম্বে, আমায়
মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা
কাপুরুষতা দূর কর, আমায়
মানুষ কর।"

এই সব কারণেই বলতে হচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর সাধক, রায়। অবশ্যই রায় তাঁর উত্তর জীবনে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের প্রভাব মুক্ত হয়েও স্বাধীন চিন্তার দ্বারাই তাঁর বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের দর্শন নবমানবতাবাদে আসতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর অষ্টাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই দু'জনের প্রভাবাধীন ছিলেন এবং তিনিও বলে গেছেন যে, ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম অনুপ্রেরণা পেতে হবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে, দ্বিতীয় প্রেরণা আসবে আধুনিক বিজ্ঞান থেকে*, সেই হেতু রায়ের ওপর এঁদের প্রভাব পরবর্তী জীবনে থাকাও যে অসম্ভব নয় তা ধরা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্কাম কর্ম বিষতুল্য বা জীবন-বিমুখতার চরম হ'লেও যাঁরা জন-সেবক, যাঁরা গণ-নায়ক, যাঁরা ক্ষমতার অধীশ্বর তাঁদের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম জনগণের পক্ষে অমৃততুল্য। যে ব্যক্তির মধ্যে বিকশিত ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সমধিক সে ব্যক্তি যে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যদি নিষ্কাম কর্ম পালন না ক'রে কর্মের ফলভোগী নিজেই হ'তে চান তা হ'লে জনগণের দুর্গতির সীমা থাকে না। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে, চলতি ইতিহাসেও চোখের সামনে অজস্র জীবন্ত দৃষ্টান্ত চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। অতএব বঙ্কিম-বিবেকানন্দের কর্মযোগকে গণ-নায়ক মানবেন্দ্রনাথ উত্তর জীবনে তুচ্ছ করেন নি।

রায় তাঁর উত্তর জীবনে বঙ্কিম-বিবেকানন্দকে কী চোখে দেখতেন সে সম্বন্ধে দু'একটি দৃষ্টান্ত দিই :

১৯৩৮ সালের ১০ই জুলাই-এর 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াতে' বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা একটি প্রবন্ধ ছাপান হয়। সে প্রবন্ধের মুখবন্ধরূপে রায় লেখেন :

"বাংলার সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিকের এই অতিশয় আকর্ষণীয় প্রবন্ধটি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ২৬শে জুন ১৯৩৮ তারিখে কলিকাতার "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড"-এর বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

*এই পরিচ্ছেদে পূর্বেই উল্লেখিত।

এই প্রবন্ধটি থেকে জানা যায়, ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে ভারতের আধুনিক ইউরোপের যুক্তিবাদ ও ভাবধারা আমদানী হয় এবং ভারতীয় নবজাগরণের (রেনেসাঁসের) বহু শিক্ষিত ব্যক্তিই ঐ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই যুক্তিবাদের কালটি খুবই সংক্ষিপ্ত। তথাপি এই সকল সুমহান ব্যক্তিগণের আরব্ধ কর্ম চালিয়ে নিয়ে যেতেই হ'বে। বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন এই বলে, যে, হিন্দু চিন্তা-ভাবনার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা এক বিরাট ব্যাপার, সুতরাং তা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকবে। নব ভারতের স্রষ্টাগণ তাঁদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার যে বিরাট গুরুদায়িত্ব ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে রেখে গেছেন তা যে আমরা সুরু করেছি সে দিকে দেশের প্রগতিশীল ধীমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই যুগান্তকারী প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করছি।"

১৯৪৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি 'ইণ্ডিপেডেণ্ট ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় রায়ের লেখা "যতীন মুখার্জি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে তিনি 'যতীন দাদার' বিকশিত ব্যক্তিত্বের দিকটাই তুলে ধরেছিলেন। লিখেছিলেন, তিনি অন্যান্য 'দাদা'দের মত 'ছেলে ধরা' জাল ফেলতেন না। ছেলেরাই ধরা দিত। "প্রথম দর্শনেই আমি 'ধরা' পড়ে গেলাম। তখন আমি বুঝলাম না কিসের আকর্ষণে ধরা দিলাম। ....পরে বুঝেছিলাম, সেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ।"

"তারপর থেকে এই যুগের বহু জগৎ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সংগে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এঁরা সবাই 'গ্রেট ম্যান'—যতীন দা ছিলেন 'গুডম্যান'—ভাল লোক এবং তেমন ভাল লোক আজও আমার চোখে পড়ল না।"

"বিখ্যাত লোকের তালিকায় ভাল লোকেরা প্রায়ই স্থান পায় না। এই রকমই চলতে থাকবে যতদিন না ভাল হওয়াটাই সত্যিকারের বিখ্যাত হওয়ার মাপকাঠি বলে গণ্য হচ্ছে। যতীন দা মধ্যযুগের মহাযোদ্ধা বীরপুরুষদের মত ছিলেন না। তাঁকে কোন বিশেষ যুগের মধ্যেই ফেলা যাবে না। তাঁর চরিত্র ছিল মানবিক মূল্যে মূল্যবান, সেই জন্যে তিনি সর্বকালের—সকল দেশের। তিনি ছিলেন পরম কারুণিক আর সত্যসন্ধ; সেই সঙ্গে ছিল অসাধারণ দুঃসাহস আর ছিল কুলিশ কঠোর দৃঢ়তা। কিন্তু তাঁর দুঃসাহসের মধ্যে নিষ্ঠুরতা ছিল না, নিজ মত ও পথের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা থাকলেও প্রচুর পরমত সহিষ্ণুতাও ছিল। সে সময়কার সকল শিক্ষিত যুবকদের মতই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত

সংস্কৃত ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বামীজির ঈশ্বরকে যুক্তির বিচারে পাওয়া যেত, ধর্ম ছিল তাঁর প্রগতিমূলক, সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী।

"নিজেকে কর্মযোগীরূপে গড়ে তোলার সাধনা ছিল যতীনদার। আমাদেরও তিনি সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেন। কর্মযোগীর প্রচলিত ধারণার মধ্যে যে কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় গূঢ় আচার-আচরণ থাকে তা বাদ দিলে কর্মযোগী অর্থে মানবতন্ত্রীকেই বোঝায়। লৌকিক কর্মের দ্বারাই যে আত্মোপলব্ধি সম্ভব এ বিশ্বাস যাদের থাকে, তারাই তো বিশ্বাস করে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে সক্ষম। মানুষের এই সৃষ্টিশীল ক্ষমতার উপরে তারা যুক্তি-সঙ্গতভাবেই আস্থাবান হয়ে ওঠে। মানবতন্ত্রের এটাই হ'ল সার তত্ত্ব। যতীনদা একজন মানবতন্ত্রী ছিলেন—সম্ভবতঃ বর্তমান ভারতে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মানবতন্ত্রী। যতীনদা যে মানবতন্ত্রী ছিলেন এই স্বীকৃতির মধ্যেই আছে তাঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।"*

এ থেকে বোঝা যায়, মানবতন্ত্রী মানবেন্দ্রনাথ বঙ্কিম-বিবেকানন্দকে কী চোখে দেখতেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়বার কারাবাস কালে মানবতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যখন তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠতে সুরু করেছে, তখন শ্রীমতী এলেনকে লেখা একটি চিঠিতে যে তিনি তাঁর নিষ্কাম কর্মের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছিলেন সে কথা আমরা উপক্রমণিকাতে বলেছি। (Letters from Jail—pp. 183).

এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নজীর তাঁর দর্শনের বিংশ সূত্র। এখানে তিনি

---

*"Like all modern educated young men of his times he tended to accept the reformed religion preached by Swami Vivekananda, —a God who would stand the test of reason, and a religion which served progressive social and human purpose. He believed himself to be a Karmayogi, trying to be at any rate, and recommended the ideal to all of us. Detached from the unnecessary mystic preoccupation, Karmayogi means a humanist. He who believes that self realisation can be attained through human action, must logically also believe in man's creativeness—that man is the maker of his destiny. That is also the essence of Humanism. Jatinda was a humanist—perhaps the first in modern India. To recognise him as such will be the most befitting homage to his memory."

"detached individuals" এবং spiritually free individuals"-এর উপরেই সকল গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনায় রায় বস্তুবাদী দর্শনের প্রথম প্রবক্তা দেকার্ত থেকে সুরু করে মার্কস পর্যন্ত দার্শনিকদের দ্বৈতবাদী বলেছেন এবং তাঁদের মত একে একে সব খণ্ডন করে নিজ অদ্বৈতবাদী দর্শন Physical Realism-কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সেই হিসাবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দও দ্বৈতবাদী। এঁদের জীবনের লোকায়তবাদী অংশটুকু দেকার্ত, মার্কস প্রমুখ দার্শনিকদের মতই বাস্তব। অ-লৌকিকবাদ অংশটুকুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। কারও ঈশ্বর, কারও মহাশক্তি, কারও আইডিয়া, কারও ম্যাটার। কিন্তু মানুষের কাছে এ সবই অ-লৌকিক। এ সবই তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার বাধা। মানবতাবাদে ঐশ্বরিক নির্দেশ্যবাদ যেমন অচল, তেমনি অচল মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ। তথাপি মানব প্রগতির ইতিহাসে মার্কসেরও যেমন স্থান আছে, ভারতের রেনেসাঁসের ইতিহাসে বঙ্কিম-বিবেকানন্দেরও তেমনি স্থান আছে। উভয়েরই প্রগতিমূলক মূল্য, Positive Value আছে। সেইজন্যই বঙ্কিম-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্মযোগী যতীন্দ্রনাথকে ভারতের আদি মানবতন্ত্রীরূপে অভিহিত করতে রায়ের বাধে নি।

রামমোহন রায় যদিচ ঐ একই লিবারেলিজিমের ছাত্র, তথাপি তাঁর সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ হওয়াতে তাঁর ধারা থেকে ডিরোজিও-মাইকেল প্রমুখ রেনেসাঁসীদের উদ্ভব হয় নি। ডিরোজিও প্রভৃতির ধারা এসেছিল সরাসরি ইউরোপ থেকে। বরং রামমোহনের উৎস থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ঘিরে অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি ও বিদ্যাসাগরের ধারা উৎসারিত হয়েছিল; এবং সে ধারা বঙ্কিম-বিবেকানন্দে গিয়ে মিশেছিল। তারপর এই দুই মহাপুরুষের এক অংশ রিভাইভ্যালিষ্ট তথা জীবনবিমুখ অধ্যাত্মবাদীদের ফুলবেলপাতার আবর্জনার মধ্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, আর আসল অংশটি বাংলার বিপ্লবীরা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। এর অবসান ঘটল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী অত্যাচারে, মৃত্যুতে ও দীর্ঘ কারাবাসে।

ডিরোজিও প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গল দলের সমাজ সংস্কারমূলক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের উত্তর সাধক সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ ব্যানার্জি (W. C.

Bonerjee), চিত্তরঞ্জন, গান্ধী, জিন্না, নেহরু প্রমুখ কংগ্রেসের ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতা এবং কমিউনিষ্টগণ।

গান্ধী, জিন্নাকে রিভাইভ্যালিষ্ট বলা যায় না। রিভাইভ্যালিষ্ট হ'ল রামকৃষ্ণ মঠের সাধু-সন্ন্যাসীরা, অরবিন্দ এবং অসংখ্য গুরু-পুরুতের দল :

গান্ধীজীর subjectivity, আত্মজীবনে "সত্য ও অহিংসার" প্রতি গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাস যা তাঁকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল তাও আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক নয়—ইহলৌকিক জীবনের সাফল্য লাভের সর্বোত্তম উপায় এই নৈতিক বিশ্বাস মাত্র, যেমন honesty is the best policy-নীতিতে বিশ্বাস, যেমন বৈদিক যুগের যজ্ঞাদি ইহলৌকিক মঙ্গল কামনায় করা হ'ত।

Objectively বা বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতিকে কায়েমী স্বার্থবানরা তাঁদের ইহলৌকিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অস্ত্রের মত ব্যবহার করেছে এবং এই নীতির দ্বারাই ভারতের গণ-বিপ্লব বার বার ব্যাহত করেছে। ধনী ও গান্ধীভক্তদের এইরূপ সত্য-অহিংসাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার আধ্যাত্মিকতা নয়। ৺কালীপূজা করে ডাকাতি করা যেমন আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন নয়, তেমনি রামধুন গেয়ে অজ্ঞ মূক মূঢ় মানুষের নিকট ভোট সংগ্রহ করা বা পকেট ভরে তোলাও আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন নয়।

ভারতীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে যাঁরা খাঁটি পাশ্চাত্য লিবারেলিজিমের ধারা অনুসরণ করে চলেছিলেন তাঁদেরই উপযুক্ত উত্তর সাধক হলেন গান্ধী, জিন্না, নেহেরু। সেই জন্যেই নিজেরা এবং তাঁদের অনুগামীরা সকলেই ইকনমিক ম্যান এবং যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা লাভ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এবং ক্ষমতা লাভের পর তাঁদের অনুগামীরা অর্থই যে পরমার্থ একথা নিজেরাও যেমন শিখেছে, তেমনি সমগ্র দেশটাকেও শিখিয়ে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে।

ডিরোজিও, মাইকেল প্রমুখ খাঁটি পশ্চিমী লিবারেলপন্থী রেনেসাঁসীদের উত্তর সাধকদের ধারাটাই ইউরোপের সঙ্গে তাল রেখে এ পর্যন্ত ঠিক অনুসৃত হয়ে এসেছে। হারিয়ে গেছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের ধারা। মানবেন্দ্রনাথ সেই ধারাকেই পুনরুদ্ধার করলেন—যুগোপযোগী সংশোধন ক'রে তাতে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করলেন। মানবেন্দ্রনাথ এঁদেরই উত্তর সাধক। এ প্রসঙ্গে ডক্টর নিরঞ্জন ধরের রায় সম্বন্ধে গবেষণামূলক রচনাবলীর কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"বস্তুতঃ রায় ভারতীয় ঐতিহ্যের যা কিছু খাঁটি আর স্থায়ী মূল্যে মূল্যবান তার সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার স্থায়ী সম্পদের সংশ্লেষ করতেই চেয়েছিলেন।

"সুদূর অতীত ভারতে লোকায়ত দর্শন ও চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল। রায় সেই লুপ্ত ধারারই উত্তর সাধকরূপে নিজেকে মনে করতেন। সেই জন্যে তিনি নিজেকে আধুনিক চার্বাকরূপে অভিহিত হ'তে পছন্দ করতেন। অধ্যাপক রিচার্ড পার্ক তাঁকে "লোকায়ত ব্রাহ্মণ" অভিধায় অভিহিত করতেন।

"ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের জনক রায় জানতেন যে, অতীতের ভিত্তির উপরই বর্তমান গড়ে তুলতে হয়। সেই জন্যে তাঁর দর্শন রচনায় যদিও পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও ভাবধারা থেকে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ অনুপ্রেরণা ও মালমশলা গ্রহণ করছেন, তথাপি ভারতের বিস্মৃত অতীতের মুক্তিকামী লোকায়ত দর্শনের লুপ্ত ধারার অনুসন্ধানও তিনি করেছিলেন।

"রায়ের নবমানবতন্ত্রী দর্শন চিন্তাজগতের এক নতুন অবদান। অন্যান্য সকল মানবতন্ত্রী দর্শন ধর্মীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত কিন্তু রায়ের মানবতন্ত্র সম্পূর্ণ বস্তু-তান্ত্রিক ও লোকায়ত দর্শনের ভিত্তির উপর রচিত—সেই জন্যই এটি অভিনব।

"যদিও রায় তাঁর লোকায়ত দর্শনের মাপকাঠি দিয়ে ভারতের অধ্যাত্মবাদী দর্শনকে খণ্ডন করেছেন, তথাপি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীরা মানবগোষ্ঠীর মুক্তি-সুখ-শান্তির পথ সম্বন্ধে যে সন্ধান দিয়ে গেছেন, তিনিও বিপরীত দিক থেকে অনুসন্ধান করতে করতে সেই পথেই এসে পৌঁছেছেন। রায়ও শেষ পর্যন্ত বহু সংখ্যক নিষ্কাম কর্মযোগী সৃষ্টির উপরই নির্ভর করেছেন। ভগবদ্গীতোক্ত কর্মযোগীর লক্ষণের সঙ্গে এর খুবই মিল। কর্মফল লাভের ইচ্ছা শূন্যতাই ত এই কর্মযোগের আদর্শ। এই নিষ্কাম কর্মযোগীর প্রয়োজন যে কেবল আজকের গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনাতেই একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তাই নয়, সকল প্রকার শাসন কার্য পরিচালন ব্যাপারেই এটির প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। প্লেটো একেই দার্শনিক শাসক বলেছেন—যিনি নিষ্কাম কর্মযোগীরূপে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজকে দার্শনিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে সম্পাদন করবেন, পরিচালনা করবেন, নির্দেশ দেবেন।"*

---

* "An unmitigated materialist that he was and never failing to attack the spiritual tradition of India. Roy, however reached from the opposite end the same conclusion as the Indian spiritualists about the deliverance of mankind For this Roy pinned his ultimate faith in the creation of a number of detached individuals. It is kindred in spirit with the doctrine of Karmayoga, the lesson of the Bhagawad Gita. Work and service without any attachment constitute the essence of this doctrine also. This is because the problem of leadership not only of democracy but of all forms of government is as Plato understands it to be, how to find the philosopher—the man possessing the capacity and the disposition to look upon public questions in their general and intrinsic aspects." (Dr, Niranjan Dhar—*Roy's Contribution to Political thought. The Radical Humanist.* Dt. 10/11/63)

এই সঙ্গে রায়ের একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের (২৫শে জানুয়ারী, ১৯৬৫) সভাপতির ভাষণ উপলক্ষ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত পি, বি, মুখার্জি মহাশয়ের ভাষণ স্মরণীয়। তিনিও এই সুরেই সেদিন বলেছিলেন :

"....ভবিষ্যৎ মনুষ্য সমাজকে বর্তমানের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রায় যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নৈতিকতার উদ্ভাবন করেছেন তা যেমন আনন্দদায়ক তেমনই অভিনব। তিনি বিশ্বাস ও সন্দেহবাদের এক চমৎকার সমন্বয়। বিশ্বাস থেকে সন্দেহবাদে এসে মানুষের যে বন্ধ্যাত্ব ও শোকাবহ পরিণতি দেখছি তা থেকে তিনি নিজেকে দূরে রেখেছিলেন এবং সন্দেহবাদ থেকে বিশ্বাসের রাজপথ বেছে নিয়েছিলেন।"

"Begining from formal intellectual construction to co-operative living Roy developed an economic, social and political morality which was refreshingly new in the history of mankind. He was a combination of both faith and scepticism. He avoided the sterile and tragic way from faith to scepticism and chose the grand way from scepticism to faith."

এই সঙ্গে "ধর্মকোষের"—(Encyclopaedia of Religion,) সম্পাদক সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত তর্কতীর্থ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশীর কথা স্মরণীয় :

" ..Roy is one of the greatest champions of reason of our times, a symbol of rationalism. But his life can be understood also as a life of pure and infinite faith. It would be otherwise difficult to explain how Roy the thinker could also be Roy the *Karmayogi.* It was a life of a great synthesis of faith and reason which could successfully emerge from all tragedies always enriched, always without a scar."

From M. N. Roy—Philosopher-Revolutionary—a symposium, —"*First Philosopher of Modern India*"—by Tarkateerth Laxman Sastri Joshi.

ভারতীয় রেনেসাঁস সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

জীবন-প্রেমিক রামমোহন প্রমুখ ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রবক্তাদের মূল প্রেরণা এসেছিল তাঁদের আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মগৌরব বোধ থেকে। এই প্রেরণা থেকেই তাঁরা ইংরেজ পাদরি ও রাজপুরুষদের ভারতীয়দের সব বিষয়ে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় দর্শন-সাহিত্য-শিল্পের ঐতিহ্য তুলে ধরে।

একদিকে যেমন তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন, ভারতীয়রা অন্যান্য বন্য আদি-বাসীদের মত পৌত্তলিক নয়, তারা ক্রীশ্চান দেশসমূহের মত দর্শন চর্চাতেও কিছুমাত্র হীন নয়, বরং অনেক উচ্চ পর্যায়ের এবং তাদের মতই একেশ্বরবাদী, তেমনি অন্যদিকে দেশের নানা কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাস ও অমানুষিক হৃদয়হীন অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর সঙ্গে লড়েছিলেন—তাঁদের সংবেদনশীলতার জন্যে ও বিদেশীর সমালোচনা, তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে।

এই প্রচেষ্টায় শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে তাঁরা যে কেবল একেশ্বরবাদকেই তুলে ধরেছিলেন তাই নয়, ভারতীয় সভ্যতার অন্যান্য মূল্যবান অবদান সমূহকেও পুনরাবিষ্কার করেছিলেন ; বিশেষতঃ মানবিক মূল্যে মূল্যবান নৈতিক আচার-আচরণ। এই সব আচার-আচরণের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় অনুরূপ আচার-আচরণের মিল ছিল খুবই বেশী। এই সব নৈতিক আচার-আচরণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্ম সমাজ।

কিন্তু ভারতীয় রেনেসাঁসের সুরু জীবনবিমুখ পারলৌকিক দর্শনাদি দিয়ে হয়েছিল বলে পারলৌকিক ভাব ও ভাবনার সঙ্গে মাটির মানুষের নাড়িচ্ছেদন আর হ'ল না। ফলে ভারতীয় হিউম্যানিষ্টদের নাবালকত্ব আর ঘুচল না। এই নবজাগরণ যে কোনদিনই পরিপুষ্ট হয়ে সাবালকত্ব পাবে না তার বীজ বপন প্রথম থেকেই হয়ে রইল। অবশ্যই সে নাড়িচ্ছেদন সহজ ছিল না। মর‍্যালিটির প্রশ্নের ইহলৌকিক ভিত্তি আবিষ্কার না করা পর্যন্ত মর‍্যালিটির ঐশ্বরিক জীবন-রজ্জু (Divine Origin) ছেদন সম্ভব নয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে ভারতীয় রেনেসাঁসের এই তফাৎ। ইউরোপের ঐতিহ্য ছিল জীবনমুখীন গ্রীকো-রোম্যান আদর্শ, আর ভারতের ছিল জীবন-বিমুখ ঐতিহ্য। অবশ্য ইউরোপেও মর‍্যালিটির লৌকিক ভিত্তি আবিষ্কৃত না হওয়ার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর পরের হিউম্যানিজিম amoral হয়েছে, ইকনমিক

ম্যান survival of the fittest নীতি গ্রহণ করেছে, সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে, মহাযুদ্ধ ঘটিয়েছে, কমিউনিজিম-ফ্যাসিজিম গ্রহণ করেছে। তথাপি জীবনমুখীন গ্রীকো-রোম্যান ঐতিহ্যটি থাকার ফলে মানুষের যা কিছু সৃজনশীলতা তা ইউরোপেই দেখা গেছে—ভারতে দেখা যায় নি।

ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গলের ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে জীবনমুখী পাশ্চাত্য আদর্শের পুরোপুরি অনুকরণ প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। কারণ তাঁদের আচার-আচরণ এতই বিজাতীয় হয়ে উঠেছিল যে, প্রতিবেশী ও দেশবাসী সে সব আচরণকে সদাচরণরূপে গণ্য করে নি। নীতি বিগর্হিত immoral আচরণ হিসেবেই গণ্য করেছিল। প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারই যদি নীতি পরায়ণতা হয়, তবে যে ব্যবহারে প্রতিবেশী অসন্তুষ্ট হবে সেটাই অসদ্ব্যবহাররূপে বিবেচিত হবে, দুর্নীতিরূপে গণ্য হবে। সেইহেতু সে ধারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরলোকের সঙ্গে umbilical chord—জীবন-রজ্জু ছেদনের অবৈজ্ঞানিক অপচেষ্টার জন্যে শিশু রেনেসাঁস মরে গিয়েছিল। একদিকে যেমন মানব জীবনের ওপর ঈশ্বরের সার্বভৌম অধিকারে বিশ্বাসের বশে পূজা প্রার্থনা চলেছিল, তেমনি ঈশ্বর প্রসাদাৎ লৌকিক বিদ্যাচর্চা, কাজ-কারবার, সুনীতি-দুর্নীতি চলেছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণে—তাদের অভিভাবকত্বে। অর্থাৎ পরলোকের সঙ্গে মানুষের জীবন-রজ্জু ছিন্ন না হবার ফলে মানুষের নাবালকত্ব ঘুচে গিয়ে স্বরাট সার্বভৌম হওয়া মানুষের পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না।

হয়েছিল মাত্র বিদ্যাসাগরের, আর কারুর হ'ল না। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় (বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন, বহু বিবাহের নিবর্তন) শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছিলেন বলে তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ ও বিশাল মানবতাবাদ পরবর্তী যুগে সংক্রামিত হ'ল না। শাস্ত্রেরই "বৈজ্ঞানিক" ব্যাখ্যা চলতে থাকল।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-মুখীনতা এতই ভারতীয় সংস্কার মুক্ত ছিল যে, ভারতীয় রেনেসাঁসের ক্রমবিকাশের ধারাটি তাঁর মধ্যে চোখেই পড়ে না। জীবনকে তিনি কেবল পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েই সম্ভোগ করেন নি—ষড় ইন্দ্রিয় দিয়েই করেছিলেন এবং সেই সম্ভোগানুভূতি শত সহস্র সংগীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনবাদ পৃথিবীর যে কোন আধুনিক জীবনপ্রেমিকের সঙ্গে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রচুর ধর্ম সংগীত থাকলেও সে সকল সংগীত ইহজীবনকে কেন্দ্র করেই এবং তা

সাম বেদীয় সংগীতের মতই প্রবল জীবনমুখীন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুঃখবাদী জীবনবিমুখ ভারতীয় ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়াই দায়। তাই তিনি ভারতীয় নয়—বিশ্বের। তিনি উপনিষদের শ্লোক গেয়ে দিনের সুরু বা শেষ করতেন ব'লে তাঁকে ভারতীয় বলা যায় না। অনুরূপ ভাব ও কাব্যমণ্ডিত শ্লোক যদি উপনিষদে না থাকত তবে অন্য যে কোন দেশের সাহিত্য থেকে অনুরূপ শ্লোক আহরণ করতে তাঁর বাধত না; যেমন অনেক ক্ষেত্রে বাধে নি। ভারতীয় রেনেসাঁসের ধারায় তাঁকে না ধরলেও ইতিহাস খণ্ডিত হয় না—তিনি ব্যতিক্রম।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-রজ্জু দিয়ে সংযুক্ত মানুষকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মণীষীরা যে আত্মমর্যাদায় ও আত্মগৌরবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সেই মানুষের মনুষ্যত্বকে এক নতুন মূল্যে মূল্যবান করে তুলতে, নব জাগ্রত নতুন মানুষের সেই আধারকে এক নতুন আধেয় দিয়ে, নতুন মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসাকে নতুন জীবনবাদ দিয়ে পূর্ণ করতে চাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের আদর্শ তুলে ধরে এবং বিবেকানন্দ তাঁর নিষ্কাম কর্মযোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কিন্তু যেহেতু মর‍্যালিটির লৌকিক উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল না, সেই হেতু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের নাড়িচ্ছেদন আর হ'ল না, সেই হেতু তাঁদের আদর্শ মানুষও আর ভূমিষ্ঠ হ'ল না।

বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ইহলৌকিক মানবতাবাদ এতই সুস্পষ্ট ও প্রবল যে, তাঁদের পারলৌকিক ঈশ্বরবাদ বাদ দিলেও তাঁদের লৌকিক অবদানের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য নষ্ট হয় না এবং তাঁদের ঈশ্বরবাদ এতই স্ববিরোধী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, Secular morality-র প্রশ্ন মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে যে তা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে সেটা তাঁদের চিন্তা ধারা, যুক্তি ও কাজকর্মের বিচার বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যাবে এবং সেই জন্যেই সেই ধারা থেকে বেরিয়েও মানবেন্দ্রনাথের মতন মানবতন্ত্রী মানুষের বিকাশ সম্ভব হ'ল।

পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম যে জাতির জীবনে রূপায়িত হয়ে উঠল না তার কারণ "ঈশ্বরের" সংগে তাঁর জীবন-রজ্জুর অবিচ্ছিন্নতা। "ঈশ্বর-মুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন—সেই অবস্থাই ভক্তি"—এই যদি অনুশীলন ধর্মের চরম প্রকাশ হয় তবে "সকল বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফূর্তির" আদর্শের কোন জোর থাকে না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই যখন লক্ষ্য তখন বৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টি ও বিকাশ প্রচেষ্টার কোন লৌকিক অর্থ থাকে না।

বৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টি ও বিকাশের ধারণা আপেক্ষিক। রাম অপেক্ষা শ্যামের বৃত্তি সমূহ অধিকতর পরিপুষ্ট, শ্যাম অপেক্ষা যদুর। অর্থাৎ সকল মানুষই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যখন সমান তখন কিঞ্চিৎ ন্যূন অনুশীলিত বৃত্তি সমূহ থাকলেই বা ক্ষতি কী? ঈশ্বর ভক্তি চর্চায় বা ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণে অনুশীলন ধর্মটি লাগে কোন কর্মে? এই সহজ চিন্তাতেই পরবর্তী কালে মনুষ্যত্ব অনুশীলন প্রচেষ্টা অপেক্ষা ভক্তি মার্গের চর্চাই জাতির জীবনে মুখ্য স্থান অধিকার করে। বিবেকানন্দের লোকায়ত কর্মযোগ অবনমিত ও বিকৃত হয় রামকৃষ্ণ মঠের শাঁখ-ঘণ্টা-ধ্যান-ধারণা-পূজা-মোচ্ছবের মধ্যে—অরবিন্দের দিব্য জীবন লাভের যোগ-সাধনায়। সাধারণ মানুষ জীবনের, সংসারের, সমাজের, রাষ্ট্রের নিত্য নতুন সমস্যা সমাধানের জন্যে নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধিকে অনুশীলিত করার পরিবর্তে গুরু-নেতা-অদৃষ্ট-ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেই চলতে থাকে। তারই ফলে রাজনীতিতে গুরুবাদ, নেতাবাদ, পার্টিবাদ, ism বাদ প্রভৃতি স্থায়ী হয়ে বিংশ শতাব্দীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর হিউম্যানিজিম জাতীয় জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় হিউম্যানিজিমের নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে যে নৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল সেই নীতিহীনতার ঢেউ ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতেও এসেছিল। তারই নিরাকরণার্থে ভারতে রামমোহন থেকে সকল নেতারাই ধর্মীয় নৈতিকতার উপর জোর দিয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর "মনুষ্যত্ব সাধনার" তত্ত্বকে "ঈশ্বরের" সঙ্গে জীবন-রজ্জুর দ্বারা যুক্ত রেখে (ভক্তি শাসিত অবস্থায় সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য") মর্যালিটি প্রশ্নের সমাধান করতে চেয়েছিলেন। নৈতিক অনুশাসনের (objective moral standard)* দ্বারা শাসিত হ'লেও ব্যক্তি মানুষের সকল বৃত্তির বিকাশ সামঞ্জস্য পূর্ণ ই হয় এবং বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে সংগতি বিধান হয়ে সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু তিনি যদি এই রজ্জু ছেদন করতে পারতেন তা হ'লে তাঁকে অবশ্যই এই নীতিতাত্ত্বিক সমস্যাটি (ethical problem) সমাধানের জন্যে মর্যালিটির ঐশ্বরিক উৎসের (Divine origin) পরিবর্তে

---

* Objective Moral Standard অর্থে নৈতিক অনুশাসন যা ধর্মের নামে এ পর্যন্ত চলে আসছে এবং সকল ধর্মেই তা প্রায় অভিন্ন; যথা মিথ্যা কথা বলিও না; চুরি করিও না; হিংসা করিও না; প্রতিবেশীকে ভালবাস প্রভৃতি নৈতিক অনুশাসন, যা বাইবেলে Ten Commandments-এ আছে, বৌদ্ধদের দশ শীলের মধ্যে আছে, হিন্দু, কনফুসিয়াসপন্থী ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের মধ্যেও আছে।

লৌকিক উৎসের (Natural origin) সন্ধান করতে হ'ত। তখনই শুধু ভারতের নয়, সারা দুনিয়ার হিউম্যানিজিম সার্বভৌমত্ব লাভ করে, ঈশ্বর নিরপেক্ষ হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি লাভ করতে পারত। তখন মানবেন্দ্রনাথের আর করণীয় কিছু থাকত না। বঙ্কিমচন্দ্র সে কাজটি অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন বলেই মানবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল!

এতাবৎকাল মর‍্যালিটির ঐশ্বরিক উৎসের সঙ্গে হিউম্যানিজিমের যে নাড়ির যোগ ছিল মর‍্যালিটির লৌকিক উৎসটি আবিষ্কার করে সেই নাড়ি ছেদন করলেন মানবেন্দ্রনাথ। সঙ্গে সঙ্গে শুধু ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে সুরু করে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলের মূল্যবান অবদানই নয়, সমগ্র বিশ্বের মূল্যবান ঐতিহ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে ভারতের শিশু রেনেসাঁসের সাবালকত্বে উন্নীত হবার পথ খুলে গেল।

মর‍্যালিটির প্রাকৃতিক উৎস আবিষ্কার না করে ধর্ম বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা মনুষ্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ভারসাম্য রক্ষার লৌকিক প্রয়োজনেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে লিবারেলরা সর্বজনগ্রাহ্য অনুশাসন (objective moral standard) ত্যাগ করে উপযোগবাদী ও ব্যবহারিক (Utilitarian and Pragmatic) মর‍্যালিটি গ্রহণ করে। কমিউনিষ্টরাও তাই করেছে কেবল লিবারেলদের ব্যক্তির স্থানে শ্রেণীকে বসিয়ে। কিন্তু তাতে ফল ভাল হয় নি। বিশ্ব সমাজ এক নৈতিক সংকটে ডুবে যায়। অবিরাম যুদ্ধে, গৃহযুদ্ধে, মহাযুদ্ধে পৃথিবী মেতে ওঠে—সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়।

নৈতিক অনুশাসনের প্রাকৃতিক উৎস আবিষ্কার না করে ধর্ম বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে যে কী ক্ষতি হয়, বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাস তার দৃষ্টান্ত।

রামমোহন থেকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্যন্ত যুগন্ধর ব্যক্তিদের জীবনবাদ যদিও জীবনমুখী ছিল, তথাপি তাঁরা নৈতিক অনুশাসনের প্রাকৃতিক উৎসের আবিষ্কার করতে পারেন নি বলে ঈশ্বর ও ধর্মের সঙ্গে নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট করতে চান নি।

দেখা যায়, রামমোহন থেকে যতদিন গেছে মানুষ ততই জীবনমুখী হয়ে

উঠেছে। বঙ্কিমের চেয়ে বিবেকানন্দ বড় হিউম্যানিষ্ট। বঙ্কিমের 'মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ঈশ্বর ভক্তিতে', এই আদর্শ বিবেকানন্দে এসে হয়েছে, 'হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও—আমায় মানুষ কর।' বঙ্কিমের মোক্ষ ঈশ্বরে—বিবেকানন্দের মোক্ষ মনুষ্যত্বে। অদ্বৈতবাদের নবতম পরিণামবাদী ভাষ্যে জন্মলাভ করেছে বিবেকানন্দের মানুষ—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' মানুষের পরিণতি মনুষ্যত্বে—মানুষই end—means নয়; ইহা সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান রচিত দর্শনের সঙ্গে এক না হ'লেও সমগোত্রীয় বটে। কিন্তু বিবেকানন্দের হিউম্যানিজিমে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আজন্ম হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্কার ও conditioning কাটিয়ে ওঠার মত শক্তি তাঁর যুক্তিতে ছিল না। তাই তাঁর সিদ্ধান্তে দুর্বলতা ছিল। তিনি পাশ্চাত্যের লিবারেলদের ডারউইন-স্পেনসারপন্থী নিরংকুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের ইউটিলিটেরিয়ান ও প্র্যাগমেটিক জীবনাদর্শে ভীত হয়ে 'প্রাচ্যের' হিন্দুধর্মের নৈতিক অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আর, সমাজে ভারসাম্য রাখলেই চলে না। সমাজপতিগণ যদি নিষ্কাম অনাসক্ত মুক্তমন না হ'ন তবে ব্যক্তির কষ্ট বাড়ে, ব্যক্তিকে সমাজপতিদের রথ টেনেই চলতে হয় পশুর মত। সেই জন্যে তিনি নিষ্কাম কর্মযোগের প্রবর্তন করেছিলেন।

কিন্তু সজ্ঞানে হয়নি বলে সে সব জীবনবিমুখ আধ্যাত্মবাদীর মতই প্রতিভাত হয়েছে। তখনকার 'পাশ্চাত্য' যেমন তাদের জীবনাদর্শকে 'যুক্তির' উপর স্থাপন করেছিল তেমনি তিনি যদি কেবল intuition*-এর উপর নির্ভর না করে সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনকে (objective moral standard) যুক্তির উপর স্থাপন করতে পারতেন তা হ'লে তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যেতে পারত, সিদ্ধান্তের দুর্বলতার অবসান ঘটত। তিনি যেটা পারেন নি, মানবেন্দ্রনাথ সেটা পেরেছেন। রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ যেমন একই আদর্শের ক্রমঃবিকাশের পথের এক একটি ধাপ মাত্র, তেমনি রায়ও সেই সিঁড়িরই শেষ ধাপ। এবং

* Intuition ও যুক্তিভিত্তিক। স্বাভাবিক চিন্তাপদ্ধতিতে যুক্তি চেতন মনে (সজ্ঞানে) ধাপে ধাপে চলে। Intuition-এর ক্ষেত্রেও চিন্তাপদ্ধতিতে যুক্তি অবচেতন মনে (নিজ্ঞানে) অনুরূপ ধাপে ধাপেই চলে। চেতন মনে আসে শুধু সিদ্ধান্তটুকু। সেই হেতু Intuition-কে অনেক সময় অযৌক্তিক মনে হয় এবং তা প্রত্যাদেশ, দৈববাণী, inner voice প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়ে এসেছে।

যেহেতু এই ক্রমবিকাশ মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং মানব সভ্যতার স্বাভাবিক বিকাশের নিয়মনীতি ও পথ ধরেই বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেই হেতু এই মানবতান্ত্রিক বিপ্লব অশ্রু আর রক্তের পথে আসবে না। আসবে পরমানন্দে, চার পাশে ফুল ফুটিয়ে, ফল ফলিয়ে, রূপের রোশনাই জ্বেলে।

রায়ের জীবনের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সমালোচকদের উক্তি সম্বন্ধে বলা যায় যে,

প্রথমতঃ রায়ের মধ্যে 'ধর্ম এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী জাতিপ্রেম' সম্ভবতঃ কোন দিনই ছিল না। তাঁর গুরু যতীন্দ্রনাথের যে ছিল না তা তাঁর লেখা থেকে পাই। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বে বিশ্বমানবিক আবেদন আছে, বিবেকানন্দের মধ্যেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি সুস্থ সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি এঁদেরই নিষ্ঠাবান অনুগামী ছিলেন। তিনি যে শৈশবের প্রারম্ভ থেকেই প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করতেন না, ঠাকুর-বামুনের উপর আস্থা যে তাঁর ছিল না, সে প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পেয়েছি।

বঙ্কিমের বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদই তাঁর জীবনকে প্রথম থেকেই প্রভাবিত করেছিল।

সর্বাঙ্গীন মুক্তিলাভের আকুতিই তাঁকে নানা পথে ঘুরিয়েছে যেন এক 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর'—'এহ বাহ্য, আগে কহ আর' মুক্তি পথের দিশারী রায়ের নানা পথ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা এই দু'টি বাক্য দিয়েই করা যায়।

যতদিন তিনি ভারতে ছিলেন, ততদিন এই মুক্তি পথের সন্ধানে গুরু খুঁজে বেড়িয়েছেন। যতীন মুখার্জির দেখা পেয়ে পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় জীবন পণ করে কাজ করে গেছেন। সে তো কাজ নয়, সে তপস্যা—কর্মযোগ—'ইহাসনে শুষ্যতি মে শরীরম্'-সংকল্পে দৃঢ়।

সে অধ্যায় শেষ হয়েছে আমেরিকা গমনের পর। তিনি বাহির বিশ্ব দেখেছেন, এবং তাঁরই মত মুক্তি পথের দিশারী মানবপ্রেমিক আরও অনেক মানুষের সঙ্গে মিশে নানা মত ও পথের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করেছেন, শুধু জাতীয়তাবাদ তাঁকে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দেবে না, তাই 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর' বলে তিনি এগিয়ে গেছেন। অপরের চোখে এটাই তাঁর অন্তর্বিরোধরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

যতীন মুখার্জির নেতৃত্বাধীনে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব প্রচেষ্টায় যে নিষ্ঠা ও

ঐকান্তিকতায় নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, ঠিক তেমন শ্রদ্ধা সহকারেই নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন মার্কসবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এর আগে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, আগা গোড়াই তিনি অন্যান্য কমিউনিষ্টদের মত গোঁড়া মার্কস-বাদী ছিলেন না। মার্কসবাদের অন্যতম মূলসূত্র অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদ কোন দিনই তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। বিকশিত ব্যক্তিত্বের সাধক ব্যক্তি-মানসের গুরুত্ব, মানুষের সৃজনী শক্তির অগ্রাধিকার সকল সময়েই স্বীকার করে গেছেন, এবং সেই অনুসারেই তিনি তাঁর সমর কৌশল রচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের সাধক যখন দেখলেন কীভাবে ব্যক্তিসত্তা মার্কস-বাদের দোহাই দিয়ে সমষ্টি সত্তার যূপকাষ্ঠে বলি পড়ছে, তখন পথ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল।

সারা পৃথিবী তখন দেখা হয়ে গেছে, মত ও পথ দেখতেও আর বাকী নাই। কোথাও তাঁর ঈপ্সিত আদর্শ মিলল না। তখন নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিলেন, মার্কসবাদ থেকে বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্ব নাগরিক মানবতন্ত্রে এসে অবতরণ করলেন। অন্তর্বিরোধ না থাকলে মানুষের "Quest for freedom and search for tiuth" (1hesis No 2.) সম্ভব হয় না।

রায়ের মধ্যে এটি অতি মাত্রায় ছিল বলেই প্রত্যেকটি পথ ও মতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতি নিষ্ঠা ও পরম ধৈর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, এবং সেই সব থেকেই দেখতে পাই তাঁর পথ পরিবর্তনের কারণ।

Quest for freedom and search for truth রায়ের প্রথম যৌবনেরই আদর্শ। জাতীয়তাবাদে ও মার্কসবাদে তাঁর আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। তাই তাঁর পথ পরিবর্তন বৈজ্ঞানিকের পথ পরিবর্তনের মতই স্বাভাবিক ও সুসংগত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা

১৯৪৯ সাল। র‍্যাডিক্যাল পার্টি নাই, আছে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মুভমেণ্ট। সুরু হ'ল অভিনব দর্শনের প্রচার ও প্রয়োগের জন্যে এক অভিনব ব্যবস্থা। পার্টি নয়, সংগঠন নয়, কোন নিয়ম-কানুনের জোরে নয়, অর্থসম্পদের মাধ্যাকর্ষণে নয়, কেবল সমভাবের ভাবী একদল মানুষের স্বেচ্ছামূলক আত্মিক সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে এই সংস্থা।

রায় র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিকদের দার্শনিক করে তোলার অসাধ্য সাধনে অনুক্ষণ ব্যস্ত। সেই সঙ্গে চলেছে প্রতি সপ্তাহে ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির ভাল-মন্দের সমালোচনা তাঁর নিজের কাগজ 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'র মাধ্যমে। এ সব লেখা এ কাগজের সেই সব দিনের সংখ্যার বুকে সঞ্চিত আছে—রায়ের অসাধারণ মনস্বিতার সাক্ষীরূপে।

এই বছরের ৩রা এপ্রিল থেকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ার নাম রাখা হ'ল র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট—Radical Humanist. মার্ক্সিয়ান ওয়ের নামও হ'ল হিউম্যানিষ্ট ওয়ে—Humanist Way.

মে মাসে মুশুরিতে ১০ দিন ব্যাপী এক অতি উচ্চাঙ্গের পাঠচক্রে সমগ্র ভারত থেকে র‍্যাডিক্যালদের ডেকে পাঠালেন। যথারীতি চক্রের অধিবেশন বসল। উচ্চাঙ্গ আলোচনার সুর অতি উচ্চ গ্রামেই উঠল।

অতঃপর তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Reason, Romanticism & Revolution প্রকাশ করার আয়োজনে তৎপর হ'লেন।

মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষের চিন্তাধারার, ভাব ও ভাবনার প্রগতির ইতিহাসের যুক্তি সম্মত পরিণতি যে নব-মানবতাবাদে এসে পরিণতি

লাভ করেছে, অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রায় সহজ সরল ভঙ্গীতে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সহ তুলে ধরলেন।

এই গ্রন্থের মুখবন্ধে (Preface) তিনি লিখলেন :

"বর্তমান সভ্যতার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট আজ পৃথিবীর সকল সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল মানুষকে মানবতাবাদী ভাব ও ভাবনার প্রতি আগ্রহান্বিত হ'তে বাধ্য করছে। মানবতাবাদ পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন প্রতিদিনই জোরদার হয়ে উঠছে। বর্তমান যুগের কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান যে নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সম্ভব সে কথাটা ক্রমেই অনুভূত হচ্ছে। রাষ্ট্রে ও সমাজ জীবনে নৈতিক মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই আজ সার্বজনীন দাবী হয়ে উঠেছে। পৃথিবী জুড়ে সর্বত্রই একটি সুষ্ঠু ও সুখকর জীবন লাভের জন্যে যে আর্তি দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠছে তার ঐকান্তিকতায় সন্দেহ করারও কোন কারণ নাই। তথাপি সব যেন অরণ্যে রোদনের মতই বৃথা হয়ে যাচ্ছে।

"আধুনিক সন্দেহবাদের (modern scepticism) বন্ধ্যাত্বের ফলেই এইরূপ দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর সন্দেহবাদী বিচার-বিতর্কমূলক চিন্তা ক্লাসিকাল দর্শনের "সঠিক যুক্তির" দ্বারা সকল সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ সত্য (ultimate truth) আবিষ্কারের দাবীকে অগ্রাহ্য করে। এই সন্দেহবাদ প্রমাণ অসিদ্ধ আপ্তবাক্যের—a priori অনুমানের—দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিন্তা পদ্ধতির সাহায্যে গড়ে তোলা ধ্যান-ধারণা-সর্বস্ব দর্শনকে পরিত্যাগ ক'রে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের নিগড় কেটে মানুষের মনকে মুক্ত করে দেয়। কিন্তু সেই সংঙ্গে বর্তমান যুগের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের বীজও বপন করে। মানুষের মনের শৃঙ্খল কাটার সঙ্গে সঙ্গে মানুষও কাটা পড়ে। এ যেন স্নান করান জল ফেলতে গিয়ে ছেলেকেও ফেলে দেওয়া। ক্লাসিকাল দর্শনের "সম্যক যুক্তির—right reason" আধিবিদ্যক ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার অর্থ যুক্তিবাদকেই নিরর্থক ক'রে দেওয়া। যুক্তিবাদের জায়গায় জীবনের পরিচালকরূপে দেখা দিল যত রাজ্যের অযৌক্তিক অতীন্দ্রিয় মিষ্টিক প্রেরণা—যথা, স্বজ্ঞা—Intuition, Elan vital, Entelechy। যদি প্রায়োগিক ধারণা (Empiricism) যুক্তিবাদকে জীবনের সর্বোচ্চ বিচারকের স্থান থেকে সরিয়ে দেয় তবে জীবনে সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক মূল্য—moral value বলে আর কিছু থাকবে না—তখন প্রয়োগবাদ-এর নীতিই (pragmatism) ব্যক্তি মানুষকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ঠিক করে

দেবে, হাতে হাতে লাভ লোকসান খতিয়ে খতিয়ে চলতে হবে—কোন্‌টি করণীয় আর কোনটি বর্জনীয়।

"সন্দেহবাদের সর্বনাশা পরিণামের ধ্বংসস্তূপ থেকে যুক্তিবাদ ও নীতিবিদ্যাকে উদ্ধারের চেষ্টাতেই এই গ্রন্থখানি লেখা হ'ল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, মানুষের যুক্তিপরায়ণতা তার সহজাত জৈব বৃত্তি। যুক্তি আধিদৈবিক পদার্থ নয়। মানুষের সহজাত যুক্তিপরায়ণতা থেকেই যে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ জাগে সেটা যখন প্রমাণ করতে পারা যায় তখনই নীতিবোধকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করা' সম্ভব। নীতিবোধ যে মানুষের বিবেকসঞ্জাত এবং সে বিবেক যে ভগবানের বাণী নয়, মানুষেরই জৈব যুক্তিপরায়ণতা থেকেই উদ্ভূত, তখন তা সহজেই মেনে নেওয়া চলে।

"মানুষের যুক্তিপরায়ণতার জৈব উৎস নীতিপরায়ণতা এবং এও যে মানুষের যুক্তিপরায়ণতা থেকেই উদ্ভূত এই দুই তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে মানবতাবাদের সঙ্গে যে একটা আধিদৈবিক ও মিষ্টিক ধারণা এতকাল জড়িত ছিল সে থেকে মানবতাবাদের মুক্তি সম্ভব হ'ল।

"অপ্রমাণিত আপ্তবাক্য অনুশাসিত (a priori) অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের (চিন্তা-পদ্ধতির) সাহায্যে গড়ে তোলা ধ্যান ধারণা সর্বস্ব (Speculative) দর্শনের দিন গেছে। মনুষ্য জীবনকে পথ দেখাবার জন্যে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ দর্শনের (a comprehensive philosophy) প্রয়োজনীয়তা একান্ত ভাবেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মানবতাবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকেই সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ যুক্তিবাদী সমাজ ও জীবন দর্শনের উদ্ভব ঘটবে।

"এই গ্রন্থে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের মানবতাবাদী উপাদান-সমূহের সাহায্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন রচনা করে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধি ও নীতি শাস্ত্রের সংযোগ সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দেরাদুন এম, এন, রায়"

১৫ই অগাষ্ট ১৯৫২

নানা কাজের ভিড়ে এ কাজ এগোয় না। লেখার বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যবসাদারী কাগজের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় তাতেই স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া পরা

ও রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের খরচ চালাতে হয়। তাঁর রাজনৈতিক লেখা বিশেষ করে কংগ্রেসী সরকারের সমালোচনামূলক লেখা তখন জাতীয়তাবাদী কাগজ ছাপতে চাইত না। তারা চাইত অন্য যে কোন বিষয়ে একটু লঘু লেখা। এই লঘু লেখার তাগিদ থেকেই তাঁর জীবনস্মৃতি লেখার সুরু। এই সব লেখার জন্যে নিত্যই আট-দশ ঘণ্টা লিখতে-পড়তে হয়। তার মাঝেই পৃথিবীর তিন মহাদেশের বহু দেশ থেকে আসা চিঠিপত্রের উত্তর দিতে হয়। সাপ্তাহিক "র‍্যাডিকাল হিউম্যানিষ্ট" ও ত্রৈমাসিক "হিউম্যানিষ্ট ওয়ে" সম্পাদনা করতে হয়। এ সব সম্ভব হয় একমাত্র শ্রীমতী এলেনের জন্যে। রায় বলে যান, এলেন সর্ট হ্যাণ্ডে নোট নেন। তারপর রায় যখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন এলেন তখন টাইপ করে যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এর পর আছে বছরের ক'মাস ভারত ভ্রমণ। এরই মাঝে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনার জন্যে সময় করে নিতে হয়।

তিনি প্রতি সপ্তাহে শুধু ভারত নিয়েই লিখতেন না, বিশ্বের ঘটনাবলী নিয়েও লিখতেন। এই সময় চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চিয়াং কাইসেকের জাতীয়তাবাদী সরকারকে হঠিয়ে চীনের ভূখণ্ডে শক্ত হয়ে ব'সে চার দিকেই লুব্ধ দৃষ্টি ফেলতে থাকে—হাতও বাড়ায়। কমিউনিজমের বিপদ কালো মেঘের মত ভারতের ঈশান কোণে পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে। সেদিন সেই মহাবিপদের দুর্লক্ষণ ভারতের কারও চোখে না পড়লেও, নেহেরু চীন প্রেমে গদগদ হ'লেও, রায়ের চোখ এড়ায় নি। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর কাগজে, বিভিন্ন সভাসমিতিতে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেই চললেন। সেই সব লেখা ও ভাষণের কিছু এখানে উদ্ধৃত করলে পাঠকের ভাল লাগতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ

রায়ের দৃষ্টিতে কমিউনিষ্ট চীন

রায় তাঁর নিউ হিউম্যানিষ্ট ম্যানিফেষ্টো (New Humanism—A Manifesto) সুরু করেছিলেন এই বলে :

"প্রোলেটেরিয়েট বিপ্লবের যুগকে আহ্বান জানাতে যে কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো প্রকাশিত হয়েছিল তার পর একশ' বছর কেটে গেছে। উদীয়মান বুর্জোয়াদের সন্ত্রস্ত করতে কমিউনিষ্ট দানব যে সারা ইউরোপ দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে, এ কথা তখন লেখা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে সে দিন সে কথা সত্য না হ'লেও আজ কিন্তু তা অতি সত্য হ'য়ে উঠেছে। যে কমিউনিজিমকে ধনতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে সারা দুনিয়াকে বাঁচাবার জন্যে ত্রাণকর্তা রূপে স্বাগত জানান হয়েছিল, সেই কমিউনিজিম আজ কেবল যে বুর্জোয়াদের পক্ষেই ভয়ংকর দানবরূপে দেখা দিয়েছে তাই নয়, সারা দুনিয়ার সভ্য, ভদ্র ও প্রগতিশীল মানুষকেও ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।"

এই দানবকে পরাভূত ক'রে তার হিংস্র সর্বনাশা গ্রাস থেকে জগৎকে বাঁচাবার অঙ্গীকার নিয়েই তাঁর নব-দর্শনের সৃষ্টি। রায় লিখলেন :

"পৃথিবীর মানব সমাজ আজ যে সর্বধ্বংসী সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সকল শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সফল ক'রে তোলার একমাত্র উপায় হ'ল কমিউনিজমের মিথ্যা স্বর্গরাজ্যের ইউটোপিয়ার অবৈজ্ঞানিক নীতি ও পদ্ধতির গলদ কমিউনিষ্টদের নিজ ইতিহাসই যে অতি নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে তা প্রকাশ করে দেওয়া, এবং তার বদলে উন্নততর, ত্রুটিহীন এক রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনের পরিকল্পনা সমাজের সামনে তুলে ধরা। পাশ্চাত্যের পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র কিংবা রুশিয়ার

কমিউনিজিম কেউই আসন্ন মহাযুদ্ধকে—যা এক অন্ধ নিয়তির মতই বিশ্বকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে—ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।"

লেনিন-ষ্ট্যালিন বিশ্বাস করতেন যে, এসিয়া জয় হ'লেই ইউরোপ ফাউ হিসাবে অতি সহজেই এসে যাবে। সেই জন্যে তাঁরা এসিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টিদের মুক্ত-হস্তে সাহায্য দিতেন। রায় এসব কথা জানতেন।

১৯৪৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট সাপ্তাহিকে তাঁর যে লেখা প্রকাশিত হ'ল তাতে তিনি লিখলেন:

"এসিয়াকে কমিউনিজিমের হাত থেকে বাঁচাবার পক্ষে ভারতই হ'ল একমাত্র নিরাপদ ঘাঁটি। কিন্তু সমগ্র চীন ভূখণ্ডটাই যদি কমিউনিষ্টরা গ্রাস করতে পারে তা হ'লে ভারত দুই দিক থেকে এক বিরাট কমিউনিষ্ট সাঁড়াশির মধ্যে পড়ে যাবে। তখন ব্রিটিশের তৈরি সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের সমরোপকরণের সাহায্যে সশস্ত্র কমিউনিষ্ট আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হ'লেও সেই সুযোগে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাধির ফলে দেশের মধ্যে যে গণ্ডগোল ও অশান্তি দেখা দেবে তা কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

"দেশের অধিকাংশ মানুষ অন্ন-বস্ত্র গৃহের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। যে পথে কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা চলেছে তাতে শীঘ্র এ সমস্যার মীমাংসা হবার কোন সম্ভাবনা নাই।

"দারিদ্র্য ও দুঃখজনিত এই যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তা' দেশের শান্তি অব্যাহত রাখতে দেবে না—আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে। তখন কমিউনিষ্টদের ঠেকাতে ফ্যাসিষ্ট ডিকটেটরি গড়ে উঠবে।"

১৯৪৯ সালের ১৪ই অগাষ্ট উক্ত সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হ'ল:

"ভারতে অশান্তি-গণ্ডগোল বাধানো, কমিউনিষ্টদের 'এসিয়া জয়েই ইউরোপ জয়'—নীতিরই একটা অংশ।

"চীনের কমিউনিষ্টরা এখন ভারতসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাইবে। শীঘ্রই বর্মা-ইন্দোচীনকে কমিউনিষ্ট আক্রমণের সম্মুখীন হ'তে হবে। তখন এসিয়ার মধ্যে একমাত্র ভারতই থাকবে আইন ও শৃঙ্খলা সমন্বিত শক্তিশালী রাষ্ট্র। সুতরাং এসিয়ায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম চালাতে হ'লে এই দেশ থেকেই তা চালাতে হবে।"

১৮ই ডিসেম্বরের, সংখ্যায় বলা হ'ল :

"ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি মাও-ৎসে তুঙ্গকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, "চীনের মত ভারতকেও তিনি রাহু-মুক্ত (liberation = নেহেরু মুক্ত ?) করবেন।"

"সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সরকার মাও-ৎসে তুঙ্গের এই সংক্ষিপ্ত উক্তির প্রতি নেহেরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"

"এখনই হয়তো চীনা সৈন্য ভারতের দরজায় এসে হানা দেবে না, কিন্তু সমগ্র চীন বিজয়ী কমিউনিজিম থেমে থাকবে না। তিব্বত, নেপাল, পূর্ব তুর্কীস্থান এবং কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে তার দাড়া বিস্তার করে চলবে। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক কমিউনিজিম আজ ভারতকে সব দিক দিয়েই ঘিরে ফেলেছে।"

প্রতি সপ্তাহেই রায়কে কোথাও না কোথাও বক্তৃতা দিতে হয়। এবং সে-বিষয়েই কিছু বলেন, তা সে বিষয়ের স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য হ'য়ে যায়। এ সব বক্তৃতার মধ্যে চীনা কমিউনিজিমের গতি-প্রকৃতি বিষয়ও থাকত। সেইসব বক্তৃতা তাঁর র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট সাপ্তাহিকে স্থানাভাবে ছাপা হ'ত না, সর্টহাণ্ড নোটে তা মজুত থাকত। তারই একটা ভাষণ ১৯৫০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর কমিউনিজিম ও জাতীয়তাবাদ (Communism & Nationalism) নামে প্রকাশিত হ'ল। তাতে তিনি বলেছিলেন :

"....নেহেরু যে চোখে চীনা কমিউনিজিমকে দেখছেন তাতে তিনি ভুল করছেন, এবং এর দ্বারা তাঁরই সমর্থনে চীনের দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের সুবিধা হ'বে মাত্র। তাতে কি ভারত, কি এসিয়ার অন্যান্য দেশ, সকলের পক্ষেই সমূহ বিপদ। নেহেরু যা চাইছেন, কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী বন্ধন, তা হবে না। কারণ, এসিয়ার নেতৃত্বের জন্যে মাও-ৎসে তুঙ্গও কম ব্যস্ত নয়, এবং এও সে জানে যে, ভারতকে মারতে না পারলে সেটা সম্ভব নয়। তাই তার প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল ভারতকে মারা। সেই কারণে কমিউনিষ্ট চীনকে নেহেরুর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা উচিত নয়।

"কমিউনিষ্টদের নীতি ও কৌশল হ'ল বন্ধুকে মেরেই বড় হওয়া। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট অধ্যুষিত দেশসমূহের ইতিহাস, বিশেষতঃ ম্যাসারিক ও বেনেসের কাহিনী থেকে শিক্ষালাভ ক'রে নেহেরু যেন সতর্ক হ'ন। শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম সান-ইয়াৎ-সেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন সেখানে যাবার জন্যে, কিন্তু

ম্যাডাম নিজে কোথায়? বন্দীশালার গরাদের ফাঁক দিয়েই নেহেরুকে স্বাগত জানাবেন বোধ হয়?"

"নেহেরু কমিউনিষ্ট ন'ন। দেশের কমিউনিষ্টদের তিনি দমনে রাখেন, সৈন্য বাহিনীকে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে তৈরি থাকতে বলেন। এ সব কথা মাও-ৎসে তুঙ্গ জানে। তারাও নেহেরুকে বিশ্বাস করে না। নেহেরুর সঙ্গে কমিউনিষ্ট চীনের মধুযামিনী যাপন ও গলাগলি শীঘ্রই শেষ হবে। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন নেহেরুর নীতির ফলে ভারতের অনেকখানি ক্ষতি হয়েই চলবে।"

১৯৫১ সালে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট-এর ১০ই জুনের সংখ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধ বের হ'ল "কমিউনিজিমের তিব্বত জয়" শিরোনামা দিয়ে। তাতে লিখলেন:

"চীনের সেণ্ট্রাল পিপ্‌ল্‌স গভর্ণমেণ্ট তিব্বতকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাহুমুক্ত করবে বলে পিকিং থেকে যে ঘোষণা বেরিয়েছে তাতে ভারত-চীন মৈত্রীর মিলন-বাঁশরী আর ঠিক সেই মধুর সুরে বাজবে না।"

"এসিয়ার রাজনীতির গতি-প্রকৃতিতে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিষ্টদের কার্যকলাপে নেহেরু বড়ই আঘাত পাবে। কমিউনিজিম যতদিন অপর দেশ গ্রাস করছিল, ততদিন নেহেরুর কাছে কমিউনিজিমের কোন দোষই ছিল না। আর আজ যখন কমিউনিজিম ভারতের দিকে হাত বাড়াচ্ছে তখন নেহেরুর আপত্তি। কিন্তু নেহেরুকে খুশী রাখতে কমিউনিষ্টদের কোন গরজই নাই।

"অবশ্য তাদের কার্য সিদ্ধির জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খুশী রাখতে তারা চাইবে। কিন্তু যদি তিব্বত 'রাহু মুক্ত' হয় তা হলে রাহুমুক্তকারীরা ভারতের বড়ই কাছে এসে পড়বে। সেই জন্যে ভারতকে প্রতিবাদও জানাতে হয়েছে। তার ফলে চীন-রুশিয়া উভয়েই চটেছে। চটবারই কথা। চীন যখন দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে, তখন ভারত চীনকে আক্রমণকারী বলতে রাজি হয় নি, পাছে বন্ধু চীন চটে যায়। তা হ'লে আজ সে চীনকে আক্রমণ-কারী বলবে কেন? অবশ্য নেহেরুর প্রতিবাদের কোন ফলই হয় নি। চীন যা করবার তা করেছে, সে তিব্বত দখল করে নিয়েছে।

"চীনা কমিউনিষ্টরা মুখে বলছে বটে যে, তিব্বতকে ইংরেজ-আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু তারা খুব ভাল করেই

জানে, ইংরাজরা ভারত ছাড়ার পর থেকে ঐ অঞ্চলে তাদের আর কোন প্রভাব নাই, আর আমেরিকার ত নাই-ই। তিব্বত আক্রমণের আসল উদ্দেশ্যই হ'ল, ভারতবর্ষ। নেহেরুর প্রাণে এ আঘাতটা বড়ই লেগেছে। প্রাণের বন্ধু মাও-এর মনে এই ছিল !!!

"কোরিয়ার পরাজয় পুষিয়ে নিতে হবে তিব্বত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ দখল ক'রে। ভারতের পালা খুব শীঘ্র নাও আসতে পারে। কিন্তু তার ভীত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার সন্দেহ হয় সত্যই বিপদ যখন আসবে তখন সে বিপদে নেহেরুর বৈদেশিক নীতি কতখানি সহায় হবে!"

১৯৫১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় রায় সম্পাদকীয়তে লিখলেন :

"কাশ্মীর ব্যাপারে যে ভাবে নেহেরু পশ্চিমী গণতন্ত্রের অনুরোধ-উপরোধ প্রত্যাখ্যান করছেন এবং কমিউনিষ্ট চীনের প্রত্যেক ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন তাতে ভারতের বৈদেশিক নীতি ক্রমেই কমিউনিষ্ট ঘেঁসা হ'য়ে উঠছে, এবং আখেরে হয়তো চীনের সঙ্গে হাতই মেলাবে। কিন্তু সেটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তার ফল হবে, ভল্লুকের আলিঙ্গনের ফল যা হয়ে থাকে, তাই।"

১৯৫২ সালের ১৩ই জানুয়ারীর সংখ্যায় "এশিয়ায় কমিউনিজিম" প্রবন্ধে লিখলেন,

"এশিয়াতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষরাই কমিউনিজিমের প্রধান সমর্থক। তারাই কমিউনিষ্ট পার্টি সমূহের নেতা, জনসাধারণ তাদের অনুচর মাত্র। এশিয়ার মধ্যবিত্তদের প্রধানতম আবেগ হ'ল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা,—আসলে জাতি-বিদ্বেষ। এই জাতি বিদ্বেষের ফলে এবং মনগড়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বপ্ন দেখার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণরাজি সমূহ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে।

"কমিউনিজিমের জনপ্রিয়তার কারণ যত না কমিউনিজিমের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, তার চেয়ে বেশী শক্তিমান রুশিয়ার নিকট আত্ম-নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা।

"কমিউনিজিমের প্রতি আকর্ষণের সবটা সুবিধাবাদের নিদর্শন না হ'লেও অনেকটা যে কাঁচা বুদ্ধি ও ভাবালুতা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এশিয়ায় ব্যাপক দারিদ্র্যের জন্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বভাবতই ধনতন্ত্রের বিরোধী। অতএব কমিউনিজিমও যখন ধনতন্ত্রের বিরোধী তখন তা ভাল, এবং রুশিয়া যখন কমিউনিষ্ট, তখন সেও ভাল, তার সব কিছুই সমর্থন যোগ্য।

"এটা একটা বিস্ময়ের বিষয় যে, এশিয়ার শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ধর্মীয় ও মধ্যযুগীয়

সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে বাস করেও কমিউনিষ্ট ইউটোপিয়াতে বিশ্বাসী। এই মনোভাবের ব্যাখ্যা একমাত্র মন সমীক্ষণের দ্বারাই পাওয়া যেতে পারে। সমাজের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের স্থান খুবই অমর্যাদার ও নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক, তাই আক্রমণাত্মক আক্রোশে তাঁদের অবচেতন মন সদাই আচ্ছন্ন। সেই জন্যেই কমিউনিজিমের সামাজিক আদর্শ তাদের কাছে যত না মনোমুগ্ধকর তার চেয়ে ঢের বেশী আকর্ষণীয় কমিউনিজিমের ডিকেটেটরী ব্যবস্থা। এশিয়ার সব দেশেই এই সব শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান সমাজের প্রতি তাদের নানা আক্রোশের অভিব্যক্তি কমিউনিষ্ট ডিকেটটরি শাসনের প্রবর্তন-প্রচেষ্টার মধ্যে। তাদের সামাজিক আদর্শবাদ সোজাসুজি অসৎ না হলেও (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নয়) এটা যে নিরংকুশ ক্ষমতা লোভেরই ভদ্র প্রকাশ তাতে আর সন্দেহ নাই।"

পুরানো ভাষণের সঙ্কিত অনুলিপি থেকে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই তারিখের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট-এ 'এশিয়ায় গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ' নামে বের হ'য়। তার ভাবার্থ নিম্নরূপ :

এশিয়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে কমিউনিজিমকে হারানো অসম্ভব। তার কারণ, যে সব জাতীয়তাবাদী সরকার কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়বে সেই সব জাতীয়তা-বাদী সরকার নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য অসন্তোষ দূর করবার প্রতি সম্যক নজর না দিয়ে ধনিক-বণিকদেরই সমর্থন ক'রে চলে এবং নিজ নিজ পার্টির ও দলের রাজত্ব ও প্রভুত্বের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার দিকেই লক্ষ্য রাখে বেশী। জনসাধারণের অসন্তোষ সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে; পশ্চাদ্‌ভাগ নিরাপদ থাকে না, কমিউনিষ্ট পঞ্চম বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর তৎপরতা বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে—সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ঘটে।

তা ছাড়া বহু যুগ-যুগান্তরের নিপীড়িত দরিদ্র দুঃখী এশিয়ার মানুষ গণতন্ত্রের মধ্যে যে মানবিক মূল্য আছে, যে মধু আছে তা বোঝে না; সে বোধই তার নাই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য—যার অর্থ, নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে জীবনকে গড়ে তোলা এবং সেই জীবনকে পছন্দমত সম্ভোগ করা প্রভৃতি আদর্শের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ নাই। অতএব কমিউনিষ্টদের একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তারা ভয় করে না, বরং খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা তাদের পক্ষে হাতে স্বর্গ পাওয়ার সামিল। তা ছাড়া কমিউনিষ্টদের আছে জাতীয়তাবাদের মত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, পাশ্চাত্য

জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা (বৌদ্ধদের দেশে তারা বৌদ্ধ সমর্থক, পাকিস্থানে তারা মুসলমান সমর্থক, হিন্দুস্থানে তারা হিন্দু সমর্থক)। সুতরাং কমিউনিষ্টদের যুদ্ধক্ষেত্রে হারানো কঠিন।

এই অবস্থায় এশিয়াতে কমিউনিজমকে যদি পরাজিত করতে হয়, তা হ'লে জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে—কমিউনিষ্টদের মতই জনসাধারণের অন্ততঃ মোটা ভাত কাপড়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। গ্রাম থেকেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্থা সমূহ গড়ে তুলতে হবে—যাতে সাধারণ মানুষ (বই পড়ে নয়, বক্তৃতা শুনে নয়) হাতে কলমে গণতন্ত্রের সুফল নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। নতুবা শত শত মাইল দূরে অবস্থিত পার্লামেণ্ট বা সংসদ মার্কা নাম-কা-ওয়াস্তে গণতন্ত্র কমিউনিষ্টদের ধাক্কায় টিকবে না।

গণতন্ত্র গড়ে তোলার প্রাথমিক উপকরণ হ'ল আত্মশক্তির উপরে ব্যক্তি মানুষের আস্থা। নিজের প্রয়োজন নিজের চেষ্টাতেই মেটাবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়। যদিও সকলেই খেটে খায় এবং সেই খাটুনি লব্ধ অন্নবস্ত্র দিয়েই সংসার যাত্রা নির্বাহ করে, তথাপি আত্মশক্তির দ্বারাই নিজ ভাগ্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বাসের শিথিলতা কম-বেশী সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। কারণ ব্যক্তি যে মানুষের ভাগ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সে অভিজ্ঞতা পূর্বে আর কারও কখনও হয়নি। বাড়া-ভাতে-ছাই-পড়াই তাদের এতকালের অভিজ্ঞতা। দিনান্ত পরিশ্রম করেও যে পেটের ভাত জোটানো দায়—এটাই তাদের একমাত্র অভিজ্ঞতা। ব'লে শোষণ, না ব'লে শোষণ, দেখিয়ে শোষণ, অদৃশ্য হস্তে শোষণ! কখন যে কোন্ মহাপ্রভু দেখা দেবেন এবং দয়া করবেন তার কোন ঠিকানাই তাদের জীবনে থাকে না। 'দিনটা যে গেল সেটাই বড় কথা', এই যাদের জীবনবাদের একমাত্র সুখবাদী নীতি, তাদের মধ্যে দুঃখবাদ, মায়াবাদ অদৃষ্টবাদ, আত্মশক্তির উপর অনাস্থা থাকবে না ত থাকবে কার?

এ সব দূর করতে হ'লে একেবারে মূল থেকে এমন সব সংস্থা গড়ে তুলতে হ'বে, যেখানে এই সব মানুষ নিজেরাই সেই সব সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে চালাবে এবং প্রত্যক্ষভাবেই তার ফলভোগ করবে। সেই সব সংস্থার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য যেন হয়—মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানো, অর্থাৎ মোটা ভাত কাপড়ের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান। মানুষ নিজেরাই যখন সেই সংস্থা

প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করে হাতে হাতে এই ফল পেতে থাকবে, তখনই তাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগবে এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝবে গণতন্ত্রের মূল্য, এবং তখন তারা তা রক্ষা করতেও চাইবে। ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈদগ্ধ্যের যুগে যে আন্দোলন কেতাবের মারফৎ হয়েছিল তাই এশিয়ায় সুরু হোক হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে। ফল ফলতে খুব দেরি নাও হ'তে পারে।

১৯৫৩ সালের ১৭ই মে'র র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট-এর সম্পাদকীয়তে রায় লিখলেন :

"মস্কোতে যাই ঘটুক, ম্যালেনকোভের শান্তির বুলি সত্য-মিথ্যা যাই হোক, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরও এশিয়াতে কমিউনিষ্টদের আক্রমণাত্মক নীতির কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা যাবে না। নেপোলিয়ানের নীতি লেনিন নিয়েছিলেন, এশিয়া জয়ে ইউরোপ জয়। ষ্ট্যালিনও সেই নীতি অনুসরণ করে এসেছিলেন, তারপর যারা আসবেন তাঁরাও ঠিক তাই করবেন। এশিয়াতে চাপ বজায় রাখতে পারলে ইউরোপে রুশিয়ার উপর চাপ কমবে। তারপর চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির সহজ সাফল্যে এশিয়া জয় বড়ই সহজলভ্য বলে মনে হচ্ছে। ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে পারলে এশিয়া জয়ের সুবিধা হবে, সেইজন্যে এখন তারা ইউরোপে ঝঞ্ঝাট বাধাতে চাইবে না। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরও এশিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না, যতক্ষণ না সমগ্র এশিয়া কমিউনিষ্ট হয়ে যাচ্ছে!"

দশম পরিচ্ছেদ

মুম্বরি দুর্ঘটনা

১৯৫০ সাল। আগের মতই অবিরাম লেখা, পুস্তক প্রকাশন, আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতিতে যোগদান ও ভারত ভ্রমণ।

Materialism গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার আয়োজন চলেছে।

১৯৫১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টদের প্রথম সঙ্গীতি ডাকা হ'ল। সারা ভারত থেকে অনেকে এলেন। দেখা গেল ধীরে ধীরে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে।

Materialism প্রকাশিত হ'ল। রায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Reason, Romanticism & Revolution-এর প্রথম খণ্ড শেষ পর্যন্ত প্রেসে গেল। প্রকাশিত হ'তে বছর পার হয়ে গেল। দ্বিতীয় খণ্ডও শেষ হ'ল। এবার ছাপা হ'লেই হয়।

১৯৫২ সাল। প্রতি বছরের মতই রায় ক'মাস কলকাতায় কাটাচ্ছেন। এবার আসতে দেরি হয়ে গেছে, গরম পড়ে গেছে। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ভারতের প্রথম নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে।

নির্বাচনের সময় রাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টরা বাংলায় ভোটার পঞ্চায়েৎ নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলে ভোটারদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছে। ব্যক্তির সার্বভৌম অধিকারকে সার্থক করতে হ'লে প্রতিনিধির হাতে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। এবং তা সম্ভব হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি তাদের পার্টির প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে যারা ভোট দিচ্ছে তাদের প্রতি অনুগত থাকেন এবং ভোটার পঞ্চায়েতের (গ্রাম সভা) নির্দেশে সংসদে, সভায় ও পরিষদে পরিচালিত হ'তে থাকেন এবং ভোটারদের অনাস্থাভাজন হ'লে গ্রামসভার (ভোটার পঞ্চায়েৎ) নির্দেশে পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকেন।

রায় ভোটার পঞ্চায়েতের অভিজ্ঞতা শুনলেন।

এই সময়েই পিপ্‌ল্‌স কমিটি (গণ পঞ্চায়েৎ) যে জনগণের সাধারণ সভার কার্যকরী সমিতি মাত্র এবং জনগণের গ্রাম সভার কাছে তা সর্বদাই দায়ী থাকবে সে পরিকল্পনা প্রচার করা হয়। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টদের কাগজে পত্রে এ যাবৎ পিপ্‌ল্‌স কমিটি পর্যন্তই ছিল। সংহত জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা-প্রয়োগের সংস্থারূপে গ্রাম সভার পরিকল্পনাটি উহ্য ছিল। সেটা এবার পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। রায় ভোটার পঞ্চায়েতের কাজ কর্মে খুশীই হলেন।

এদিকে রায় বিশ্বের বিভিন্ন স্তরের মানবতন্ত্রীদের সঙ্গে পত্রালাপ ক'রে সকল মানবতন্ত্রীদের নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে এক বিশ্ব মানবতন্ত্রী সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়েছেন। অগাষ্ট মাসে আমস্টারডামে ইনটারন্যাশন্যাল হিউম্যানিষ্ট এণ্ড এথিক্যাল ইউনিয়ান স্থাপিত হবার সকল আয়োজনও সমাপ্ত প্রায়। এই কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে এই পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা রায় আনুষ্ঠানিকভাবে নিমন্ত্রিত হলেন অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে। তিনিও সে নিমন্ত্রণ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলেন। এই সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমি ও প্রতিষ্ঠান থেকেও ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ পেলেন। তিনি সেই সকল আমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় পাশপোর্ট ও ভিসার জন্যে দরখাস্ত করলেন।

জুলাই মাসেই যাত্রা করতে হবে। মে-জুন—দেরাদুনে বেজায় গরম। দীর্ঘ ভ্রমণের জন্যে শরীরটাকেও একটু সুস্থ করে তোলা দরকার। বহু সংস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার জন্যে কিছু প্রস্তুতিরও প্রয়োজন। নব-মানবতাবাদকে সমগ্র মানবজাতির এ যুগের জীবনবাদরূপে গ্রহণ করাতে হবে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমিই হ'ল সমাজ জীবনের সিংহদ্বার। এবং সেটি উত্তীর্ণ হ'তে পারলে সহজেই আশা পূর্ণ হ'তে পারে। কিন্তু কাজ সহজ নয়। তিনি দেহ ও মনকে কিছু বিশ্রাম দিতে মুশুরিতে গেলেন।

১১ই জুন। প্রাতঃতে ভ্রমণের জন্যে রায় একাই বেরিয়েছেন, একটু পরেই শ্রীমতী এলেন আসবেন। বেশী দূর যান নি, হঠাৎ পা পিছলে পঞ্চাশ ফুট নীচে গড়িয়ে পড়ে গেলেন। নিকটের বাড়ী থেকে লোক ছুটে এল, শ্রীমতী এলেনও এলেন। অচেতন দেহ তুলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ডাক্তাররা এলেন। সারা ভাদ্রত্বে

অবিলম্বে সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ভারতের চারিদিক থেকে বহু ভক্ত ও বন্ধু ছুটে গেল, চিকিৎসার জন্যে অর্থ পাঠাতে লাগল।

পাঁজরার কয়েকটা হাড় ভেঙেছে; পায়ের হাড়, হাতের হাড়ও ভেঙেছে; মেরুদণ্ডে আঘাত লেগেছে, তবে মাথায় বিশেষ গুরুতর আঘাত লাগেনি, কিছু ছিঁড়ে গেছে, কেটে গেছে মাত্র। কয়েকদিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান হ'লে দেখা গেল, মেরুদণ্ডের আঘাতের ফলে নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে। কয়েকদিন পর অতি সাবধানে দেরাডুনে নামিয়ে আনা হ'ল।

রোগ শয্যায় মাসের পর মাস কাটতে লাগল, জীবন মৃত্যুর মাঝখানে। অতি সতর্ক দৃষ্টি মেলে অনুক্ষণ নিরবকাশ সেবা করে চললেন মহীয়সী মহিলা সহধর্মিনী শ্রীমতী এলেন।

বিশ্বজোড়া বন্ধু ও অনুরাগীদের সাগ্রহ অনুসন্ধানের জবাব দিতে হয় এলেনকে। ভারতব্যাপী র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম দেখতেও হয় তাঁকে।

রেনেসাঁস ইনষ্টিটিউট, রেনেসাঁস পাবলিশার্স তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। বিশেষতঃ কলকাতায় রেনেসাঁস পাবলিশার্স-এর প্রতি নজর না দিলে পুস্তক প্রকাশনার কাজ থেমে যায়—সুতরাং সেদিকেও নজর না দিলেই নয়। তারপর আছে প্রতি সপ্তাহে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট-এর নিয়মিত প্রকাশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাত। এ সবই করতে হয় এলেনকে। এ ছাড়া গৃহকর্মের খুঁটিনাটিও তাঁকে ছাড়া চলে না।

নিজেদের হাতে তৈরী ঐ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাগানের, শত শত বহুমূল্য গুল্মলতা বৃক্ষকে নিজের চোখে না দেখলে ফুল ফোটে না। জেল থেকে আনা রায়ের প্রিয় বিড়ালের বংশধরদের নিজ হাতে না খাওয়ালে উপোস করে পড়ে থাকে।

দেশ বিদেশের বন্ধু ও অনুরাগীদের মন বিষাদে ভরে উঠেছে। নব মানবতাবাদ (আগামী কালের মানুষের জীবনবাদ) এখনো সম্যক বুঝে নেওয়া হয় নি। এমন ঘটবে যদি জানা যেত!

জীবনস্মৃতি লিখছিলেন, তাও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল! জীবনের চিরটা কাল অহর্নিশ কত না অত্যাশ্চর্য সব কাজ করেছেন, কিন্তু সে সবের কথা সম্যকরূপে কেই বা জানে। অধিকাংশ ঘটনার প্রমাণই তিনি সযত্নে নিজ হাতে মুছে

ফেলেছেন। চিরকাল এমনই নীরবতা অবলম্বন করে এসেছেন যে, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বিশেষ কিছুই জানবার উপায় নাই। কত বই লিখেছেন, তাতে নিজস্ব মানুষটি যে কেমন তা বোঝা যায় না। কিছু বোঝা যায় শ্রীমতী এলেনকে জেল হ'ত মাসে একখানি করে লেখা চিঠিগুলি থেকে। এই পত্রগুচ্ছ The Letters from Jail নামে ছাপা হয়েছে। এই সব পত্র থেকেই আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম রায়ের এই একান্ত নিজস্ব জীবনের কিছুটা পরিচয় দেবার জন্যে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জেলের চিঠি

* * *

"তুমি জান যে, এই সব অসুখ-অসুবিধা, দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে আমি উদাসীন হ'লেও উত্তম বস্তুকে আমি প্রত্যাখ্যান করি না।

"কৃচ্ছ সাধনের পথে বৈরাগ্য যোগ আমার নয়।"

* * *

"হা-হুতাশ করে ভেঙ্গে পড়ো না। জীবনে যা আসে আসতে দাও। সেই সঙ্গে, এসো, শুভ দিনের সাধনা করি।"

* * *

"দেখছ ত, বড় নিষ্ঠুর এই দুনিয়া। দেখ না, আমাদের মত নির্বিরোধী শান্তশিষ্ট মানুষকেও অযথা কত কষ্ট সইতে হয়। সান্ত্বনা এই যে, আমরা এই পৃথিবী নতুন করে গড়ে তুলব।"

* * *

"দুর্ভাবনা না ভেবে জীবনটাকে সহজ করে নাও। দেখছ না, ধরণীর বুকে শীতের অবসানে বসন্তের আবির্ভাব। লতায় পাতায় জলে স্থলে কত রং, কত ফুল কত কিছুতে ভরে গেল। বাইরের কুঞ্জের মতই জীবন কুঞ্জও কত কিছুতে ভরে উঠবে।"

* * *

"মুখ বুজে সবই সইতে পারি, তবে কিনা কষ্ট সইতে সইতে শরীরটা ভেঙ্গে পড়ে।"

* * *

"এত অসুবিধা সত্বেও, যেমন করেই হোক, কিছু না কিছু সৃষ্টির জন্যে আমি ব্যাকুল। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কোন কিছু মূল্যবান বস্তু গড়ে তোলার চেষ্টা না করে বৃথা দিন কাটাচ্ছি, এ কথা মনে হলেই আমার যে কী নিদারুণ অস্বস্তি হয় তা তুমি সহজেই বুঝবে। সেই যে এক নৈরাশ্যবাদী অত্যাধুনিক জীববিজ্ঞানী বলেছিল, এই অনন্ত সৃষ্টিতে মানুষ ঘৃণ্য কৃমিকীটেরই সমতুল্য, আজকাল নিজেকে তাই ভাবি।"

* * *

"'অপরে পারে যা, তুমিও পারিবে তা', এই ছিল আমার জীবনের সাধনা।"

* * *

"একাকিত্বই আমার ভাল লাগে। তুমি জান, বাছা বাছা মানুষের সঙ্গও আমি বেশীক্ষণ সইতে পারি না। যার তার সঙ্গ, সে ত খুন হওয়ার সামিল।"

* * *

"আকাশ ঢাকা প্রাচীরে ঘেরা এই ছোট্ট কুঠরিতে বসে সেই সব স্মরণীয় দিনগুলির কথা ভাবতে ভাল লাগে, যখন কেবল হেসে খেলেই সারাটা দিন কাটিয়ে দিয়েছি ; সেই সব দিন ফিরে পাবার ইচ্ছা এখনো আমার এতই প্রবল যে, বেশ বুঝতে পারছি, যে বয়সে মানুষ তেমন করে হেসে খেলে বেড়াতে লজ্জা বোধ করে, সে বয়সে পৌছতে এখনো আমার অনেক বাকী।"

* * *

"বসন্ত যদি সম্ভোগই করতে হয় তবে বসন্ত একলা আসবে কেন। সুন্দর কিছু উপভোগের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছি। পাইন ঢাকা পর্বতে ভাল একটি হোটেল, খুব খানিকটা ঘুরে দারুণ ক্ষুধা, অপেক্ষমান নানা সুখাদ্যে ভরা টেবিল, আর সেই সঙ্গে হাসি আর হাসি। আমার সুন্দরের এই ধারণা হয়তো সৌন্দর্যবিদ্‌গণের নিকট খুবই আপত্তিকর, কিন্তু উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্যবিদ্‌গণের আপত্তি কানে না তুলেই আমি এই ভাবেই আমার জীবনে সুন্দরের উপাসনা করতে চাই।"

* * *

"অবাস্তব ইচ্ছাকে আমি প্রশ্রয় দিই না, কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখেই আমার ভাবনা চলে।"

* * *

"পরম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। জীবনের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ধৈর্যের কঠিন পাঠ নিচ্ছি। জানি না ভবিষ্যতে এই ধৈর্যের শিক্ষায় আমার কাজ হবে, না অকাজ হবে। জীবনে এমন সময়ও আসে যখন পরম যোগীরও মনের প্রশান্তি (philosophic calm) রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।"

* * *

"আমি একজন পাকা আশাবাদী (incorrigible optımst)। তাই তো আমি এমন প্রাণ খোলা হাসি হাসতে পারি, যদিও আগের মত হাসতে এখন আর পারি না। আমার কুঠরির ছোট্ট আঙ্গিনায় কাঁচা সোনা রংয়ের ফুল ফুটেছে; কিন্তু তুমি অত দূরে থাকলে আমি তা পাঠাই কেমন করে?"

* * *

"একমাত্র বিকৃতমনা কিংবা অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিই বলবে যে, মনুষ্যজাতি তার পূর্ণ পরিণতির সীমাহীন লক্ষ্যের পথে এগুচ্ছে না—যদিও তার এই চলার শেষ কোন দিনই হবে না। যাই হোক, আসলে পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা নয়, যদিও সেখানে আছে জেলখানা, হিটলার, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাথা ধরা, মনোকষ্ট, এবং আরও কতই না ব্যথা-বেদনা।"

* * *

"মনের মত সঙ্গীর সাহচর্য যে কী বস্তু তা'ত প্রায় ভুলতেই বসেছি। বুঝতে পারছি, যখন এখান থেকে বেরুব, তখন আমি আগের চেয়েও বেশী অসামাজিক হয়ে উঠব। নীরবতা যে সুবর্ণ তুল্য এ বিশ্বাস আমার চিরকালের; এতদিন যা ছিল সোনা ভবিষ্যতে তাই আমাতে হীরকের দ্যুতিতে দ্যুতিমান হয়ে উঠবে।"

* * * ৬

"তুমি কি জান, কাল কি ঘটবে? অবশ্য দুরাশা ভাল নয়। কোন কিছুই ত পূর্ব নির্ধারিত নয়। জীবন ত' বিস্ময়ে ভরা।"

* * *

"বড় মজার এ সংসার। কত দুঃখ! তবু কত রঙ্গ, রস। চমকে দেবার মত ঘটনার কি অভাব আছে?"

*　　*　　*

"সুখকর চিন্তাই হ'ল জীবনের মধু। জীবনকে এই মধু দিয়ে ভরে তোলাই ত' জীবনের আর্ট।"

*　　*　　*

"ব্যথা-বেদনার ত' অন্ত নাই, তবু তারই মাঝে খুশী হবার মত ঘটনার সম্ভাবনায় খুশী হয়ে উঠতে হ'বে বৈকি। এই ত জীবন। এই জীবনকে আরও সুখকর করে তোলাই ত' আমাদের কাজ। সকল কুশ্রিতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে জীবনকে মুক্ত করে পরম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে গড়ে তোলার সঠিক সন্ধান আমাদের জানা আছে।"

*　　*　　*

"অতীতে নয, ভবিষ্যতে নয়, বর্তমানেই বেঁচে থাকি, এসো।"

*　　*　　*

"উত্তম সংগীতের জন্যে মনটা বুভুক্ষ হয়ে আছে। সংগীত বিশারদ আমি নই। আমি মাত্র ভাল গান, মিষ্টি সুর শুনতে ভালবাসি। এ সংসারে সংগীতেই বোধ করি আমার প্রীতি সবাধিক। আসার সময় গ্রামোফোনের সঙ্গে কিছু ভাল রেকর্ড এনো। এদেশে বীঠোফেনের সিম্ফনি, দেবুসির থেইসের সংগীতের মত উচ্চাঙ্গের রেকর্ড মেলা কঠিন।"

*　　*　　*

"দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশি—বড় সত্যি কথা। দারিদ্র্যের পীড়ন, নোংরা বস্তিতে বাস, নিত্য অভাবের জ্বালা আদর্শ প্রেমিক যুগলকেও পরস্পরের প্রতি তিক্ত করে তোলে। আজ যে পৃথিবীতে এত কম ভালবাসাবাসি তার কারণ বর্তমানের অভাব-অনটন। প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝে একখানি মনোরম বাসা, আর অন্য দিকে আলোবাতাস শূন্য ধোঁয়া আর দুর্গন্ধে ভরা ক্ষুদে ঘরের মধ্যে কোন তফাৎ নাই, এ কথা যে বলে সে ত' উন্মাদ। স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্যই হ'ল আমার কাম্য। অতিরিক্ত কঠোর জীবন তিক্ততায় ভরে ওঠে। আর তিক্ত মনে প্রশান্তি আসে না, মনের ভারসাম্য থাকে না। কুশ্রিতা মনকে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে। যারা কল্পনা করতে জানে না, তাদের কোন আদর্শও থাকে না। যে মানুষের কোন আদর্শ নাই, সে ত জন্তু। এসব কথা আমার

কাছ থেকে শুনে আমায় ভাববাদী বলে মনে হচ্ছে নাকি? না, তা নয়। আদর্শবাদ এক জিনিষ আর ভাববাদ আর এক জিনিষ।"

* * *

"তুমি ত' জানই, আমি কোন সমস্যাকেই এড়িয়ে যেতে চাই না। সব সমস্যাকেই মাথা পেতে নিই, আর সমাধানের চেষ্টা করি। আমি বিশ্বাস করি, সমাধান করার ক্ষমতা আমার আছে।"

* * *

"কর্ম করে যাবে, কিন্তু ফলের আশা করবে না, এও কি সম্ভব? আগে কিন্তু সে বিশ্বাস আমার ছিল। আমার সে বিশ্বাসের জোর যেন একটু কমেছে বলে মনে হচ্ছে। এটা অবশ্যই সাময়িক। চিরকাল এ বিশ্বাস আমার গর্বের বিষয় ছিল; অতএব আজও তাই আমার পুরাতন বিশ্বাসকেই ধরে রাখতে চাই।"

* * *

"সব দেবতারই পা মাটি দিয়ে গড়া, একদিন না একদিন তা ফাঁস হয়ে যায়ই; নইলে আর দেবতা বলেছে কেন?"

* * *

"আমি তৎএকটা চিন্তা-ভাবনার কল; কিন্তু তাই বলে আমি মনুষ্যত্বের লক্ষণ যে কেবল লম্বমান মেরুদণ্ডী এক জীবের মেরুদণ্ডের শীর্ষদেশে অবস্থিত বস্তুর উপরই নির্ভরশীল তা বলব না। অন্যান্য জীব ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই আমি তার বিচার করব। এই লম্বমান মেরুদণ্ডী জীব আখ্যাটি তোমারই প্রিয় নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত ফ্রেজারের দেওয়া।* তোমার এই কালাপাহাড়ী বীর পুরুষটি আমারও প্রিয়। তাঁর পুরো কথাটি হ'ল মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা আছে মানুষের মেরুদণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত সকল বৃত্তিরই সম্যক চর্চা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে। অতীতের গ্রীকেরা সে আদর্শে অনেকটা পৌঁছেছিল। আমরাও যে একদিন মহাকবি হোমারের যুগের প্রাণখোলা অট্টহাসি হেসেছি, সে কথা ভুলব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবার আমরা তেমনি করেই বাঁচব।"

* * *

"সহজে আমি সংযম হারাই না; আমার ক্রোধও সংযত হয়েই প্রকাশ পায়।"

---

* শ্রীমতী এলেন ফ্রেজারের জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ Golden Bough জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

* * *

"সংসার অতি নিষ্ঠুর—তবে আমাদের সহ্যশক্তিও কিছু কম নয়।"

* * *

"আশাবাদকে যুক্তির বহিরাবরণে সজ্জিত রোমান্টিকবাদ বলা চলে। সেই জন্যে যারা কট্টর বাস্তববাদী তাদের কখনও কখনও দুঃখবাদী বলা হয়। সে হিসাবে আমি একান্তই দুঃখবাদী। সান্ত্বনাদায়িনী আত্মপ্রবঞ্চনাকারিনী ঐতিহাসিক অনিবার্যতার নীতিকে বিশ্বাস কোরো না। ইতিহাসে কিছুই অনিবার্য নয়।

* * *

"আস্থার মধ্যে অনেকটাই থাকে আশা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেষ অধ্যায়

১৯৫২ সাল কেটে গেল। রায় ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছেন। নিম্নাঙ্গের অসাড়তা ক্রমেই কমে আসছে। একটু একটু করে বলতে লাগলেন আর শ্রীমতী এলেন সর্টহ্যাণ্ডে লিখে নিতে লাগলেন। সে লেখা ছাপাও হ'তে থাকল। বন্ধু-অনুরাগী মহলে আনন্দের হিল্লোল বইতে সুরু করল।

একদিন জওহরলাল দেখা করতে এলেন। রায় বললেন, মোসাদেকের মত* আপনাকে শুয়ে শুয়েই স্বাগত জানাচ্ছি।"

জওহরলাল কিছুক্ষণ রইলেন, দুজনে কী কথা হ'ল কেউ জানল না। চলে যাবার সময় সবাই শুনল, নেহরু বলছেন, "শীগ্‌গীর ভাল হয়ে উঠুন, অনেক কাজ আমাদের করতে হ'বে।"

রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজস্ব অর্থ ভাণ্ডার থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সকলেরই মনে হচ্ছে, রায় শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। একটু-আধটু চলাফেরাও করতে পারতেন তখন। ১৯৫৩ সাল কেটে গেল আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। পুনরায় ইউরোপ-আমেরিকা যাবার তোড়জোড় সুরু হল।

অকস্মাৎ ১৯৫৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী বুকের পুরানো ব্যাথাটা যেন দেখা দিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাটাও বেড়ে চলল।

যে অসাধারণ মনোবল দিয়ে আঠার মাস রোগের সঙ্গে অহর্নিশ সংগ্রাম ক'রে নিজের দেহকে সুস্থ করে তুলে সকলকে অবাক করেছেন, সেই মনোবল যেন আজ আর পেরে উঠছেনা—হটে আসছে—ভেঙ্গে পড়ছে।

---

*ইরাণের তদানীন্তন অসুস্থ প্রধানমন্ত্রী। জওহরলাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় তিনি শুয়ে শুয়েই অভ্যর্থনা জানান। নিজের অক্ষমতার জন্যে রায় সেই ঘটনার উল্লেখ করেন।

যে মানব শিশু ১৮৮৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলা দ্বিপ্রহরে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে উঠেছিল, কৈশোরে অনুশীলন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিজের সকল বৃত্তি ও শক্তিকে বিকশিত করে তুলতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যার বিন্দুমাত্র শিথিলতা ছিল না, যার অসাধারণ মনোবল কিংবদন্তী হয়ে মুখে মুখে ফিরেছে, আজ সবই ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। রাত্রি ১১টা ৫০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের প্‌্রম্বসিস রোগে সর্ব যুগের মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু মানবেন্দ্রনাথের ৬৬ বৎসরের একাগ্র সাধনায় অনুশীলিত ও বিকশিত অনন্য সাধারণ দেহ ও মন চিরদিনের মত নীরব হ'য়ে গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন শয্যা-পার্শ্বে ছিলেন না। তাঁর অনুশীলন ধর্মের সাধনায় সিদ্ধ পুরুষের ছবি তিনি আঁকেন নি। মানসকন্যারূপে দেবী চৌধুরাণীকে এঁকে ছিলেন। গরীবের অশিক্ষিত মেয়ে প্রফুল্লকে অনুশীলন ধর্মে সিদ্ধিলাভের পর তাকে অবতার পর্যায়ে তুলে ধরেছিলেন। আর এঁকেছিলেন জীবানন্দ-শান্তিকে। আনন্দমঠের পরিসমাপ্তিতে লিখেছিলেন, "হায়, আবার আসিবে কি মা? জীবানন্দের মত পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?"

মানবেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর মানসপুত্ররূপে, উত্তর সাধকরূপে স্বীকার করতেন কিনা জানি না, আবার তাঁকে ঘরে ঘরে জন্ম নেবার জন্যে আহ্বান জানাতেন কিনা জানি না। তবে এইটুকু মাত্র জানি, প্রফুল্লের মতই গরীব ব্রাহ্মণের ঘরেই মানবেন্দ্রনাথের জন্ম এবং সাধনা ও অনুশীলনের দ্বারা একজন মানুষ যে কী থেকে কী হ'তে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। আর দেখেছি, বিকশিত ব্যক্তিত্ব বলতে কী বুঝায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত অমিত শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের কল্পনাকেও মাটির মানুষ মানবেন্দ্রনাথ হার মানাল। তাঁর অনুশীলন ব্রতের আদর্শব্রতীর চিত্র আঁকতে তিনি প্রফুল্ল চরিত্র ছাড়া আর বেশী কিছু কল্পনা করতে পারেন নি। আর আমাদের সত্যিকারের মানুষ বাস্তবে তাঁর কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যে কতদূর চলে গিয়েছিলেন তা যে বঙ্কিমচন্দ্রকেও বিস্ময়ে হতবাক্‌ করত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

গরীব কিন্তু অতি সুন্দরী প্রফুল্লকে অনুশীলন ব্রতে ব্রতী করবার জন্যে গুপ্তধনে ধনী না করলে চলছিল না। আমাদের দরিদ্র রায়ের সে সব সৌভাগ্য হয় নি। শিক্ষা সমাপনান্তে অনুশীলন ধর্মে সিদ্ধ ব্রতী প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের তৈরী "রাজ্যের' সিংহাসনে ব'সে পোষাকী রাণী সেজে ধন বিলিয়েছেন মাত্র। আর

আমাদের রায় কারও তৈরী 'রাজ্যে' নয়, সুদূরে—মেক্সিকো, স্পেন, জার্মানী, রুশিয়া, চীন, ভারতে নিজ হাতে গড়া রাজ্যে 'রাজত্ব' করেছেন। যাঁদের নিয়ে 'রাজত্ব' করেছেন, তাঁরা ভবানী পাঠকের লেঠেল ও গরীব নিরক্ষর চাষী নয়; তাঁরা সব আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের মহাগুণী, জ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থায় তখন যে সব ধীমান ও মহান চরিত্রের সমাবেশ হয়েছিল তেমনটি আর বিশ্বের ইতিহাসে কখনও হয় নি। লীগ অব্ নেশন বা ইউ, এন, ও-তে ঠিক তেমনটি ছিল না বা নাই। এই সব স্থানে যাঁরা শোভা বর্ধন করেন তাঁরা প্রচলিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় বা প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি। তাঁরা কেতা দুরস্ত রুটিন মাফিক কাজ করতে বা সেইমত ভাষণ দিতে, বিতর্ক চালাতে দক্ষ। বর্তমানের সব বিরাটকায় জাহাজের কাপ্তেনদের সঙ্গে কলম্বাস, ভাস্কোডিগামা, কুক, আমুণ্ডসেন, পিয়ারির যে তফাৎ লীগ অব নেশনের—U N. O-র সুপণ্ডিত, তর্কচূড়ামণি, পার্টি পলিটিক্সের প্যাঁচ বিশারদ প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই সব রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবীদের সেই তফাৎ। নতুন পথে চলে নতুন সভ্যতা সমাজ গড়ে তোলার জন্যে যে ধীশক্তি, কল্পনার যে দুঃসাহস, চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন তা এঁরা পাবে কোথায়? তা ছিল সেই সব বৈপ্লবিক সমাবেশে যা দেখা গিয়েছিল আমেরিকায়, ফ্রান্সে, পশ্চিম ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদগ্ধ্যের যুগে ও বিপ্লবের যুগে। বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবীদের খাস দরবারের অন্যতম হয়েছিলেন তিনি। কোথায় কল্পনার প্রফুল্ল আর কোথায় বাস্তবের মানবেন্দ্রনাথ!

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে মানবতন্ত্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেটুকু তখন ভারতে পৌঁছেছিল তারই চূড়ান্ত ফলস্বরূপ উপস্থিত করেছিলেন—তখনকার বাঙ্গালী পাঠকের শিক্ষা ও সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি রেখে।

মানবেন্দ্রনাথ সেই মানবতন্ত্রকেই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে পরিশ্রুত করলেন, এবং নিজ জীবনে তার সার্থক প্রয়োগ করে সকল মানুষেরই যে তা সাধ্যায়ত্ত তা প্রমাণ করে পরম রমণীয় করে তুললেন।

রায় শুধু মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন না, সে মন্ত্র যে ফলপ্রদ এবং সাধ্যায়ত্ত, তা যে একান্ত লোকায়ত, তিনি তা সাধনার দ্বারা নিজ জীবনে সার্থক করে তুলেছিলেন।

নিখিল বিশ্বের মানবজাতির কাছে মানবেন্দ্রনাথ চিরকাল অমর হ'য়ে থাকবে: তাঁর জীবন, তাঁর বাণী এই মহাসংকটে তাদের ধ্রুবতারার মতই পথ দেখাবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রায় যদি আজ থাকতেন

১৯৬৩ সালের ২৫শে জানুয়ারী কলিকাতায় মানবেন্দ্রনাথের নবম স্মৃতি-বার্ষিকী সভার অধিবেশন চলেছে। সভাপতির আসনে হাইকোর্টের বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র মহাশয়। তিনি বলছেন, "আমার স্মৃতিপথে ভেসে উঠছে সেই রৌদ্র করোজ্জ্বল প্রভাত—কারামুক্তির পর যেদিন তিনি তাঁর খ্যাত নাম্নী সহধর্মিণীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা আসেন, এবং শোভাযাত্রা সহকারে হাওড়া ষ্টেশন থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নীত হ'ন। আমি তাঁকে সেদিন প্রথম দেখি আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থল থেকে। আমাদের সবাইকে বলা হয়, মানবেন্দ্রনাথই শরৎচন্দ্রের অমর রচনা পথের দাবীর নায়ক সব্যসাচী।"

মনে পড়ে গেল, শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

"রাজার শত্রু! হ্যাঁ, শত্রু বলবার মত লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন, সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমান চলত, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মা নদী সাঁতার কেটে পার হ'য়ে যান, বাধে না, সম্প্রতি অনুমান এই যে, চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তিনি বর্মা মুলুকে পদার্পণ করেছেন।

"........এই সব বড়লোকদের কি আর কেবল একটি নামে কাজ চলে? অর্জুনের মতো দেশে দেশে কত নামই হয়তো এঁর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়তো শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারছ না। আর কী যে ইতি মধ্যে করে

ছিলেন সম্যক ওয়াকিবহাল নই। রাজশক্ররা তো তাঁদের সমস্ত কাজ কর্ম ঢাক পিটিয়ে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুণায় এক দফায় তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর এক দফায় তিন বছর জেল খেটেছেন জানি! ছেলেটি দশ-বারোটি ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার, ইনি কোথাকার। জার্মানীর জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাস করেছে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, বিলেতে আইন পাস করেছে, আমেরিকায় কী পাস করেছে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন তখন কিছু একটা করেই থাকবে—এসব বোধ করি তার তাস-পাশা খেলার সামিল, রিক্রিয়েশন,—কিন্তু কিছুই কোনো কাজে এল না বাবা, এর সর্বাঙ্গের শিরা দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে, ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও, ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শাস্তি-স্বস্তি নেই। এদের না-আছে দয়া-মায়া, না-আছে ধর্ম-কর্ম, না-আছে কোনো ঘর-দোর। বাপ্ রে বাপ! আমরাও তো এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মাল তা ভেবেই পাওয়া যায় না।"

সেই সঙ্গে মনে পড়ল, মানবেন্দ্রনাথের কথা, "........ধনতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে জগৎকে বাঁচাবার জন্যে যে কমিউনিজমকে স্বাগত জানানো হয়েছিল আজ সেই কমিউনিজিম ভয়ংকর দানবরূপে সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছে।"

সেই দানব আজ ভারতের দ্বার ভেঙ্গে অনেক—অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। রুখবে কে? আজ কি কেবল বীর পূজার দিন, শুধু তাঁর আলেখ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেই আয়োজন শেষ হ'বে?

সব্যসাচী তাঁর অসাধারাণ দৈহিক, মানসিক ও ধীশক্তির বলে পদ্মানদী সাঁতার কেটে পেরিয়েছেন, বন্দুক-পিস্তলে তাঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য ছিল, বহুজ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন তিনি। কিন্তু সে সব স্মরণ করে কি আজ কমিউনিজিমের দানবকে রোখা যাবে?

মনে পড়ল রায়ের কথা:

"কমিউনিজিমকে পরাভূত করার একমাত্র উপায় হ'ল, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ও কমিউনিজিমের ডিকটেটরি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে এক উন্নততর রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।"

কিন্তু এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা তো দু'একদিনের কর্ম নয়, তবে কি কমিউনিষ্ট চীনকে রোখা যাবে না ?

আবার মনে পড়ল রায়ের কথা। কোনদিন কোন সমস্যাকেই তিনি সুদূর প্রসারী সমাধান দিয়ে কর্তব্য শেষ করতে চাইতেন না। সেই সঙ্গে আশু কর্তব্য কী হ'বে তাও বলতেন। তাহ'লে বর্তমানে সেই আশু কর্তব্য কী ? কে বলবে ?

আজ যদি রায় থাকতেন !

তিনি নাই কিন্তু তাঁর অজস্র লেখা ও কথা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। আজ তার মধ্যে থেকেই পথের নিশানা খুঁজে নিতে হবে।

মনে পড়ল চীনের আক্রমণ অনুমান করে তিনি যে সব সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তার একটিতে বলেছিলেন :

"এশিয়াতে কমিউনিজিমকে যদি পরাজিত করতে হয় তাহলে জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। কমিউনিষ্টদের মতই জনসাধারণের অন্ততঃ মোটা ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। গ্রাম থেকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্থা-সমূহ গড়ে তুলতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ, বই পড়ে নয়, বক্তৃতা শুনে নয়, হাতে-কলমে গণতন্ত্রের সুফল নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। নতুবা শত শত মাইল দূরে অবস্থিত পার্লামেণ্ট বা সংসদ মার্কা নাম-কা-ওয়াস্তে গণতন্ত্র কমিউনিষ্টদের ধাক্কায় টিকবে না।"

রায়ের এই আশু ব্যবস্থা কি অবিলম্বে গড়ে তোলা যায় না ? মোটা ভাত-কাপড়ের অঙ্গীকার ? উপকরণ কি নাই ? সাধারণের চোখে যা উপকরণ নয়, তা তাঁর হাতে পড়ে কোন এক সুমহান সৃষ্টির চমৎকার উপাদান হয়ে যেত। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তাই ভাবি, আজ যদি তিনি থাকতেন !

তবু কল্পনা থেমে থাকে না। অনুমান করি, তিনি দেখতেন, বর্তমান কংগ্রেসী সরকার প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি না করেই লিবারেলদের মতই 'ভাল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ভাল মানুষ তৈরীর' কারখানা খুলেছেন—পঞ্চায়েৎরাজ আইন, গ্রামসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র গ'ড়ে। কিন্তু গ্রামে ভাল মানুষের সংখ্যাধিক্য না হয়ে দলাদলিই বেড়েছে। সেই সঙ্গে নোংরামী। বেড়েছে ধূর্ত লোকের সুযোগ-সুবিধা। ব্যক্তি-মানুষ আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, নিজ ভাগ্য নিজে গড়তে, নিজের সংসার সমাজের সমস্যা নিজে সমাধান করতে যদি নাই এগিয়ে এল তবে গ্রাম-সভার হাতে ক্ষমতা

প্রত্যর্পণের ফল কী দাঁড়াল? গ্রামের মোড়লরা—মুখ্যরা—প্রধানরা যা করবেন তাই চলতে থাকবে, আর জনসাধারণ কেবল ঘাড় নাড়বেন, আর বলবেন, "আজ্ঞে, আপনারা যা করবেন তাতেই আমাদের মত আছে।"

তথাপি এটি একটি মস্ত উপাদান হ'তে পারে।

তারপর বর্তমান আপৎকালীন ব্যবস্থারূপে পল্লী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও শ্রম ব্যাঙ্ক পরিকল্পনা। এটি যদিও একটি কবন্ধ মার্কা অসম্পূর্ণ পরিকল্পনা, তথাপি একে যুক্তিসংগতভাবে সম্পূর্ণতা দান করতে পারলে অর্থাৎ ধড়ের উপর মাথাটি বসালে, এটিও একটি চমৎকার উপাদান হ'তে পারে।

পঞ্চায়েৎরাজ আইনের দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধি মারফৎ শাসনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হ'য়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচিত হয় খুব ছোট ছোট নির্বাচন কেন্দ্র থেকে (মোটামুটি ৫০ থেকে ১০০ জন পর্যন্ত পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি নিয়ে এক-একটি কেন্দ্র গঠিত) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। এরা এই সকল ভোটারদের সম্মিলিত সভার অর্থাৎ গ্রামসভার নিকট দায়ী থাকেন। সকল কাজের হিসাব দিতে হয়, সকল কাজের ও বাজেটের নির্দেশ নিতে হয়—বছরে দু'বার। গ্রামসভা ইচ্ছা করলে একুশ দিনের বিজ্ঞপ্তির পরও যখন খুশী কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় সত্যই এটি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। কিন্তু এর অর্থ কেউ বোঝে না, কাউকে বোঝান হয় না। যত টাকা এই পঞ্চায়েৎ আইন চালু করবার জন্যে ব্যয় করা হয় তার চেয়ে বহুগুণ অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করা হয় মানুষ যাতে আত্ম-সচেতন হয়ে না ওঠে, আত্মশক্তির সন্ধান না পায় তার জন্যে। সমগ্র সনাতনী সমাজ ও কায়েমী স্বার্থ এই কাজে লিপ্ত আছেন। অতএব এই প্রতিষ্ঠান শত বৎসর ধরে চললেও যে লোকে এর সম্যক তাৎপর্যসহ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মূল্য বুঝবে এমন ভরসা হয় না। ইউরোপে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও হয় নি। তথাপি এই পঞ্চায়েৎকে কাজে লাগান যায় এই পল্লী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে এর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে।

পল্লী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নর-নারীকে অন্ততঃ মাসে একদিন করে শ্রমদান করতে হবে—বিকল্পে একদিনের মজুরীর মূল্য। বর্তমানে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই শ্রমদান করতে প্রস্তুত, কিন্তু শ্রমদান করবে কোথায়? পরিকল্পনায় উৎপাদনের কতকগুলি

তাসা উপায়ের কথা লেখা হয়েছে—এই শ্রমব্যাঙ্কের শ্রমশক্তি নিয়োগ করে এক সর্বজনীন ধনভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে এবং এ থেকে দেশরক্ষা খাতে ও স্থানীয় অভাবগ্রস্তদের সাহায্যদান খাতে বরাদ্দ রাখা হ'বে। কিন্তু "দেশরক্ষা খাত" ও "স্থানীয় অভাব গ্রস্তের সাহায্যদান খাত" যতখানি কঠিন বাস্তব, পরিকল্পনায় উল্লিখিত উৎপাদনের উপায়গুলি ততখানি বাস্তব নয়—অনেক ক্ষেত্রেই অলীক। অর্থাৎ তার দ্বারা কোন ধনোৎপাদনই হবে না। ফলে প্রথমে প্রায় ন'দশ মাস অনেক সাধ্য-সাধনা ও অর্থব্যয় করে এখন সর্বত্রই কাগজ-পত্রের মধ্যেই প্রকল্পটি অনড় হয়ে পড়ে আছে।* নড়ন চড়ন চলেছে কেবল মন্ত্রী মহলে, কমিটির পর কমিটির সংগঠনে ও অধিবেশনে। তবু কুল মিলছে না—প্রকল্পকে এত ঢাক ঢোলের চিতেন বাজিয়েও জাগান যাচ্ছে না। এবার হয়তো বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের ডেকে পাঠান হবে রোগের নিদান আবিষ্কারের জন্যে!

অথচ এই রাতকানাদের সম্মুখেই রয়েছে বিনোবা ভাবের পরিকল্পনা: বিঘা-কাঠা দানের আন্দোলন। অর্থাৎ শতকরা ৫% ভাগ কৃষিযোগ্য জমি পঞ্চায়েতের হাতে অর্পণ। এই পরিকল্পনা যদি এই পল্লী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী প্রকল্পের মধ্যে গ্রহণ করা হ'ত, তাহ'লে এই শ্রম ব্যাঙ্কের শ্রমশক্তি এই জমির উপর নিয়োগ করে যে ধনোৎপাদন হ'ত তাতে যাদের নাই বা যাদের কিছু কম পড়ে (deficit) তাদের ডাল-ভাতের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে অঙ্গীকার করা চলত। ফলে চীনেদের ঠেকিয়ে রাখা নিশ্চয় সম্ভব হ'ত।

রায় বলেছেন, "কমিউনিষ্টদের মতই জনসাধারণকে অন্ততঃ মোটা ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।" এই ধনভাণ্ডার থেকে তা সম্ভব হতে পারত বা এখনো পারে।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, পল্লীর "অধিকাংশ মানুষের কম দুঃখ" আছে (১) এবং "কম মানুষের অধিক দুঃখ আছে" (২) গণনা করলে দেখা যাবে পল্লীর "অধিকাংশ মানুষের কম দুঃখ" নিবারণ পল্লীর মোট উৎপাদনের দুই শতাংশ থেকে করা যাবে; আর "কম সংখ্যক মানুষের অধিক দুঃখ" নিবারণ মোট উৎপাদনের তিন শতাংশ থেকে করা যাবে। তিন ও দুই, এই পাঁচ শতাংশ

---

* এ অংশটি ১৯৬৩ সালে লেখা। পরে এই প্রকল্পটির একেবারেই অপমৃত্যু ঘটেছে।

(১) অর্থাৎ পল্লী অঞ্চলের বর্তমান মাপ অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কম।

(২) অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশী।

উৎপাদন শ্রম ব্যাঙ্কের নিকট থেকেই পাওয়া যাবে ঋণ হিসাবে। এবং এই ঋণ শোধ করিয়ে নেওয়া যাবে পঞ্চায়েতের জমিতে কাজ দিয়ে।

বর্তমানে পারস্পারিক দরদ ও মরমী সহযোগিতার অভাবে—প্রতিবেশীর প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি গরীব জনসাধারণের কোন দরদ নাই, বিপদে প্রাণকে পণ রেখে লড়াই করার প্রবৃত্তি নাই; আর দেশশুদ্ধ সবাই তো গরীব।

এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে সেই অসহায় মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে। আর যেহেতু নিজেরাই সমবেতভাবে গ্রামের অন্নবস্ত্রের এতবড় নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম হচ্ছে, এই উপলব্ধির ফলে মানুষ যে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলতে পারে তার প্রত্যয় ও আত্ম বিশ্বাস গড়ে উঠবে; গণতন্ত্রের মধ্যে যে পদ্মমধু লুকানো আছে তার সন্ধান তখন সকলে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারাই পেতে থাকবে।

রায় বলেছিলেন, "গ্রাম থেকেই প্রকৃত গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে"।

এই নীতি দিয়েই সহর অঞ্চলেও সর্বজনীন ধনভাণ্ডার গড়ে জনসাধারণের মোটা ভাত-কাপড়ের deficit পূরণ করা চলবে। কল-কারখানার মালিকদের সামান্য কিছু সময়ের জন্যে তাদের কল-কারখানাকে শ্রমিকদের শ্রম-ব্যাঙ্কের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। প্রকল্পের এইরূপ রূপায়ণের ফলেই কমিউনিজিমের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে—সেই সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকবে এক নতুন মূল্যের উপর নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতা—যা মানব সভ্যতাকে লিবারেলিজিম কমিউনিজিমকে ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

উপাদান আজ অনেকই আছে, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করে কে?

এ কাজ যে বর্তমান ভারত সরকার পারবেন না, তা তো এই সর্বাধুনিক পরিকল্পনাটি থেকেও বেশ বোঝা যায়। বুঝতে কষ্ট হয় না, এই পরিকল্পনাটি রচনা হবার পর একাধিক হাত-এর ওপর তাঁদের অধিকারের অভিজ্ঞান চিহ্নিত করেছেন। উদ্দেশ্য হয়তো ছিল পরিকল্পনাটিকে কিঞ্চিৎ খাটো করার, কিন্তু খাটো করার উদগ্র আগ্রহে জিনিষটি এমনই খণ্ডিত হয়েছে যে তা একেবারেই অর্থহীন হয়ে সকল কাজের বাইরে গিয়ে বাতিল পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। সেই জন্যে সর্বত্রই আজ এই পরিকল্পনা অচল হয়ে পড়ে আছে। এ অবস্থা যে আসবে সে সময়েই আমরা সে কথা লিখেছিলাম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ইতিমধ্যে চীনের উদ্দেশ্য ঠিকই সিদ্ধ হয়ে চলেছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে জিনিষপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে, সাধারণের মধ্যে অসন্তোষও সেই অনুপাতে বাড়ছে। চীন এটাই

চেয়েছিল। এটাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র। সে অস্ত্রে আজ তারা ক্রমেই বলীয়ান হয়ে উঠছে।

সুতরাং এ কাজ করবে কে?

রায়ের historiology (ইতিহাসের গতি বিজ্ঞান) মার্কসীয় নয়। তিনি মার্কসীয় (historiology) দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদকে খণ্ডন করেছেন। তিনি মার্কসের ডায়লেকটিক্স অনুসারে পুরাতন সভ্যতার বিপর্যয়ে 'সম্পূর্ণ নতুন সভ্যতা সৃষ্টি' তত্ত্বের ত্রুটি দেখিয়েছেন। তাঁর historiology হ'ল, পুরাতন সভ্যতার শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ মল্যে মূল্যবান অবদান সমূহ যখন মানুষ ভোলে, জীবন যখন কষ্টকর হয়ে ওঠে, তখনই ভুলে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান অবদানসমূহ অর্থ নৈতিক পরিবেশ নিরপেক্ষ হয়েই মানুষ পুনরাবিষ্কার করে এবং নতুন মূল্যের সৃষ্টি করতে পারে।

অবশ্য সেই সব পুনরাবিষ্কৃত পুরাতন মল্য ও নতুন মূল্য ব্যক্তি মানুষের জীবনে গৃহীত হয়ে সমাজগ্রাহ্য হ'তে, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, মানুষের জীবন পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে তুলতে পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতার জন্যে বিলম্বিত হ'তে পাবে মাত্র; কিন্তু আইডিয়া—নতুন ভাব-ভাবনা, নতুন আদর্শবাদ অনুকূল অবস্থা পাওয়া মাত্র সমাজ জীবনে সাফল্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাসে negation of negation ঘ'টে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের একেবারে বিচ্ছেদ ঘটে না। মূল্যবান অবদানসমূহ ঠিকই উত্তরাধিকার সূত্রে পুরাতনের হাত থেকে নতুন পেতে পেতেই চলে—সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। মানুষের সহজাত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এনে দেয় ইতিহাসের এই গতিবেগ এবং এই মুক্তি প্রচেষ্টার কারণেই এর আনুষঙ্গিক সহজাত সত্যানুসন্ধিৎসা। এই মুক্তির প্রেরণাতেই মানুষ ইতিহাস রচনা করে, মুক্তির ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাময় সভ্যতা সৃষ্টি করে চলে। এই মুক্তির অর্থ হ'ল, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও সম্ভাবনাসমূহ বিকশিত ও পরিস্ফুট করে তোলার পথে বাধাসমূহের অপসারণ।

রায়ের নতুন সমাজ গড়ে তোলার পদ্ধতি (Methodology) হ'ল শিক্ষা বিস্তার। যদিও তিনি বিপ্লবী কিন্তু তিনি রক্তলোলুপ ভাবোন্মাদ ন'ন। নতুন সৃষ্টিসুখের রোমান্টিক ভাবাবেগকে তিনি যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি বলেছেন, নতুন মূল্যবোধ মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টার দ্বারাই জাগতে পারে; জোর করে মাথার ওপর চাপিয়ে দিলে তা ঘটে না। সেই জন্যে প্রয়োজন,

মানুষকে বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে নতুন মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান এবং তা জীবনে ও সমাজে রূপায়িত করে তোলার জন্যে মানুষকে নিজ নিজ সৃজনী ক্ষমতা সম্বন্ধে আত্মসচেতন করে তোলা।

তাঁর এই historiology ও methodology-কে (আদর্শ লাভের পদ্ধতি ও কৌশল) মিশিয়ে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, রায় কি তবে সংস্কার-বাদী ছিলেন? সংস্কারবাদ (Reformism) বলতে যা বোঝায়, তা তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি বিপ্লবী। বিপ্লব বললেই রক্ত ও ব্যাপক ধ্বংসলীলার কথাই মনে আসে। কিন্তু বিপ্লব তা নয়—বিপ্লব, নতুন মূল্য সৃষ্টি।

সংস্কারবাদ বা রক্ষণশীলতা তাকেই বলা হয় যা নতুন সৃষ্টিতে ভীত-আতঙ্কিত হয়ে অযৌক্তিক আগ্রহে পুরাতনকেই আঁকড়ে থাকতে চায়। রায়ের ত্রিসীমানাতেও সে রক্ষণশীলতা ছিল না। বিভিন্ন বিপ্লবের ইতিহাস থেকেই তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, রক্তপ্রবাহে বৈপ্লবিক মূল্যসমূহ ভেসে যায়—বিপ্লবের অকাল মৃত্যু ঘটে। নতুন মূল্য সৃষ্টি জোর করে রাতারাতি হয় না। ফুলকে যেমন জোর করে ফোটান যায় না, আপন অন্তর্নিহিত তাগিদেই ফোটে, তেমনি মানুষের নতুন মূল্যবোধ আপন অন্তর্নিহিত তাগিদেই জাগে এবং অনুকূল পরিবেশে জীবনে রূপায়িত হয়ে ওঠে। কেবল সেই সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হয়, বাধা অপসারিত করতে হয়, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়তা করতে হয়।

বিপ্লবের এই নতুন historiology ও methodology রায়ের নিজস্ব অবদান। পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন।

রায় ছিলেন অতি উচ্চস্তরের একজন সমাজ সংগঠক—সোস্যাল আর্কিটেক্ট। রায় যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সকল দিক থেকেই নানা মানুষ এসেছিলেন তাঁর কাছে। তাঁদের মধ্যে যে কেবল সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও সোস্যাল টেকনলজিস্টই ছিলেন তাই নয়, ছিলেন অধ্যাপক, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতি। তিনি তাঁর নতুন সমাজ সংগঠন প্রচেষ্টায় প্রত্যেককেই যোগ্যতা অনুসারে যথোপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ধর্মী রায় ভক্তগণ একযোগে তাঁর অসম্পূর্ণ কার্য সমান জোরের সঙ্গে চালিয়ে নিতে পারেন নি। রায়ের প্রতি আনুগত্য থাকলেও রায়ের অবর্তমানে নিজেদের মধ্যে থেকে এমন কেউই এগিয়ে আসেন নি যিনি এই সকল রায়পন্থীকে সংহত করে তুলতে পারেন।

তাঁর পদ্ধতি যখন মানবতন্ত্রীদের দ্বারা ক্ষমতা দখল ক'রে সমাজে মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা নয়—শিক্ষার দ্বারা মানুষের সৃজনী ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের দিয়েই নতুন সমাজ গড়ে তোলা, তখন এই শিক্ষাদান পদ্ধতির কৌশল যে ঠিক কী হবে সে সম্বন্ধে গবেষণা-পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো দরকার। কারণ স্কুল-কলেজী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান যদি ফলপ্রসূ হ'ত তবে এতদিনে অনেক ভাল সমাজই গড়ে উঠতে পারত, কারণ স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে অনেক ভাল ভাল কথাই লেখা থাকে। ভারতের পুরাতন সভ্যতার মধ্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ প্রভৃতি মূল্যকে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পুনরাবিষ্কৃত করার উদ্দেশ্যে ও এই নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি আবিষ্কারের মানসে তিনি Indian Renaissance Institute নামে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন তাও ঠিকমত চালানো সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে লেখা ছিল :

"The objects of the Society are :—

(a) To develop, organise and *conduct* a movement to be called the Indian Renaissance Movement, etc...." কিন্তু তা রূপায়িত করে তোলা হয় নি। দিনের পর দিন বিতর্ক চলতে থাকে এই "conduct" কথার তাৎপর্য নিয়ে। কে কাকে conduct করবে? তাতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খণ্ডিত হবার সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই যদি গেল তবে আর পার্টি তুলে দেওয়া হল কেন?

আসলে এটা যুক্তি নয়। কারণটা ছিল, রায়-অনুগামীদের মধ্যে যাদের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সোশ্যাল টেকনোলজির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল তারা এই সংহত প্রচেষ্টার বিরোধী ছিল না। কারণ তাঁরা জানতেন, কোন আদর্শের সমর্থন ও তা পাওয়ার জন্যে একই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে সোচ্চারিত চাঞ্চল্যকেই আন্দোলন বলে এবং তা গড়ে তুলতে হ'লে বা সেই আদর্শকে নির্ভুল করার জন্যে এবং তা জীবনে রূপায়ণের কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা চালাতে গেলে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় এবং তা সম্ভব হয় না যদি না তাকে "conduct" করা হয়। আপত্তি উঠত সেই সব রায়ভক্তগণের মধ্য থেকে যাঁরা অধ্যাপক, সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী। কারণ তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাঁরা স্বতন্ত্র এবং তাতেই তাঁদের সৃজনী শক্তির সম্যক বিকাশ সম্ভব। তাঁরাই এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতেন। ফলে

সমগ্র ভারতে রায়ের ঈপ্সিত আন্দোলন বা গবেষণা কার্য কোনটাই তেমন চলে নি।

সেই জন্যে বলছি, আজ যদি তিনি থাকতেন তবে এমনটি যে হ'ত না তা অনুমান করা যায়।

এতদিনে তাঁর জীবন দর্শনের মূল ও প্রধান কথাটি হয়তো তিনি প্রতি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন। সেই কথাটি হ'ল, ব্যক্তি মানুষ তার নিজ নিজ সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে সঠিক পথে চিন্তা করে কাজ করতে পারলে নিজ সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে।

হয়তো দেখতাম, এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে, নিজ কর্তৃত্ববোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধন হচ্ছে, সেই সঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধও বাড়ছে।

এই আত্মমর্যাদা বোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম যে, আত্মমর্যাদায় সচেতন মানুষের পক্ষে আর ঘুষ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ভেজাল মেশাতে বাধছে, মুনাফাবাজি করা চলছে না। হয়তো দেখতাম, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ নিজেও যেমন প্রত্যাশা করছে, অপরে তাকে মর্যাদা দিক, সেও তেমনি অপরকে মর্যাদা দিতে শিখছে; অপরের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করছে আর সদ্ব্যবহার পাবার প্রত্যাশাও করছে। অর্থাৎ মানুষ মর্যাল হয়ে উঠছে—নীতি-পরায়ণ হয়ে উঠছে।

হয়তো দেখতাম, সমাজ জীবনে সকল মানুষ সকলকে মর্যাদা দান সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজ জীবনে এক রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে।

দেখতাম, রাজনীতি ক্ষেত্রে, পার্টি পলিটিক্সে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি দূর হ'য়ে সত্যিকারের সেবা করার মনোবৃত্তি জেগে উঠে এক সুস্থ আবহাওয়া বইতে সুরু করেছে। প্রতিনিধিরা ভোটারদের কাছে পাঁচ বছর অন্তর না গিয়ে ঘন ঘন যেতে সুরু করেছেন এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে ভোটারদের নিকট প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য নিজ পার্টির সঙ্গে লড়ছেন, বিধানসভায় চেষ্টা করছেন, সরকারী কর্মচারীদের প্রভাবিত করছেন।

দেখতাম, সরকারী কর্মচারীদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগার ফলে সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে সুখৈশ্বর্য লাভের পরিবর্তে প্রকৃত Public Servant-দের যেমনটি হওয়া উচিত সেইরূপ জনসেবকের মনোভাব দেখা দিচ্ছে।

দেখতাম, অর্থনীতি ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা যখন তাদের অতিরিক্ত মুনাফাবাজি দিয়ে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে তখন আত্মসচেতন মানুষ তাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে এবং অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখতাম, ছাত্রদের মধ্যে, যুবকদের মধ্যে যাতে সঠিক ভাবে চিন্তা করার পদ্ধতিটি গড়ে ওঠে সেই জন্যে দেশের সর্বত্র রেনেসাঁস আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

একদিন মানবেন্দ্রনাথ দেশব্যাপী নির্জীব প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে বিপ্লবী ভারতের মূল ভিত্তিরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—শ্লোগান দিয়েছিলেন, "প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে তোল।"

আজ এই দেশব্যাপী নির্জীব গ্রামসভাগুলিকেও সংহত গণতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে তোলার জন্যে হয়তো ধ্বনি তুলতেন, "গ্রাম-সভা সমূহকে সক্রিয় করে তোল—Activise the Gramsabhas।"

আজ তিনি নাই। রেখে গেছেন দায়-দায়িত্ব, আর সে দায়িত্ব বহনের জন্যে তিনি রেখে গেছেন তার দর্শন—রাজনীতি—অর্থনীতি আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে অনুশীলন ব্রতের সাধনার এক সফল দৃষ্টান্ত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রায় রচিত পুস্তক-পুস্তিকা

এটি রায় রচিত সকল গ্রন্থাদির তালিকা নয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বহু রচনা পুস্তক-পুস্তিকাকারে বা সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছিলেন। বহু লেখা বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের পুরাতন ফাইলের মধ্যে রয়েছে যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। জেলে বসে যে সব লেখা লিখেছিলেন তা M. N. Roy Archives, দেরাদুন-এ এখনো প্রকাশের অপেক্ষায় সংরক্ষিত রয়েছে। যে সব পুস্তক-পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল তারই একটি তালিকা রায়ের জীবদ্দশাতেই তিনি এবং তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতী এলেন রচনা করেছিলেন। এই তালিকার অধিকাংশ পুস্তকই দেরাদুনের রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটে আছে—অন্ন কিছু নাই। ১৯৫৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ণ ইণ্ডিয়ান প্রোজেক্টের অধীনে মিঃ প্যাট্রিক উইলসন রায়ের লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তার সংখ্যা ১২৪টি। নিম্নলিখিত তালিকাটি এই দু'টি তালিকা থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। মিঃ উইলসনের তালিকায় একই পুস্তকের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত পুস্তকের নামও ছিল ; আমরা সেগুলি বাদ দিয়েছি।

তারকা চিহ্নিত বইগুলির কপি এখন দুষ্প্রাপ্য।

*1. High Road to Peace. Mexico, 1917 (mentioned by Roy in his Memoirs).

2. La India : su pasado, su presente y su porvenir, Mexico, 1918.

*3. Letters to Indian Nationalists, 1920

*4. The Problems of India, 1920.

5. India in Transition, Geneva, 1922. Also Russian version, 1920 and German version, 1922.

6. What do we want ? Geneva, 1922.

7. India's Problem and its solution, 1923.

8. One year of Non-Cooperation from Ahmedabed to Gaya, Calcutta, 1923.

9. Political Letters, Zurich, 1924.

10. Cawnpur Conspiracy Case : An open letter to the Rt. Hon. J. R. Macdonald, London, 1924.

11. What is to be done ? 1925.

12. The Aftermath of Non-Cooperation, London, 1926.

13. The Future of Indian Politics, London 1926. Also Russian edition ; German edition Hamburg, Berlin.

14. La Liberation Nationale des Indes, Paris, 1927.

15. Les Allies Internationaux de l' Opposition du P. C. et de l' RUSS, Paris, 1927.

16. Die Internationalen Verbundeten der Opposition in der KPDSU, Hamburg, 1928.

17. Kitaiskaia revoliutsiia i Kommunisticheskii internatsional ; Moscow & Leningrad, 1929.

*18. The Lessons of the Lahore Congress, 1930.

19. Revolution und Konter Revolution in China, Berlin, 1930. English version, "Revolution and Counter-revolution in China" Published from Calcutta, 1946.

20. Our Task in India, 1932.
21. I' accuse, New York, 1932. Same text published in India at the same time under the title, My Defence.
22. Our Problems, 1937.
23. Letters to Congress Socialist Party, 1937.
24. Our Differences, 1938.
25. My Experiences in China, 1938.
26. Fascism, Its Philosophy, Profession and Practice, 1938.
27. The Historical Role of Islam, 1939.
28. Heresies of Twentieth Century, 1939.
29. From Savagery to Civilization, 1939.
30. The Alternative, 1940.
31. Materialism, An Outline of the History of Scientific Thought, 1940.
32. Science and Superstition, 1940.
33. Man and Nature, 1940.
34. Letters to Mahatma, 1940.
35. Gandhism, Nationalism and Socialism, 1940.
36. Memoirs of a Cat, 1941.
37. Ideal of Indian Womanhood, 1941.
38. Freedom or Fascism ? 1942.
39. Scientific Politics, 1942.
40. War and Revolution, 1942.
41. India and War, 1942.
42. Communist International, 1943.
43. Nationalism, An Antiquated Cult, 1943.
44. Indian Labour and Post-War Recostruction, 1943.
45. Nationalism, Democracy and Freedom, 1943.

46. Poverty or Plenty ?, 1943.
47. Planning a New India, 1943.
48. Letters from Jail; 1943.
49. Alphabet of Fascist Economics, 1944.
50. National Government or People's Government ?, 1944.
51. Constitution of India, A Draft, 1944.
52. This way to Freedom, 1944.
53. Last Battles of Freedom, 1944.
54. Problems of Freedom, 1945.
55. Jawaharlal Nehru, 1946.
56. I. N. A. and August Revolution, 1946.
57. New Orientation, 1946.
58. Beyond Communism, 1946.
59. New Humanism, 1947.
60. Science and Philosophy, 1947.
61. The Russian Revolution, 1949
    The first part of the book was originally published as a smaller book in 1937.
62. India's Message, 1950.
63. Radical Humanism, 1952.
64. Reason, Romanticism and Revolution, 2 vols, 1952.
65. Crime and Karma, Cats and Women, 1957.
    (Posthumously published)
66. Politics, Power and Parties, 1962.
    (Posthumously published)
67. Memoirs, 1964—(Posthumously published).

PAMPHLETS

1. My crime (on his expulsion from the Comintern).
2. On Stepping Out of Jail.
3. Which way, Lucknow ? (Written in Jail).
4. My Differences with the Congress.
5. Tripuri and After.
6. This war and our Defence.
7. The New Path (Manifesto of the Radical Democratic Party).
8. Message to the U. S. S. R.
9. History is not made this way (with others).
10. On the Congress Constitution.
11. On Communal Question.
12. What is Marxism ?
13. The Future of Socialism.
14. A New Approach to Communal Problem.
15. Indian Renaissance Movement.
16. New Orientation.
17. The Congress and the Kisans.
18. States' People's Struggle and the Congress.
19. Principles of Mass Mobilisation.
20. Twentieth Century Jacobinism.
21. Relation of Classes.
22. Your Future.
23. Future of Democracy.
24. Sino-Soviet Treaty.
25. Satyagraha.
26. Origin of Radicalism in Congress.
27. People's Party.
28. Postwar Perspective.
29. Library of a Revolutionary.

30. Problems of Indian Revolution.
31. Whither Europe ?
32. World Crisis.
33. Leviathan and Octopus.
34. Asia and the World
35. Cultural Prerequisites of Freedom.
36. The Concept of Causality in Modern Science.
37. The 22 Theses of Radical Democracy.
38. The Way Ahead in Asia
39. Humanist Politics.

এই সকল পুস্তক-পুস্তিকা ছাড়াও রায়ের লিখিত প্রচুর পরিমাণ মুদ্রিত পুস্তিকা আছে যার নাম দেওয়া হল না। সম্প্রতি প্রকাশিত রায়ের জীবনস্মৃতিতে আরও ২৭ খানি পুস্তিকার নাম আছে ও বহু অমুদ্রিত লেখা আছে যা একদিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে, এবং প্রতি বছরই এর থেকে কিছু কিছু নতুন পুস্তক ছাপা হচ্ছেই। যে সব পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে তা চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(১) জেলের মধ্যে লেখা ৯ খণ্ডে বিভক্ত Philosophical Consequences of Modern Science-এর পাণ্ডুলিপি।

(২) সর্টহ্যাণ্ডে লিখিত বক্তৃতামালার প্রচুর পরিমাণ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

(৩) প্রচুর পরিমাণ অপ্রকাশিত পত্রাবলী।

(৪) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত প্রচুর পরিমাণ রচনা যা এখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

এই চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত রচনার মধ্যে আছে তৃতীয় দশকে সম্পাদিত **Masses**, Vangurd ও Advance Guard পত্রিকায় লিখিত বহু লেখা; কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র INPRECOR পত্রিকায় লেখা বহু রচনা; এবং কমিউনিষ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠদের পত্রিকায় লেখাসমূহ; ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত (অপ্রকাশিত লেখা পরেও অনেক বেরিয়েছে) সাপ্তাহিক The Independent **India** পরে **The Radical Humanist** এবং **Daily Independent India,** পরে **Vanguard** (যুদ্ধের সময় কিছু দিন দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল)—এতে

লেখা সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধাদি ; ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ত্রৈমাসিক The Marxian Way ও পরে The Humanist Way-তে লেখা রচনাসমূহ। এই সকল লেখার মূল পাণ্ডুলিপি বা পাণ্ডুলিপির মাইক্রো ফিল্ম ফটো তোলা হয়ে দেরাদুনের 'রায় আর্কাইভস্'-এ রক্ষিত আছে। এই সকল সংগ্রহ ছাড়াও এখনও বহু লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যথা ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাসমূহ ; মেক্সিকোতে থাকাকালীন সেখানে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি ; তৃতীয় দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছদ্মনামে লেখা রচনাবলী, ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে নিজ সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা সমূহ।

দেরাদুনের Indian Renaissance Institute রায়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশের চেষ্টা করছে। প্রয়োজনীয় অর্থাদি যেমন যেমন সংগ্রহ হ'তে থাকবে এই আরব্ধ কার্যও সেই মত সম্পাদিত হতে থাকবে।*

* Vide—*M. N. Roy—Philosopher—Revolutionary* : A symposium compiled and Edited by Sib Narayan Ray.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	২১	Derection	Direction
৪১	১৭	বৈপ্লাবিক	বৈপ্লবিক
৪৬	১৫	কৈশেরের	কৈশোরের
৫০	৮	Councial	Council
৬৩	২২	সন্ত্রান্ত	সম্ভ্রান্ত
৭২	১৬	থামাকো	থামোকা
৭৫	২০	কবতরণ	অবতরণ
৯৫	২১	আবদান	অবদান
৯৬	১	রাজাত্বে	রাজত্বে
১০৪	৯	বিলাপ	বিলোপ
১০৭	১০	বৈপ্লাবিক	বৈপ্লবিক
১১০	৩০	বুদ্ধিজীদের	বুদ্ধিজীবীদের
১১৭	২৩	পাশ্চাদ্দেশ	পশ্চাদ্দেশ
১২৭	১৩	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যে
১২৮	১৯	করেই চলতে হবে।	করেই চলতে হবে।”
১৩০	২১	সম্মলনের	সম্মেলনের
১৩১	২৯	উইরোপে	ইউরোপে
১৫৭	১১	জানিত	জনিত
১৬৩	১৮	কংগ্রেসব	কংগ্রেসের
১৬৯	২৮	লুক্সেমবার্গ	লুক্সেমবার্গ
১৭৬	২৭	সমালেচনা	সমালোচনা
১৭৮	১০	কনিউনিষ্ট	কমিউনিষ্ট
১৭৯	২০	কাজ শেষ করে। তিনি	কাজ শেষ করে· তিনি
১৮৭	৩	পুবোভাগ	পুরোভাগে
১৮৯	১৩	আশা-আকাঙ্খা	আশা-আকাঙ্ক্ষা
১৯৬	৮	Theroy	Theory
১৯৭	৯	মার্কাসকে	মার্কসকে
২০৬	৮	আরব সাগর	আরল সাগব
২১৩	২১	রায়েক	রায়ের
২৪৭	১২	সক্রির	সক্রিয়
২৪৯	১৯	ধারণকে	ধারণাকে
২৫২		একচত্বরিংশ পরিচ্ছেদ	একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ
২৫৬	৩	১৯৬২	১৯২৬
২৫৭	৮	১৯৪৭	১৯২৭
২৬২	২২	New Orietation	New Orientation
২৭১	১৩	রায় যে কমিউনিষ্ট	রায় কমিউনিষ্ট

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৪	১৬	আম্মোগোপন	আত্মগোপন
২৭৯	২৯	দেখা হয়	দেখা দেয়
২৮২	৯	ভ্রান্ততা	ভ্রান্তি
৩০৩	১৪	পদচ্যুতা	পদচ্যুত
৩০৮	৯	Secessation	Secession
৩১৮	৪	কবাবাসের	কারাবাসের
৩১৯	১৯	কোম্পনীব	কোম্পানীর
৩৩৩	২৮	মধ্যবিত্তের	মধ্যবিত্তের
৩৪৪	১	অস্বীকার ক'রে। ভারতের	অস্বীকার ক'রে ভারতের
৩৬৬	১৫	দ্বারই	দ্বারাই
৩৭০	১৩	জয়ী হয়েছেন।	জয়ী হয়েছেন,
৪১৪	২	যথসম্ভব	যথাসম্ভব
৪৩৬	২৫	সাখ্যাধিক্যে	সংখ্যাধিক্যে
৪৪০	পত্রাঙ্ক	৩৪০	৪৪০
৪৫৬	২৭	বর্ত্তামানের	বর্ত্তমানের
৪৯৩	৪	দুঃসাহিক	দুঃসাহসিক
৪৯৭	১	ফ্যাদিবাদের	ফ্যাসিবাদের
৪৯৭	১৯	গ্রহণ করে একে	গ্রহণ করে চললেও একে
৫০০	১১	পাঞ্চাশ	পঞ্চাশ
৫৬৪	পত্রাঙ্ক	৬৬৪	৫৬৪
৫৬৮	১৫	অপ্রিব	অপ্রিয়
৫৭৬	৭	নেই	সেই
৫৯৭	১০	অর্তি	আর্তি
৬১৪	৫	Optimst	Optimist

এ ছাড়া ণত্ব—ষত্ব বিধান ও উ ঊ কার প্রভৃতির কিছু ভুল রয়ে গেল, সুধী পাঠক সে জন্য ক্ষমা করবেন।

সাংকেতিকী

Ibid—In the same book mentioned just before: পূর্ববর্তী পুস্তকে।

I. I.—Independent India.

৫৩ পৃষ্ঠা থেকে ৬১ পৃষ্ঠার ২১ পঙক্তি পর্যন্ত সিডিসন কমিটির রিপোর্টের অনুবাদ। কিন্তু নিয়মমত উদ্ধৃতি চিহ্ন "—" দিতে ভুল হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত (২৯৬ পৃঃ) উদ্ধৃতি অংশগুলি ছোট মাপের পঙক্তির সাহায্যে (ইণ্ডেণ্ট কম্পোজ) দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী খণ্ড সমূহে তা পুরোমাপের পঙক্তিতে উদ্ধৃতি চিহ্নের "—" সাহায্যে দেওয়া হয়েছে।

শুদ্ধিপত্র—৩ (উপক্রমণিকা)

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	২৬	পরিবর্ত্তণ	পরিবর্ত্তন
১৪	১৯	Revolution	Revelation
২০	১২	Sarte Briand	Chateau-briand
২০	৫	Jhon Boodle	Jhon Bowle
২০	১১	Erich Fromme	Erich Fromm
২১	২৪	Obejective	Objective